ISBN 984-70000-0231-0

অসম্পূর্ণ যদিও পূর্ণ ছবির সন্ধান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রামেন্দ্র চৌধুরী

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

অসম্পূর্ণ যদিও পূর্ণ ছবির সন্ধান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রামেন্দ্র চৌধুরী



Northern University * Bangladesh
NUB Library

অসম্পূর্ণ যদিও পূর্ণ-ছবির সন্ধান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রামেন্দ্র চৌধুরী

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

NUB LIBRARY
ACCESSION NO. 98797
ACCESSION DATE
PROGRAM, CAMPUS

অসম্পূর্ণ যদিও পূর্ণ-ছবির সন্ধান :
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
রামেন্দ্র চৌধুরী

প্রকাশক : কমলকান্তি দাস, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, বেজমেন্ট : ৫৫, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কম্প্লেক্স, ২৫৩-৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু। বর্ণবিন্যাস : ইমারত কম্পিউটারস, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা—১১০০। মুদ্রণে : মৌমিতা প্রিন্টার্স, ২৫ প্যারীদাস রোড, ঢাকা—১১০০। গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রকাশকাল : এপ্রিল, ২০১৩।

মূল্য : ৫০০.০০ টাকা মাত্র।

Bangabandhu Shakh Mujibur Rahaman By Ramandra Chowdhury. Published by Kamolkanti Das, Jatiya Sahitya Prakash, Basemant : 55, Concord Emporium Shoping Comoplex, 253-54 Elephant Road, Kantabon, Dhaka-1205. Design : Charu Pintu. Computer : M.D Elias, Emarat Computer, 34 Northbrook Hall Road, Dhaka-1100. Date of Published : April 2013.

Price Tk. 500.00 Only. US $ 10.

ISBN 984-70000-0231-0

উৎসর্গ

আবার বাবা
রাজেন্দ্র কুমার চৌধুরী
আমার চেতনায়
মুজিব-অনুরাগের বীজ বপন করেছিলেন
তারই ফসল এ বইটি
তাঁর পুণ্য স্মৃতিতে নিবেদিত

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬০০০; ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
ই-মেইল bangla@du.bangla.net

Department of Bengali
University of Dhaka
Dhaka—1000, Bangladesh
Call: 9661900-73/6000; Fax: 880-2-8615583
E-mail: bangla@du.bangla.net

Date:

মুখবন্ধ

এই বইতে রামেন্দ্র চৌধুরী চেষ্টা করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরতে। প্রকাশিত উপকরণের ভিত্তিতে তিনি বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনৈতিক কর্মধারার ধারাবাহিক আলেখ্য তৈরি করেছেন। লেখক বঙ্গবন্ধুর অনুরাগী, তাই বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে তাঁর আবেগ ও শ্রদ্ধাবোধ। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে যেসব রাজনৈতিক সমালোচনা আছে, তিনি তার সবই উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে খন্ডন করেছেন।

যাঁরা অল্প পরিসরে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে চান, এ বই তাঁদের প্রয়োজন মেটাবে। বইটি পাঠকের সমাদর লাভ করবে বলে আমার বিশ্বাস ॥

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৬ নভেম্বর ২০১১

"কেউ হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বা মুজিব বা আইনস্টাইন হয়ে উঠতে পারেন না"

'সবিনয় নিবেদন'

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি যিনি, তাঁর প্রতি পরম কৌতুহল আমার ১৯৬০এর দশক থেকেই। কৌতুহল ক্রমশ তুঙ্গস্পর্শী হয় একাত্তরের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের সময়, দিন-ক্ষণের নির্দেশ করতে গেলে বলতে হয় একাত্তরের পয়লা মার্চ স্বতঃস্ফূর্ত মিছিলে-স্লোগানে প্লাবিত অপরাহ্নের ঢাকার কথা। অতঃপর কৌতুহল থেকে আকর্ষণ এবং ফল-পরিণামে গভীরতম শ্রদ্ধাবোধ। আমার উপলব্ধিতে বঙ্গবন্ধু মুজিব শুধু বাংলাদেশের নয়, উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটেও একজন ব্যতিক্রমী রাজনীতিবিদ। বিশ্বমানেও তিনি তূলণীয় রাজনীতির শ্রেষ্ঠ বরপুত্রদের সাথেই। সশ্রদ্ধ অনুভবে বিশ্বাস করি, বুদ্ধি বা কৌশল অপেক্ষা ব্যক্তিগত সাহস, সততা এবং আপোষহীন গণ-কল্যাণকামিতাই ছিল তাঁর প্রধানতম শক্তি। আমরা বাঙালিরা একান্ত গৌরবের সাথেই বলতে পারি, তিনি বাঙালি, আমাদের বাংলারই মানুষ, সতত শ্রদ্ধেয় এবং অনুসরণীয় একজন মানুষ। নিজের মত করেই আমি সন্ধান করি, সন্ধান চাই সেই মানবিক রাজনীতি-নিবেদিত, 'রাজনীতির কবি' মানুষটির পূর্ণ-ছবির, মনের গভীরে যাঁর দিকে তাকিয়ে আপ্লুত কণ্ঠে বলা চলে, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'। কিন্তু আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় দেখেছি, তৃষ্ণা মেটে না, পূর্ণ-ছবির সন্ধান মেলে না।

মণীষী-বাক্য : কোনো বিষয়ে ভালো করে জানতে হলে, সে-সম্পর্কে লিখতে শুরু করাই হচ্ছে উত্তম পন্থা। তবু সাহস করে উঠতে পারিনি। কিন্তু এক সময় অনুভব করেছি, আমার সকল জড়তা-ভয়-অক্ষমতা ছাপিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর জীবনের পূর্ণ-ছবির সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা। হাতের কাছেই ছিল কিছু বইপত্র, মূল 'আকর গ্রন্থ' হিসেবে কাজে লেগেছে ভিয়েনা প্রবাসী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত, তিন খণ্ডের 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারক গ্রন্থ"। সব মিলিয়ে প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠায় বহুজনের লেখার সংগ্রহ-ভান্ডার। সহায়তা নিয়েছি বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে তো বটেই, আরো অনেক প্রাজ্ঞজনের লেখা থেকেও। বিভিন্ন জনের লেখা থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছি সমগুরুত্বের সাথেই। সবার প্রতি সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সস্নেহ

ধন্যবাদ আমার কনিষ্ঠা কন্যা নবনীতাকে, তার নিরন্তর উৎসাহ এ বিষয়ে আমাকে সতত সচেষ্ট রেখেছে। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই জাতীয় সাহিত্য প্রকাশের স্বত্বাধিকারী কমলকান্তি দাসকে, যাঁর আগ্রহ এবং সহযোগীতায় বইটি প্রকাশিত হলো।

পরম শ্রদ্ধেয় প্রাজ্ঞজন অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের লিখিত 'মুখবন্ধ আমার অকিঞ্চিৎকর প্রয়াসকে চরিতার্থ করেছে। সবিনয়ে তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করছি।

একটি স্বীকারোক্তি করতেই হচ্ছে, প্রায় বছর জুড়ে চেষ্টার পরেই উপলব্ধি করছি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ণ পরিচয়ে উপস্থাপন করা আমার সাধ্যাতীত। সাগর কিংবা পাহাড় দেখে আমরা বলি, দেখেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কতটুকু দেখা হয় ? তাই নিশ্চিত জানি, অসম্পূর্ণই রয়ে গেলো পূর্ণ ছবির সন্ধান। তবু এ অসম্পূর্ণ অক্ষম প্রয়াস যদি কোনো কারণে কারো এতটুকু ভালো লাগে, যদি কেউ সেই মহাজীবনের প্রতি বর্ধিত আগ্রহ-আকর্ষণ বোধ করেন, ধন্য মনে করবো নিজেকে।

রামেন্দ্র চৌধুরী
ঢাকা, মার্চ, ২০১৩ইং

সূচিপত্র

সূচনা-কথন	১১
টুঙ্গিপাড়ায় শুরু টুঙ্গিপাড়াতেই শেষ	১৭
শিক্ষা এবং রাজনৈতিক প্রস্তুতির কালপর্ব ঃ রাজনৈতিক গুরুগণ	২২
ঢাকায় শেখ মুজিব ঃ সংগ্রামী রাজনীতির প্রধান কর্মক্ষেত্র	৪০
বাংলার ভাষা-আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতি-রাষ্ট্র চিন্তা	৪২
সাংগঠনিক বিকাশ ঃ আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ	৫৭
যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনের ফল-প্রতিক্রিয়া ঃ আওয়ামী মুসলিম লীগের ভূমিকা	৬৫
পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার ঃ খাদ্য সংকট মোকাবেলা এবং ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর মতভেদ	৯৩
মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে কাগমারী সম্মেলন ঃ আওয়ামী লীগ-ন্যাপ বিভাজন	১০১
শেখ মুজিব এবং হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী ঃ পারস্পরিক আস্থা ও মূল্যায়ন	১১০
পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে-গোলযোগ ঃ নিহত ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী	১১৪
পাকিস্তানে সামরিক শাসন ঃ মামলায় জর্জরিত মুজিব	১১৮
শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চিন্তায় পরিবর্তন ঃ কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে গোপন আলোচনা	১২২
সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার ঃ পূর্ব বাংলায় প্রবল ছাত্র-গণঅন্দোলন	১২৬
আওয়ামী লীগের পূণরুজ্জীবন ঃ অভ্যন্তরীণ মতভেদ সত্বেও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত	১৩০
আইয়ুব-বিরোধী 'কপ' গঠণ ঃ ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচন	১৩২
পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৫ইং ঃ নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ	১৩৫
ঐতিহাসিক ছ'দফা ঘোষণা ঃ বাংলার রাজনীতির অব্যর্থ গতিমুখ	১৩৮
তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' ঃ পরিণামে আইয়ুবের জন্য বুমেরাং	১৫৩
গণ-অভ্যুত্থানে মুজিবের মুক্তি ঃ অতঃপর গণ-মানুষের প্রিয়নাম 'বঙ্গবন্ধু'	১৬৬
ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন ঃ ১৯৭০ইং নির্বাচনে ছয়-দফার পক্ষে অভাবনীয় 'ম্যান্ডেট'	১৭৭
ইয়াহিয়া-ভুট্টোর 'লারকানা ষড়যন্ত্র' ঃ পাকিস্তানের ভাঙ্গনের প্রেক্ষাপট	১৮৫
অসহযোগ আন্দোলন ঃ অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ইতিহাস	১৯৬
বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ঃ স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের হলো	২০১
অসহযোগ আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া আলোচনা ঃ প্রতিজ্ঞা আর প্রতারণা যখন মুখোমুখী	২০৮

২৫ মার্চ ইয়াহিয়ার আক্রমণ এবং পলায়ন ঃ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা ২১৪
তবু সংশয়, তবু প্রশ্ন ঃ বঙ্গবন্ধু কি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন? ২২২
বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট ঃ
অতঃপর পশ্চিম পাকিস্তানের সেনা-কারাগারে ২৩০
"THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE ২৩৫
সামরিক কারাগারে সাজানো বিচার ঃ মৃত্যুভয়হীন সাহসী মুজিব ২৩৬
একাত্তরে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ঃ বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুময় ২৪২
মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাংলাদেশ ঃ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ২৫৫
বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫ ঃ পূণর্গঠন, সংবিধান রচনা এবং ষড়যন্ত্র মোকাবেলা ২৬২
বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান, ১৯৭২ইং ২৮১
বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৩ইং ঃ সমালোচনা এবং বাস্তবতা ৩৯০
দালাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সাধারণ ক্ষমা ঃ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা ২৯৪
১৯৭৪ইং মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ঃ গণমৃত্যুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা ৩০২
বঙ্গবন্ধুর 'বাকশাল' ঃ তথাকথিত একদলীয় শাসন ৩০৬
"দুঃখের তিমিরে ... জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক" ঃ
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, ১৯৭২-১৯৭৫ ৩১৮
১৯৭৫ইং বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ড ঃ ষড়যন্ত্রকারী এবং উপকারভোগীদের কথা ৩২৮
কয়েকটি মানবিক মন্তব্য ৩৪০
পরিশিষ্ট-১ ৩৪২
পরিশিষ্ট-২ ৩৪৩
পরিশিষ্ট-৩ ৩৪৫
তথ্য-সূত্র ৩৪৬

সূচনা-কথন

'সত্যের জয় অনিবার্য' শিরোনামের নিবন্ধে শেখ হাসিনা লিখেছেন, "পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে পূর্ব পাকিস্তান নামক অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বৈষম্য ও উপেক্ষায় বঞ্চিত হচ্ছিল অনবরত। ... এই বঞ্চিত মানুষকে শোষণ, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে রুখে দাঁড়ালেন এক নির্ভীক সেনা, যাকে পাকিস্তানি শাসকরা কোনো মতেই বাগে আনতে পারেনি। দিনের পর দিন জেল খেটেছেন, নির্যাতিত হযেছেন, ফাঁসির দড়ি বেছে নিয়েছেন কিন্তু আপস করেননি। দেশপ্রেম ও বাঙালি জাতির প্রতি তার বিশ্বস্ততা ছিল অবর্ণনীয়। নিজের জীবনের বিনিময়ে তিনি বাংলাদেশের মানুষকে দিতে চেয়েছিলেন সুখী-সমৃদ্ধ এক সমাজ। ... তিনি হলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান" (১(১)/২৩)। শুরুতেই শেখ হাসিনার উদ্ধৃতি দেয়া হলো, আদৌ এজন্য নয় যে, তিনি বঙ্গবন্ধু মুজিবের আত্মজা, বরং এজন্যই যে, বাংলাদেশের অগণিত মানুষের বিশ্বাস, দেশের প্রতি, দেশবাসীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর সুগভীর ভালোবাসা এবং কল্যাণ-চিন্তা তিনিও আপন চেতনায় ধারণ করেন।

ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সালাহউদ্দিন আহ্মদের পর্যবেক্ষণ, "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো তিনি আমাদের বাঙালি জাতিসত্বাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ... বাঙালির দীর্ঘদিনের আত্মানুসন্ধান,দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও সংগ্রামের অমোঘ পরিণতি হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল। ... এদেশের রাজনীতিকে মধ্যযুগীয় ধর্ম-সাম্প্রদায়িক আবর্ত থেকে উদ্ধার করে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় প্রবাহিত করার পেছনে শেখ মুজিবের অবদান ছিল অনন্য। ... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জনসাধারণ সকল সম্প্রদায়ের মানুষ - হিন্দু, মুসলমান,বৌদ্ধ, খৃস্টান- সকলে একত্রিত হয়ে এক অখন্ড বাঙালি জাতিতে পরিণত হয়েছিল, যেটা আগে কখনো হয়নি" (১(১)/৫২)।

সমাজতত্বের অধ্যাপক গাজী সালেহ উদ্দিন সহজ বিশ্লেষণসহ বলেছেন : "সুদীর্ঘ ২৭বছরের শিক্ষকতা-জীবনে বিভিন্ন সময়ে মৌলবাদী সংগঠনের ছাত্রদের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে– শেখ মুজিবকে আমরা কেন জাতির পিতা বলবো? শেখ মুজিবের জন্মের পূর্বে কি বাঙালি জাতি ছিল না? আমি তাদেরকে সাধারণত এরূপ ব্যাখ্যা দিই : মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক নিউটন, ফল কেন নীচে পড়লো, ... এই ভাবনা নিউটনের মাথায় আসার বহু পূর্ব থেকেই অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির পর হতেই গাছের

ফল মাটিতে পড়েছে। মূলতঃ এ থেকেই তিনি মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কার করেন। ... অনেক বাঙালি মণীষী চেষ্টা করেছেন ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালিদের কীভাবে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। কিন্তু কেউ সেই চেষ্টায় সফল হননি। ... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবই বাঙালিদের ঐক্যবদ্ধ করার সেই গোপন রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হন। বাঙালিদের হাজার বছরের ইতিহাসে কখনো তাঁরা স্বাধীন ছিলেন না। ... তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ... বাঙালি জাতিকে একটি মঞ্চে একত্রিত করতে হলে প্রয়োজন বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানো। ... ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, তা চরম বিকাশ লাভ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর, ... 'বাংলাদেশ' নামক একটি রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে। ... যার নেতৃত্বে এই সফলতা আসে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ... হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বাঙালি" (১(২)/১০১৪-'১৬)।

'Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman' (১৯৮৩ইং) রাজনৈতিক গবেষণামূলক বইটিতে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদকেও বলতে হয়েছে, "শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। ... বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর চাইতে বেশি অবদান রেখেছেন এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। ... স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ চিরদিন শেখ মুজিবের কীর্তি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অমলিন হয়ে থাকবে"। (১(২)/১০৫৭)।

বঙ্গবন্ধুর প্রসঙ্গে সশ্রদ্ধ বিস্ময় ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের। নিজের সম্পাদিত 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' নামক দু'খন্ডের বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে (৯ সেপ্টেম্বর, '০৪ইং) অধ্যাপক মামুন বলছিলেন, আরো অর্ধশত বছর আগের একান্ত দুর্গম যোগাযোগের পথ পাড়ি দিয়ে একটা অজ পাড়াগাঁ থেকে উঠে এসে শেখ মুজিব কি করে এমন পরিচ্ছন্ন রাষ্ট্রচিন্তার অধিকারী হতে পেরেছিলেন, পেরেছিলেন একটা আধুনিক জাতি-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হতে? তাঁর বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা এবং ধর্ম-সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান' নামক অগণতান্ত্রিক উপনিবাশবাদী রাষ্ট্রের শোষণ-শৃঙ্খল ছিঁড়ে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্থপতি হয়ে ওঠা অনস্বীকার্যভাবেই বিশ্ব-রাজনীতির অন্যতম উজ্জ্বল বিস্ময়।

সুধীজন শামসুজ্জামান খান সেই অনুষ্ঠানেই বললেন, সমগ্র বিশ্ব প্রেক্ষাপটেই বঙ্গবন্ধু একমাত্র রাষ্ট্রনায়ক, যিনি মুসলিম সংখ্যা-প্রধান একটি দেশে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেদিক থেকে তাঁকে বিশ্বের অন্যতম প্রাগ্রসর চিন্তার রাজনীতিবিদ বলেই শ্রদ্ধা জানাতে হয়। তিনি বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর চিন্তার অনুসরণে বাংলাদেশের জাতি-রাষ্ট্রসত্বা পূণঃপ্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, ভৌগলিক বাংলাদেশ থাকলেও মুক্তিযুদ্ধটাই অর্থহীন প্রতিপন্ন হবে। পশ্চাদমুখী চেতনার 'দ্বিতীয় পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গবন্ধুর নামে-নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়নি। আলোচনার এ পর্যায়ে আমার পাশে-বসা এক তরুণের মন্তব্য আমাকে চমকে দিয়েছিল,

দ্বিজাতিতত্বকে কল্যাণকর ভাবলে বঙ্গবন্ধু পাক-মার্কিণ অক্ষের কথিত আপোষের পথে 'Federating two Pakistan' ভিত্তিক মূল পাকিস্তানেরই প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। বঙ্গবন্ধু মুজিব কার্যত বর্জন করেছিলেন দ্বিজাতিতত্বকে, তাই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীত্বও তাঁকে আকর্ষণ কিংবা আপোষের পথে টানতে পারেনি। অপরিচিত সেই তরুণের কথা আমাকে নির্ভুল জানিয়ে দিয়েছিল, যারা মুজিবকে খুণ করে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুহীন এবং আদর্শচ্যুত করতে চেয়েছিল এবং যারা এখনো চায়, তাদের সফলতার সম্ভাবনা নেই।

কয়েক বছর আগে একদিন মুক্তিযোদ্ধা-কুটনীতিবিদ মহিউদ্দিন আহমদের উত্তরার বাসায়, প্রয়াত কবি শামসুর রহমান বলতেন 'আড্ডা-তীর্থ', ক'জন প্রবীণ-প্রাজ্ঞের ঘরোয়া অলোচনায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। নানা কথায় আলোচিত হলো, সমকালীনতার ইতিহাসে আবেগ-স্বার্থ-ক্ষোভের মিশ্রণ ঘটতেই পারে, কিন্তু সময়ের পরিশীলণে কেবল নির্মোহ সত্যটাই টিঁকে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ইত্যাদি কথায় অনিবার্যভাবেই উঠে এলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপস্থিত প্রাজ্ঞজনেরা সেদিন আবেগ-শ্রদ্ধার প্রসারিত ক্যানভাসে যুক্তি-তথ্য-বিশ্লেষণে যা বলেছিলেন, তাতে মুজিব কখনো সিরাজ-সমান্তরাল,কখনো যেন নেতাজী সুভাষের সম্প্রসারিত সত্তা। মনে হলো, বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক জীবনে বিশ্বকবির যে প্রভাব, মূজিব তারই প্রতি-তূলণীয় রাজনীতির কবি। "মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে, দেখিবে যে অন্যায় ভয়ে ভীত তুমি, সে অন্যায় ভীরু তোমা' চেয়ে" - বঙ্গবন্ধু তো আজীবন রাজনৈতিক কর্ম-সাধনায় বাঙালিকে নির্ভয় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন মুক্তির যুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে মীরজাফরের চক্রান্তে সিরাজের পরাজয় আর পরবর্তী সময়ে নেতাজীর অসমাপ্ত সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুই একমাত্র বাঙালি নেতা, যিনি মাতৃভূমির স্বাধীনতার সংগ্রামে বিজয় অর্জন করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ওয়াশিংটন, ভারতে মহাত্মা গান্ধী, ইন্দোনেশিয়ায় বাংকার্নো নামে অভিহিত সুকার্নো, ভিয়েতনামের হো চি মিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন মেন্ডেলার অনুরূপ ভূমিকাই ছিল বাংলাদেশে শেখ মুজিবের।

প্রশ্ন উঠেছিল, বঙ্গবন্ধু কি সত্যি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন? প্রশ্নের সাথেসাথেই নানা-মুখে ছুটলো শব্দভেদী বাণ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের অনিবার্য চুড়ান্ত পর্যায়, তার পূর্ব-প্রস্তুতির অবিরত প্রচেষ্টার কথা ভুলবো কি করে? পাকিস্তানের সিকি-শতাব্দীর ইতিহাসে মুজিব তো কখনো লক্ষ্যচ্যুত হননি, আপোষ করেননি কায়েমী স্বার্থের সাথে। প্রশ্নাতীত আপোষহীনতার মূল্যই তাঁকে দিতে হয়েছে ঘাতকের হাতে নিহত হয়ে। অপরিচিত এক সামরিক কর্মকর্তার হঠাৎ হুইসেলে মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভাবতে হলে, শুধু ইতিহাস-মনস্কতা নয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং যুক্তিবোধও বিসর্জন দিতে হয়।

প্রাজ্ঞজনদের আলোচনা শুনতে শুনতেই আমার মনে হয়েছিল, সহজ যোগাযোগহীন গোপালগঞ্জ থেকেও ততোধিক বিচ্ছিন্নতার প্রায় কুড়ি মাইল দূরের টুঙ্গিপাড়া গ্রামের খোকা তো আজীবন নির্ভীক এবং স্থির-লক্ষ্য সংগ্রাম সাধনার মধ্য

দিয়েই বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন। আমরা যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল, তারাও কি শেখ মুজিবের বাঙালির জাতির জনক হয়ে উঠার সবটুকু সংগ্রামের কথা, ত্যাগের কথা জানি? অধ্যাপক মামুনের বিস্ময়, শামসুজ্জামান খানের মন্তব্য, এবং ঘরোয়া আলোচনায় ওঠা সংশয়-প্রশ্ন, সব মিলেয়েই আমার মনে হয়, এই মহাজীবনের দিকে, বারবার ফিরে তাকানো প্রয়োজন। ষাট-সত্তর ছোঁয়া বয়সের মানুষ আমরা, আমাদের করো কারো মনেও যদি সংশয় থাকে, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কিনা, তাহলে তরুণ প্রজন্ম, প্রকৃত ইতিহাস যাদের 'সিলেবাস' বহির্ভুত অথবা পাঠ্য 'বিকৃত ইতিহাস', তারা কেউ যদি অসচেতনতায় পথ হারায়, দোষ দেয়া যাবে না, অথচ সমুহ ক্ষতির আশংকা ঘটবে জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশের। সামনে যাবার প্রয়োজনেই আজ পেছন ফিরে তাকানো দরকার, বাঙালির পেরিয়ে আসা রাজনৈতিক পথের উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব, 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দিকে। প্রতিজ্ঞায়-প্রতিবাদে-সাহসে-ত্যাগে সতত অবিচল বঙ্গবন্ধু মুজিবের পরিচয় তরুণতর প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেই আমরা প্রত্যাশায় সামনে তাকাতে পরি, 'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে'।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরেই, ৫ এপ্রিল ১৯৭১ ইং 'Poet of Politics' - 'রাজনীতির কবি' শিরোনামে 'নিউজ উইক' লিখেছিল, "এক নতুন বাঙালি জাতির যোদ্ধা-নেতারূপে মুজিবের আবির্ভাব বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য তাঁর আজীবন সংগ্রামেরই যুক্তিযুক্ত পরিণতি। মুজিব হয়তো এখন ঢেউয়ের চুড়োয় সওয়ার হয়েছেন। কিন্তু ওখানে তাঁর থাকাটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। ... তিনি রাজনীতির কবি - কৃৎকৌশলী নন; তবে বাঙালি যত না প্রায়োগিক, তার চেয়ে বেশি শৈল্পিক। কাজেই, এই অঞ্চলের সকল শ্রেণী ও মতাদর্শের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে যা প্রয়োজন, তাঁর রীতিতে হয়তো ঠিক তাই আছে" (১(৩)/১৫১৭)। 'নিউজ উইক'এর রিপোর্টটির এক সপ্তাহ আগে, অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরেই লন্ডনের 'দি অবজার্ভার'-এ সিরিল ডান লিখেছিলেন : "Although it has taken Sheikh Mujibur Rahman more than twenty years to bring his life to its present stunning climax, the liberation of his homeland East Pakistan from its status as a colony of West Pakistan has always been his aim. Whatever may be said against him, he is not a political opportunist. (১(১)/৪৬)। কখনো সুবিধাবাদের রাজনীতি করেননি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

বহু-সূত্রে প্রক্ষেপিত আলোয় সেই মহাজীবন পর্যবেক্ষনের লক্ষ্যেই স্মরণ করছি, বঙ্গবন্ধুকে আন্তর্জাতিক 'জুলিও কুরি পুরষ্কার' প্রদানের মানপত্রে সম্বোধন করা হয়েছিল 'বিশ্ববন্ধু' বলে। বঙ্গবন্ধু সবিনয়ে বলেছিলেন, "আমি বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের অবশ্যই বন্ধু কিন্তু আমাকে বঙ্গবন্ধুই থাকতে দিন। আমি জীবনে-মরণে একজন খাঁটি বাঙালি থাকতে চাই। বাঙালির যে হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য, সেই শাশ্বত ঐতিহ্যকে আমি রাষ্ট্রে রূপ দিতে চেয়েছি। এই বাংলার রূপকার হওয়ার চেয়ে অন্য কোন বড় পরিচয় আমার দরকার নেই" (১(১)/৪২৩)। "Sheikh Mujib : Triumph and

Tragedy" গ্রন্থে লেখক এস.এ করিমের মন্তব্য : "No one can deny that Sheikh Mujib was a larger-than-life figure in the political landscape of the subcontinent ... the founding father of a new nation : Bangladesh".অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের কথা, "২৪ বছরের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে বোঝা যাবে না। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, এ কে ফজলুল হকের মত অভিজ্ঞ নেতারাও অনেক অবদান রেখেছেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ হয়েও একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন"।

অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন, "ওই রাজনীতিক আকাশে একটিই নক্ষত্র ছিল, তাঁর নাম ... শেখ মুজিব। ... ১৯৬৮ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন আমাদের রাজনীতির প্রধান পুরুষ, এবং ঐতিহাসিক বিচারেও তাঁর সঙ্গে তূলনীয় আর কোন বাঙালি রাজনীতিবিদ নেই। ... তাঁর পাশে অগ্রজরা মাঝারি, অনুজরা তুচ্ছ ... । তিনি শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি করেননি, তিনি যুগান্তর ঘটানোর রাজনীতি করেছেন"। সত্যি যুগান্তর ঘটিয়েছেন। আজীবন সংগ্রামের পথে চলেই আমাদেরকে দিয়ে গেছেন একটি স্বাধীন স্বদেশ-মানচিত্র-পতাকা। তথাপি, প্রবুদ্ধ অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের সখেদ মন্তব্য, "পৃথিবীর সব দেশেই মানুষ মনে করে কোনো মহৎই তার কাছে অতীত নয়। সব মহৎই তার কাছে বর্তমান। কেবল আমাদের বাংলাদেশেই অতীত মানে বিস্মৃত, ... বর্তমান মানে অতীতকে অস্বীকারকারী এক যাযাবর"। আমরা কি যাযাবরের ঠিকনাহীন উত্তরাধিকারই রেখে যাব আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য? না, আমরা যাযাবর নই, সাময়িক প্রতিক্রিয়াশীল ঝড়ে 'আদর্শের আবাস' উড়ে গেলেও আমাদের প্রকৃত ঠিকানা হারাবার নয়। অগণিত প্রাণের দামে কেনা আমাদের আবেগ-ভালোবাসার বাংলাদেশ, এই জাতি-রাষ্ট্র পরিচয় অবিস্মরণীয়।

এক সময় আমরা উচ্চকণ্ঠে স্লোগান দিয়েছি 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', গভীর আস্থায় বলেছি, 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'। জনতার আস্থার মূল্য দিয়েছেন নেতা, আমাদেরকে দিয়ে গেছেন পদ্মা মেঘনা যমুনার ঠিকানায় একটি স্বদেশ, 'হিমালয় থেকে সুন্দরবন হঠাৎ বাংলাদেশ"। কিন্তু প্রশ্ন তো উঠবেই, নিজের মনে উঠবে, উঠবে বাইরেও, জনতার অংশভাগী আমরা কি পেরেছি নেতার আস্থা আর ভালোবাসার মূল্য দিতে? ফরাসী দার্শনিক আঁদ্রে মালরো, কী দারুণ চিনেছিলেন বঙ্গবন্ধুর বিশালতার বিপরীতে আমাদের লোভাতুর ক্ষুদ্রতাকেও ! মালরোর সাথে আলোচনায় অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ আচমকা প্রশ্ন করেছিলেন, "মুজিব পারবেন তো একটি নতুন রাষ্ট্র তৈরি করতে'? তীক্ষ্ণ ত্বরিত জবাব এলো, 'অবশ্যই, যদি না আপনারা শিক্ষিতরা, বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে মেরে ফেলেন। ... পেছন ফিরে গিয়ে ভাবি, শেখ মুজিব ঘাতকের হাতে মৃত্যুবরণ করলেও তিনি মালরোর চেতনায় এক ঐতিহাসিক 'বিজয়ীদের' মিছিলে স্থান নিয়েছিলেন, যে মিছিল এরকম : মুজিব-গান্ধী, গান্ধী-নেহরু, নেহরু-শার্ল দ্য গল, মালরো" (১(১)/১৮২-১৯২)। সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের অমোঘ প্রশ্ন : "মৃত্যু প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটি অবধারিত সত্য। প্রশ্ন হলো কে কিভাবে নিজের কর্মফলকে পূণ্যের ঘরে উঠিয়ে দিয়ে মৃত্যুকে জয় করেন। ... বঙ্গবন্ধু

এদেশের মানুষকে স্বাধীনতার স্বপ্নের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতির গৌরবে পৌঁছে দিয়েছেন। এর চেয়ে বড় এবং মহৎ কর্মফল একজন মানুষ তাঁর জীবনে অর্জন করতে পারে না। সে কারণেই তিনি ... মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আমরা কি তাঁকে যথাযথ সম্মান দিতে পেরেছি?" (১(১)/৩২৩)। ধারণা করি, প্রকৃত প্রশ্নটি হচ্ছে, আমরা কি বঙ্গবন্ধু মুজিবকে যথার্থ উপলব্ধি করতে পেরেছি এযাবৎ?

"আজ গর্বিত বাঙালি ... বিশ্বের দরবারে একটি আলাদা পতাকা হাতে, পাসপোর্ট নিয়ে ঘুরছে, তার পিছনে ওই একটি মানুষের অবদান যে কতখানি তা নিয়ে বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানই প্রশ্ন তুলবে, আর কেউ নয়" (১(৩)/১৬১০)। 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' নিবন্ধে এ জেড এম আব্দুল আলী, গভীর ক্ষোভেই লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু-পরবর্তী বাংলাদেশে এখনো কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী "বঙ্গবন্ধুকে 'তাহাদের নেতা' হিসেবে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ নামক রাজনৈতিক দলের নেতা" পরিচয়ে উপস্থাপন করেন। অথচ বঙ্গবন্ধুর 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' পরিচয়টি বিশ্ব জেনেছে ২০০৪ইং বিবিসি-জরিপে। আব্দুল আলী উদ্ধৃতি দিয়েছেন, বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেনের 'বাংলার কথা' বইটি থেকে, "তিনি (বঙ্গবন্ধু) বহুবার বলেছেন, 'আমার নিজের রক্ত দিয়ে আমি শোধ করে যাবো এদেশের মানুষের প্রতি আমার ঋণ'। ঋণ শোধ তিনি দিয়েছেন, তবে বড় বেশি শোধ দিয়েছেন। ... আততায়ীর হাতে মহাপুরুষের মৃত্যু ইতিহাসে নতুন নয়। মৃত্যু হয়েছে সক্রেটিসের বিষ পান করে। মৃত্যু হয়েছে যিশুখৃস্টের ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে, মৃত্যু হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর, মৃত্যু হয়েছে অনেক মনীষীদের। ... মনসুর হেল্লাজের মত লোককে কতল করা হয়েছে, সেই খন্ডিত মাথা তখনও বলেছে 'আনাল হক' - আমিই সত্য। এসব মহাপুরুষের পর্যায়ে আসেন বঙ্গবন্ধু। মৃত্যুর সামনে তিনি মাথা নোয়াননি। ... তিনি তো ইতিহাসের মহাসমুদ্রে রয়ে গেছেন। ... মহাত্মা গান্ধী যেমন সারা জীবন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সাথে থেকেও গত সহস্রাব্দের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃত, তেমনি বঙ্গবন্ধু যে রাজনৈতিক দলই করে থাকুন না কেন, তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালিই থেকে যাবেন। ... তিনি আপন পরিচয়েই ভাস্বর"।

আব্দুল গাফফার চৌধুরী জানিয়েছেন, মিশরের প্রয়াত রাষ্ট্রপতি নাসেরের সুহৃদ এবং বিখ্যাত 'আল আহরাম' পত্রিকার (প্রাক্তন) সম্পাদক মোহাম্মদ হেইকল বলেছিলেন, "প্রেসিডেন্ট নাসের যেমন সেক্যুলার আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, তেমনি শেখ মুজিব প্রবক্তা ছিলেন সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদের। গান্ধীর ভারতীয় জাতীয়তা ছিল ধর্ম-মিশ্রিত। ... মুজিব তাঁর সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদে ধর্মাচরণকে যুক্ত করেননি। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাঁর মতো রাজনৈতিক ভিসনের অধিকারী আরেকজন নেতা আমি দেখি না" (১(১)/১২১)। রাজনীতিক-সাংবাদিক-সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত লিখেছেন, "যেমন জাগরুক সালভাদর আলেন্দে চিলিতে, ওলাফ পালমে সুইডেনে, সামোরা মাসেল মোজাম্বিকে, বাংলাদেশে শেখ মুজিব"। স্মরণ করছি ফিদেল ক্যাস্ট্রোর একটি গভীর ব্যঞ্জনাবহ উক্তি : "আমি হিমালয় দেখিনি, তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি"।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় লন্ডণে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কর্মে যুক্ত প্রাক্তন কুটনীতিবিদ এবং বর্তমানের সুপরিচিত কলামিস্ট মহিউদ্দিন আহমদের লেখায় পড়েছি, পঁচাত্তরে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের ক'দিন পরে আন্তর্জাতিক টেলিকম ইউনিয়নের নেতা মিঃ মিলি ভিয়েনায় বাংলাদেশের কুটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদকে প্রশ্ন করেছিলেন, "How could you do it"? আর ঐ মর্মান্তিক হত্যাকান্ডের দীর্ঘ ১৬ বছর পরে জনাব মহিউদ্দিনই আবার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এবারের প্রশ্নকর্তা কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার অন্যতম বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক তাঞ্জানিয়ার সাবেক রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস নায়ারে। প্রশ্নের আকারে তাঁর বিষাদ-বিস্ময় আর হতাশাই প্রকাশ করেছিলেন, "He gave you a country and you killed him?" (জনকণ্ঠ,৪-০৪-০২)। নতমস্তকে মৌন ছিলেন মহিউদ্দিন, তাঁর বলার কিছু ছিল না। ভিন্ন মর্যাদা-পরিচয়-পরিবেশের দু'জন সুখ্যাত মানুষের মন্তব্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধুই যে বাংলাদেশের স্থপতি, এ বিষয়েও বিশ্বসমাজের কোনো সংশয় কখনো ছিল না।

১৯৭৩ ইং বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাত কযেকটি ট্যাঙ্ক উপহার দিয়েছিলেন বাংলাদেশকে। সেই ট্যাঙ্ক কাজে লাগিযেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল। খবর শোনে এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি সাদাত যে, বাংলাদেশ থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি পাঠিয়ে তাঁর ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করতে হয়েছিল। সেদিন বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে গিযেছিলেন বিচারপতি সাত্তার, সেনা-শাসক জিয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তাঁর পক্ষে রাষ্ট্রপতি সাদাতের ক্ষোভ কতটুকু কমানো সম্ভব হযেছিল, জানার কোনো উপায় নেই। সেদিন যা-ই ঘটে থাকুক, আশা করি, আন্তরিকভাবেই আশা করি, ভবিষ্যতের বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্র-নায়কেরা দেশে-বিদেশে প্রশ্নহীন জানিয়ে দিতে পারবেন, পঁচাত্তরে যা ঘটেছিল বাংলাদেশে, একান্তই সাময়িক প্রতিক্রিয়ার ঘুর্ণীঝড়, তাতে সাময়িক বিপথগামিতা অনস্বীকার্য বটে, কিন্তু আদর্শচ্যুতি ঘটেনি। তবে মানতেই হবে, এমন কথা বলার যুক্তি-শক্তি অর্জনের জন্যই বঙ্গবন্ধুকে জানা এবং তাঁর আদর্শ উপলব্ধি করার দরকারই সবচেয়ে বেশি।

টুঙ্গিপাড়ায় শুরু টুঙ্গিপাড়াতেই শেষ

মাত্র ৫৫ বছরের অনতিদীর্ঘ জীবন বঙ্গবন্ধুর। জন্ম ১৭মার্চ, ১৯২০ইং। পিতা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ মহকুমা আদালতের সেরেস্তাদার, মাতা শেখ সাহেরা খাতুন, গৃহিণী। চার বোন দু'ভাই - ছ'জনের মধ্যে খোকা নামের মুজিব ছিলেন পিতামাতার প্রথম পুত্রসন্তান। শৈশব-কৈশোর কেটেছে মা-বাবার কোলে এবং কোলের কাছে, নিজ-গ্রাম টুঙ্গিপাড়া আর প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরের মহকুমা শহর গোপালগঞ্জে। খুবই সংক্ষিপ্ত সময় মাদারিপুরে। মাদারিপুর আর গোপালগঞ্জ ছিল চাকুরিজীবী পিতার কর্মস্থল, স্কুলে পড়ার অধিকাংশ সময়জুড়েই মুজিব থাকতেন পিতার সাথে। মুজিবের পিতা আবাল্য স্বাধীনচেতা পুত্রকে শুধুই 'ভাল ছেলে' নয়, যথার্থই 'মানুষ' করতে চাইতেন। পিতা কখনো পুত্রের চিন্তা এবং কর্মের পথে অভিবাবকত্বের প্রতিবন্ধক আরোপ করেননি। প্রসঙ্গতই উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্জন

করেছিলেন, তার পেছনে পিতা শেখ লুতফর রহমানের 'নার্সারী কেয়ার'এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনস্বীকার্য।

১৯৪২ সালে "আব্বা আমাকে ... একটা কথা বলেছিলেন, 'বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না, ... তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না। লেখাপড়া না শিখলে মানুষ হতে পারবে না। আর একটা কথা মনে রেখ, 'Sincierity of purpose and honesty of purpose' থাকলে জীবনে পরাজিত হবে না'। একথা কোনোদিন আমি ভুলি নাই। আর একদিনের কথা, গোপালগঞ্জ শহরের গণ্যমান্য কয়েকজন ব্যক্তি আমার আব্বাকে বলেছিলেন, আপনার ছেলে যা আরম্ভ করেছে তাতে তার জেল খাটতে হবে। তার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে, ... আমার আব্বা যে উত্তর করেছিলেন, তা আমি নিজে শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, 'দেশের কাজ করছে, অন্যায় তো করছে না; যদি জেল খাটতে হয়, খাটবে। তাতে আমি দুঃখ পাব না। জীবনটা নষ্ট নাও তো হতে পারে। ওর কাজে আমি বাধা দেব না। আমার মনে হয়, পাকিস্তান না আনতে পারলে মুসলমানদের অস্তিত্ব থাকবে না" (৮/২১-২২)।

কেমন ছিল মুজিবের প্রথম জীবন, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুরে? জবাব মেলে মুজিবের জবানীতেই, "আমি খেলাধুলাও করতাম। ফুটবল, ভলিবল ও হকি খেলতাম। খুব ভাল খেলোয়ার ছিলাম না, তবু স্কুলের টিমের মধ্যে ভাল অবস্থান ছিল। এই সময় আমার রাজনীতির খেয়াল তত ছিলনা। ... স্কুলে ছেলেদের মধ্যে আমার বয়স একটু বেশি হয়েছে, কারণ প্রায় চার বছর আমি (অসুস্থতার কারণে) লেখাপড়া করতে পারি নাই। আমি ভীষণ একগুঁয়ে ছিলাম। আমার একটা দল ছিল। কেউ কিছু বললে আর রক্ষা ছিল না। মারপিট করতাম। আমার দলের ছেলেদের কেউ কিছু বললে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আমার আব্বা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন। ... আব্বাকে আমি খুব ভয় করতাম। ... আমার কাছে তখন হিন্দু-মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান-বাজনা, খেলাধুলা, বেড়ান - সবই চলত (৮/১১)।

একেবারেই সহজ-সরল কথায় মুজিব জানিয়েছেন, "নিশ্চয়ই অনেকেই আশ্চর্য হবেন। আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বার-তের হতে পারে। রেণুর বাবা মারা যাওয়ার পর ওর দাদা আমার আব্বাকে ডেকে বললেন, 'তোমার বড় ছেলের সাথে আমার এক নাতনীর বিবাহ দিতে হবে। ... মুরুব্বির হুকুম মানার জন্যই রেণুর সাথে আমার বিবাহ রেজিস্ট্রি করে ফেলা হল। আমি শুনলাম আমার বিবাহ হয়েছে, তখন কিছুই বুঝতাম না, রেণুর বয়স তখন বোধ হয় তিন বছর হবে। রেণুর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার মা মারা যান। ... দাদাও রেণুর সাত বছর বয়সে মারা যান। তখন সে আমার মায়ের কাছে চলে আসে। আমার ভাইবোনদের সাথেই রেণু বড় হয়" (৮/৭-৮)। আরো ১০ বছর পরে, "১৯৪২ সালে আমাদের ফুলশয্যা হয়" (৮/২১)। প্রায়ই বলা-লেখা হয় : প্রতিটি সফল মানুষের পেছনে থাকেন একজন মহিয়সী নারী। কবি নজরুল লিখেছেন, "এ পৃথিবীতে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর// অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"। প্রাচীণ সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীকে বলা হতো,

'গৃহিনী, সচিব, সখা ... "। মুজিব-জীবনে রেণু ছিলেন সবদিক থেকেই যথার্থ, এ-সত্য অনস্বীকার্য। দৃশ্যতই তিনি মুজিব-সংসারে গৃহিনী-জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু মুজিবের রাজনৈতিক জীবনকে তিনিই সাংসারিক দুশ্চিন্তামুক্ত রেখেছেন। আবার মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন সংকটে-সমস্যায় সমাধান দিয়েছেন একান্তই সহজ সাবলীলতায়। স্বীকার করতেই হবে, এখানেই বেগম ফজিলতুন্নেসা রেণুর অনন্যতা।

শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল থেকে ১৯৪২ইং দ্বিতীয় বিভাগে 'এন্ট্রান্স' (স্কুল-ফাইন্যাল) পরীক্ষায় পাশ করেন। পরবর্তী পাঁচ বছরের মত সময় কেটেছে কোলকাতায়, লেখাপড়ায় আর রাজনীতির পর্যবেক্ষণে-প্রস্তুতিতে। কোলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকেই তিনি ইন্টারমিডিয়েট আর ডিগ্রি পাশ করেছিলেন। শেখ মুজিব স্কুল-জীবনের মতই কলেজেও শিক্ষকদের অকৃপণ স্নেহ পেয়েছেন, অনেক সময় প্রশ্রয়ও। কখনো প্রকট অসুস্থতা, কখনো প্রবল রাজনৈতিক ব্যস্ততায় মুজিব 'ভালোছাত্র' হতে পারেননি। কিন্তু যা' অর্জন করেছিলেন, তাতে দশজনের একজন নয়, সর্বদাই বিশেষ একজন বলে বিবেচিত হয়েছেন। অতঃপর ঢাকায় (১৯৪৭ইং), নবজাত পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তানে। মুজিব অবশ্য 'পূর্ব পাকিস্তান' বলতেন না, বলতেন পূর্ব বাংলা। ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। রাজনীতিতে জড়িয়েছিলেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই, বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলন (১৯৪৮ইং) এবং বাংলাভাষার দাবিতে জাতীয় আন্দোলনের সূচণায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে কর্তৃপক্ষ তাঁকে শাস্তিমূলক জরিমানা করেছিল মাত্র দশ টাকা (মতান্তরে পনের টাকা)। সহযোগী ছাত্রনেতারা মুচলেকা-জরিমানা দিয়ে 'ছাত্রত্ব রক্ষা' করেছিলেন। কিন্তু মুজিব 'মাথা নোয়াবার নয়', তাঁর বক্তব্য, তিনি স্বাধীন দেশে যুক্তিসঙ্গত আন্দোলনে যুক্ত হয়েছেন, কোনো অন্যায় করেননি, সুতরাং মুচলেকা-জরিমানা দেবেন না। কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেছিল। পাকিস্তানে এটাই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র বহিষ্কারের প্রথম ঘটনা। এখানেই মুজিবের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার ইতি এবং প্রতিবাদী, আপোষহীন রাজনীতির দীর্ঘ যাত্রাপথের শুরু।

১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ইং পাকিস্তান সরকার তাঁকে দু'বার গ্রেপ্তার করেছিল ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকার 'অপরাধে'। অতঃপর বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, প্রদেশিক মন্ত্রীত্ব (১৯৫৪ইং), কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য (১৯৫৬ইং) , ঐতিহাসিক ছ'দফা ঘোষণা (১৯৬৬ইং), আগরতলা 'ষড়যন্ত্র' মামলা। দেশজুড়ে সৃষ্টি হলো উনসত্তরের উত্তাল গণ-আন্দোলন, তখন একটা আকাশ-ভেদী স্লোগান ছিল : 'জেলের তালা ভাঙ্গবো, শেখ মুজিবকে আনবো'। সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় মুক্ত মুজিবকে জনগণ সম্মানে-ভালোবাসায় নাম দিয়েছিল- 'বঙ্গবন্ধু'। ১৯৭০ইং 'এক লোক এক ভোট' ভিত্তিক পাকিস্তানের প্রথম অসাম্প্রদায়িক যুক্ত-নির্বাচনে ইতিহাস সৃষ্টিকারী বিপুল বিজয় এবং অতঃপর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। মুজিব জীবনের সর্বশেষ বন্দীত্ব প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস, পশ্চিম পাকিস্তানের সেনা-কারাগারে, ২৬মার্চ ১৯৭১ থেকে ৭ জানুয়ারি ১৯৭২ইং পর্যন্ত। ১৯৪৭-'৭১ইং পাকিস্তানের ২৪বছরের মধ্যে তাঁকে

১৮বারের বন্দীত্বে কারাগারেই কাটাতে হয়েছিল মোট ১৪টি বছর।

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ১০জানুয়ারি ১৯৭২ইং। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত স্বদেশ এবং নতুন রাষ্ট্রের বিপর্যস্ত অর্থনীতির পুণরুদ্ধার-পূণর্গঠন, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টা এবং লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন। বাহাত্তরেই জাতীয় সংবিধান ঘোষণা অতঃপর জাতীয় নির্বাচনে (১৯৭৩ইং) বিপুল বিজয়। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারায় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু মুজিব। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংঘাত-স্যাবোটেজ মোকাবেলায় সংবিধান সংশোধনপূর্বক রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন প্রবর্তন, ১৯৭৫ইং বাকশাল ঘোষণা। ১৯৭৫ইং ১৫আগস্ট পাকপন্থী বাংলাদেশী সেনাচক্রের হাতে সপরিবারে নিহত হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঘটনাক্রমে বিদেশে থাকায় বেঁচে রইলেন কেবল তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা। খুণী-সেনাচক্রের পরিকল্পনায় বঙ্গবন্ধুর টুঙ্গিপাড়ায় দাফন। একটা পুরণো বাংলা গানের কথা, "দিন ফুরালে সন্ধ্যা হলে, মা করিবেন কোলে"। আক্ষরিক অর্থেই যেন নিজের মা আর মাটির কোলে চির-শান্তিময় নিদ্রায় শায়িত হলেন বঙ্গবন্ধু মুজিব। খুব সংক্ষেপে বিপুল বৈচিত্র্যমন্ডিত এইতো পথ পরিক্রমা মুজিব-জীবনের - টুঙ্গিপাড়াতে শুরু এবং টুঙ্গিপাড়াতেই শেষ।

অন্য কথায় যাবার আগে, এখানে একটা আবেগের কথা বলতে চাই, উল্লেখযোগ্য উপমাও। কবি নজরুল একটা গানে লিখেছিলেন, "মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও রে ভাই// কবর মাঝে শুয়ে যেন মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই"। তাই তো হলো কবির জীবন শেষে। এবার বঙ্গবন্ধুর কথা। "১৯৬৯ সালে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মারা যান। সিদ্ধান্ত হলো ... সোহরাওয়ার্দীর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে। সরকারী অনুমতির প্রয়োজন পড়বে এর জন্য। মানিক মিয়ার ... ধানমন্ডির বাসায় মৃতদেহের পাশে বসেছিলেন বঙ্গবন্ধু, ... মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটরের সাথে বঙ্গবন্ধুর কিছুক্ষণ (ফোনে) কথাবার্তা হলো। ... মুজিব ... রেগে গেলেন এবং বললেন, 'আমি আমার নিজের লাশের জন্য কবরের জায়গা চাচ্ছি না। চাচ্ছি বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্য। ... বাংলার মাটিতে বাংলার মানুষের জন্য আপনাদের কাছে ভিক্ষে চাইতে আমি রাজি নই। ... মুজিব ফোন রেখে দিলেন। তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার জন্যে ভাবি না, বাংলার কোনো গ্রামে ধান ক্ষেতের পাশে কিংবা বাঁশ বাগানে কবর হলেই চলবে। কবরে শুয়ে যেন বাংলার মাটির স্বাদ পাই, বাংলার পাখির গান শুনি, আর যেন ঘ্রাণ পাই বাংলার সোনালী ধানের'। ... মাত্র ছ'বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর এই কথাগুলো এমন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে, সেদিন কল্পনা করাও যায়নি" (১(৩)/১৬০৫)।

বঙ্গবন্ধুর মনোবাসনা পূরণের জন্য খুণীচক্র টুঙ্গিপাড়ায়-নেয়নি তাঁর মরদেহ। ওদের আতঙ্ক ছিল, ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর কবর কালক্রমেই বাঙালির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উৎস-ভূমি হয়ে উঠতে পারে। বাংলার শহীদ মিনার সম্পর্কে পাক-সেনাচক্রের বুকের ভিতরে দারুণ ভয় ছিল। তাইতো একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে বাংলাদেশে মানুষ হত্যা শুরুর পরই পাশবিক আক্রোশে কামানের গোলায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল শহীদ মিনারকেও।

তারও অনেক আগে, বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ভাষা-মিছিলের ছাত্রজনতাকে হত্যা করেছিল পাক-শাসকেরা। ছাত্রছাত্রীরা সেদিনই বর্তমান অবস্থানেই গড়েছিল এক অস্থায়ি শহীদ মিনার। সেটিও ভেঙ্গে ফেলেছিল পাক-শাসকেরা। তা' বায়ান্ন বলি, কিংবা একাত্তর অথবা পঁচাত্তর, অস্ত্রধারী সেনা-পুলিশ কিংবা অস্ত্র-নির্ভর সরকার, চেতনায় ফারাক নেই, থাকেও না।

গণ-তীর্থ হয়ে ওঠার আশংকা ঠেকাতেই খুণী-চক্র বঙ্গবন্ধুর মরদেহ কবর দিয়েছিল ঢাকা থেকে দুর্গম দূরত্বের টুঙ্গিপাড়া, মুজিবের জন্মভিটায়। কিন্তু "বাঙালির তীর্থভূমি ঃ টুঙ্গিপাড়ায়" (১(১)/২৯৫) শিরোনামে সুধীজন রশীদ হায়দার জানিয়েছেন, "জীবিত বঙ্গবন্ধুর চাইতে মৃত বঙ্গবন্ধুও যে অধিক শক্তিশালী, তা তিনি নিহত হবার পর থেকে বারবার প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর প্রতিপক্ষ ... বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তি সচেতনভাবে তাঁকে ইতিহাসের অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করতে চাইলেও, বারবারই লক্ষ্য করা গেছে তাঁর পূণরুত্থান হয়েছে নবতর রূপে, নতুন অভিধায়। ... টুঙ্গিপাড়া এখন বাঙালি জাতির তীর্থভূমি ... দেশের সর্বত্রই ... বঙ্গবন্ধু যে আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছেন, তাই বর্তমানে স্বাধীনতা-বিরোধীদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে"। প্রসঙ্গতই উল্লেখ্য, এসব কথা রশীদ হায়দার লিখেছিলেন ১৯৯৫ইং অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের ২০ বছর পরে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের প্রথম বার রাষ্ট্র-ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনেরও এক বছর আগে।

মহীউদ্দিন খান আলমগীর তৃতীয়বার টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলেন ২০০৩ইং মার্চ মাসে, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন নয়, একটি সাধারণ দিনে। তখন আওয়ামী লীগের দারুণ 'দুঃসময়', ক্ষমতায় বিএনপি-জামাত জোট, ইতিহাস বিকৃতির প্রকট প্রচেষ্টা চলছে। সেই সময়ে মহীউদ্দিন আলমগীর একটা ঘটনায় আবেগাপ্লুত হয়েছিলেন। "এক মা, কোলে তিন বছরের এক শিশু, পা খালি, গা-জড়ানো ব্লাউজবিহীন মলিন শাড়ি, যাচ্ছেন মাজারের দিকে। দেখলাম ... বাঁদিকে মোড় নিয়ে মা শিশুকে দেখাচ্ছেন, 'এটা বঙ্গবন্ধুর মসজিদ, এখানে নামাজ পড়ে দোয়া করেন সবাই বঙ্গবন্ধুর জন্য। দেশটা তো তিনি দেছেন আমাদের'। ... তারপর এগিয়ে গেলেন ... মাজারের দেয়ালের চিকন আবরণীর ফাঁক দিয়ে চোখ রেখে চাইলেন বেশ কতক্ষণ, বঙ্গবন্ধু শুয়ে আছেন শ্যামল দূব্বার আবরণে। ... বললেন, 'খোকা ঐ খানে বঙ্গবন্ধু শুইয়া আছেন, বঙ্গবন্ধু, যিনি আমাদের দেশ দিছেন, স্বাধীন করছেন। খোকা তুই বঙ্গবন্ধুর মত হবি না?' পেছন থেকে দেখছি,- শুনছি" (১(১)/১৫৯)।

বিশ্বাস করি, বাংলার চিরন্তন মা-খালা-দাদী-নানীরা এভাবেই শিশু-মনে ভালো চিন্তার বীজ বুনে দেন। প্রাসঙ্গিক প্রতি-তূলণায় জহুর হোসেন চৌধুরীর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি, "শৈশবে নানী-খালা নামাজ পড়ে আমাকে কোলে নিয়ে দরুদ পরে মাথায় ফুঁ দিতেন আর বলতেন, 'ইংরেজকে কোনো দিন ক্ষমা করবি না। ... বাণিজ্য করতে এসে ছলে ও বলে মীরজাফর-জগৎশেঠ-উমিচাঁদের সাহায্যে পলাশীর মাঠে সিরাজউদ্দৌলাকে হারায় ও পরে মোহম্মদী বেগকে দিয়ে খুণ করায়। কিন্তু মীর মদন ও মোহনলাল দু'জনেই তলোয়ার হাতে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেন - পলাশীর

ময়দান হিন্দু ও মুসলমানের রক্তে পবিত্র হয়'। ... মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মওলানা মোহম্মদ আলী, মওলানা শওকত আলী, ডাঃ আনসারী, হেকিম আজমল খাঁর ছবি দেখিয়ে বলতেন, 'এদের আদর্শ বলে মানবি" (৯/১০)। সুতরাং আমরা নির্ভুল জেনে যাচ্ছি, বাংলাদেশের মানুষই, আন্তরিক শ্রদ্ধায়-ভালোবাসায় টুঙ্গিপাড়াকে গণতীর্থ বানিয়েছে। এটা কোনোভাবেই ক্ষমতাসীনের সাজানো নাটক নয়। বঙ্গবন্ধুর খুণী এবং পাকপন্থী মদদদাতারাও জেনে গেছে, জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু বিপুলতর শক্তিমান, অধিকতর অলঙ্ঘণীয়। যারা বঙ্গবন্ধুকে ভালোবাসেন এবং যারা বিপরীত, সবার জানা হয়ে গেছে, যেভাবে অনুপস্থিত বঙ্গবন্ধু তাঁর আদর্শ দিয়েই একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য সুনিশ্চিত করেছিলেন, ঠিক সেভাবেই তাঁর আদর্শ বাংলাদেশকে সতত সফলতার পথে নিয়ে যাবে। সেই আদর্শের ঠিকানা টুঙ্গিপাড়া হলেও দুনিয়াজোড়া বাঙালির প্রাণে প্রাণে তার উত্তরাধিকার বিস্তৃত।

"বীরপূজার কথা নয়"। সচেতক মন্তব্য অধ্যাপক মুস্তাফা নুরউল ইসলামের, "একটা জাতি যখন উঠছে বীরের প্রয়োজন অবশ্যই থেকে থাকে। সেইমতো পুরুষসিংহ বন্দী কোটি মানুষের শৃঙ্খলমুক্তির সংগ্রামে তিনি সাহসের প্রতিনিধিত্ব করেন। এবং আমাদের প্রত্যক্ষ জানা, বাংলাদেশের তেমনি হয়ে-ওঠার-কালে ইতিহাসতূল্য মানুষটি - শেখ মুজিব, আপন দেশবাসীর ভালোবাসার ডাকে তিনি বঙ্গবন্ধু। ... অনেক কাল আগে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছিলেন 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির', গান লিখেছিলেন 'ওই মহামানব আসে' - এখন যখন প্রতিবাদী সংগ্রামী মানুষটিকে স্পষ্ট দেখতে পাই - সামনে দাঁড়িয়ে শক্ত মেরুদন্ডের দীর্ঘদেহী, উন্নত শির, প্রশস্ত ললাট, শূন্যে উত্থিত দক্ষিণ হস্ত - ইমেজটা এবং ছবিটা কেমন মিশে গিয়ে একাকার হয়ে আসে" (১(২)/৭৫২-৭৫৩)।

পর্বত কিংবা সমুদ্র যেমন একনজরে পুরোটা দেখা যায় না, এদিক-ওদিক থেকে এবং অন্য দিক থেকেও বারবার দেখতে হয়, তবু দেখা শেষ হয় না, বঙ্গবন্ধুর জীবনটাও তাই। এক নজরে কিংবা একরৈখিক পরিক্রমায় ফুরোবার নয়। জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে ৫৫ বছরের জীবন বঙ্গবন্ধুর, তাকে খুব মোটা দাগে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে, এক ভাগে শিক্ষা ও রাজনৈতিক প্রস্তুতির কালপর্ব এবং অন্য ভাগে কর্মময় রাজনৈতিক জীবন। বঙ্গবন্ধুর প্রায় জীবন-জোড়া রাজনীতির প্রেক্ষাপটকে খুব সহজেই ভাগ করা চলে বৃটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ পরিসরে। আবার এভাবেও ভাগ করা যায়, রাজনৈতিক প্রস্তুতি, প্রতিবাদী রাজনীতি এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও জাতির পিতার পরিচয়ে। অনস্বীকার্য মানি, যে-কেউ ইচ্ছে করলেই অন্য কোনো ভাবেও ভাগ করতে পারেন।

শিক্ষা এবং রাজনৈতিক প্রস্তুতির কালপর্ব

রাজনৈতিক গুরুগণ

জ্ঞানীজনের কথা, পশুপাখি জন্মেই পশুপাখি। কিন্তু মানুষকে মানুষ হয়ে উঠতে হয়। অনস্বীকার্য যে, শিক্ষাই মানব-সন্তানকে মানুষ করে তুলে, আর একথাও সত্য যে,

শিক্ষকরাই হচ্ছেন 'মানুষ গড়ার কারিগর'। একটু মনোযোগ দিয়ে বঙ্গবন্ধুর জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে, এ বিশ্বাসই গভীর হয় যে, নানা মতে-পথে অর্জিত যে-সকল বিশ্বাস এবং কর্ম-কীর্তির জন্য বঙ্গবন্ধু অমর হয়ে আছেন, তাঁর অবিচল লক্ষ্য-ভিত্তিটা নির্মিত হয়ে গিয়েছিল আশৈশব শিক্ষকদের প্রভাবে এবং পরিবেশের বাস্তবতায়। তবে তাঁর সম্মন্ধে সাধারণ পুঁথি-পড়া ছাত্রের বর্ণনাটা আদৌ মেলে না বরং তিনি ছিলেন সেই শিক্ষার্থী, যে নিজের মনেই স্থির করে নেয়, 'বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,সবার আমি ছাত্র// নানান কথা নানান মতে শিখছি দিবা রাত্র"।

বালক মুজিবের 'হাতে-খড়ি' গৃহ-শিক্ষক পন্ডিত সাখাওয়াতুল্লাহর কাছে। 'বঙ্গবন্ধু ও শিক্ষকসমাজ' নিবন্ধে ড. মোহাম্মদ শাহাদাত আলী জানিয়েছেন, "পণ্ডিত সাখাওয়াতুল্লাহ ছিলেন নিতান্ত সাদাসিধে, মিষ্টভাষী, সত্যাশ্রয়ী, স্বাধীনচেতা, নিষ্ঠাবান শিক্ষক। তাঁর সাহচর্যে এসে শিশুকাল থেকে বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সত্যাশ্রয়ী, স্বাধীন-চেতা। নিজের মতামতে সর্বদা অবিচল থাকতেন শিশু মুজিব। শিশুকাল থেকেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন নির্ভয়, নির্ভীক" (১(২)/১০২৪)। প্রথম স্কুলে যাওয়া, বাড়ি থেকে প্রায় এক মাইল দূরে, ১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত 'গিমাডাঙ্গা ফ্রি প্রাইমারি স্কুল'- মুজিব এখানে ক্লাস টু পর্যন্ত পড়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে যেটি হাই স্কুলে উন্নীত হয়েছে, নাম 'জি. টি. হাইস্কুল' - গিমাডাঙ্গা-টুঙিপাড়া হাইস্কুল। জি-টি স্কুলের বর্তমান অবস্থান হাইওয়ের পাশে, টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু-স্মরণের বড় বড় অনুষ্ঠানগুলি অনেক সময় এ স্কুলটির মাঠেই করা হয়।

১৯৩৪ইং স্বল্পকালের ছাত্রত্ব মাদারীপুর ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণীতে, তারপর গোপালগঞ্জ শহরের সীতানাথ একাডেমি। পঞ্চম শ্রেণীতে গোপালগঞ্জ পাবলিক উচ্চ বিদ্যালয়ে। এসময় প্রথমে 'বেরিবেরি' রোগে হার্টের দুর্বলতা এবং পরে মারাত্মক চক্ষুরোগে আক্রান্ত মুজিবের স্কুলের লেখাপড়া বন্ধ থাকে প্রায় তিন-চার বছর। কিন্তু বলা চলে, মুজিবের প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য এসময়টাই গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হয়ে উঠেছিল। "ঐ সময়ে গৃহ-শিক্ষক হিসাবে হামিদ মাস্টার বঙ্গবন্ধুর লেখা-পড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ শাসন-বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের একজন নিষ্ঠাবান বিপ্লবী কর্মী ছিলেন। বেশ কয়েক বছর রাজবন্দী হিসাবে তিনি কারাবাস করেছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে কিশোর মুজিব তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের নতুন পথ খুঁজে পেলেন। হামিদ মাস্টারের কাছে বিপ্লবীদের ইংরেজ-বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের নানা রোমাঞ্চকর কর্মকান্ডের কথা কিশোর মুজিব মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। ... বস্তুত হামিদ মাস্টার ছিলেন বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দীক্ষা-গুরু" (১(২)/১০২৪-১০২৫)

এখানে দু'টি বিষয় নজর এড়াবার নয়। প্রথমত, বঙ্গবন্ধুর পিতৃ-পরিবারের শিক্ষানুরাগ। প্রত্যন্ত গ্রামের একটি সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের কর্তা শেখ লুৎফর রহমান, মারাত্মক রোগে আক্রান্ত, স্কুল ছাড়তে বাধ্য হওয়া কিশোর পুত্রের লেখাপড়া সাময়িকভাবেও বন্ধ না করে গৃহ-শিক্ষক রেখে দিলেন। দ্বিতীয়ত, এক 'জেল-খাটা' বিপ্লবীকে দিলেন পুত্রের শিক্ষার দায়িত্ব। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐ সময়টাতে

ইংরেজ সরকারের ক্রোধ-নির্যাতনের প্রধান শিকার ছিলেন বিপ্লবীরাই। একজন বিপ্লবীকে পুত্রের গৃহ-শিক্ষক রাখাটাই ছিল বিস্ময়কর। অপরদিকে পারিপার্শ্বিক সচেতন উদারতা না থাকলে কেবল পারিবারিক উদ্যোগেও এটা সম্ভব হতো না। সে-কালের বিবেচনায় আরেকটা পারিবারিক ব্যতিক্রমের কথা, মুজিবের ভাষাতেই : "আমার আব্বা খবরের কাগজ রাখতেন। আনন্দবাজার, বসুমতি, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী ও সওগাত। ছোটকাল থেকে আমি সকল কাগজই পড়তাম" (৮/১০)। অনস্বীকার্য যে, এসবের মাধ্যমেই বালক মুজিবের সচেতন পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশটিও আমাদের জানা হয়ে যায়।

"হামিদ মাস্টারের নেতৃত্বে কিশোর মুজিব গড়ে তুললেন একটি সেবামূলক সংগঠন"। সংগঠনটি প্রতিদিন স্বচ্ছল বাড়িগুলি থেকে ধান-চাল সংগ্রহ করে 'ধর্ম-গোলা' নামে সঞ্চয়-ভান্ডার গড়ে তুলেছিল। সঞ্চিত ধান-চাল-অর্থ দান করা হতো নিঃস্ব মানুষদেরকে। জনসেবার এ মহান ব্রতটি বালক বয়সেই মুজিব শিখেছিলেন গৃহ-শিক্ষক হামিদ মাস্টারের কাছে। অধ্যাপক ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী 'বঙ্গবন্ধু ও আজকের বাংলাদেশ' নিবন্ধে (১(২)/৯৯৪) উল্লেখ করেছেন, "কথিত আছে যে, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের ('পঞ্চাশের মন্বন্তর, ১৩৫০বাংলা) সময় শেখ মুজিব তাঁর পিতার অনুপস্থিতিতে নিজেদের ধানের গোলা খুলে দিয়েছিলেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য"। বিপ্লবী গৃহ-শিক্ষক হামিদ মাস্টারের সাফল্য এখানেই যে, তাঁর একদার ছাত্র মুজিব আজীবন এ ব্রত-কর্তব্য পালণ করেছেন, অন্যের বিপদে সাড়া দিতে কখনো ভুলেননি। দুয়েকটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

১৯৩৪-'৩৫ সালে কলকাতার পুলিশ অফিসার অজয় কুমার দে'র সাথে ছাত্র শেখ মুজিবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল চিকিৎসাধীন নেতাজী সুভাষ বসুর দর্শনার্থী হিসাবে কোলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় অজয় কুমার দে প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের ঝাউতলার বাসায় ডিউটিরত ছিলেন। অজয় কুমার দে লিখেছেন, "আমি তাকে (শেখ মুজিব) চিনতে পারলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম - তার আগমনের কারণ কি? সে বলল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সে খুব ভালভাবে পরিচিত এবং তার এ হিন্দু বন্ধুর জন্য যেকোন চাকরির ব্যবস্থা করতে এসেছে, কেননা ছেলেটির বাবা মারা গেছে এবং কোন একটা চাকরি তার খুবই দরকার। ... কিছু সময়ের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী তাকে ডেকে পাঠালেন। ২০/২৫মিনিট পরে হক সাহেব তার গাড়ি বের করতে বললেন। অতঃপর ফজলুল হক সাহেব শেখ মুজিবুর রহমান, সেই হিন্দু বিধবা এবং তার পুত্রকে নিয়ে কোথাও বেরিয়ে গেলেন। ১/২ ঘন্টা পর হক সাহেব ফিরে এলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের মিশন সফল হয়েছে কিনা? হক সাহেব বললেন মুজিবকে তিনি খুব স্নেহ করেন, তাই তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন না। ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনে হিন্দু যুবকটির চাকরি হয়েছে" (১(৩)/১৫১৫)।

তখনো মুজিবের কোলকাতার ছাত্রজীবন শুরুই হয়নি, কোনো রাজনৈতিক নেতা বা কর্মীর খ্যাতি-পরিচয়ের 'লেবেল' লাগেনি তাঁর গায়ে। ঐ তরুণ বয়সেই দূরাতিদূর টুঙ্গিপাড়া-গোপালগঞ্জ থেকেই স্বতঃপ্রণোদিত মুজিব যোগাযোগ রাখতেন তদানিন্তন

বাংলার সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের সাথে। এক্ষেত্রে মুজিবের পিতামাতা-পরিজনের সচেতন সমর্থনের কথাটাও না বললেই নয়। সময়টা তখন এমন যে, নানা কারণেই পরিবারের কোনো সন্তানের রাজনীতির লাইনে চলা-ফেরার বিষয়টা পিতামাতা সহজ স্বাভাবিকভাবে দেখতেন না, প্রশ্নই উঠতো না সমর্থন-সহযোগিতার। বঙ্গবন্ধু মুজিবের সারাজীবনের রাজনীতিকে যদি বিরল ব্যতিক্রম বলে মানি, তাহলে তো একথাও মানতে হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমান ততোধিক বিরল সচেতনতাসম্পন্ন একটি পল্লী-পরিবারের সন্তান ছিলেন।

"১৯৩৭ সালে মুজিব গোপালগঞ্জ মিশন বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক গিরিশ বাবু তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন। ... সে-সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে হিন্দু ছাত্রদের সংখ্যাধিক্য ছিল লক্ষণীয়। তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভাব লক্ষ্য করে তিনি (মুজিব) ব্যথিত হয়েছিলেন এবং প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি প্রতিদিন বিদ্যালয়ের প্রথম বেঞ্চে বসার চেষ্টা করতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনে মিশন বিদ্যালয়ের শিক্ষক গিরিশ বাবু তাঁর সহায়ক হন" (১(২)/১০২৫)। ক্লাসের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ছাত্রদের সাম্প্রদায়িক ভাব লক্ষ্য করে ব্যথিত হয়েছিলেন মুজিব, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটানোকেই নিজের জীবনের ব্রত করেছিলেন। তাঁর আদর্শের প্রভাবেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালির কণ্ঠে গীত হয়েছিল, "হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খৃস্টান দেশমাতা এক সকলের"।

১৯৩৮ইং (মতান্তরে ১৯৩৯ইং) বাংলায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের "প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও বাণিজ্য ও পল্লী-উন্নয়ন মন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ ... মিশন স্কুল পরিদর্শনে যান। তখন কংগ্রেস কর্মীরা মন্ত্রীদ্বয়ের সফরের বিরোধিতা করলে শেখ মুজিব তাঁর বন্ধুদের নিয়ে স্কুলে মন্ত্রীদ্বয়কে সংবর্ধনা জানাবার কাজে অংশ নেন এবং তাঁদের ডাক বাংলায় প্রত্যাবর্তন কালে স্কুল হোস্টেলের ভাঙ্গা ছাদ মেরামতের দাবি জানান। মন্ত্রীবর্গ শেখ মুজিবের এই সাহসিকতায় মুগ্ধ হন এবং স্কুল হোস্টেলের ছাদ পূণর্নির্মানের ব্যবস্থা করেন। বলা যায়, এই ঘটনার মধ্য দিয়েই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। মিশন স্কুলে অধ্যয়ন কালে অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং সত্যের পক্ষে অবস্থান নেবার কারণে তিনি একাধিকবার গ্রেপ্তার বা কারাবরণ করেন। ... গোপালগঞ্জে এ কে ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর আগমনের সূত্রে মুজিবের সাথে তাঁদের, বিশেষভাবে সোহরাওয়ার্দীর পরিচয় হয় এবং সেই সূত্রেই কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি (১৯৪২ইং) হবার পর তিনি সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক শিষ্যের মর্যাদা লাভ করেন" (১(৩)/১৩৯৯-১৪০০)।

১৯৪২ইং কোলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র হিসাবে বেকার হোস্টেলে অবস্থানকালে সর্বস্তরের ছাত্রদের সাথে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে এবং হোস্টেলের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ সালে মুজিব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন। একই বছর তিনি "গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন"। ১৯৪৬ইং অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে

শেখ মুজিব "মুসলিম লীগের পক্ষে প্রচারণায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালণ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়সহ কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। ১৯৪৭ সালের ৬ এবং ৭ জুলাই সিলেটে অনুষ্ঠিত গণভোটে মুসলিম লীগের বিজয়ের নেপথ্যে ... তিনি পাঁচ শ' মুসলিম লীগ কর্মীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির পর ... শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা ত্যাগ করে পূর্ব বঙ্গের রাজধানী ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন" (১(৩)/১৬৭৬)।

শেখ মুজিব যখন বেকার হোস্টেলের আবাসিক ছাত্র তখন হোস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক, পরবর্তী সময়ে ঢাকার জগন্নাথ কলেজের বিখ্যাত অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান। "অসাম্প্রদায়িক ও উদার রাজনৈতিক চিন্তার ধারক অধ্যাপক সাইদুর রহমান ছাত্র-মুজিবকে খুবই স্নেহ করতেন। অসাম্প্রদায়িক ও উদার রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণে তিনি বঙ্গবন্ধুকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছিলেন" (১(২)/১০২৫)। পরিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক এবং মানবিক মুজিবকে চিনবার জন্য এসময়ের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করা অপরিহার্য। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ইং মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' আহ্বানে কলকাতায় তিনচার দিন ব্যাপি 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে পরিচিত ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলেছিল। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল লিখেছেন, চারদিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কলকাতায় যত মানুষ মারা গিয়েছিল, পলাশির যুদ্ধেও তত মানুষ মারা যাযনি। অনেকেরই হিসাব, নিহত হয়েছিল ৬,০০০ মানুষ, আহত ১৫,০০০এর কম নয়।

তখন ইসলামিয়া কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক, পরবর্তী সময়ে ভারতের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্তের 'আট দশক' নামক স্মৃতিকথা থেকে বিবরণটি উদ্ধৃত করেছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান :"ছাত্ররা আমাদের অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। আমরা মুসলমান নই বলে যেন কোনো আঘাৎ না পাই তারাও চেষ্টা করতেন। প্রায় সব ছাত্রই অবশ্য লীগ-পন্থী। পাকিস্তান-কামী। মুসলমান শিক্ষকেরাও তাই। ... উর্দুভাষীরা নিজেদের একটু বেশী কুলীন মনে করতেন। কিন্তু বাংলাভাষীদের সংখ্যা ছিল বেশী। এই বাংলাভাষী দলের নেতা ছিল একটি কৃশকায় ছেলে - নাম শেখ মুজিবুর রহমান। ... ছাত্ররা যে আমাদের জন্য কতটা করতে পারত তার প্রমান পেলাম ১৯৪৬-এর রক্তাক্ত দাঙ্গার সময়। বালিগঞ্জ থেকে ইসলামিয়া কলেজের রাস্তায় পদে পদে বিপদ। এই রাস্তা আমাদের ছাত্ররা পার করে দিত। ... কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি ইসলামিয়া কলেজের সেইসব মুসলমান ছাত্রদের যাঁরা আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে বিপজ্জনক এলাকাটা পার করে দিতেন। এই-সব ছাত্রদের একজনের নাম ছিল শেখ মুজিবুর রহমান" (১(১)/২৪১)।

শেখ মুজিবের প্রিয় পাঠ্য-বিষয় ছিল ইতিহাস এবং অন্যতম বিষয় হিসাবে ইতিহাস নিয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৭ইং বি এ পাশ করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস-চেতনা এবং নিজস্ব ব্যতিক্রমী বিশ্লেষণের বিভিন্ন

তথ্যই পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে, আগে ছাত্রজীবনের কথা শেষ করা যাক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে মুজিবের ছাত্রত্ব মোটামুটি এক বছরের মত। কিন্তু দু'টি ব্যতিক্রমী ঘটনায় তাঁর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বিচারপতি হাবিবুর রহমান জানাচ্ছেন, বাংলা ভাষার দাবিতে "সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা-হরতাল সংগঠনের অভিযোগে ১৯৪৮-এর মার্চ ও সেপ্টেম্বরে দুবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়"। এছাড়া, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায়, মুজিবসহ ক'জন ছাত্রনেতার নামে কর্তৃপক্ষ জরিমানা এবং মুচলেকা প্রদানের শাস্তি আরোপ করেছিল। কিন্তু মুজিব সেই শাস্তি মেনে না নেওয়ায় তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার (মার্চ ১৯৪৯ইং) করা হয়। এটিই ছিল পাকিস্তান আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শাস্তিমূলক ছাত্র বহিষ্কারের প্রথম ঘটনা। স্মরণ করা যেতে পারে, ২০১১ইং বিশেষ সিনেট-সভার অনুমোদনক্রমে বঙ্গবন্ধু মুজিবের প্রতি (মরণোত্তর) সম্মানসূচকভাবে সেই বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এটা, বিশ্বাস করি বিশ্বেই এক বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা।

টুঙ্গিপাড়ায় গৃহশিক্ষার শুরু থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে হঠাৎ-শেষ ছাত্রজীবনের কথা, অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর প্রথাগত শিক্ষার কথা মোটামুটি বলা হলো। কিন্তু শেখ মুজিব, রাজনীতি যার জীবনেরই অন্য নাম, তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রস্তুতির কালপর্ব হিসাবে কোন সময়টাকে চিহ্নিত করা চলে? বঙ্গবন্ধুর জীবনের দিকে একটু মনোযোগ দিলে নজর এড়ায় না যে, তাঁকে কেউ কখনো হাত ধরে এনে রাজনীতিতে যুক্ত করেছেন, গড়ে-পিটে 'কাজের যোগ্য' করেছেন, এমন তথ্য মেলে না। বরং তিনি নিজে থেকেই রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছেন, বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের বিবেচনা মতই পথ-পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন। ১৯৩৮ইং শেরে বাংলা আর সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিভ্রমন এসেছিলেন। তাঁদের "সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। এই বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি তাঁর কর্তব্য পালন করেন যথাযথভাবে। পরিণতিস্বরূপ বিরুদ্ধবাদীদের কারসাজিতে (হিন্দুদের পরিকল্পিত 'মিথ্যা মামলা'য় অভিযোগ করা হয়েছিল মুজিব তাঁর সমবয়সী এক হিন্দু যুবককে খুন করার জন্য ছুরি মেরেছিলেন) তাঁর কারাবাস ঘটে"। ঘটনাটির উল্লেখ করে ড. দেওয়ান ওয়াহিদ নবী জানাচ্ছেন, "শেখ মুজিবের নিজের মতে এই কারাবাস তাঁর মধ্যে মানসিক পরিপক্কতা এনে দেয়" (১(৩)/১৫০২)। তাঁর বয়স তখন মাত্র আঠার। সেই বয়সেই মুজিব একটা চরম নেতিবাচক সাম্প্রদায়িকতার ভেতর থেকে পরম ইতিবাচক অসাম্প্রদায়িকতার শিক্ষাটাই গ্রহণ করেছিলেন।

একটা কথা বলা যেতেই পারে, মুজিব যদি পিতৃ-পরিবারে এবং পরিবেশে অসাম্প্রদায়িকতার শিক্ষা না পেতেন, তাহলে কি তিনি অবাল্য অসাম্প্রদায়িক হতে পারেতেন? বস্তুত এমন ধারণাই সঠিক বলে মনে হয় যে, মুজিবের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির কথা বলি কিংবা রাজনৈতিক প্রস্তুতির, গোড়াপত্তন হয়েছিল পরিবারেই। এতকাল পরেও পেছন ফিরে তাকালে মনে হয়, মুজিবের পিতা, পুত্রকে পরীক্ষা পাশ করানোর জন্য নয় বরং প্রকৃত মানুষ করার চিন্তা থেকেই সবকিছু করেছিলেন। তাই মুজিব প্রকৃত মানুষ হয়ে মানুষের রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন, অমানুষের রাজনীতিও তিনি

দেখেছেন, হয়তো ভিতর থেকেই দেখেছেন, কিন্তু নিজের আবাল্য শিক্ষার জোরেই সতত পরিহার করে চলতে পেরেছেন। বিজ্ঞানের অনস্বীকার্য সত্য : "এ লিভিং বিয়িং ইজ এ্যা প্রডাক্ট অব হেরিডিটি এ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট"।

তখনকার একান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই মুজিব মুসলিম লীগ রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু বিরূপ সমালোচকরাও স্বীকার করবেন, মুসলিম লীগ রাজনীতির সাম্প্রদায়িকতাকে মুজিব কখনো মেনে নেননি। প্রসঙ্গতই কলকাতায় ১৬আগস্ট ১৯৪৬ইং মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে' সংক্রান্ত ঘটনাবলী স্মরণ করা যেতে পারে। আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "সত্যই এই সময় কলিকাতার বেশির ভাগ মানুষ তাদের মনুষ্যত্ব-বোধ হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। একটা সংক্রামক ফ্রেনযিতে যেন সবাই সমবেতভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এই সামগ্রিক উন্মত্ততার মধ্যেও দুএকটা সাহসিক মানবিকতার দৃষ্টান্ত মহত্ত্বের উজ্জ্বলতায় ঝলমল করিতেছে। হিন্দু-এলাকায় উন্মত্ত জনতা বেষ্টিত মুসলমান পরিবারকে রক্ষায় হিন্দু নারী-পুরুষের বীরত্ব এবং মুসলিম এলাকায় ঐ অবস্থায় পতিত হিন্দু পরিবার রক্ষায় মুসলিম নারী-পুরুষের বীরত্ব ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকার যোগ্য" (২/২৫২)। সেই কেয়ামতের কলকাতায় যে 'দুএকটা ... দৃষ্টান্ত মহত্ত্বের উজ্জ্বলতায় ঝলমল করিতেছে' তারই একটা নাম শেখ মুজিবুর রহমান, সেকথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে ইসলামিয়া কলেজের তদানিন্তন অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের বর্ণনায়।

'রাজনৈতিক গুরু'দের সান্নিধ্য মুজিব পেয়েছেন, গ্রহণও করেছেন কিন্তু এঁদের চেয়ে 'শিক্ষাগুরু'রাই তাঁর ওপর গভীরতর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে মনে হয়। রাজনীতিকে তিনি ক্ষমতালাভের নয় বরং জন-কল্যাণের এবং জাতি-গঠনের উপায় হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাই দেখা যায়, তরুণ বয়সে 'রাজনৈতিক গুরু' সন্নিধানে তিনিও গেছেন, কিন্তু কখনো কোনো স্বার্থ-আনুগত্যের চিন্তাই মুজিবকে অন্ধ অনুগত করতে পারেনি, বরং অপছন্দের মত-পথ ছেড়ে এসেছেন যখন প্রয়োজন বোধ করেছেন তখনই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতির প্রয়োজনে সমাজ এবং ইতিহাসের প্রতিই আকর্ষণ বোধ করেছেন অধিক। তাঁর এ মনস্তাত্বিক চাহিদা মিটিয়েছেন শিক্ষকরা। তাঁরাই তরুণ মুজিব-মানসে ইতিহাস-বোধ জাগিয়েছেন,'রাজনীতির কবি' হওয়ার স্বপ্ন-বীজ বুনেছেন। প্রকৃতপক্ষেই মুজিব ইতিহাস এবং ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা দ্বারাই পথ-প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন, যখন যেমন প্রযোজন।

এমন একটা প্রশ্ন মাঝেমাঝেই উঠে যে, মুজিবের মত অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী চিন্তার মানুষ কেন মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন? এটা কিন্তু আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না। পরিবার-পরিবেশ মিলিয়ে মুজিব-মানসে যে সমাজ-পরিচয় গড়ে উঠতে থাকে, সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান, এঁদের কল্যাণ-চিন্তা থেকেই তাঁর মনে সমাজ-কল্যাণ চিন্তা জেগেছিল - এ বাস্তব সত্যটুকু মেনে নিতে দ্বিধার কারণ নেই। মুসলিম লীগ রাজনীতিবিদেরা মুসলমানদের কল্যাণের কথাই বলতেন, সুতরাং মুজিবের পক্ষে সমাজ-কল্যাণের চিন্তার আবেগে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মুসলিম লীগের কর্মী হয়ে উঠাই তো স্বাভাবিক ছিল। কিছুটা

পরবর্তী সময়ে মুসলিম লীগ বলতো মুসলমানদের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা। কিন্তু মুজিবের মনে লাহোর প্রস্তাবের 'মুসলিম রাষ্ট্রসমুহ' কিছুতেই 'সাম্প্রদায়িক মুসলিম রাষ্ট্র' ছিল না। তাছাড়া, সোহরাওয়ার্দী এবং আবুল হাশেম প্রমুখের রাজনৈতিক লাইনে থেকেই তিনি বিভক্ত ভারতে অসাম্প্রদায়িক 'স্বাধীন বাংলা' বা 'যুক্ত বাংলা'র স্বপ্ন দেখেছিলেন।

১৯৭৪ইং বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন বিখ্যাত লেখক এবং অকৃত্রিম বাংলাদেশ-সুহৃদ অন্নদা শঙ্কর রায়। 'ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে' শিরোনামের এক নিবন্ধে সেই আলোচনার কথা লিখেছেন শ্রী রায়, জানাচ্ছেন মফিদুল হক : "সেই ১৯৪৭ সালে, আমি (মুজিব) তখন সোহরাওয়ার্দী সাহেবের দলে। তিনি ও শরৎচন্দ্র বসু চান যুক্তবঙ্গ। আমিও চাই সব বাঙালির এক দেশ। বাঙালিরা এক হলে কী না করতে পারতো। তারা জগৎ জয় করতে পারতো। বলতে বলতে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেন। তারপর বিমর্ষ হয়ে বলেন, দিল্লি থেকে খালি হাতে ফিরে এলেন সোহরাওয়ার্দী ও শরৎ বোস। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউ রাজি হয় না তাঁদের প্রস্তাবে। তাঁরা হাল ছেড়ে দেন, আমিও দেখি যে আর কোনো উপায় নেই। ... তখনকার মত পাকিস্তান মেনে নেই। কিন্তু আমার স্বপ্ন কেমন করে পূর্ণ হবে এই আমার চিন্তা" (১(৩)/১৫২১)। সাংবাদিক সোহরাব হাসান জানিয়েছেন, "১৯৫৬ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক সভায় যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে ... তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বিরোধিতা করে বলেছিলেন : Islamic Republic না হয়ে পাকিস্তান রিপাবলিক হোক, সেজন্য আমরা fight করেছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃস্টান সব সমান হবে, সত্য এবং সাম্যের নীতির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক। আমি ... বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, minority, majority, মোহাজের , আনসার, হিন্দু এবং মুসলমান- মানুষ হিসাবে এসবের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই" (১(৩)/১৩১১)।

কোনো স্কুলে না পড়েই রবি ঠাকুর হতে পেরেছিলেন বিশ্বকবি। স্কুলের পড়া শেষ না করেই বিদ্রোহী কবি নজরুল আমাদের জাতীয় কবি। কেউ ভাবেও না, কার দেখানো পথে চলে মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী, গান্ধীজী বা মহাত্মাজী হয়ে উঠেছিলেন। অথচ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত আলোচনায় প্রায়শ প্রশ্ন উঠে কোন 'রাজনৈতিক গুরু'র কাছে তিনি কতটুকু পাঠ নিয়েছিলেন। সত্যিকার অর্থেই এটা আদৌ কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়, তবে প্রথাগত প্রশ্ন বটে। এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধানেই মনে রাখা দরকার, আঠারো বছরের 'ভয়ঙ্কর বয়সে' মুজিব যখন গোপালগঞ্জে সাম্প্রদায়িক পীড়ণ-প্রতিক্রিয়ার মাঝেও নিজের মনেই পরম অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তাঁর কোনো 'রাজনৈতিক গুরু' ছিলেন না, ছিলেন 'শিক্ষাগুরু'রা, আর ছিল, যেটা আগেই বলেছি, উদার এবং সচেতন পারিবারিক শিক্ষার অভঙ্গুর ভিত্তিটুকু।

কোলকাতায় চক্ষু-চিকিৎসার পর ১৯৩৬ইং মুজিব ফিরে এলেন মাদারীপুরে। প্রাঙ্গিক বর্ণনায় নিজেই লিখেছেন, "কোন কাজ নেই। লেখাপড়া নেই, খেলাধুলা নেই। শুধু একটা মাত্র কাজ, বিকালে সভায় যাওয়া। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। ...

স্বদেশী আন্দোলন তখন মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জের ঘরে ঘরে। আমার মনে হত, মাদারীপুরে সুভাষ বসুর দলই শক্তিশালী ছিল। ... আমাকে রোজ সভায় বসে থাকতে দেখে আমার উপর কিছু যুবকের নজর পড়ল। ইংরেজদের বিরুদ্ধেও আমার মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হল। ইংরেজদের এদেশে থাকার অধিকার নাই। স্বাধীনতা আনতে হবে। আমিও সুভাষবাবুর ভক্ত হতে শুরু করলাম। এই সভায় যোগদান করতে মাঝে মাঝে গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর যাওয়া-আসা করতাম। আর স্বদেশী আন্দোলনের লোকদের সাথেই মেলামেশা করতাম" (৮/৯)। নেতাজী সুভাষ বসুর প্রতি মুজিবের পরোক্ষ যোগাযোগ এবং শ্রদ্ধাভক্তির দিকটা পরবর্তী সময়েও অবিচল ছিল। মুজিবের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় সর্বদাই নেতাজীর প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

১৯৩৮ইং গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ছাত্র থাকার কালেই মুজিব নজরে পড়েছিলেন তদানিন্তন বাংলার সফলতম দু'জন রাজনীতিবিদের - এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ১৯৪২ইং মুজিব যখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র, তাঁদের সাথে যোগাযোগ ঘনিষ্টতর হয়েছিল। ফজলুল হক মুজিবকে স্নেহ করতেন আর সোহরাওয়ার্দী তখনই মুজিবের রাজনৈতিক শ্রম এবং নিষ্ঠায় আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪৬ইং জাতীয় নির্বাচনের সময় নিখিল ভারত ছাত্র লীগের একনিষ্ঠ কর্মী মুজিবের ওপর গোপালগঞ্জ মহকুমার (মতান্তরে ফরিদপুর জেলার) নির্বাচন সংগঠকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী। সিলেট জেলার পাকিস্তান-ভুক্তির 'রেফারেন্ডাম'এর (১৯৪৭ইং) সময় সোহরাবর্দীই মুজিবকে ৫০০ স্বেচ্ছাকর্মীর্র বিরাট দলসহ সিলেটে পাঠিয়েছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই মুজিব প্রশ্নাতীত সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কোলকাতায় মুজিবের রাজনৈতিক জীবনের "বড় সাফল্য মুসলিম লীগের তূলণামূলক আধুনিক নেতা ও সুশিক্ষিত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা। এছাড়া ছাত্রনেতা হিসেবে নিজেকে পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করা"। 'স্থির লক্ষ্যের রাজনীতিবিদ শেখ মুজিব' নিবন্ধে স্বদেশ রায় আরো লিখেছেন, "শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন বিকশিত হবার অনুকুল পরিবেশ পায় পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই। ... ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে পাকিস্তান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই একটা শূণ্যতার সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির আগে পূর্ব বাংলার নেতা ছিলেন শেরে বাংলা ... আর কোলকাতা-কেন্দ্রিক বাংলার মুসলিম নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পাকিস্তান সৃষ্টির কিছুকাল আগে থেকে মুসলিম লীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক শেরে বাংলা ... অনেকটা পরাজিত হন। তিনি রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। ... অন্যদিকে কোলকাতা-কেন্দ্রিক যে মুসলমানদের নেতা ... সোহরাওয়ার্দী ... পাকিস্তান সৃষ্টির আগে তিনিও মুসলিম লীগের কট্টর রাজনীতির কাছে অনেকখানি পরাজিত হয়েছিলেন। ... জিন্নাহ-লিয়াকত আলীরা পূর্ব বাংলার রাজনীতি তুলে দেন নবাব পরিবারের হাতে। খাজা নাজিমুদ্দিন হন পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগের নেতা" (১(৩)/১৫২৩-২৪) এবং মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যতর একটা বিশ্লেষণ দিয়েছেন ওয়াহিদুল হক 'হৃদয়টা ছিল তাঁর আকাশের

মত' শিরোনামের নিবন্ধে। "সোহরাওয়ার্দী পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে হেরে গিয়ে এলেন না এদেশে, ভারতের মুসলমানদের (ও গান্ধীজীর) সেবা করবার জন্য রয়ে গেলেন ভারতে। ... মুজিব কি কেবল তারই কারণে প্রতিবাদী রাজনীতি গ্রহণ করলেন? তা হ'লে মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবেন কেন? সোহরাওয়ার্দী মুগ্ধতার ব্যাপারটা ছিল মুজিবের অনেক দিন। কিন্তু এটাই তাঁর জীবনের প্রধান নিয়ামক ছিল না। শহীদ সাহেব ও অন্যান্য অনেক মুসলমান নেতাদের মত তিনি পদলালসায় রাজনীতি করতেন না। রাজনীতি তিনি করতেন, তাঁর বুদ্ধিতে যতদূর কুলায়। অধিকাংশের (তথা কৃষকের) মঙ্গলের স্বার্থে, তাঁর অভ্রান্ত কিবলা ছিল সর্বমানবের, তাঁর আশেপাশের সর্বগরিবের কল্যাণ। এবং সেখানে পৌঁছবার তাঁর অবলম্বন ছিল এই লাঞ্ছিত নিপীড়িতদের মতামত। সকলেই জানে, তিনি জাতির 'পালস্' কতটাই না পড়তে পারতেন" (১(৩)/১৫৩৪)।

"জনগণের নাড়ীনক্ষত্রের খবর তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) ছিল অসাধারণ - শেরে বাংলা বা সোহরাওয়ার্দী কোনমতেই তার সমকক্ষ ছিলেন না। ... অনেক আদর্শ বা ধারণা তিনি আবিষ্কার করেননি, কিন্তু একটি আদর্শকে জনগণের আদর্শে রূপান্তরিত করতে তিনি ছিলেন সার্থক শিল্পী। জনহিতে নিবেদিত এমন নেতা আমি আর দেখিনি"। 'বাংলাদেশ ও শ্রেষ্ঠতম বাঙালি' নিবন্ধে আবুল মাল আবদুল মুহিত, বঙ্গবন্ধুর মূল্যায়ন করে আরো লিখেছেন, "একজন সাধারণ বাঙালি যার পান্ডিত্য তেমন অসাধারণ ছিল না, তিনিই শেষ বিচারে প্রতিষ্ঠা করেন বাঙালিদের জাতিরাষ্ট্র- সহস্র বছরের ঘাত-প্রতিঘাত ও আরাধনার ফসল। রবীন্দ্রনাথ শিল্প-সাহিত্য ও রুচির বিকাশে দিশারী। দেশবন্ধু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ। জাতীয়তাবোধ জাগরণে বিপিন পাল চির-বিদ্রোহী। সমাজ বিনির্মানে রাজা রামমোহন রায় সংস্কারের অগ্রদূত। বাংলা ভূখন্ডের একীভূত অবস্থান রচনায় গোপাল, ইলিয়াস শাহ ও শায়েস্তা খানরা মহান সম্রাট। ধর্মপ্রচারে হযরত শাহ-জালাল বা অতীশ দীপঙ্কর অথবা শ্রীচৈতন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। ... একান্তভাবে বাংলার শাশ্বত উত্তরাধিকারের বাহক, একজন সাধারণ বাঙালি শেখ মুজিবুর রহমান এদের সবার উপর বাঙালি জাতিকে উপহার দেন একটি জাতিরাষ্ট্র - ৫৭হাজার বর্গমাইলে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ" (১(২)/৬২৪)।

বিশ শতকের "চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানের বৃহত্তর রাজনীতিতে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ। রাজনৈতিক আদর্শ বিচারে ... ভাসানী ছিলেন সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা এবং ... সোহরাওয়াদী ও ... ফজলুল হক ছিলেন পাশ্চাত্য ধারার গণতন্ত্রের প্রবক্তা"। 'মৃত্যুহীন বজ্রকণ্ঠ' নিবন্ধে অধ্যাপক আব্দুল খালেক আরো উল্লেখ করেছেন, "এই প্রখ্যাত তিন নেতার মধ্য থেকে শেখ মুজিব, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেই তাঁর আদর্শ নেতা হিসাবে বেছে নেন এবং পাশ্চাত্য ধারার গণতন্ত্রকেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করেন। ... সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবের সাথে মাওলানা ভাসানীর আদর্শগত পার্থক্য এক সময় এতটা প্রকট হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত মাওলানা ভাসানী

আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (NAP) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠণ করেন" (১(১)/৪২৫)। প্রসঙ্গতই উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগ গঠণকারী অন্যতম প্রধান নেতা ভাসানী আওয়ামী লীগ ছেড়ে গিয়েছিলেন। আর জিন্নাহর মৃত্যুর পরে সোহরাওয়ার্দী গঠন করেছিলেন 'জিন্নাহ মুসলিম লীগ' কিন্তু ঠিক সুবিধা হয়নি, মুজিবও আকর্ষণ বোধ করেননি। অতঃপর সোহরাওয়ার্দী নিজেই যোগ দিয়েছিলেন ভাসানী-মুজিবের আওয়ামী লীগে। অনেকেরই ধারণা, সোহরাওয়র্দী আওয়ামী লীগের ভিতরে জাতীয়তাবাদী ধারার অনুসরণের চেয়ে ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক চুক্তি-ঘেঁসা ঝোঁক বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর (১৯৬৩ইং) পর থেকেই মুজিব আওয়ামী লীগের ভিতরে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, ভাষা-ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদ দৃঢ়-বদ্ধ করে তুলতে আরম্ভ করেছিলেন।

হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ "১৯৫৪ সালে একুশ দফার প্রণেতারা অভ্যন্তরীণ কোন্দলেই কেবল জড়িয়ে পড়লেন না, তারা নানা ভাবে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির সঙ্গে আপস করতে থাকলেন। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক- যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, কলকাতায় দুই বাংলার অভিন্নতা সম্পর্কে আবেগপ্রবণ মন্তব্য করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী দ্বারা বরখাস্ত হয়েছিলেন; পরবর্তীকালে তিনি গভর্ণর পদ টিঁকিয়ে রাখতে আবার সেই শাসকদের তোয়াজ করেছিলেন। একুশ দফার অন্যতম নেতা ... সোহরাওয়ার্দীও বাঙালির ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা ভুলে ... পাকিস্তানীদের সঙ্গে 'প্যারিটি' গড়ে তুলেছিলেন; পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পূর্ব বাংলার ৯৮% স্বায়ত্বশাসন অর্জিত হয়েছে বলে ঘোষণাও দিয়েছিলেন। একুশ-দফার সবচেয়ে সাহসী নেতা মওলানা ভাসানী তখন নীতি ও আদর্শের ব্যাপারে অবিচল থেকেছিলেন এবং কাগমারী সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানিদের 'আস্ সালামু আলায়কুম' বলেছিলেন একথাও সত্য। কিন্তু পরবর্তীকালে এই বয়োবৃদ্ধ রাজনীতিক আইয়ুবের বিশেষ দূত হয়ে চীন সফর করেছিলেন। ফিরে এসে বলেছিলেন 'ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব'। এরা তিনজনই ... বিভিন্ন সময় বাঙালির স্বাধিকার আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। গণতন্ত্রের সংগ্রামেও জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন। তারপরও ... তারা প্রত্যেকেই কোন না কোন সময় পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে আপোষরফা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ... শেখ মুজিব সেটি করেননি" (১(৩)/১২৯১)।

বঙ্গবন্ধু মুজিবের 'রাজনৈতিক গুরু' সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সোহরাওয়ার্দী এবং শেরে বাংলার কথা বলা হয়েছে, এবার মাওলানা ভাসানীর কথা। "মওলানার একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। ব্যক্তিগতভাবে ... অসাম্প্রদায়িক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে সমাজতন্ত্রের কথা ভাবতেন, তাকে তিনি ভাবতেই পারতেন না ধর্মকে বাদ দিয়ে। পরিচ্ছন্ন সমাজতন্ত্র নয়, তার লক্ষ্য ছিল ইসলামি সমাজতন্ত্র, যার দরুন সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিযোজিত হয়েও তিনি সামন্তবাদের প্রভাব থেকে যে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন এমনটা বলা যাবে না"। "শেখ মুজিবের অঙ্গীকার' নিবন্ধে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ, "মওলানার ওই সমাজতন্ত্রের তূলণায় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ছিল অধিকতর ধর্মনিরপেক্ষ। ছিল তা ভাষাভিত্তিক, যে-ভাষা কোনো

সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়, সব বাঙালীর মানসিক ও ব্যবহারিক সম্পদ বটে। ... জাতীয়তাবাদের এই ধারা বিকশিত ... হয়ে এক সময় রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ফেলবে, ... এ ছিল অনিবার্য। ... শেখ মুজিব মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই এসেছিলেন। ... নিম্নমধ্যবিত্ত। ... কিন্তু ঐখানে তিনি আটকে থাকেননি ... পরিণত হয়েছেন জনগণের নেতাতে, তার জোরটা ছিল ওইখানেই" (১(২)/৭৮১)।

'মুক্তিযুদ্ধের নায়ক' শিরোনামে সাংবাদিক সোহরাব হাসান লিখেছেন, "বলতে গেলে সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরেই শেখ মুজিবের রাজনীতিতে আসা। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী সাহেব যখন ১৯৫৬ সালে সংখ্যাসাম্যভিত্তিক ('প্যারিটি') সংবিধান মেনে নিলেন শেখ মুজিবের তাতে আপত্তি ছিল। ... ১৯৬৪ সালে এক বক্তৃতায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেন : সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিশ্বাস করে আমাদের নেতা সোহরাওয়ার্দী প্যারিটি মেনে নিয়েছিলেন। আজ মনে হচ্ছে তাদের কথায় বিশ্বাস করা ভুল হয়েছে। আজ আমরা বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ন্যায্য হিস্যা চাই" (১(৩)/১২-১১)। বঙ্গবন্ধু-সোহরাওয়ার্দীর পারস্পরিক রাজনৈতিক মতভিন্নতার প্রসঙ্গে মফিদুল হক লিখেছেন, "সোহরাওয়ার্দীর আশ্রয়-প্রশ্রয় তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) রাজনৈতিক বিকাশের জন্য অনুকুল ছিল বটে; লিডারের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাভাব বজায় রেখেছেন, কিন্তু সোহরাওয়ার্দীর অন্ধ বা অনুগত অনুসারী কখনো হয়ে ওঠেননি। সোহরাওয়ার্দী ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নে ছিলেন দ্বিধান্বিত, মুজিব ছিলেন আন্দোলনের অন্যতম উদ্গাতা; এক ইউনিটের সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সমর্থক, মুজিব তা মেনে নিতে পারেননি - এমনিভাবে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে মুজিব ও সোহরাওয়ার্দীর পথ ছিল ভিন্ন। শেখ মুজিব জাতীয় অধিকারের সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকারকে মিলিয়ে দেখেছেন সবসময়ে" (১(৩)/১৫২১)।

আব্দুল গাফফার চৌধুরীরর পর্যবেক্ষণ: সোহরাওয়ার্দীর আপোষের রাজনীতির ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই সংগ্রামী ও আপোষহীন মুজিবের অভ্যুদয়। ... সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। ... বিশ্বাসী ছিলেন প্রাসাদ রাজনীতিতে। ১৯৫৫ সালে ... বাংলাদেশ তখন এক ইউনিট (পশ্চিম পাকিস্তানে) মেনে নিয়েছে; তার পূর্ব বাংলা নাম লুপ্ত, পূর্ব পাকিস্তান নাম চালু হওয়ার পথে। শহীদ সাহেব পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছেন। বাজারে তখন জোর গুজব সোহরাওয়ার্দী দু'একদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। তিনি আওয়ামী লীগ- মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। ... তার পরিবর্তে জানা গেল, চৌধুরী মুহম্মদ আলীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ-কৃষক শ্রমিক পার্টি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেছে। ... অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দীকে দিয়ে এক ইউনিট ও প্যারিটি প্রবর্তনের চক্রান্ত সফল করিয়ে নেওয়ার পর তাকে ... পরিত্যাগ করা হয়। অভিমানাহত সোহরাওয়ার্দী সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন, 'আমি মানবতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছি'। সে সময়ও শেখ মুজিবকে দেখেছি ... সোহরাওয়ার্দীর সামনে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলছেন, 'মানবতা আর পাকিস্তানি আমলাতন্ত্র এক জিনিষ নয়। আপনি গণ-মানুষের প্রতি আস্থা রাখুন।'৫৪ সালে বাংলার মানুষ আপনাকে হতাশ করেনি।

ভবিষ্যতেও করবে না। ... আপনি গণ-মানুষের সমর্থনে শক্তিশালী হয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। আর সেখানেই আপনার মর্যাদা। আওয়ামী লীগ এবং আমাদের গৌরব। সোহরাওয়ার্দী তবু গণ-মানুষের রাজনীতির দিকে এগুতে পারেননি। ১৯৫৬ সালে তিনি হলেন 'পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সরকারীভবে স্বীকৃত বিরোধী দলের নেতা। ... এ সময় শেখ মুজিবকে দেখেছি, 'ইত্তেফাক' অফিসে ... মানিক মিয়াকে তিনি বলতেন, 'মানিক ভাই,লীডারকে আপনিও বোঝান। তিনি যে পথে যাচ্ছেন, সে পথ আমাদের নয়" (২৮/১৫৪-১৫৬)।

বঙ্গবন্ধুর আরেকজন 'রাজনৈতিক গুরু' বলা হয় অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমকে। মুজিব যখন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র তখনই আবুল হাশিমের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ইং ভারত-ভাগের আগে শরৎ বোস এবং সোহরাওয়ার্দীর সাথে মিলে আবুল হাশিম স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। আবুল হাশিম ৮মে ১৯৪৭ইং তারিখে গান্ধীজীর সাক্ষাতে বলেছিলেন, 'বাঙালিদের একই ভাষা, একই সংস্কৃতি এবং একই ইতিহাস যা বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে ঐক্যবদ্ধ করেছে। হিন্দুই হোক বা মুসলমানই হোক, বাঙালি বাঙালিই। হাজার মাইলের বেশি দূরের পাকিস্তানকে আমরা ঘৃণা করি' (১(৩)/১৪৮২-৮৩)। অথচ তিনিই পরবর্তী সময়ে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হেঁটেছেন। "আবুল হাশিমের কথা বলতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন, যে আবুল হাশিম হতে পারতেন স্বাধীন বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা, শেষ বয়সে তিনিই পথভ্রষ্ট হলেন। সর্ব-ভারতীয় যে-নেতা, জিন্নাহ যাকে সম্বোধন করতেন মওলানা সাহেব বলে, তিনি পাকিস্তানের রাজনীতিতে শুধু মৌলবাদী হলেন না; আয়ুব-মোনায়েম খানের দলে যোগ দিয়ে তাদের তল্পিবাহকও হয়েছিলেন। বাঙালির সেকুলার রাষ্ট্রসাধনার পথপ্রদর্শক হয়ে গেলেন খেলাফতে রব্বানী প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা (১(১)/১২৬-১২৭)।

অনেক প্রাজ্ঞজন রাজনীতি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর ওপর গান্ধীজী-দেশবন্ধু-নেতাজী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গের প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এঁরা তিনজনই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদর্শ এবং কর্মের জন্য অবিস্মরণীয়। গান্ধীজী সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটেই ছিলেন সর্বাধিক প্রভাবক এবং গুরুত্বপূর্ণ নেতা। অপরদিকে দেশবন্ধু এবং নেতাজী সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হলেও প্রধানত বাংলার রাজনীতিতেই সমধিক কার্যকর প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সুতরাং রাজনীতি সচেতন বঙ্গবন্ধু মুজিবের পক্ষে এঁদের রাজনৈতিক আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতির দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক। বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

গান্ধীজী (১৮৬৯-১৯৪৮ইং) ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের "রাজনীতিতে অহিংস আন্দোলনের প্রবক্তা ... বর্তমান ভারত রাষ্ট্রের জাতির পিতা হিসাবে স্বীকৃত। 'মহাত্মাজী' রূপে তিনি সমধিক পরিচিত। ... গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মনীতির মূলকথা ছিল অহিংসা। ... তিনি মনে করতেন, অহিংস শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রকৃত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সাধারণ মানুষের আয়ত্বে আনা সম্ভব। ... হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা চালিয়ে গেছেন" (শিশু বিশ্বকোষ, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০-১৮১)। ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বিকাশের লক্ষ্যেই তিনি একসময় খিলাফত আন্দোলনের (১৯১৯-১৯২৪ইং) নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের (১৯২১-১৯২২ইং) মাধ্যমে গান্ধীজী ভারতে ইংরেজ-শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিলন। প্রসঙ্গতই স্মরণীয় যে, ১৯৭১ইং প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর 'অসহযোগ আন্দোলন' তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি শাসন সম্পূর্ণ অকার্যকর করে দিয়েছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০-১৯২৫ইং) কংগ্রেসের ভেতরেই, গান্ধীজীর নীতির বিরোধিতা করে 'পরিবর্তনবাদী' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে 'স্বরাজ্য দল' গঠন (১৯২২ইং) করে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংসদীয় কার্যক্রমকে ইংরেজ শাসনবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সহায়ক প্রতিপন্ন করতে পেরেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য চিন্তার প্রায়োগিক উপায় হিসাবে তাঁর 'বেঙ্গল প্যাক্ট' অবিস্মরণীয় সফলতা লাভ করেছিল। দেশবন্ধুর এ দু'টি রাজনৈতিক উদ্যোগই পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। বঙ্গবন্ধু আগাগোড়াই পরিপূর্ণ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি অনুসরণ করেছেন। গণতান্ত্রিক ধারার সংগ্রামে নির্বাচনের শক্তিটাও বঙ্গবন্ধু পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই দেখা যায়, ১৯৭০ইং নির্বাচনের আগে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে অপরিমেয় জানমালের ক্ষয়ক্ষতির প্রেক্ষাপটে মাওলানা ভাসানী এবং আরো অনেকেই যখন নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবি করছিলেন, 'ভোটের আগে ভাত চাই' স্লোগান তুলছিলেন, তখনও বঙ্গবন্ধু নির্বাচনের দাবিতেই অবিচল ছিলেন। তখন পিছিয়ে দিলে নির্বাচনটাই শুধু অনিশ্চিত হতো না, এটা যে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকেও বিলম্বিত এবং অনিশ্চিত করে তুলতো, এসত্য অস্বীকার করা যায় না।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫ইং) তাঁর কথায়-কাজে তরুণ মুজিবকে গভীরভাবেই প্রভাবিত করেছিলেন। ১৯৪০ইং নেতাজী যখন অসুস্থ বন্দী অবস্থায় কোলকাতার হাসপাতালে রয়েছেন, তখন ৯ম/১০ম শ্রেণীর ছাত্র মুজিব তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে কলকাতায় গিয়েছিলেন। বন্দী নেতাজীর নিরাপত্তা প্রহরায় নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তা অজয় কুমার দে পরবর্তী সময়ে 'ডাউন ফেডিং মেমোরি লেন' নামক স্মৃতি-কথায় প্রাসঙ্গিক দুটি ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন, তা' উল্লেখ করেছেন মফিদুল হক 'সুভাষ বসু ও শেখ মুজিব : আলাদা ও অভিন্ন' শিরোনামের নিবন্ধে। অজয় কুমার দে লিখেছেন, "একদিন সকাল দশটার দিকে একজন উঠতি বয়সের তরুণ শ্রী বসুর সাথে সাক্ষাতের আবেদন-পত্র পাঠায়। ... সে সাধারণ পাজামা ও শার্ট পরিহিত ছিল। ... বলল তার নাম মুজিবুর রহমান, ... জিজ্ঞাসা করলাম কেন সে শ্রী বসুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। সে বলল, শ্রী সুভাস বসুর বীরত্বের সে একজন ভক্ত, অনুরাগী। ... তাকে শ্রদ্ধা জানাতে চায়। কোন গোপন সংগঠনের সাথে তার কোন যোগাযোগ আছে কিনা তা জানার জন্য মিনিট দশেক আমি তার সঙ্গে কথা বললাম। ... দেখলাম যে সে উচ্চ আদর্শ পোষণকারী একজন উদীয়মান যুবক, যা সে-যুগের তরুণদের মধ্যে

বিরল। লেখাপড়ায় আরও মনোযোগ দেয়ার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়ে আমি তাকে ফিরে যেতে বললাম। ... সে চলে গেল। ... কিছুদিন পর সুভাষ বসুর ৩৮/২ এলগিন রোডের বাড়িতে ... শেখ মুজিবুর রহমান নামে যুবকের দেখা পেয়ে অবাক হলাম। যখন সে ... বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি তাকে ... জিজ্ঞাসা করি এবার শ্রী বসুর সঙ্গে তার সাক্ষাতের কারণ কি? সে সহজভাবে বলল, সুভাষ বসুর রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা" (১(৩)/১৫১৪-১৫১৫)।

১৯৪০ইং ২ জুলাই (মতান্তরে ৩ জুলাই) সুভাষ বসু শেষবারের মত গ্রেফতার হয়েছিলেন। এর আগেই "তরুণ মুজিব তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বোঝা যায় এই আকর্ষণ নিছক আবেগ-তাড়ণা থেকে ছিল না, মুজিবের অসাম্প্রদায়িক জনকল্যাণমুখী প্রতিবাদী রাজনৈতিক চেতনার একটি উন্মেষ এখানে লক্ষ্য করা যায়। ... গ্রেফতারের প্রাক-মুহূর্তে সুভাষ বসু হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে সামিল হয়ে স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে কলঙ্কিত করার (বৃটিশ-কথিত 'অন্ধকূপ হত্যা'র কল্পকাহিনী) উপনিবেশিক প্রয়াসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন" (১(৩) ১৫১৬)। তরুণ শেখ মুজিব তখন সুভাষ বসুর ময়দানের এই জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিজেই সে-কথা উল্লেখ করেছেন।

এবার আমরা স্মরণ করতে পারি, জার্মান সরকারের সহায়তায় সুভাষ বসুর প্রবাসে গঠিত 'আজাদ হিন্দ সরকার (অক্টোবর, ১৯৪৩ইং) এবং 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' (Indian National Army – INA) এর কথা। বার্মা থেকে বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে নেতাজীর ফৌজ আসামের কোহিমায় পৌঁছে ভারতের স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিল। তখনই নেতাজী বহুল আলোচিত তাঁর সেই আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'ভারতবাসী আমাকে রক্ত দিন, আমি ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেব'। এর সাথে মিলিয়েই স্মরণীয় একাত্তরের ৭ মার্চ প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সেই অমোঘ অংশটুকু, "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশা আল্লাহ"। মিলটা লক্ষণীয় বটে, তবে নেতাজীর আহ্বান সফল হয়নি, বঙ্গবন্ধুর সফলতায় আমরা পেয়েছি মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশ। প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ বলেই এখানে স্মরণীয় যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তির কাছে সিঙ্গাপুরের পতন ঘটলে বন্দী আই.এন.এ সৈনিকদেরকে ভারতে এনে বিচার করা হয়েছিল। "One of the first INA men to be tried was Rashid Ali. A huge demonstration was held in Calcutta to protest his trial. This was the only non-Muslim League demonstration in which Mujib participated in Calcutta. The political path taken by Subhas Bose and the example he had set in seeking outside allies had made a lasting impression on Mujib on a subconscious level" (৭/১০৭)। একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বের কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

ঘটনাটি অনেক পরবর্তী সময়ের, তবু প্রসঙ্গত এখানেই উল্লেখ্য : বিশ্বের চোখে রাজনৈতিক নায়ক-প্রতীম বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু মুজিব কলকাতা সফরে যান ১৯৭২ইং ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সুবিশাল

জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। এ সফর কালেই বঙ্গবন্ধু "সরকারি প্রটোকলের বাইরে দুই রাজনৈতিক নেতার ভাস্কর-মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। এঁরা হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র বসু। স্মর্তব্য যে, ভারতে সরকারী পর্যায়ে সুভাষ বসু তখনও বিতর্কিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য, তাঁর অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা হলো অনেক পরে, ১৯৯৭ সালে, জন্মশতবর্ষে যখন তাঁকে 'ভারতরত্ন' হিসেবে বরণ করা হয়। ১৯৭২ সালে সুভাষ বসুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হয় মুজিবের একান্ত আগ্রহে, রীতিভঙ্গ করেই তিনি নিবেদন করেন তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা। কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুভাষ বসুর মুর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের ঘটনা সেটাই ছিল প্রথম" (১(৩)/১৫১৩)।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং তাঁর ওপর গান্ধীজী-নেতাজীর প্রভাবের দিকটা উপলব্ধির জন্য আরো কিছু তথ্য-সন্ধান করা যেতে পারে। ১৯৭২ইং সৈয়দ মুজতবা আলী এবং কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সন্তোষ ঘোষ একসঙ্গে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সন্তোষ ঘোষ বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, "আপনিও তো রাজনীতিতে গান্ধীবাদকে অনুসরণ করেছেন। স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে আপনি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। সুতরাং আপনিও রাজনীতিতে কিছুটা গান্ধীবাদী। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, আমি গান্ধীবাদী নই। পাকিস্তানের সশস্ত্র হানাদারদের মোকাবেলায় মহাত্মার নীতি অনুসরণ ছিল আমার আত্মরক্ষার কৌশল। লক্ষ্য ছিল প্রয়োজনে সশস্ত্র সংগ্রাম। নইলে ... দেশের মানুষকে এ কথা বলতাম না যে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো" (১(৩)/১২৯)। উল্লেখ্য যে, "মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আস্থা ছিল না। তাই তিনি গিয়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের পথে" (২৮/১৫১)

বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে অবিচল থেকেই বঙ্গবন্ধু প্রায়োগিক পন্থা হিসাবে যখন যেমন প্রয়োজন, তেমনি করেই বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্তে গান্ধীজীর অসহযোগ থেকে নেতাজীর সশস্ত্র সংগ্রাম, সব দিকেই জাতিকে পরিচালিত করেছেন। মফিদুল হক লিখেছেন, ভারতের ইতিহাস থেকে নেতাজীকে মুছে ফেলবার প্রবল প্রচেষ্টা ছিল, তেমনি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা। "কিন্তু ইতিহাস তার বরপুত্রদের আবার ফিরিয়ে এনেছে ... বাঙালি আবারো জানতে চিনতে বুঝতে শিখেছে ... নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁরা অভিন্ন আদর্শ ও সংগ্রামের প্রতীক। ... সুভাষের জীবনের সুর যেখানে মিলিয়ে গিয়েছিল সেখান থেকে শুরু হয়েছিল মুজিবের জাগরণী মন্ত্রের উচ্চারণ (১(৩) ১৫২২)।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রস্তুতির মূলে ইতিহাস-চেতনার দিকটি ছিল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আব্দুল গাফফার চৌধুরীর সাথে আলোচনায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "কলকাতার ময়দানে ৩ জুলাই (সিরাজ-হত্যা দিবস) পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সমাবেশে নেতাজী সুভাষ বসুর সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কিত বক্তৃতা শুনেছি। তিনি

(নেতাজী) বলেছেন, যারা সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলা ভাষা জানতেন না এবং অন্যান্য কারণে বিদেশী বলে চিহ্নিত করে তাঁর মৃত্যুতে বাংলার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়নি বলে পান্ডিত্য জাহির করতে চান, তাদের আমি বলতে চাই, এই অল্প বয়সী নবাব যদি বাংলার স্বার্থ ও স্বাধীনতার কথা না ভেবে প্রমোদে লিপ্ত থাকতে চাইতেন, তাহলে অনায়াসে মীর জাফরের মতো ইংরেজদের বিনা শুল্কে সুবে বাংলায় বাণিজ্য করতে দিয়ে, কলকাতায় দুর্গ গড়ার অনুমতি দিয়ে মজাসে নবাবি করতে পারতেন। তিনি তা করেননি। নিজের সিংহাসন রক্ষা, সেই সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে তিনি আত্মাহুতি দিয়েছেন। তিনি বাঙালির জাতীয় বীর" (১(১) ১২৬)।

বঙ্গবন্ধু-প্রসঙ্গে মুস্তফা নুরুল ইসলামের একটি তত্ত্বীয় পর্যবেক্ষণ :"প্রকৃতির রাজ্যেই হোক, কিংবা মানবজীবনেই হোক, ইহজাগতিকতার এলাকায় দৈব-ভূমিকা কতটা গ্রহণযোগ্য? ... জ্ঞানবুদ্ধি তা সমর্থন করে না। অনুসন্ধিৎসু পন্ডিতজন সন্ধান করেন বাস্তবতার পটভূমিতে ইতিহাস যে সম্ভূত হয়ে ওঠে, নির্মিত হয়, বাঁক নেয়, ইতিহাসের গর্ভ থেকে যে নায়ক-সন্তানের জন্ম - ঐ দৈব বা আকস্মিকতা সেক্ষেত্রে কদাপি মূলে কাজ করে না। ... অবতারের ঠাঁই কল্প-পুরাণে। ইতিহাসে নয়। এই প্রেক্ষিতে শেখ মুজিব কথা" (১(২)/৭৪৩)। মোদ্দা কথাটা বলেছেন সাংবাদিক সোহরাব হাসান, "তিনি ইতিহাসের সৃষ্টি যেমন, তেমনি ইতিহাসের স্রষ্টাও। এখানেই শেখ মুজিবের বিশিষ্টতা, এখানেই অনন্যতা" (১(৩)/১৩১২)।

"বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করলে ইতিহাসবেত্তারা শুধুমাত্র একজন তেজোদীপ্ত নেতাকেই খুঁজে পান না, বরং চেতনায় নিপুণভাবে শাণিত এমন একজন বিরল মানুষকে আবিষ্কার করেন যিনি দূরদর্শী ... বিশ্ব-ভাবনা তথা ভূ-অঞ্চলভেদে রাজনৈতিক কৃষ্টি ও জীবনবোধ সম্পর্কে বাস্তব-জ্ঞান ধারণ করেন"। অধ্যাপক. ড. সামছুল হুদা হারুন লিখেছেন, "বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তাতে বঙ্গবন্ধু অনুপ্রেরণা বোধ করেছেন, নিজের ভাবনাগুলোর সাথে মেলাতে পেরেছেন, কিন্তু পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসন-বিরোধী আন্দোলন যখন রাজনীতির মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে সাম্প্রদায়িক ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে, তখন তাতে দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রভাব ইত্যাদি উপকরণ যোগ হয়; বঙ্গবন্ধু তাতে স্বস্তিবোধ করেননি (১(২)/৭৩৫)। পাকিস্তানের উদ্ভব-অস্তিত্বের ভিত্তিটাই মানুষের ইতিহাস, রাজনীতির ইতিহাসের অনুকুলে ছিল না। খাজা নাজিমুদ্দিনের কথা, "Muslim League claimed to have avenged the downfall of Muslim empire in the subcontinent by achieving Pakistan in 1947" ('ডন' অক্টোবর ১৩, ১৯৫২ইং)। অর্থাৎ পাকিস্তান সৃষ্টি করে ভারতে ইংরেজের হাতে মুসলমানদের সাম্রাজ্য-হারাণোর ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া হয়েছে বলে মুসলিম লীগের অবাস্তব দাবি এবং দৃষ্টিভঙ্গী বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব হয়নি ইতিহাস-চেতনার কারণেই।

বঙ্গবন্ধু মুজিবের রাজনৈতিক মানস-গঠনের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা-যেতে পারে, ১৯৫৬ইং পাকিস্তান গণ-পরিষদে যখন সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে 'যুক্ত নির্বাচন'

এবং 'পৃথক নির্বাচন' নিয়ে বিতর্ক চলছে তখন মুসলিম লীগ এবং মোল্লাগোষ্ঠী যুক্ত-নির্বাচনকে অনৈসলামিক বলে অভিহিত করে। গণপরিষদে প্রাসঙ্গিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, "In Egypt, Turkey, Lebanon, Indonesia, Iran, China and also Russia, in all these places there is Joint-Electorate and even in Morocco, Iraq and Sudan there is Joint-Electorate. So according to my Moulana friends of the Nizam-e-Islam Party, the people of these places are not Muslims" (১(২)/৯১৩)। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ইং যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময়ও আওয়ামী লীগ যুক্ত-নির্বাচনের দাবি তুলেছিল, কিন্ত নেযামী ইসলামী'র আপত্তিই প্রবল প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল। তখন কম্যুনিস্ট পার্টির 'বাস্তববাদী' হস্তক্ষেপে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, যদিও কম্যুনিস্ট পাটির্কে যুক্তফ্রন্টের বাইরেই থাকতে হয়েছিল। আরেকটি তথ্যও উল্লেখ করা প্রয়োজন, "পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত এক গণভোটে এখানকার মানুষ যুক্ত-নির্বাচনের পক্ষে রায় দেয়", কিন্তু বাঙালির আরো অনেক দাবির মতই যুক্ত-নির্বাচনের দাবিটিও পাকিস্তানের সংবিধানে অবহেলিত হয়েছিল।

১৯৪৭ইং ভারত-ভাগের সময় তদানিন্তন বংলার পূর্বাঞ্চলকে 'পূর্ব বাংলা' নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৫৬ইং প্রথম সংবিধান রচনার আগে থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার 'পূর্ব বাংলা'র নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এবিষয়ে প্রতিবাদ করে বঙ্গবন্ধু আগস্ট ১৯৫৫ইং পাকিস্তান জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, "We have demanded so many times that you should make it Bengal. The word Bengal has a history...a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. ...We would like to be called ourselves as Bangali" (১(২)/৭৩৭)। এ ভাষণেই বঙ্গবন্ধু অবিচল সাহসে তাঁর ভবিষ্যত রাজনীতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। "I appeal to my friends, *zulum maat koro*. If you will force it upon us we have to adopt unconstitutional means ... .that is what happened all over the world" (প্রাগুক্ত)।

ইতিহাস-চেতনাই ছিল বঙ্গবন্ধুর জাতীয়তাবাদী চিন্তার ভিত্তি। প্রধানমন্ত্রী মুজিব, তাঁর আত্মজীবনীর শ্রুতি-লেখক আব্দুল গাফফার চৌধুরীকে ১৯৭২ইং একদিন বলছিলেন, "উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনায় সকল প্রদেশেই একটা ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এই সম্প্রদায় দু'টির মুসলমান অংশ দিল্লিতে মোগল শাসনের পতনকে দেখেছে তাদের বাদশাহির অবসান হিসেবে। আর ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ দেখেছে একে শাসকের পরিবর্তন এবং নতুন শাসকদের অনুগ্রহে শাসনব্যবস্থায় অধিকতর সুবিধা পাওয়ার সুযোগ হিসাবে। তারা মোগল শাসনের পতনকে ভারতের স্বাধীনতার অবসান হিসেবে দেখেনি। একমাত্র অবিভক্ত বাংলাদেশেই এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা গেছে। বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ই ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে সর্বপ্রথম সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে। ... তা' সত্বেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মত তারা বাংলাদেশে ইংরেজের রাজত্ব

প্রতিষ্ঠাকে কেবল শাসক পরিবর্তন হিসেবে দেখেনি। দেখেছে বাংলার স্বাধীনতা-হরণ হিসেবে। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তই প্রথমে পলাশীর যুদ্ধে নিহত নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে 'বাংলার শেষ নবাব' হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিয়েছে এবং তাঁর হত্যা-দিবস ৩ জুলাইকে (১৭৫৭) জাতীয় শোক দিবস হিসেবে দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে পালন করেছে" (১(১)/১২৫)।

বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস-চেতনার প্রসঙ্গে মোনায়েম সরকার 'বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মানস গঠন' নিবন্ধে লিখেছেন :"বঙ্গবন্ধুর ভাবনা জুড়ে ছিল হাজার বছরের বাংলাদেশ। তাঁর সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখার ইতিকথা কেবল পাকিস্তান আমলে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগে নয়, তারও আগের। শেখ মুজিব সর্বভারতীয় রাজনীতি অপেক্ষা বাংলার রাজনীতি, বাংলার ভাগ্য নিয়ে বেশি ভাবতেন, ... বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ইতিহাস সর্বোতভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত" (১(২)/৯২৬)। মোনায়েম সরকারের সুস্পষ্ট মন্তব্য, "বাংলাদেশকে স্বাধীন করাই বঙ্গবন্ধুর একমাত্র কৃতিত্ব নয়। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে, শতাব্দী-লালিত মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র শোনা গিয়েছিল তাঁর কণ্ঠে। ... বঙ্গবন্ধুর নামে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে" (১(২)/৯২৯)।

ঢাকায় শেখ মুজিব ঃ
সংগ্রামী রাজনীতির প্রধান কর্মক্ষেত্র

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (আগস্ট, ১৯৪৭ইং) পরে কোলকাতার সোহরাওয়ার্দী অনুগত ছাত্রনেতা মুজিব চলে এসেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায়। মুজিবের তৎকালীন চিন্তার পরিচয় মেলে তাঁর লেখা থেকেই : "আমি ভাবতাম, পাকিস্তান কায়েম হয়েছে, আর চিন্তা কী? এখন ঢাকায় গিয়ে ল' ক্লাসে ভর্তি হয়ে কিছুদিন মন দিয়ে লেখাপড়া করা যাবে। চেষ্টা করব সমস্ত লীগ কর্মীদের নিয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়। ... সেপ্টেম্বর (১৯৪৭ইং) মাসে ঢাকা এলাম। পূর্বে দু'একবার এসেছি বেড়াতে। পথঘাট ভালো করে চিনি না। ... ১৫০ নম্বর মোগলটুলীতে উঠব ঠিক করলাম। ... শামসুল হক সাহেব ওখানেই থাকেন। মুসলিম লীগ ও অন্যান্য দলের কর্মীদের সভা ডেকেছেন ... রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে। আমাকে পূর্বেই খবর দিয়েছেন। তাই কয়েকদিন পূর্বেই এসে হাজির হতে হল। ... শামসুল হক সাহেব বললেন, 'জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় কনফারেন্স করব? সরকার নাকি এটাকে ভালো চোখে দেখছে না। ... গোলমাল করে কনফারেন্স ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।' আমি বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি এরা আমাদের ভুলে গেল হক সাহেব।' হক সাহেব হেসে দিয়ে বললেন, 'এই তো দুনিয়া' (৮/৮২-৮৩)। উল্লেখ্য যে, তখন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ-বিরোধী অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির আদি ঠিকানা হয়ে উঠেছিল ১৫০নং মোগলটুলী আর শেখ মুজিবুর রহমান কথায়-কাজে পরিচিত হয়েছিলেন পূর্ব বাংলার প্রথম সক্রিয় প্রতিবাদী রাজনীতিবিদ হিসেবে।

বিচারপতি হাবিবুর রহমান 'বঙ্গবন্ধু ... সম্পর্কে কিছু কথা' শিরোনামের নিবন্ধে লিখেছেন, "বংশ, বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিত্তের ওপর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি অনেকখানি নির্ভর করে। শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষেত্রে এসবের কোনোটারই বিশেষ ভূমিকা ছিল না। ... শেখ মুজিবকে কর্মী হিসাবে অন্যদের প্রশংসা কুড়াতে হয়েছে। একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো, দাবি-দাওয়ার প্রস্তাব এবং তা আদায় করার প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবের সেই কৈশোর ও ছাত্র অবস্থা থেকেই এক ধরণের পারঙ্গমতা ছিল। সভা-সমিতি এবং শোভাযাত্রা-হরতাল সংগঠনের অভিযোগে (১৯৪৮ইং, ঢাকায়) দুবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়" (১(১)/৮৯)।

বঙ্গবন্ধুর "৫৫ বছরের জীবনের প্রায় অর্ধেক - শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য আর যৌবনের এক অংশ কেটে যায় ভবিষ্যতের প্রস্তুতিতে, পরাধীন ভারতবর্ষে। তারপর ১৯৪৭ সালের আগস্ট থেকে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত ২৪ বছর ... পাকিস্তানে বাংলার মানুষের এবং বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। ... আর ২৫মার্চ ১৯৭১ সালের মধ্যরাত থেকে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে (৮জানুয়ারি) মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত ন' মাস কেটে যায় সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে। মুক্তির পরের সাড়ে তিন বছর সময় অতিবাহিত হয় একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কঠোর প্রচেষ্টায় এবং একই সাথে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত সামলাতে"। এমন কাল-পর্ব বিভাজনের পর, 'সংগ্রামী এক জীবনগাঁথা' শিরোনামের নিবন্ধে মেজর রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম স্পষ্ট করেই বলেছেন, "পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির ২৪ বছরই শেখ মুজিবের জীবনের সবচেয়ে কঠোর সংগ্রামের অধ্যায়" (১(১)/১৩৩)।

স্থপতি-সংস্কৃতিসেবী রবিউল হুসাইন বঙ্গবন্ধুর জীবনের কাল-পর্বগুলিকে চিহ্নিত করেছেন : "সেই ১৯৪৭ সালের আগে থেকে ধাপে ধাপে ১৯৪৮, ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭০ এবং ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও সর্বশেষ স্বাধীনতা প্রাপ্তি - সর্বক্ষেত্রে শীর্ষবিন্দুর শীর্ষব্যক্তিত্ব" (১(২)/৮১৮)। তবে অনস্বীকার্য যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই এমন সব ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে, যার শুরু হয়েছিল আগে থেকেই আর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অনিবার্যভাবেই কাল-চিহ্ন অতিক্রম করেছে। মাত্র ২৪ বছরের (১৯৪৭-১৯৭১ইং) পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির গতিপথে দিকচিহ্নমূলক কয়েকটি ঘটনা হচ্ছে; আটচল্লিশে ভাষা আন্দোলনের সূচনা, বায়ান্নর শহীদ দিবস, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ছেষট্টি'র ছ' দফা, আগরতলা 'ষড়যন্ত্র' মামলা, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং সত্তরের নির্বাচন ইত্যাদি। অতঃপর একাত্তরের মুক্তির যুদ্ধ।

ঐতিহাসিক এসব বিভিন্ন ঘটনায় মুজিব ছিলেন কখনো আপোষহীন সংগ্রামের সাথী, কখনো সংগঠক এবং কখনোবা অবিসংবাদিত নেতা। ঐ সময়কালে লক্ষ-কোটি মানুষের প্রাণে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো, সকলের পরম আস্থাভাজন নেতাও ছিলেন একজন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দিয়ে এ ভূখন্ডে সচেতন প্রতিবাদী রাজনীতির সূত্রপাত, বিকাশ-বিবর্তনের পথ পেরিয়ে সেটাই হয়ে উঠেছিল 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা' আর সেই সাথে 'এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ'। রাজপথের জনতা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করেছে - 'জেলের তালা ভাংবো শেখ

মুজিবকে আনবো'। পৃথিবীর খুব বেশি দেশে তো একক কোনো নেতার নামে কোটি-কণ্ঠে এমন আস্থা-প্রতিবাদ মুখরিত স্লোগান উচ্চকিত হয়নি, বাংলাদেশে তো আর কোনো নেতার নামেই নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে 'হঠাৎ পাওয়া ধন' বলে অবমূল্যায়ন না করলে মানতেই হয়, বঙ্গবন্ধু মুজিব আপন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞায়, সতত আপোষহীন সংগ্রামে সমগ্র জাতিকে একটি সুস্থির রাজনৈতিক লক্ষ্যে সংগঠিত এবং সক্রিয় করতে পেরেছিলেন। নিঃসংশয় লক্ষ্যটি ছিল বাঙালির জাতীয় পরিচয় অর্জনের, স্বাধীন স্বদেশ, একটি আধুনিক জাতি-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার।

বাংলার ভাষা-আন্দোলন এবং
বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতি-রাষ্ট্র চিন্তা

ভাষার দাবিতে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সেটাই পরিস্থিতির ধারাবহিকতায় স্বায়ত্বশাসনের দাবি হয়ে উঠেছিল এবং শেষ পর্যায়ে স্বাধীনতার। একথাও অনেকেই বলেন যে, পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন যখন উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন তখনই ছাত্র-যুবসম্প্রদায় সোচ্চার প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগতেই পারে, পাকিস্তানী শাসক-চক্র কি হঠাৎ করেই বাঙালির ওপর 'রাষ্ট্রভাষা উর্দু' চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আর ঢাকায় নবাগত শেখ মুজিবুর রহমান কি আকস্মিকভাবেই সঙ্গী-সাথীসহ প্রতিবাদে সক্রিয় হয়েছিলেন?

বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস-চেতনা এবং রাজনৈতিক প্রস্তুতির বিষয়টা উপলব্ধি করার জন্যই, সংক্ষেপে হলেও বাঙালির ভৌগলিক ও জাতীয় পরিচয় এবং ভাষা আন্দোলনের পশ্চাদপটের কিছু কথা উল্লেখ করা অপরিহার্য। ড. হোসেন মনসুর 'ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও স্বাধীনতার বিকাশ' শিরোনামের নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "প্রাচীনকালে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা অববাহিত এলাকাকে বলা হত ভাঙ্গা। এই ভাঙ্গা এলাকায় বঙ্গ, পুন্ড্র, সমতট, হরিকেল নামে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ গড়ে উঠে। ভাটি অঞ্চলের এসব জনগোষ্ঠিকে বলা হত বঙ্গাল। ... এ জনগোষ্ঠীর ভাষা ও কৃষ্টিতে সামঞ্জস্য ছিল। তাদের ভূখন্ডের কোন সীমারেখা ছিল না। কারণ, তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। মুসলিম শাসক সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ সালে মূলতঃ তিনটি রাষ্ট্রকে একত্র করে 'বাঙ্গালা' নাম দেন। এই প্রথম একটি একক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী একটি রাষ্ট্রীয় এবং ভৌগলিক সীমারেখায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ... বৃটিশ আমলে বাঙালি জাতির নির্দিষ্ট ভূখন্ড চিহ্নিত ছিল, কিন্তু বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ছিল না" (১(২) ১০৮৮)।

"শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল অত্যন্ত প্রখর। দ্বিজাতিতত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও শেখ মুজিব শুরুতেই বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে শঙ্কিত ছিলেন"। এর কারণ হিসাবে সংস্কৃতি-কর্মী গোলাম কুদ্দুছ লিখেছেন, "পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা পাবার আগেই অবাঙালি মুসলমান এবং মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ... গণতান্ত্রিক রীতিনীতি না মেনেই পাকিস্তানের মাত্র ৫% জনগোষ্ঠির ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন পূর্ব

পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হিসেবে শাসন করে সম্পদ লুণ্ঠন করা। আর সে উদ্দেশ্যে প্রথম আঘাত ... পাকিস্তানের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ... ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারকে হরণ করবার। ... মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান ১৯৪৭ সালের ১৭মে হায়দ্রাবাদে ... ঘোষণা করেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। এর দু'মাস আগেই ... এক সম্মেলনে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহম্মেদ পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির লক্ষ্যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। ... পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী নামমাত্র বাঙালি ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসেই করাচীতে একটা ... সম্মেলনে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। ১৯৪৮ সালের ১১মার্চ পাকিস্তান গণপরিষদের সভায় এ সুপারিশ প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়" (১(২)/১০৯৩-৯৪)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৪০ইং গৃহীত মূল 'লাহোর প্রস্তাব' পরিবর্তন করে জিন্নাহর উদ্যোগে "১৯৪৬ইং মুসলিম লীগের দিল্লী কনভেনশনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দুইটি অঞ্চল নিয়ে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয় চুড়ান্ত হলে গণআজাদী লীগ, গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও তমদ্দুন মজলিস বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার লক্ষ্যে গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে গঠিত হয় প্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ... শেখ মুজিবুর রহমান ... ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করে সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন। ... ২৩ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান আইন পরিষদে উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। শেখ মুজিব তার প্রতিবাদে আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন" (১(২)/১০৮৯)। "২৮ ফেব্রুয়ারি, ৪৮ইং তমদ্দুন মজলিস ও মুসলিম ছাত্র লীগের সভায় ভাষার দাবিতে ১১মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান সম্বলিত এক বিবৃতিতে সই করেন শেখ মুজিব, নইমুদ্দিন আহম্মদ, আব্দুর রহমান চৌধুরী" (সূত্রঃ 'ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু', সরদার সিরাজুল ইসলাম, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২)।

"১৯৪৮ সালের ২মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় সকল ছাত্র-সংগঠনের প্রতিনিধিদের এক সভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এই পরিষদের পক্ষ থেকে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনের দিন অর্থাৎ ১১মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল আহ্বান করা হয়। এই দিন ঢাকার আব্দুল গনি রোডে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে একটি জঙ্গী মিছিল তৎকালীন আই.জি. শামসুদ্দোহার মুখোমুখি হয়। ... এক পর্যায়ে পুলিশ শেখ মুজিবসহ কয়েকজন ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করে" (১(২)/১০৯৪)। লক্ষণীয় যে, ২রা মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রথম সভায় প্রকৃতপক্ষে পুর্বোল্লেখিত তমদ্দুন মজলিস এবং মুসলিম ছাত্র লীগের ২৮ ফেব্রুয়ারি গৃহীত সিদ্ধান্তটিকেই নিজেদের কার্যক্রমে গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবেই ভাষা-আন্দোলনের বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বিত করা হচ্ছিল এবং সক্রিয় সংগঠকের ভূমিকায় শেখ মুজিবের উপস্থিতি ছিল প্রায় সর্বত্রই।

'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি' নিবন্ধে বিচারপতি কে. এম. সোবহান লিখেছেন, "১৯৪৮-এর ১১মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করবার দাবির জন্য প্রথম যে-সব ছাত্রনেতা গ্রেফতার হন, বঙ্গবন্ধু তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন" (১(১)/১০৯)। মুজিবের প্রত্যক্ষ সংগ্রামী মানসিকতার পরিচয় হিসেবে একটি তথ্য উল্লেখ করেছেন এস. এ. করিম; সচিবালয় ঘেরাওয়ের সময় মুজিবের অন্যতম সহযোগী কামরুদ্দিন আহমদ পরামর্শ দিয়েছিলেন, মুজিবের উচিৎ সামনে না গিয়ে কোথাও আড়ালে থাকা, তাতে তিনি সংগঠনিক দক্ষতায় আন্দোলন এগিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু মুজিবের তাৎক্ষণিক জবাব ছিল, "Unless he- Mujib was in the forefront of the struggle, his followers might lose heart and not perform to the best of their abilities" (৭/৩৯)।

ছাত্রদেরকে গ্রেফতার করেও মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন স্বস্তিতে ছিলেন না, কারণ গভর্ণর জেনারেল জিন্নাহ কয়েকদিন পরেই ঢাকায় আসছেন। নাজিমুদ্দিন তখন ছাত্রদের দাবি মানার শর্তে একটি চুক্তি করে ছাত্রনেতাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জেলের ভেতর থেকেই এই চুক্তিনামা অনুমোদন করেছিলেন শেখ মুজিব। প্রাসঙ্গিক একটি বিশেষ তথ্য মেলে বিচারপতি সোবহানের লেখায়, "চুক্তিনামার শর্ত অনুযায়ী ছাত্রনেতাদের মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে বার হতে অস্বীকার করেন, যতক্ষণ না সমস্ত রাজবন্দীদের জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন বাধ্য হয়েছিলেন সে শর্ত মেনে নিতে। সে সময় দুই কমিউনিস্ট নেতা রণেশ দাশগুপ্ত ও ধরণী রায় রাজবন্দী হিসাবে আটক ছিলেন জেলে" (১(১)/১০৯)। ড. রফিকুল ইসলাম তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন, "আটচল্লিশ সালের ভাষা আন্দোলনের নেতাকর্মীদের সঙ্গেই ছাত্রনেতা শেখ মুজিবকে প্রথম দেখি সচিবালয়ের প্রবেশ পথে পিকেটিং রত অবস্থায়। ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠের পুকুর পাড়ে (এখন নেই) একটি ছাত্রসভায় প্রথম বক্তৃতা করতে শুনি। ... প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্রদের দাবি মেনে চুক্তিপত্রে সই দিয়েছেন, বন্দী ছাত্রনেতারা মুক্তি পেয়েছেন, তারপরেও শেখ মুজিব ছাত্রসভা ডেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভবনের (জগন্নাথ হল পুরাতন মিলনায়তন) চলে গেলেন। সেই সভায় তিনি নাজিমুদ্দিনের চুক্তিভঙ্গের আশঙ্কা প্রকাশ ... করেছিলেন। ... শেখ মুজিব ... পরিষদ ভবনে বিক্ষোভের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেফতার হয়ে এটা যথার্থভাবে প্রমান করেছিলেন যে খাজা নাজিমুদ্দিন চুক্তিভঙ্গকারী" (১(৩)/১৩৪৮)।

সচিবালয়ে 'পিকেটিং' করা হয়েছিল ১১ মার্চ ১৯৪৮ইং, সেদিনই গ্রেপ্তার হয়ে মুজিব মুক্তি লাভ করেছিলেন ১৫মার্চ সন্ধ্যায়। ড. রফিকুল ইসলাম উল্লেখিত প্রাদেশিক আইন পরিষদের দিকে শেখ মুজিবের মিছিল নিয়ে যাবার ঘটনাটি হয়েছিল ১৬মার্চ। ১৬মার্চের ঘটনাবলীর কিছু প্রসঙ্গিক তথ্য-মন্তব্য সম্যকরূপেই গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌতুহলোদ্দীপক। এস. এ. করিম জানাচ্ছেন, বদরুদ্দিন উমর 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীণ রাজনীতি' বইতে লিখেছেন, ১৬ মার্চ ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করা কথা ছিল তোয়াহার এবং মিছিল-ঘেরাও করার কোনো পূর্ব-অনুমোদিত সিদ্ধান্তও

ছিল না। কিন্তু সভা শুরুর আগেই শেখ মুজিব সভাপতির চেয়ারে বসে সভা শুরু করে দেন। আর কাউকে কিছু বলতে না দিয়েই নিম্নলিখিত তিন-দফা সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়ে নেন।

- ঢাকা এবং অন্যান্য স্থানে পুলিশের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করতে হবে;
- পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করে প্রস্তাব অনুমোদন করতে হবে এবং
- যদি উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করা না যায়, তাহলে পূর্ব বাংলার পরিষদ সদস্যগণ এবং মন্ত্রীবর্গ পদত্যাগ করবেন।

সভায় কিছু সময় লক্ষ্য এবং সারবস্তুহীন ভাষণ প্রদানের পর মুজিব হঠাৎই স্লোগান তেলেন - 'On to Assembly' - চল চল এ্যাসেম্বলী চল। এবিষয়ে এস. এ. করিমের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, বদরুদ্দিন উমর তাজউদ্দিনের ডায়েরি এবং তোয়াহার একটি সাক্ষাৎকারের বরাত দিয়ে, উভয়ের মৃত্যুর পর এসব কথা লিখেছেন। তাউজউদ্দিনের ডায়েরিতে ১৬মার্চ লেখা রয়েছে "Mujibur Rahman presided" – আর কিছু নেই। অতঃপর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এস. এ. করিমের : সভায় নিজ উদ্যোগে সভাপতিত্ব করার বিষয়ে শেখ মুজিব সম্পর্কে বদরুদ্দিন উমরের কথাগুলির পক্ষে প্রামান্য কেনো তথ্য নেই। তবে "It is true that the procession was not authorized by the Action Committee nor was it in conformity with the agreement (between the Government and the SAC) . Ever the man of action, Mujib grasped instinctively that a general meeting of the students...consisting of nothing more than fiery speeches....would not serve any practical purpose. By leading the march to the Assembly Mujib provided the mob-thrust needed to prod the provincial legislators to stand firm on the language issue on the eve of Jinnah's visit." (৭/৪২)। বদরুদ্দিন উমর তাঁর বইতে বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে যেসব কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে সপ্রমান তথ্যের অভাবে এস.এ. করিমকে নির্ভর করতে হয়েছিল যৌক্তিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ওপর। তবে এখন আমরা বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকেই সংশয়াতীত তথ্য জানতে পারি।

"১৬ তারিখ (মার্চ, ১৯৪৮ইং) সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রসভায় আমরা সকলেই যোগদান করলাম। হঠাৎ কে যেন আমার নাম প্রস্তাব করে বসল সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য। সকলেই সমর্থন করল। বিখ্যাত আমতলায় এই আমার প্রথম সভাপতিত্ব করতে হল। অনেকেই বক্তৃতা করল। সংগ্রাম পরিষদের সাথে যেসব শর্তের ভিত্তিতে আপোস হয়েছে তার সকলগুলিই সভায় অনুমোদন করা হল। তবে সভা খাজা নাজিমুদ্দীন যে পুলিশী জুলুমের তদন্ত করবেন, তা গ্রহণ করল না; কারণ খাজা সাহেব নিজেই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমি বক্তৃতায় বললাম, 'যা সংগ্রাম পরিষদ গ্রহণ করেছে, আমাদেরও তা গ্রহণ করা উচিত। শুধু আমরা ঐ সরকারি প্রস্তাবটা পরিবর্তন করতে অনুরোধ করতে পারি, এর বেশি কিছু না'। ছাত্ররা দাবি

করল, শোভাযাত্রা করে আইন পরিষদের কাছে গিয়ে খাজা সাহেবের (মুখ্যমন্ত্রী) কাছে এই দাবিটা পেশ করবে আর চলে আসবে। আমি বক্তৃতায় বললাম, তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়েই আপনার আইনসভার এরিয়া ছেড়ে চলে আসবেন। ... কারণ সংগ্রাম পরিষদ বলে দিয়েছে, আমাদের আন্দোলন বন্ধ করতে কিছুদিনের জন্য। সকলেই রাজি হলেন" (৮/৯৬-৯৭)।

পরবর্তী ঘটনাবলীও বঙ্গবন্ধুর কথায় : "শোভাযাত্রা করে আমরা হাজির হয়ে কাগজটা ভিতরে পাঠিয়ে দিলাম খাজা সাহেবের কাছে। আমি আবার বক্তৃতা করে সকলকে চলে যেতে বললাম এবং নিজেও সলিমূল্লাহ মুসলিম হলে চলে আসবার জন্য রওনা করলাম। কিছু দূর এসে দেখি ... কিছু ছাত্র ও জনসাধারণ তখনও দাঁড়িয়ে আছে আর মাঝে মাঝে স্লোগান দিচ্ছে। আবার ফিরে গিয়ে বক্তৃতা করলাম। এবার অনেক ছাত্র চলে গেল। আমি হলে চলে আসলাম। প্রায় চারটায় খবর পেলাম, আবার বহু লোক জমা হয়েছে, তারা বেশির ভাগ সরকারি কর্মচারী ও জনসাধারণ, ছাত্র মাত্র কয়েকজন ছিল। শামসুল হক সাহেব চেষ্টা করছেন লোকদের ফেরাতে। ... আমি ছুটলাম এ্যাসেম্বলির দিকে। ঠিক কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছি তখন লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে শুরু করেছে পুলিশ। ... কিছুক্ষণ পরে ... দেখি মুসলিম হলে হৈচৈ। বাগেরহাটের ... সাহেবকে ধরে নিয়ে এসেছে। তিনি এমএলএ। তাঁকে ছাত্ররা জোর করছে লিখতে যে তিনি পদত্যাগ করবেন। ... তিনি লোক ভাল এবং শহীদ সাহেবের সমর্থক ছিলেন। অনেক কষ্টে, অনেক বুঝিয়ে তাঁকে মুক্ত করে বাইরে নিয়ে ... একটা রিকশা ভাড়া করে তাঁকে উঠিয়ে দিলাম" (প্রাগুক্ত)।

"পূর্ব বাংলাকে পঃ পাকিস্তানের ... কলোনীরূপে রূপান্তরিত করার জন্য পশ্চিমা শাসকরা প্রথমেই বাঙালির মাতৃভাষা বাংলার উপর আঘাত হানতে সচেষ্ট হয় এবং তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের প্রথম গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার মাধ্যমে। ছাত্রনেতা শেখ মুজিব ও তাঁর সহকর্মীরা 'না, না, তা হবে না, তা হবে না' চিৎকার করে সেই ঘোষণার জবাব দিয়েছিল"। লেঃ কঃ (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী আরো উল্লেখ করেছেন, "রাষ্ট্রভাষার দাবি রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯৪৯ খৃস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল সেই আন্দোলন ... তীব্র আকার ধারণ করে। ... শেখ মুজিবুর রহমানসহ ২৪ জনকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয় ... ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদানের মাধ্যমে অনেকেই নিজেদের ছাড়িয়ে নেন, কিন্তু শেখ মুজিব ছিলেন আদর্শ ও নীতিতে অটল। তাই ভাষা আন্দোলনের চরম মুহূর্তেও (২১ ফেব্রু, '৫২) তিনি জেলখানা থেকে ছাড়া পাননি" (১(১) ২৮২-২৮৩)।

শেখ মুজিব জেলে থেকেও সক্রিয়ভাবেই ভাষা-আন্দোলনে পরামর্শ-সহযোগিতা দিয়েছেন, সে আলোচনায় যাবার আগেই কর্ণেল চৌধুরীর উল্লেখিত আরো কিছু কথা, "ভাষা আন্দোলনের দীর্ঘ ৮/৯ বছরের ইতিহাসে সব ছাত্রনেতা ও কর্মীরাই যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা নয়। সরকার নেতৃস্থানীয় বহু ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবিকে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আন্দোলনকে নেতৃত্বহীন

করে দমিয়ে রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন, তা যেমন সত্য, শেখ মুজিব, গাজীউল হক প্রমুখের আপোসহীন নেতৃত্বাধীন বহু ছাত্রনেতা-কর্মীদের গ্রেফতার, নির্যাতন ও হত্যার বিনিময়ে অবশেষে ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানে সরকার বাধ্য হয়, এটাও তেমনি এক ঐতিহাসিক সত্য" (প্রাগুক্ত)। "তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান সরকার সংবিধানের ২১(১) অনুচ্ছেদে বলতে বাধ্য হয় যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা। এই প্রথম বাংলাভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করে" (১(২)/১০৯১)।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই ভাষা-আন্দোলন এমনই এক ঘটনা যে, সেকালে অনেকে আপন স্বার্থ-চিন্তায় আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেছেন, আবার একালে অনেকেই সে-আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করেন। এখানে এরকম দু'টি বিপরীত তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪৮ইং ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক সময়ের ফজলুল হক হলের ঘটনার কথা জানিয়েছেন অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, "একদিন দেখলাম সেখানে ছাত্ররা খুব উত্তেজিত, শুনলাম নাজিমউদ্দিন সরকার-বিরোধী তিনজন নেতা মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) , তফাজ্জল আলী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) এবং এম এ মালেক (কুষ্টিয়া) সরকারের টোপ গিলেছেন এবং মন্ত্রীত্ব, রাষ্ট্রদূত আর আইএলও-তে স্থায়ী প্রতিনিধিত্বের লোভে ডিগবাজি খেয়েছেন" (১(৩)/১৩৪৯)। এম এ মালেক মুক্তিযুদ্ধের সময় ইয়াহিয়ার নিযুক্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর হয়েছিলেন।

কয়েক বছর আগে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে জামাত-নেতৃবৃন্দ ভাষা-আন্দোলনে 'নিজেদের অবদান' সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ দাবি তুলেছিলেন। জামাতের আমীর জোট সরকারের শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী একবার একুশের এক সভায় বলেছিলেন, "ভাষা আন্দোলনের কৃতিত্ব এককভাবে মুসলমানদের। ... ১৯৫২ সালে যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন তাঁরা সবাই ছিলেন মুসলমান, কোন হিন্দু বা কম্যুনিস্ট জীবন দেয়নি। তাই বাংলা ভাষায় একক অবদান মুসলমানদের " (জনকণ্ঠ, ২০-০২-'০৫)। সেই সভাতেই জনৈক রফিকুল ইসলাম খান বলেছিলেন, "ভাষা আন্দোলন মুসলিম নেতৃবৃন্দ শুরু করেন। অধ্যাপক গোলাম আজমসহ কয়েকজন এতে নেতৃত্ব দেন"। তখন 'ভাষা-সৈনিক গোলাম আজম'এর রঙিন পোস্টারে চারদিক ছয়লাব করা হয়েছিল। তথাকথিত প্রসঙ্গটির ব্যাখ্যায় শ্রদ্ধেয় গাজীউল হক সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, "গোলাম আযমকে ভাষাসৈনিক বলা হয়। আসল ঘটনা হচ্ছে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী যখন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষ থেকে এক ... মানপত্রে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দানের দাবী জানানো হয়। সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র পরিষদের সভাপতি ছিল জনৈক অরবিন্দ রাজ। হিন্দু হওয়ায় তাকে মানপত্র পড়তে দেওয়া হয়নি। সাধারণ সম্পাদক ছিল গোলাম আযম। সে সেই মানপত্র পড়ে। এতেই সে হয়ে গেল ভাষাসৈনিক" (জনকণ্ঠ, প্রাগুক্ত)। ভাষা সৈনিক গাজীউল হক বলেছেন, "ভাষা আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলকে একসূত্রে গ্রথিত

করা"। তিনি আরো বলেছেন, "পাকিস্তান আমলে আমরা যখন আন্দোলন করি তখন এ সকল অপশক্তি ও মৌলবাদীরা এত প্রকাশিত ছিল না। এক একটা আন্দোলন হয়েছে আর তারা খড়কুটার মত ভেসে গেছে। এখন তারা আবার শক্তিশালী হচ্ছে এবং প্রকাশ্যে প্রগতিশীলতার বিরোধিতা করছে। এ আমাদের ব্যর্থতা"।

বাঙালির ভাষা-আন্দোলনকে সেদিনের মুসলিম লীগের শাসক-চক্র কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করতেও রাজি ছিলেন না। তারা এতবড় একটি উত্তাল ঘটনাকে দেখছিলেন কেবল তাদের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টি দিয়েই। ১৯৫২ইং ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকায় ছাত্র-জনতা নিহত হওয়ার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে আইন পরিষদের অধিবেশনে ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে যখন মওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, মনোরঞ্জন ধর, গোবিন্দলাল বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ অধিবেশন বয়কটের প্রস্তাব এনে ছাত্র-হত্যার বিচার দাবি করছিলেন, তখন বাঙালি-সন্তান মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন নির্লিপ্তভাবে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বললেন, "It's a fantastic story ... উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্য পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। এর জন্য কারো মৃত্যু হলে আমরা কি করতে পারি? আপনারা জানেন, এর পেছনে কম্যুনিস্ট এবং হিন্দুদের উস্কানি রয়েছে। আমরা এদের নির্মুল করবো ইনশাল্লাহ্ ... " (৩/৬০)। প্রসঙ্গতই সবিশেষ উল্লেখ্য যে, সেদিন একমাত্র আবুল কালাম শামসুদ্দিন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসাবে পদত্যাগ করে ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি তখন ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পাকিস্তানের শাসকচক্র বিপাকে পড়লেই দোষ দিয়েছে, ভারত, হিন্দু আর কম্যুনিস্টদের ওপর। কিন্তু একটা প্রশ্ন, মিথ্যার বালুতে মুখ ঢেকে তারা কোনো সত্য লুকাতে পেরেছেন, কোনো বিপদ উৎরাতে পেরেছেন কি?

আবার ফেরা যাক ভাষা আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতায় বঙ্গবন্ধুর জীবন-কথায়। 'Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Remembered' শীর্ষক নিবন্ধের শুরুতেই, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মডার্ণ এশিয়ান হিস্ট্রি'র শিক্ষক ড. প্রেমেন আড্ডি লিখেছেন, "It was in Dhaka, in early 1948, that a young Bengalee Muslim university student achieved public attention. The occasion was a meeting addressed by Mohammed Ali Jinnah, the founder of ... Pakistan.....The Quid-i-Azam.....announced that Pakistan, of which East Bengal was a part, could have only one national language, Urdu. Urdu, they proclaimed, had the Islamic pedigree, that Bengali lacked. There was an uproar. Mujibur Rahman led the protest. He had made his first tryst with destiny....For the people of East Bengal and the youthful Mujib, this event marked a defining moment" (১(১)/৫২৯-৫৩০)। প্রকৃতপক্ষে জিন্নাহ ১৯৪৮ইং মার্চ মাসে দু'টি সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন, ২১ মার্চ রেসকোর্সের জনসভায় আর ২৪ মার্চ কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে। নিম্নোল্লেখিত উভয় সভাতেই জিন্নাহ একই কথা বলেছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।

"ছাত্র-যুবকদের আন্দোলন নতুন মাত্রা পেল যখন ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকায় এক জনসভায় (রেসকোর্স মাঠে) ভাষণদান কালে ... জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, 'Let me make it very clear to you that the State Language of Pakistan is going to be Urdu and no other language.' বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো পূর্ব বাংলা - অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি শিকড় নিলো মুসলিম পাকিস্তানে" (১(২)/৯১২)। এখানে প্রশ্ন জাগতেই পারে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' - সিদ্ধান্তমূলক এমন কথা বলার আগে-পরে গভর্ণর জেনারেল জিন্নাহকে কেন বলতে হয়েছিল 'এটা আমি খুব পরিষ্কার করে দিতে চাই' এবং 'অন্য কোনো ভাষা নয়'? ঐতিহাসিক তথ্যেই একটু পরে প্রশ্নটির উত্তর সন্ধান করা যাবে। তবে তার আগে জিন্নাহর দ্বিতীয় সভাটির কথা উল্লেখ করা যাক।

কার্জন হলে প্রদত্ত 'কনভোকেশন ভাষণ'এ জিন্নাহ বলেছিলেন, "My dear students, for the sake of Islam I have decided that Urdu alone would be the state language of Pakistan." - তখন ছাত্রসমাজের প্রথম সারিতে উপবিষ্ট আইনের ছাত্র শেখ মুজিবুর রহমান এবং বরিশালের মেধাবী ছাত্র ফজলুল করিম একই সংগে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানান। `No, No, Bangla, we want Bengali shall be the state language of Pakistan.' (৩/৫৫)। সম্ভবত তিনদিন আগের রেসকোর্সের বক্তৃতায় ছাত্র-জনতার প্রতিবাদের কথা মনে রেখেই কার্জন হলের বক্তৃতায় উর্দুই রাষ্ট্রভাষা করা হবে বলতে গিয়ে জিন্নাহ 'ইসলাম রক্ষার' অনুষঙ্গটি যুক্ত করেছিলেন। পাকিস্তানের পূর্বাপর ঘটনাবলীতে 'ইসলাম রক্ষা'র কথাটি যে কতভাবে কতবার অপব্যবহৃত হয়েছে, সেটা একান্তই গবেষণার বিষয়। কমিউনিস্ট নেতা খোকা রায় 'সংগ্রামের তিন দশক' বইতে লিখেছেন, "No, No' বলে ঐ প্রতিবাদ যে খুব বড় ছিল তা' নয়। কিন্তু মিঃ জিন্নাহর জনপ্রিয়তা ছিল তখন তুঙ্গে। ... তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে ঐ প্রতিবাদ - সেটা তখন খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রের কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হলেও, তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাঁদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতি মেনে নিতে রাজী ছিল না" (৪/৭৬)।

যদিও বিভিন্ন তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয় যে, রেসকোর্স এবং কার্জন হলে জিন্নাহর বক্তৃতার সময় উভয় ক্ষেত্রেই মুজিব তাঁর সহযোগিদের নিয়ে 'No, No' বলে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে বর্ণনা দিয়েছেন অনেকটাই পরোক্ষভাবে : রেসকোর্স মাঠে জিন্নাহ যখন বলেছিলেন "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে, আমরা চার-পাঁচশত ছাত্র এক জায়গায় ছিলাম সেই সভায়। অনেকে হাত তুলে জানিয়েছিল 'মানি না'। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ... তিনি যখন আবার বললেন, 'উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'– তখন ছাত্ররা তাঁর সামনেই চিৎকার করে বললেন, 'না না না'। জিন্নাহ প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করেছিলেন। ... আমার মনে হয়, এই প্রথম তাঁর মুখের উপর তাঁর কথার প্রতিবাদ করল বাংলার ছাত্ররা। এরপর জিন্নাহ যতদিন বেঁচে ছিলেন আর কোনোদিন বলেননি, উর্দুই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে" (৮/৯৯)।

এবার সেই প্রশ্নটির উত্তর সন্ধান করা যাক, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র

াষ্ট্রভাষা, এমন সিদ্ধান্তমূলক ঘোষণার আগে-পরে জিন্নাহকে কেন কিছু বাড়তি কথা বলতে হয়েছিল, 'এটা আমি খুব পরিষ্কার করে দিতে চাই' এবং 'অন্য কোনো ভাষা নয়'? প্রসঙ্গত দু'টি ভিন্ন তথ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। একটি হচ্ছে, পূর্ব বাংলার কংগ্রেস নেতা (কুমিল্লার) ধীরেন দত্ত কর্তৃক ১৯৪৮ইং ফেব্রুয়ারি মাসে করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদে উত্থাপিত বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় অবস্থান-মর্যাদা সংক্রান্ত প্রস্তাব। আর দ্বিতীয়টি, পূর্ব বাংলায় চলমান ভাষা-আন্দোলন এবং ছাত্র-বন্দীদের মুক্তির বিষয়ে ছাত্র-নেতাদের সাথে সম্পাদিত প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের চুক্তি। এসব কোনো কথাই গভর্ণর জেনারেল জিন্নাহর অজানা থাকার কথা নয়। তাই জিন্নাহ, যিনি নিজেকে 'কুল ব্লাডেড লজিশিয়ান' হিসাবে উল্লেখ করতেন এবং অন্যরা যার সমালোচনা করতেন 'কর্তৃত্ববাদী একনায়ক' হিসেবে, নিজের বক্তব্যে বাড়তি দৃঢ়তা যুক্ত করেই ছাত্র-জনতার ভাষা আন্দোলন এবং প্রত্যাশা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন।

"১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি করাচীর 'কনস্টিট্যুয়ান্ট এসেম্বলী'তে সর্বপ্রথম শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত দাবি জানান যে, উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও সরকারী কাজে ব্যবহার করতে হবে। ... 'পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা হিসেবে বাংলা তার যোগ্য মর্যাদা পাবার দাবি অবশ্যই জানাবে' (৩/৫৫)। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রস্তাবটিই ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদার বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের নিকট উত্থাপিত প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব। প্রসঙ্গত একথাও স্মরণীয় যে, একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক-সেনারা প্রবীণ রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তকে তাঁর কুমিল্লার বাসায় হত্যা করেছিল। 'লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলী'তে বাংলাকে অন্যমত রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবে তাৎক্ষণিকভাবেই তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী উর্দুভাষী মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং এ্যাসেম্বলীর বাঙালি 'ভাইস প্রেসিডেন্ট' অর্থাৎ 'ডেপুটি স্পিকার' তমিজউদ্দিন খানও। পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু মুজিব গভীর দুঃখের সাথেই বলেছিলেন, "...had a single Bengali Muslim Legislator echoed the sentiments of Dutta, the rulling circle of Pakistan would have had second thought about the wisdom of imposing `One Nation, One Language' Policy in a country as diverse as Pakistan" (৭/৩৯)।

ছাত্রনেতাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে খোকা রায় লিখেছেন, "পুলিশী দমননীতি সত্ত্বেও ১১মার্চ (১৯৪৮ইং) ধর্মঘটের প্রসারতা এবং আন্দোলনের প্রসারে আতংকিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে (ক) আন্দোলনে ধৃত সকলের মুক্তি, (খ) বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম ও ইংরেজী উঠে যাওয়ার পরে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং (গ) বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করে পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভায় প্রস্তাব গ্রহণ– এই তিনটি শর্তে এক আপোষ (চুক্তি) করেছিলেন। এই আপোষের পর ভাষা সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিল। কিন্তু আন্দোলন

প্রত্যাহারের পর নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা আপোষের তৃতীয় শর্তটি পূরণ করে নাই। এ ক্ষেত্রে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছিল" (৪/৭৫)। চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দিন আহমদ। খোকা রায় এখানে নাজিমুদ্দিন সরকার এবং ভাষা সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে সাক্ষরিত চুক্তির তিনটি মাত্র ধারার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চুক্তি-নামাটি ৮-দফা সম্বলিত ছিল (দ্রষ্টব্য : পরিশিষ্ট-১)।

ভাষা-আন্দোলনের ধারাবাহিক ঘটনাবলী প্রমান করেছে, নাজিমুদ্দিন প্রকৃতপক্ষে চুক্তি-রক্ষার জন্য ছাত্রনেতাদের সাথে চুক্তি করেননি, তার একমাত্র প্রযোজন ছিল গভর্ণর জেনারেল জিন্নাহর আসন্ন সফরটি নিরাপদ করা। সেটাও জিন্নাহর অতি-উৎসাহ এবং অগণতান্ত্রিক মানসিকতার কারণেই সম্ভব হয়নি। নাজিমুদ্দিন শুধু যে চুক্তি-ভঙ্গ করেছিলেন, তাই নয়, ১৯৪৮ইং পরবর্তী প্রায় চার বছর স্তিমিত হয়ে থাকা ভাষা-আন্দোলনকে তিনিই হঠকারী এক ঘোষণায় তুঙ্গস্পর্শী করে তুলেছিলেন। "১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ঢাকা সফরে এসে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবেব ঘোষণা দিলে বাংলা ভাষার আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ... নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে শেখ মুজিবুর রহমান জেলখানাতে বসে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদকে আহ্বান জানান ... বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারী মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে উঠে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। এ পরিষদ একুশে ফেব্রুয়ারী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে" (১(২)/১০৯০)। প্রসঙ্গতই অতঃপর শ্রদ্ধেয় তিনজন ভাষা-সৈনিকের লিখিত কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করছি।

ভাষা-সৈনিক গাজীউল হক, ভাষা আন্দোলনে আগাগোড়া সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ছাত্র-সভাতেই ১৯৫২ইং ২১ ফেব্রুয়ারি মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠছে তখন শেখ মুজিবুর রহমান জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় নিশ্চুপ ছিলেন না। পরামর্শ দিয়েছেন এবং কারাগারে বন্দী থেকেও আন্দোলনের শরীক হয়েছেন। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পল্টন ময়দানে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ৩০ জানুয়ারি (মতান্তরে ৩১শে) সন্ধ্যায় শামছুল হকের উদ্যোগে ঢাকা বার লাইব্রেরী মিলনায়তনে আহুত সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু তখন চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ৩ ফেব্রুয়ারী শামছুল হক, আব্দুস সামাদ আজাদ ও ডা. গোলাম মাওলার মাধ্যমে মুজিব ভাই সংবাদ পাঠালেন যে, ২১ ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী হরতাল ডেকে মিছিল করে ব্যবস্থাপক পরিষদ ভবন ঘেরাও করা যায় কিনা বিবেচনা করে দেখতে। ৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের মিছিল শেষে বেলতলায় ২১ ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী হরতাল ঘোষণা হলো" (১(৩)/১৬৪৯)।

দ্বিতীয় জন ভাষা-সৈনিক এবং ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান। তাঁর স্মৃতিচারণ : "বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিন ধরে জেলে আবদ্ধ ছিলেন। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে তাঁর স্বাস্থ্য

ভেঙ্গে পড়ে। তাই তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ... বঙ্গবন্ধু সে সময় ছাত্র নেতাদের গভীর রাতে আলাপ আলোচনার জন্য ডাকতেন এবং তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় রাজনৈতিক বিষয় এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে আলোচনা করতেন। ... ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারীকে রাজবন্দী মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি দিবস হিসাবে পালন করার জন্য বঙ্গবন্ধুই আমাদেরকে নির্দেশ দেন। ... বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে প্রথম দিনেই পরিষদ ভবন ঘেরাও করার কথা বলেছিলেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে, একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে তিনি আমরণ অনশন করবেন। একথা আজ অনেকেই রাজনৈতিক কারণে মানতে চান না, কিন্তু আমি এসব সত্য বলেই জানি" (১(৩) ১৬৪৯-৫০)।

তৃতীয়জন ভাষা আন্দোলন এবং আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সময়ে বঙ্গবন্ধুর সতীর্থ অলি আহাদ। ঐতিহাসিক কাগমারী সম্মেলনের (১৯৫৭ইং) পর থেকে বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর মত-পথের ভিন্নতা সকলেরই জানা। অলি আহাদ লিখেছেন, "প্রহরী পুলিশের ইচ্ছাকৃত নির্লিপ্ততার সুযোগ গ্রহণ করে আমরা তাঁর সহিত হাসপাতালে কয়েক-দফা দেখা করি। ... এর পরে সরকার তাঁকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে সরিয়ে নেয়" (১(৩)/১৬৫০)। উল্লেখ্য যে, ফরিদপুর জেলেই শেখ মুজিব ও তাঁর সহবন্দী মহিউদ্দিন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। একটানা ১১দিন অনশনের পর সেখান থেকে চরম ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থায় মুজিব ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ইং মুক্তি লাভ করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ গোপালগঞ্জে এবং টুঙ্গিপাড়ায় কাটিয়ে তিনি ঢাকায় ফিরেছিলেন।

১৯৬৬-'৬৯ইং সময়কালে বঙ্গবন্ধুর কারাবন্দী অবস্থায় লিখিত বিবরণ, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' থেকে কিছুটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "আমি হাসপাতালে আছি (জানুয়ারি ১৯৫২ইং, 'নিরাপত্তা বন্দী' হিসাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে)। সন্ধ্যায় মোহাম্মদ তোয়াহা ও অলি আহাদ দেখা করতে আসে। আমি ওদের রাত একটার পরে আসতে বললাম। ... রাতে অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন পিছনের বারান্দায় ওরা পাঁচ-সাতজন এসেছে। ... পুলিশরা চুপচাপ পড়ে থাকে, কারণ জানে আমি ভাগব না। ... আমি বললাম সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে। আওয়ামী লীগ নেতাদেরও খবর দিয়েছি। ছাত্রলীগই তখন ছাত্রদের মধ্যে একমাত্র জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান। ছাত্রলীগ নেতারা রাজি হল। অলি আহাদ ও তোয়াহা বলল, যুবলীগও রাজি হবে। ... আরও বললাম, 'খবর পেয়েছি, আমাকে শীঘ্রই আবার জেলে পাঠিয়ে দিবে। কারণ আমি নাকি হাসপাতালে বসে রাজনীতি করছি। তোমরা আগামীকাল রাতেও আবার এস'। ... পরের দিন রাতে ... অনেকেই আসল। সেখানেই ঠিক হল আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২ইং) রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে এবং সভা করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করতে হবে। ... ফেব্রুয়ারি থেকেই জনমত সৃষ্টি করা শুরু হবে। আমি আরও বললাম, 'আমিও আমার মুক্তি দাবি করে ১৬ই ফেব্রয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু করব। আমার ছাব্বিশ মাস জেল হয়ে গেছে'। আমি একথাও বলেছিলাম. 'মহিউদ্দিন জেলে আছে। আমার কাছে থাকে। যদি সে অনশন করতে রাজি হয় তার নামটাও আমার নামের সাথে দিয়ে দেবে" (৮/১৯৬-১৯৭)।

"সরকার আমাকে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দিলেন, ভালভাবে চিকিৎসা না করে। ... মহিউদ্দিনও রাজি হল অনশন ধর্মঘট করতে। আমরা দুইজন সরকারের কাছে পহেলা ফেব্রুয়ারি দরখাস্ত পাঠালাম যদি ১৫ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে আমাদের মুক্তি দেওয়া না হয় তাহা হলে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট করতে শুরু করব। ... যখন জেল কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করল অনশন ধর্মঘট না করতে তখন আমি বলেছিলাম, ... কোন অন্যায় করি নাই। ঠিক করেছি জেলের বাইরে যাব। হয় আমি জ্যান্ত অবস্থায় না হয় মৃত অবস্থায় যাব। ... সমস্ত জেলায় ছাত্রলীগ কর্মীদের ও যেখানে যেখানে আওয়ামী লীগ ছিল সেখানে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। ... রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদও গঠন করা হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারি দিনও ধার্য করা হয়েছে। কারণ, ঐ দিনই পূর্ব বাংলার আইনসভা বসবে। ... ১৯৪৮ সালে ছাত্ররাই এককভাবে বাংলা ভাষার দাবির জন্য সংগ্রাম করেছিল। এবার আমার বিশ্বাস ছিল, জনগণ এগিয়ে আসবে। ... মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতি সহ্য করতে পারে না" (প্রাগুক্ত)।

"জেলের ভেতর আমরা দুইজনে প্রস্তুত হচ্ছিলাম অনশন ধর্মঘট করার জন্য। ... যাই হোক না কেন, আমরা অনশন ভাঙব না। ... ১৫ফেব্রুয়ারি তারিখে সকালবেলা আমাকে জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হল ... একটু পরেই মহিউদ্দিনকেও নিয়ে আসা হয়েছে ... । ... কর্তৃপক্ষ বললেন, আপনাদের অন্য জেলে পাঠানোর হুকুম হয়েছে। ... ফরিদপুর জেলে। ... আমরা (ফরিদপুর) জেলগেটে এসে দেখি ... জায়গাও ঠিক করে রেখেছেন, রাজবন্দিদের সাথে নয়, অন্য জায়গায়। আমরা তাড়াতাড়ি ঔষধ খেলাম পেট পরিষ্কার করার জন্য। তারপর অনশন ধর্মঘট শুরু করলাম। ... মহিউদ্দিন ভুগছে ধুরিসি রোগে, আর আমি ভুগছি নানা রোগে। ... চারদিন পরে আমাদের নাক দিয়ে জোর করে খাওয়াতে শুরু করল। ... এদের কথা হল, 'মরতে দেব না'। ... পাঁচ-ছয় দিন পর বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ... কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ-পানি খেতাম। কারণ এর মধ্যে কোনো ফুড-ভ্যালু নেই। আমাদের ওজনও কমতে ছিল। ... এখন আর বিছানা থেকে উঠবার শক্তি নাই। ... প্যালপিটিশন হয় ... নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। ভাবলাম আর বেশি দিন নাই" (৮/২০১-২০৩)।

"২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটালাম, রাতে সিপাহিরা ডিউটিতে এসে খবর দিল, ঢাকায় ভীষণ গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন লোক গুলি খেয়ে মারা গেছে। ... মনে হচ্ছিল চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছি। ... অনেক রাতে একজন সিপাহি এসে বলল, ছাত্র মারা গেছে অনেক। ... পরের দিন নয়-দশটার সময় মিরাট শোভাযাত্রা বের হয়েছে, বড় রাস্তার কাছে জেল। শোভাযাত্রীদের স্লোগান পরিষ্কার শুনতে পেতাম ... হর্ন দিয়ে একজন বক্তৃতা করছে। ... কি হয়েছে ঢাকায় কিছু কিছু বুঝতে পারলাম। ... মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিল। ... ২৭তারিখ রাত আটটার সময় আমরা দুইজন চুপচাপ শুয়ে আছি। ... খোদার কাছে মাপ চেয়ে নিয়েছি। ... ডেপুটি জেলার এসে আমার কাছে বসলেন এবং বললেন, 'আপনাকে যদি মুক্তি দেওয়া হয়, তবে খাবেন তো'? বললাম 'মুক্তি দিলে খাব, না দিলে খাব না, আমার লাশ মুক্তি পেয়ে যাবে'। ... ডেপুটি জেলার সাহেব

বললেন, 'আপনার মুক্তির অর্ডার এসে গেছে ... । দুই চামচ ডাবের পানি দিয়ে মহিউদ্দিন আমার অনশন ভাঙ্গিয়ে দিল। ... পরের দিন (২৮-০২-১৯৫২) আব্বা আমাকে নিতে আসলেন। অনেক লোক জেলগেটে হাজির। আমাকে স্ট্রেচারে করে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হল এবং গেটের বাইরে রেখে দিল, যদি কিছু হয়, বাইরে গিয়ে হোক, এই তাদের ধারণা (৮/২০৩-২০৬)।

১৯৫২ সালের ২৭ এপ্রিল আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদের সম্মেলনে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শেখ মুজিব বলেছিলেন, "দীর্ঘ আড়াই বছর কারাবাসের পর আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা ভাষা-সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, আমি তখন কারাগারে অনশনরত। আপনারা সংঘবদ্ধ হোন, মুসলিম লীগের মুখোশ খুলে ফেলুন। এই মুসলিম লীগের অনুগ্রহে মওলানা ভাসানী, অন্ধ আবুল হাশিম ও অন্যান্য কর্মী আজ কারাগারে। আমরা বিশৃঙ্খলা চাই না। বাঁচতে চাই, লেখাপড়া করতে চাই, ভাষা চাই। ... মুসলিম লীগ সরকার আর 'মর্ণিং নিউজ' গোষ্ঠি ছাড়া প্রত্যেকেই বাংলা ভাষা চায়" (১(৩)/১৬৫০-৫১)। উল্লেখ্য যে, ঢাকার 'মর্ণিং নিউজ' পত্রিকাটি রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন এবং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে সরকার এবং মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসাবে চরম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেছিল। এস. এ. করিম লিখেছেন, "On 27 April, five hundred delegates from various districts assembled at the Dhaka Bar Library for a conference on the language issue. Mujib was an active participant in it. One of the outcomes of the conference was the decision ….to observe the Martyrs' Day annually on 21 February. When it was observed for the first time after independence in 1972, Mujib described it as 'the fountainhead of Bangalee nationalism" (৭/৫৩)। তদবধি ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা-শহীদ দিবস এবং ২০০০ইং থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

১৯৫৫ইং পাকিস্তান গণপরিষদে প্রদত্ত অবিস্মরণীয় বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "অন্য কোন ভাষা জানি কি না জানি তা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমরা এখানে বাংলাতেই কথা বলতে চাই। যদি আমরা এটা উপলব্ধি করি যে, আমরা বাংলা ভাষায় ভাব বিনিময়ে সক্ষম, তা হলে সকল সময়ই বাংলায় কথা বলবো, এমনকি ইংরেজীতেও যদি আমাদের সমান দক্ষতা থেকে থাকে। যদি আমাদের অনুমতি না দেযা হয় তবে আমরা হাউজ পরিত্যাগ করবো। বাংলাকে অবশ্যই হাউজ কর্তৃক গ্রহণ করে নিতে হবে। এটাই আমাদের স্ট্যান্ড" (১(৩)/১৬৫১)। প্রসঙ্গতই স্মরণীয়, বাংলাদেশের সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন এবং মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার দিকটিও প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারও অনেক আগে, অক্টোবর, ১৯৫২ইং পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে শেখ মুজিব গণচীনে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির শান্তি সম্মেলনে ৩৭টি দেশের কয়েক শত প্রতিনিধির সমাবেশে বাংলাতেই ভাষণ দিয়েছিলেন। অনস্বীকার্য যে, সেদিন

মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসাটাই যথেষ্ট ছিল না, প্রয়োজন ছিল যথার্থ সাহসেরও। শান্তি সম্মেলনে বাংলা ভাষণটি ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন আতাউর রহমান খান। উল্লেখ্য যে, উক্ত সম্মেলনে ৩০সদস্যের পাকিস্তান প্রতিনিধি-দলে পাঁচজন মাত্র ছিলেন পূর্ব বাংলার।

আমাদের বাঙালিত্ব এবং বাংলা ভাষা সম্পর্কে বিদগ্ধজন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একটি উদ্ধৃতিযোগ্য বক্তব্য : "আমরা হিন্দু বা মুসলমান একথা যেমন সত্য, তার চেয়েও বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয় এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি ... আমাদের চেহারা ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ এঁকে দিয়েছেন, যা মালা-তিলক-টিকিতে বা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নাই" (৩/৫৭)। এমন স্পষ্ট-সত্য কথাটি তিনি বলেছিলেন ১৯৪৮ইং ৩১শে ডিসেম্বর করাচিতে পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে। নিশ্চয়ই আমরা উপলব্ধি করবো, কী গভীর বাস্তবতাবোধ এবং সাহস থেকে তিনি বাঙালির অস্তিত্ব-সত্যের এমন অমোঘ কথাটি বলেছিলেন। ড. শহীদুল্লাহ রাজনীতির মানুষ ছিলেন না, কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়ায় মানুষের পরিচয়। আবেগে-প্রতিজ্ঞায় বঙ্গবন্ধু আজীবন দাঁড়িয়েছিলেন এ ভিত্তিরই ওপর। তাই অনস্বীকার্য যে, ভাষাবিদ ড. শহীদুল্লাহর বিশ্বাস আর রাজনীতিবিদ মুজিবের চেতনার ভিত্তিটি অভিন্ন ছিল।

এখানে ভাষা-আন্দোলন প্রসঙ্গে সোহরাওয়ার্দি এবং শেরে বাংলার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে ভিন্ন দু'টি ঐতিহাসিক তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। করাচিতে বাস করায় সোহরাওয়ার্দি পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত ঘটণাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ইং পুলিশের গুলিবর্ষণে ছাত্রজনতার মৃত্যুর পর "he issued a statement condemning the police excesses, adding at the same time that Urdu, in his opinion, should be the state language. His statement was so out of tune with the sentiments of the people in East Bengal…..Mujib flew to Karachi to apprise Suhrawardy about the situation ... Suhrawardy then issued another statement expressing his full support for Bengali as a state language" (৭/৫৩)। ঢাকায় বাংলা ভাষার সমর্থক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের তালিকাসহ একটি প্রচার-পত্র প্রকাশ করা হয়। তাতে সোহরাওয়ার্দী এবং ফজলুল হক উভয়ের নামই ছিল। "Huq, however, blamed his unnamed opponents for trying to create a rift between himself and Nurul Amin and publicly dissociated himself from the langage movement, ... he did not want to jeopardize his lucrative position as Advocate General. But soon he realized that he had nothing to gain in the long run from hanging on to the coattails of Nurul Amin and resurrected his old party under the new name of Krishak Shramik Party (KSP) ..It was another manifestation of erratic behaviour of the mercurial politician (প্রাগুক্ত)।

ভাষা-আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা সম্পর্কে শাসকচক্রের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসঙ্গে এখানে দু'টি 'কৌতুহলোদ্দীপক' গোপন প্রতিবেদনের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি ১৯৫৪ইং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়েছিলেন গভর্ণর ইস্কান্দর মির্জা। শেখ মুজিবুর রহমান "Has been in prison several times. Is a remarkably good organizer. Has gatts. Holds extreme views in politics. Is an experienced agitator ... the stormy petrel of Awami League. A dangerous gentleman who is best in jail." আর দ্বিতীয়টি সেনা-শাসক আয়ুব খানকে প্রেরিত গোয়েন্দা রিপোর্ট : "Took prominent part in 1948 langage movement and was arrested on 11.03.48. Again arrested on 19.04.49.....Took leading part in the language movement to boycott Urdu provincewise" (১(২)/৭৩৭-৭৩৮)।

'ভাষা-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু' শিরোনামের নিবন্ধে যাহিদ হোসেন উল্লেখ করেছেন, ১৯৫৬ইং ৭ ফেব্রুয়ারি করাচীতে পাকিস্তান 'কন্সটিটিউয়েন্ট এ্যাসেম্বলী'তে খসড়া সংবিধানের ওপর আলোচনাকালে "শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম একটি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দানের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, যেহেতু পাকিস্তানের ৫৬% লোকের ভাষা, তাই উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা প্রদান করতে হবে। ... এটা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি। ... সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, বাংলা ও উর্দুকে সমভাবে সমৃদ্ধ করে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করাটা সমভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের গুরুদায়িত্ব। তিনি আরো বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সবাই চায় যে আজ থেকেই উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা করা হোক" (১(৩)/১৫৯৪)। পরবর্তী ১৬ফেব্রুয়ারি তারিখে 'কনস্টিট্যুয়ান্ট এ্যাসেম্বলী'তে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আবার আলোচনা করতে গিয়ে মুজিব বলেছিলেন, "বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন ছাত্র শহীদ হয়েছেন এবং প্রায় ১৫০০জন জেল খেটেছেন"।

১৯৫৬ইং 'কনস্টিট্যুয়ান্ট এ্যাসেম্বলী'তে গৃহীত অন্তর্বর্তী সংবিধানে বাংলাকে উর্দুর সাথে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও পূর্ব বাংলায় গভর্ণরের শাসন, জরুরী অবস্থা এবং ১৯৫৮ইং পাকিস্তানে আয়ুবের সামরিক শাসনে বাংলা ভাষার প্রশ্নটি পিছিয়ে পড়েছিল। অতঃপর ১৯৬২ইং বেসামরিক শাসন এবং সংবিধান পূণঃপ্রবর্তনের পর ভাষার প্রশ্নে আয়ুব শর্ত আরোপ করেছিলেন, "বাংলা ভাষা চালুর সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য একটি কমিটি করা হবে। উক্ত কমিটি ১০ বছর পর ... রিপোর্ট দেবে যে কখন নাগাদ বাংলাভাষা চালু করা যাবে। অর্থাৎ এটি ছিল ... ভাঁওতা। দেশ স্বাধীন না হলে বাংলা ভাষা আজ কোথায় থাকত, কে জানে" (সূত্রঃ 'ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু', স.সিরাজুল ইসলাম, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০-২১ ফেব্রুয়ারি,'১২)। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ইং ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমাদের হাতে যেদিন ক্ষমতা আসবে সেদিন থেকেই দেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু হবে। ... আমরা ক্ষমতা হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা চালু করে দেব। সে বাংলা যদি ভুল হয়, তবে ভুলই চালু হবে, পরে তা' সংশোধন করা হবে" (প্রাগুক্ত)।

বাংলা ভাষা জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার প্রকৃত সুযোগ আসে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের সাথে সাথেই। অতঃপর শাসনতন্ত্র তৈরি হয় বাংলায়। "বঙ্গবন্ধুর কাছে ইংরেজিতে লেখা কোন ফাইল পাঠাতে কেউ সাহস করত না"।

বঙ্গবন্ধুর কথা দিয়েই 'বাংলার ভাষা-আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতি-রাষ্ট্র চিন্তা' প্রসঙ্গটি ইতি টানতে চাই, যাতে সহজেই উপলব্ধি করা যাবে, বাংলা আর বাঙালি সম্পর্কিত নিজের চেতনাকে কী গভীর বাস্তবতাবোধ থেকে একটি জাতি-রাষ্ট্রে রূপ দিয়েছিলেন। ১৯৭২ইং ঢাকায় সৈয়দ মুজতবা আলী বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনাদের জাতীয়তার ভিত্তি কি কেবল ভূগোল আর ভাষা? বঙ্গবন্ধু মৃদু হেসে বলেছিলেন, না, কেবল ভূগোল আর ভাষা হলেতো আপনাদের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বিহার-ওড়িশ্যার অংশবিশেষ দাবি করতাম। ... আমাদের বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তি বাংলার সকল ধর্মের সকল বর্ণের মানুষের হাজার বছরের মিলিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি। তাতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও উপজাতীয় সভ্যতার যেমন ছাপ আছে, তেমনি আছে মুসলমান সভ্যতা-সংস্কৃতির মিশ্রণ। বর্তমানের ভারত একটি পলিটিক্যাল ইউনিয়ন। আর আমরা একটি কালচারাল নেশন। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের পরিচয় বাঙালি। বহুকাল আমাদের একটি নেশন স্টেট ছিল না। সেটি এখন পেয়েছি। সেটি যদি তার সেক্যুলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমরা টিঁকিয়ে রাখতে পারি, তাহলে বাঙালি জাতি বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি বিশ্বে একটি আধুনিক জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাবেই" (১(১)/১২৯-১৩০)। প্রাসঙ্গিক মন্তব্য আব্দুল গাফফার চৌধুরীর, "অত্যন্ত সাদামাটা ভাষায় বঙ্গবন্ধু সেদিন সৈয়দ মুজতবা আলী এবং সন্তোষ কুমার ঘোষকে বাঙালি জাতীয়তা ও বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা সম্পর্কে তাঁর মনের কথা খুলে বলেছিলেন। দু'জনেই তাতে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। বিদায় নেওয়ার সময় দু'জনেই বঙ্গবন্ধুকে সালাম জানাতে গিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন জয় বাংলা"।

সাংগঠনিক বিকাশ ঃ

আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ

"রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বের। সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিয়েছে। ... নেতৃত্বের সাথে প্রয়োজন আদর্শের। যাকে অপর কথায় বলা যায় ম্যানিফেস্টো। ... নেতৃত্ব ও আদর্শের পরে প্রয়োজন নিঃসার্থ কর্মীর। নিঃসার্থ কর্মী ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান বড় হতে পারে না, কোন সংগ্রাম সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। এর পরে প্রয়োজন সংগঠনের। সংগঠন ছাড়া কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কাজ সফল হতে পারে না। ... আওয়ামী লীগের ১৯৪৯সাল থেকে আজ পর্যন্ত নেতৃত্ব ছিল, আদর্শ ছিল, নিঃসার্থ কর্মী ছিল এবং সংগঠন ছিল। এই ভিত্তির উপরই সংগ্রামে এগেয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগ ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছে"। --বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধুর 'আওয়ামী লীগ'এর সাথে সেই নদীর উপমাটিকেই যথার্থ মানি, যে নদী সাগর থেকে অনেক দূরে প্রবল প্রতিকুল পরিস্থিতিতে যাত্রা শুরু করে, পথে পথে

আবিলতা-বিরূপতা মোকাবেলা করতে হয়, সহযোগিতাও মেলে, কিন্তু নদীটিকে সমুদ্রে যেতেই হবে, কোথাও কোনো শৈবাল-বন্ধনে 'হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে' পরিণতি তার হতেই পারে না। আ.লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন, "১৯৪৯ সালের ২৩ জুন। বাঙালির জীবনে ঐতিহাসিক দিন। মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী দল আজকের আওয়ামী লীগ, তদানিন্তন আওয়ামী মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশের সন্ধিক্ষণ। ... মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের জন্ম-বিকাশের জন্য ঠিক এই দিনটিকেই বেছে নেন, কেননা ১৭৫৭ সালের এই দিনে পলাশী আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল" (১(২)/৬২৬)। আওয়ামী (মুসলিম) লীগের জন্মদিনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য জানা গেল। কিন্তু কী কঠিন-কঠোর প্রতিকুলতা মোকাবেলা করতে হয়েছিল সেদিনের নেতৃবৃন্দকে, তারও হদিস খোঁজা দরকার, সংক্ষিপ্তভাবে হলেও।

আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "পাকিস্তান হাসিলের সংগে-সংগেই মুসলিম লীগের দরজা জনগণের মুখের উপর বন্ধ করিয়া দেওয়া শুধু রাজনৈতিক অপরাধ ছিল না, নৈতিক মর‍্যাল ও এথিক্যাল অপরাধও ছিল। তবু নেতারা কোটারি-স্বার্থ রক্ষার জন্য মুসলিম লীগকে পকেটস্থ করিলেন। ... প্রথম অসাধুতার আশ্রয় নিলেন বাংলা বাটোয়ারা হইয়াছে, এই অজুহাতে বাংলার মুসলিম লীগ ভাংগিয়া দিয়া। ... পাঞ্জাব ভাগ হওয়া সত্বেও পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ ভাংগিলেন না। ... দ্বিতীয় অসাধুতা করিলেন তাঁরা বাধ্য-অনুগত লোক দিয়া এড-হক কমিটি গঠন করিয়া। তৃতীয় অসাধু কাজ ... প্রাইমারি মেম্বারশিপের রশিদ বই বগল-দাবা করিয়া। মুসলিম লীগ কর্মীদের পক্ষে জনাব আতাউর রহমান খাঁ ও বেগম আনোয়ারা খাতুন প্রথমে মওলানা আকরম খাঁ ও পরে চৌধুরী খালিকুযযামানের কাছে দরবার করিয়াও রশিদ বই পান নাই। তাঁরা ... বলিয়াছিলেন, এখন তাঁরা আর লীগের বেশী মেম্বর করিতে চান না। ... এখন শুধু গঠনমূলক কাজ দরকার। হৈ হৈ করিলে তাতে কাজের বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে। ... অগত্যা মুসলিম লীগ কর্মীরা প্রথমে নারায়নগঞ্জে ও পরে টাংগাইলে কর্মী-সম্মিলনী করিয়া নেতাদের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং মুসলিম লীগের দরজা খুলিয়া দিবার দাবি করেন। নেতারা কর্ণপাত না করায় ১৯৪৯ সালে কর্মীরা নিজেরাই 'মুসলিম লীগ' গঠন করেন। সরকারী মুসলিম লীগ হইতে পার্থক্য দেখাইবার জন্য তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম রাখিলেন : জনগণের (আওয়ামী) মুসলিম লীগ" (২/৩০৯-৩১১)। এখানে বক্তব্যের শেষাংশে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি অনস্বীকার্য।

আবুল মনসুর আহমদের ভাষ্যে, পূর্ব বাংলার কতিপয় মুসলিম লীগ কর্মীর 'আওযামী মুসলিম লীগ' গঠন ছিল নিতান্তই পার্টির বিভক্তি, এক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন ছিল 'নামগত ফারাক'। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা কি এমনই ছিল? 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠন কোনোভাবেই ক্ষোভে-ক্রোধে সৃষ্ট পার্টি-বিভক্তি ছিল না, বরং ১৯৪৭ইং পূর্ব থেকেই ফারাকটা দৃশ্যমান হতে শুরু করেছিল। তাছাড়া, 'আওযামী মুসলিম লীগ' গঠনকারীদের দিক থেকে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি অনুসরণের নৈতিক প্রেরণাটাও পূর্বাপর কারোই অজানা ছিল না। অবুল মনসুর আহমদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য একান্তই

তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়। তবে ইতিহাসে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভাষা-ভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদই ছিল 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'এর প্রধান রাজনৈতিক বিশ্বাস। এবার অন্যতর সূত্রে কিছু তথ্য-সন্ধান করা যাক।

"১৯৪৭-এর ২০ জুন বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত হয় বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সভায়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় গণআজাদী লীগ নামে একটি অসাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে ওঠে। এতে ছিলেন কমরুদ্দিন আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ প্রমুখ। ভারত ভাগ হওয়ার পর কোলকাতা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদুল্লা কায়সার, আতাউর রহমান (রাজশাহী) , দবিরুল ইসলাম (দিনাজপুর), আখলাকুর রহমান প্রমুখ এসে একত্র হয়েছিলেন তাদের সঙ্গে ঢাকার ১৫০ পুরানো মুগলটুলি কর্মী শিবিরে। এখানে ছিল মুসলিম লীগের বামপন্থী তরুণ কর্মীদের আড্ডা, এঁদের ... রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত কমিটিতে ছিলেন তসাদ্দুক আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান, শহীদুল্লা কায়সার, তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। ... সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭। এই সম্মেলনে যে ঘোষণাপত্র গৃহীত হয় তার কর্মসূচীর চরিত্র ছিল অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী। এ সময়ে গঠিত হয় গণতান্ত্রিক যুবলীগ। শামসুল হক নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রথম আহ্বায়ক, শেখ মুজিবুর রহমান ও আতাউর রহমান যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে সরকারি নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ কমিটির আহ্বায়ক সহয়েছিলেন নঈমুদ্দিন আহমদ। ১৪-সদস্য নিয়ে গঠিত সাংগঠনিক কমিটিতে শেখ মুজিবুর রহমানসহ তরুণ প্রগতিশীল ছাত্র-কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন" (১(২)/৯২৫)।

প্রকৃতপক্ষেই পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল চিন্তার নেতাকর্মীরা উদার অসাম্প্রদায়িক এবং গণতান্ত্রিক একটা রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তুতি শুরু করেছিলেন। আর মওলানা আকরম খাঁ ও চৌধুরী খালিকুযযামান প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ বাস্তব ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে সোহরাওয়ার্দি-ভাসানী প্রমুখ গণ-সমর্থিত নেতৃবৃন্দকে মুসলিম লীগ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। মওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দী তখনো পূর্ব বাংলায় আসেননি। শেখ মুজিবুর রহমান উদ্যোগী হয়ে ভাসানীকে ঢাকায় আনিয়েছিলেন আর সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তান সরকার প্রথমে ঢাকায় আসতেই দেয়নি। পরবর্তী সময়ে সোহরাওয়ার্দী পশ্চিম পাকিস্তানে বাধ্য হয়েই নিজস্ব সংগঠন 'জিন্নাহ মুসলিম লীগ' গঠন করেছিলেন। সেটা বেশি দিন স্থায়ি হয়নি।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান 'বঙ্গবন্ধুকে অবলোকন' শিরোনামের নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে মুসলিম লীগের যেসব নেতা ও কর্মীর মোহভঙ্গ হয়েছিল, তাঁরা যখন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন (২৩ জুন, ১৯৪৯ইং) করেন, তখন করারুদ্ধ শেখ মুজিবুর রহমানকে একজন যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। এ থেকে অনুমান করা যায়, ১৯৪৯ সালেই তিনি কী রকম মর্যাদা লাভ করেছিলেন। মুক্তিলাভ করে শেখ মুজিব সর্বক্ষণ ব্যয় করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কাজে। তবে কারাগারে যাওয়া তাঁর পক্ষে নিত্য-

নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তবু নিজের বিশ্বাস ও কর্তব্যবোধ থেকে তিনি এতটুকু সরে আসেননি এবং নিজের পরিবারের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কেও উদ্বিগ্ন হননি" (১(১)/২৪৩)। শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৫৩ইং ৯ জুলাই আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ৬-৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ইং ঢাকার ১৫০, মুগলটুলিতে সমবেত প্রগতিশীল চিন্তার নেতাকর্মীরা একটি সম্মেলন করেছিলেন। এবার দ্বিতীয় সম্মেলনটির কথা, "মুসলিম লীগের আবুল হাসেম (হাশিম) ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী জোটের তরুণ কর্মী ও ছাত্রবৃন্দ অন্যান্য স্থান থেকে ঢাকায় সমবেত হয়ে ১৫০ নম্বর মুগলটুলিস্থ কর্মী শিবিরে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করেন। ... এই কর্মী শিবিরের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের ... লক্ষ্যে গঠিত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন আসাম মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং সম্পাদক ছিলেন ইয়ার মুহম্মদ খান। ১৯৪৯ সালের ২৩শে ও ২৪শে জুন টিকাটুলির কাজী বশিরের বাসভবন 'রোজ গার্ডেন'-এ মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিন শতাধিক কর্মী এতে যোগদান করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন - সামসুল হক, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন, আলী আহম্মদ খান, শওকত আলী, আতাউর রহমান খান, আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, কুষ্টিয়ার শামসুদ্দিন আহমদ, আলী আমজাদ খান, ইয়ার মোহাম্মদ খান প্রমুখ। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের এডভোকেট জেনারেল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক কিছুক্ষণের জন্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অনেকের ধারণা ছিল তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করবেন। ... ২৩শে জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মাওলানা ভাসানী সভাপতি, সামসুল হক সম্পাদক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (তখন কারারুদ্ধ) যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরা সহ নবগঠিত দলটির ৪০ সদস্য বিশিষ্ট সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়" (৫/২৪)।

"প্রতিষ্ঠা-লগ্নে গৃহীত আওয়ামী (মুসলিম) লীগের ঘোষণাপত্র ও কর্মসূচীতে নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়গুলি (৬/২৮২) ছিল :

১. পাকিস্তান হবে সর্ব প্রকার বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম জনকল্যাণমূলক (Welfare) রাষ্ট্র। আল্লাহতালার প্রতিনিধিরূপে পাকিস্তানের জনসাধারণ হবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।
২. লাহোর প্রস্তাব মোতাবেক পাকিস্তানের দুই অংশকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দান।
৩. বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ এবং চাষীদের মধ্যে জমি বিতরণ।
৪. দেশকে শিল্পায়িত করণ।
৫. নিরাপত্তা আইনসমুহ বাতিল এবং পূর্ণ নাগরিক অধিকার দান।
৬. জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহের মান উন্নয়ন। শ্রমিক শ্রেণীকে সুন্দর জীবন যাপন উপযোগী মজুরি প্রদান।
৭. জাত ধর্ম বর্ণ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার।
৮. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষাদান।
৯. পৃথিবীর সকল দেশের সাথে বন্ধুত্ব এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।

প্রসঙ্গতই উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৫৪ইং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের একুশ-দফা কর্মসূচীও উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল।

১৯৫১ইং বছরের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত 'আন্ডারগ্রাউন্ড' কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'এর রাজনৈতিক মূল্যায়ন করা হয়েছিল :"১৯৪৯ সনে একটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচী নিয়ে সরকার-বিরোধী দল হিসাবে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তখন শুধুমাত্র মুসলমান জনগণই আওয়ামী মুসলিম লীগের সভ্য হতে পারতেন। ... এদিক দিয়ে ... তখন আওয়ামী মুসলিম লীগের একটি সাম্প্রদায়িক চরিত্রও ছিল। কিন্তু ঐ দলের কর্মসূচীতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, রাজবন্দীদের মুক্তি, প্রাপ্ত-বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচন, বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ, বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল। কর্মসূচীতে কোন সাম্প্রদায়িক দাবী ছিল না। ঐ দলের কাজকর্মের মধ্যেও কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। ঐ দলের কর্মতৎপরতা পরিচালিত হচ্ছিল মুসলিম লীগ সরকারের গণ-বিরোধী নীতিসমুহের বিরুদ্ধে। তদুপরি, ১৯৪৮সন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভিতর যে জাতীয় অধিকার বোধ জেগে উঠছিল, আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল তার প্রধান ধারক ও বাহক" (৪/১০৭-১০৮)।

প্রশ্ন জাগতেই পারে, মুজিবের মত অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী এবং তাঁর প্রগতিশীল সহযোগীরা কেন একটি রাজনৈতিক দল গঠনে 'মুসলিম' পরিচয়টি বহাল রেখেছিলেন? প্রকৃতপক্ষে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির লক্ষ্যে গঠিত হলেও, বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে দলটির নামকরণ করা হয়েছিল। আজ এতকাল পরে পেছন ফিরে তাকালে, এ-কথাই মনে হয় যে, দলটি অসাম্প্রদায়িক নামে গঠিত হলে, শুরুতে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলাই অসম্ভব হয়ে পড়তো, তাতে লাভ হতো মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরই। বস্তুত অনিবার্য বাস্তবতার কারণেই প্রগতিশীল চিন্তার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা সেদিন নবগঠিত দলের নামে একটি 'ছদ্ম-পরিচয়' রক্ষার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

প্রসঙ্গতই শেখ মুজিবের উদ্যোগে 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম স্টুডেন্ট লীগ' (৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮ইং) প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তখন সোহরাওয়ার্দী-হাশিম গ্রুপের ছাত্র-তরুণদের প্রতিষ্ঠিত 'ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ লীগ' কার্যত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারছিল না। কম্যুনিস্ট ভাবধারার 'স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন'ও বাস্তব কারণেই কার্যকর হয়নি। মুসলিম লীগের অঙ্গ-সংগঠন, শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বাধীন 'নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম স্টুডেন্টস' লীগ' ছিল একমাত্র বৃহৎ ছাত্র সংগঠন। কিন্তু তাদের কোনো গঠনমূলক কার্যক্রম ছিল না, বিপক্ষ সংগঠনের, বিশেষত বামপন্থী ছাত্র-সংগঠেনের কার্যক্রমে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করা, এমনকি ভাড়াটিয়া গুন্ডাদের সহায়তায় তাদের মিছিল-মিটিং পন্ড করাই ছিল প্রধান কাজ। মুজিবের রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল, "Political agitation could bear fruit only if it was guided and channeled in the desired direction by an effective organization. He did not believe that the existing student bodies were adequate for the requirements

of the moment" (৭/৩৮)। তখন মুজিব নতুন ছাত্র-সংগঠন গঠনের লক্ষ্যে শাহ আজিজকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে নেতৃত্ব হারানোর আশংকায় তিনি রাজি হননি। মূলত মুজিবের সক্রিয় উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম স্টুডেন্টস্ লীগ'। তখনই মুজিবের সহযোগী অলি আহাদ এবং তোয়াহা প্রমুখেরা নতুন সংগঠনের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিতে চেয়েছিলেন। "But Mujib argued that if the word 'Muslim' was deleted, it would give the Government an excuse to misrepresent their aims; he was not opposed to the idea as such, but he believed that it should be considered at the appropriate time, not now" (প্রাগুক্ত)।

কম্যুনিস্ট নেতা খোকা রায় লিখেছেন : ১৯৪৯ইং "মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট মুসলিম লীগ নেতা ও কর্মী, মুসলিম লীগ ত্যাগ করে একটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেছিলেন। কিছুদিন পরে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঐ দলে যোগদান করেছিলেন। মুসলিম লীগ নেতৃত্ব আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনে বহু বাধা দিয়েছিল ... প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান বার বার হুমকিও দিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের মুসলমানদের ভিতর যারা মুসলিম লীগের বিরোধী দল গঠন করবে, তাদের 'শির কুচল দেঙ্গে'। কিন্তু ... নানা বাধা ও ঐসব হুমকি প্রভৃতি অগ্রাহ্য করে পশ্চিম পাকিস্তানস্থ বৃহৎ বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থ-রক্ষক প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগের বিরোধী দল হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগ গড়ে উঠেছিল। ... ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল" (৪/৭৮)।

"পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক জনসাধারণের ওপর তখনও মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব বিদ্যমান ছিল" (প্রাগুক্ত)। সুতরাং সাধারণ জনগণের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ছাড়া হঠাৎ করেই সুস্পষ্ট অসাম্প্রদায়িক নাম-পরিচয়ের দল গঠন করে, পাকিস্তান অর্জনকারী দল মুসলিম লীগের বিরোধিতা করলে, জনসমর্থন পাওয়া যথার্থই দুরুহ হয়ে পড়তো, এ সত্য অনস্বীকার্য। আওয়ামী মুসলিম লীগ দলটির সংগঠকবৃন্দ যে সময়োচিত যথাযথভাবেই অগ্রসর হয়েছিলেন, তারও পরোক্ষ স্বীকৃতি মেলে খোকা রায়ের লেখাতেই, "ঐ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের কর্তব্য ছিল নবজাত মধ্যবিত্ত, ছাত্র, যুব প্রভৃতির সাথে পার্টির যোগাযোগ গড়ে তোলার কাজে সর্বোতভাবে ব্রতী হওয়া এবং মুসলমান জনগণ থেকে পার্টির বিচ্ছিন্নতা কাটাবার পথে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু আমরা পার্টি নেতৃত্ব ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছিলাম" (৪/৭৯)। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী মুসলিম লীগের অনুসৃত পথটাই তখন অনুসরণীয় ছিল। পরবর্তী সময়ে 'মুসলিম' শব্দটি বর্জন করে আওয়ামী লীগ নামকরণ এবং ভাষা-আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম পর্যন্ত সকল পর্যায়েই বঙ্গবন্ধু জনগণের 'পাল্‌স্' বুঝে জনগণকে সাথে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন বলেই জনগনও সর্বদাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে। 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামকরণ সত্বেও দলটি যে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছিল, তার সবচেয়ে বড় প্রমান, সময়ের

সাথে সাথে ক্রমশই স্পষ্টতর অসাম্প্রদায়িকতার পথে অগ্রসর হয়েই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন দলটি পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি-তত্বের বিভ্রান্তি কাটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে ভাষা-ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ।

স্বদেশ রায় লিখেছেন, ১১মার্চ, ১৯৪৮ইং হরতালের দিন পিকেটিংরত অবস্থায় গ্রেফতার হয়েছিলেন শেখ মুজিব। পরবর্তী ইতিহাস প্রমান করেছে, "এই গ্রেফতারের ভিতর দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের এবং পূর্ব বাংলার তরুণ নেতাদের অন্যতম নেতায় পরিণত হন। ... ভাষা আন্দোলনের এই পর্ব ... যাদের দূরদৃষ্টি ছিল তারা বুঝতে পারে যে, পূর্ব বাংলার রাজনীতি একটি নতুন পথে যাচ্ছে। সে পথ আর যা-ই হোক কোন ধর্মীয় অন্ধকারের ভিতর থাকবে না। ... এ সময়ে উদার রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার মত উদার জাতীয় নেতার অভাব দেখা দেয় পূর্ব বাংলায়। কারণ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখনও ভারতে, শেরে বাংলা নিশ্চুপ। তাছাড়া শেরে বাংলার একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল সব সময়ই। ... শেখ মুজিবুর রহমান উদ্যোগ নেন আসাম থেকে মওলানা ভাসানীকে পূর্ব বাংলায় নিয়ে আসার জন্য। ... একদিকে যেমন জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠন কোন জাতীয় প্রবীণ নেতার মাধ্যমে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন শেখ মুজিব, তেমনি তিনি কিন্তু ১৯৪৮-এর পর থেকে একদিনের জন্যও কোন আন্দোলন থেকে দূরে থাকেননি" (১(৩)/১৫২৫-২৬)।

আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন মওলানা ভাসানী, কিছুকাল পরেই দলে যোগ দিয়েছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। বলা চলে, আওয়ামী-রাজনীতির প্রথম দিকের দীর্ঘ সময় জুড়ে শেখ মুজিবের এক পাশে ছিলেন বামপন্থী ভাসানী আর অন্য পাশে ডানপন্থী সোহরাওয়ার্দী। শেখ মুজিব উভয়ের প্রতিই পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু তিনি বলতেন, "আমি লেফটও নই, রাইটও নয়, আমার রাজনীতি হলো লেফট-রাইট-ফরোয়ার্ড"। বস্তুত পক্ষে দলের নামে উর্দু শব্দ 'আওয়ামী' আর সাম্প্রদায়িক শব্দ 'মুসলিম' যুক্ত থাকলেও 'ফরোয়ার্ড' বা সতত অগ্রগামিতাই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির আদি এবং অকৃত্রিম পরিচয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ইং গঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগ-বিরোধী নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্ট। বিভাগ-পূর্ব কাল থেকেই মুসলিম লীগ ছিল সাম্প্রদায়িক 'পৃথক নির্বাচন' (ধর্ম-সম্প্রদায় ভিত্তিক আসনবণ্টন এবং ভোট প্রদান) পদ্ধতির সমর্থক। যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক অবস্থান থেকেই জোর দাবি করা হয়েছিল যুক্ত-নিবাচনের। নেজামে ইসলাম পার্টির ঘোরতর আপত্তির কারণেই সে দাবি তখন বাস্তবায়ন করা যায়নি।

"আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের কাজেও ... সোহরাওযার্দী-নেতৃত্ব ছিল দ্বিধান্বিত। কিন্তু দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন শেখ মুজিব এবং মওলানা ভাসানী। ... ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি কতটা জনপ্রিয় হবে সে সম্পর্কেও শহীদ সোহরাওয়ার্দী দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু দ্বিধামুক্ত ছিলেন শেখ মুজিব। তিনি সংগে পেলেন মওলানা ভাসানীকে। শহীদ সাহেবের দ্বিধার সুযোগ নিয়ে আওয়ামী লীগের একটা গ্রুপ আব্দুস সালাম খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সাম্প্রদায়িক চরিত্র বজায় রাখার জন্য চক্রান্ত শুরু করলেন। এদের সঙ্গে হাত মেলালেন খোন্দকার মোশতাক আহমেদ। কিন্তু

আওয়ামী লীগে ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল নীতির দল ভারী হল। শহীদ সাহেবও সংগঠনটিকে অসাম্প্রদায়িক করার পক্ষে মত দিলেন" (২৮/১২৯)।

১৯৫৫ইং ২১-২৩ আক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনেই 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নামকরণ করা হয়েছিল। সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন. "একথা অনস্বীকার্য যে, যে সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম (রাখা) হয়, তখনকার বাস্তব প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের সংগঠনকে একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা আর নেই। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আজ অবসান ঘটেছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল পাকিস্তানবাসীর নিজস্ব রাজনৈতিক জোট হিসেবে গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দান করার মহান দায়িত্ব আজ আওয়ামী লীগ গ্রহণ করতে পারে। ... আমরা দ্বিধাহীনচিত্তে এ কথা ঘোষণা করিতে পারি যে, দেশের সকল ধর্মের, সকল বর্ণের এবং সকল ভাষাভাষী মানুষকে একটি গণ প্রতিষ্ঠানে সমবেত করা প্রয়োজন। বস্তুত আওয়ামী লীগ দলকে সম্প্রদায় নির্বিশেষে অবারিত করার মধ্য দিয়েই আমরা আমাদের প্রগতিশীল ভূমিকাকে অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হবো" (৫/২৮-২৯)।

'আওয়ামী লীগ' নব-নামকরণের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ নামেই দলটি থেকে ১৯৫৫ইং বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের পণপরিষদ-সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং আ.লীগ ২২টি আসন লাভ করেছিল। অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক 'আওয়ামী লীগ' নামকরণের পরেও গণপরিষদ নির্বাচনে ভোট পেতে অসুবিধা হয়নি। ১৯৫৬ইং জানুয়ারি মাসে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রের খসড়া বিল উপস্থাপিত হলে ১৫ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ বিলটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করে পূর্ব বাংলার মৃত্যু-পরোয়ানা আখ্যায়িত করেছিল। ১৬-২২শে জানুয়ারি পূর্ব বাংলায় সপ্তাহব্যাপি প্রতিবাদী কালো-ব্যাজ ধারণ এবং ২৯শে জানুয়ারি 'শাসনতন্ত্র প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয়। বঙ্গবন্ধুসহ পাকিস্তান গণপরিষদের অনেক আওয়ামী লীগ সদস্যই খসড়া শাসনতন্ত্র বিলে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। ১৯৫৬ইং ২৯ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান সরকার সংবিধানের ২১(১) অনুচ্ছেদে বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু ও বাংলা। নিঃসংশয়ে বলা চলে, সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি-তত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগেই অসাম্প্রদায়িক ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং যুক্ত-নির্বচনের ব্যবস্থাগুলি সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত এবং আইনে পরিণত হয়েছিল।

১৯৫৬ইং আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যুক্ত-নির্বাচনের দাবি উপস্থাপন করলে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর আগ্রহে বিলটি ১১ অক্টোবর পরিষদে উত্থাপিত হয়। ১২ অক্টোবর ১৯৫৬ইং পাকিস্তানে 'যুক্ত নির্বাচন' সংক্রান্ত বিলটি অনুমোদিত হয়। ১৯৫৭ইং ৩ এপ্রিল তারিখে আওয়ামী লীগের উত্থাপিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের প্রস্তাব পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদে অনুদোদিত হয়েছিল। বিলটির সমর্থনে প্রাদেশিক পরিষদে শেখ মুজিব বলেছিলেন, "স্বায়ত্বশাসনের দাবি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবী। এই দাবীর ভিত্তিতেই আমরা গত নির্বাচনে (যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলাম। শাসনতন্ত্র

রচনার সময় আওয়ামী লীগের ১২জন সদস্য স্বায়ত্বশাসনের জন্য সংগ্রাম করেছিল। গত ৯ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বুঝা যাবে আমরা কেন স্বায়ত্ব শাসন চাই। ... এ আমাদের বাঁচা-মরার দাবী" (৫/২৯)।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন পরবর্তী সময়টা প্রকৃতপক্ষেই পূর্ব বাংলার জনস্বার্থ-বিরোধী পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাদের অব্যাহত চক্রান্তের পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস। এসময়ের ঘটনাবলী যুক্তফ্রন্ট গঠন, নির্বাচন এবং ফল-প্রতিক্রিয়া উপ-শিরোনামে বিস্তারিতভাবেই আলোচ্য। অতঃপর আলোচনায় আসবে সামরিক-শাসনের পূর্বগামী ঘটনাবলী। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের মূল মনোযোগ থাকবে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের দিকে। অনিবার্যভাবেই লক্ষ্য করা যাবে যে, আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধুকে 'শত্রু' চিহ্নিত করেই মুসলিম লীগ এবং সেনা-আমলা চক্র ষড়যন্ত্র এবং নির্যাতনের জাল বিস্তার করছিল কিন্তু বঙ্গবন্ধু কিংবা আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা যায়নি। প্রসঙ্গতই বলে রাখা দরকার যে, আঘাৎ শুধু বাইরে থেকেই আসেনি, এসেছে ভেতর থেকেও। তবে সেসব ঘটনাবলীর ধারাবাহিক আলোচনায় যাবার আগে, প্রাসঙ্গিক অর্থবোধক বলেই এখানে সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি কবিতার পংক্তি উদ্ধৃত করছি ঃ "জ্বলেপুড়ে মরে ছারখার তবু মাথা নোয়াবার নয়"।

যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং নির্বাচনের ফল-প্রতিক্রিয়া ঃ

আওয়ামী মুসলিম লীগের ভূমিকা

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশ' নিবন্ধে ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম লিখেছেন, "১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা ফজলুল হক ও মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে যৌথ নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। যেমনটি বিজয় হয়েছিল (পরবর্তী সময়ের) ১৯৭০এর নির্বাচনে। সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক ছত্রছায়ায় গড়া পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী জনগণের এ বিজয়কে মেনে নেয়নি ১৯৫৪ সালে, তেমনি মেনে নেযনি ১৯৭১-এ" (১(১)/২০২)। প্রকৃতপক্ষেই জনমত বা গণকল্যাণের ভিত্তিতে নয়, পাকিস্তান শাসিত হতো সেনা-আমলাচক্রের মর্জি-মাফিক।

একান্ত বিরল আলোচিত একটি তথ্য হচ্ছে, শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক আদর্শ-চিন্তায় 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনে আগ্রহী ছিলেন না, আগ্রহ কম ছিল সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীরও। কিন্তু ঘটনাক্রমে শেরে বাংলা এবং ভাসানীর সম্মত-সিদ্ধান্তেই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়ে গেলে শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাতে যুক্ত হয়েছিলেন। এবিষয়ে বঙ্গবন্ধু মুজিবের কথা, "আমার মতের বিরুদ্ধে হলেও যখন নেতারা ভাল বুঝে এটা করেছেন তাতে দেশের ভাল হতেই পারে। আমি চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে যুক্তফ্রন্ট চলে" (৮/২৫২)। তৎকালীণ পরিস্থিতিতে যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিষয়ে অনীহার কারণটাও বঙ্গবন্ধুর কথাতেই জানা যায়, "আমি মওলানা সাহেবকে বললাম,

'আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয় লাভ করবে, ভয়ের কোন কারণ নাই। আর যদি সংখ্যাগুরু না হতে পারি, আইনসভায় আওয়ামী লীগই বিরোধী দল হয়ে কাজ করবে। রাজনীতি স্বচ্ছ থাকবে, জগাখিচুড়ি হবে না। আদর্শহীন লোক নিয়ে ক্ষমতায় গেলেও দেশের কাজ হবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার হতে পারে" (৮/২৪৯)। এতকাল পরেও মানতেই হয়, সেদিনের তরুণ নেতা শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ধারণাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রতিপন্ন হয়েছিল।

বিশিষ্ট সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবু জাফর শামসুদ্দিন লিখেছেন, "ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি (প্রকৃতপক্ষে কৃষক শ্রমিক পার্টি - কেএসপি) ছিল একটি নামসর্বস্ব দল। কিন্তু সেদিনের পূর্ব বাংলায় ব্যক্তি ফজলুল হক ছিলেন এক প্রচন্ড শক্তি। ... যুক্তফ্রন্টে মওলানা আতাহার আলীর নেজামে ইসলাম দলকে না টানলেও চলতো। ওরা ফজলুল হক সাহেবের কৃষক প্রজা দলের সঙ্গে আঁতাত করে যুক্তফ্রন্টে প্রবেশ করে। এ দলটিকে যুক্তফ্রন্টে গ্রহণ করা ছিল একটি মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল। ফলাফল শুভ হয়নি। ... আওয়ামী লীগ দলে যারা ছিলেন না, যারা রাজনীতি করতেন সমাজে নামধাম কামাবার জন্য তারাই প্রধানত কৃষক প্রজা দলের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হন। গণতন্ত্রী দল ছিল প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসীদের মুক্তফ্রন্ট ... । অবশ্য এ দলেও কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধাবাদী ছিলেন। ... নেজামে ইসলাম দল মুসলিম লীগের বেনামিতে যুক্তফ্রন্টে প্রবেশ করেছিল ... " (৬/২৬৬-২৬৭)। আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব প্রবল আপত্তি করেছিলেন নেজামে ইসলাম পার্টির অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে। কিন্তু শেরে বাংলার বয়স-মর্যাদা-আগ্রহের প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়েই নেজামে ইসলামকে যুক্তফ্রন্টে নিতে হয়েছিল। শেরে বাংলার সাথে রাজনৈতিক মত-পথের ভিন্নতা সত্বেও, শেখ মুজিব সর্বদাই তাঁকে মান্য করেছেন।

বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "প্রত্যেকটা নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগ প্রার্থী ছিল, যারা ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৪সাল পর্যন্ত নিজ নিজ এলাকায় কাজ করেছে। হক সাহেবের কৃষক শ্রমিক দলের প্রার্থীর অভাব থাকায় বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকা থেকে যারাই ইলেকশন করতে আশা করে তারাই কৃষক শ্রমিক দলে নাম লিখিয়ে দরখাস্ত করেছিল। ... এমন প্রমানও আছে, প্রথমে মুসলিম লীগে দরখাস্ত করেছে, নমিনেশন না পেয়ে কৃষক শ্রমিক দলে নাম লিখিয়ে নমিনেশন পেয়েছে। ... নেজামে ইসলাম দল কয়েকজন মওলানা সাহেবের নাম নিয়ে এসেছে, তারা দরখাস্তও করে নাই। তাদের সব কয়জনকে নমিনেশন দিতে হবে। এই দল একুশ দফায় দস্তখতও করে নাই। তবে এই দলের প্রতিনিধি একটা লিস্ট দাখিল করলেন, যাদের নমিনেশন দেওয়া যাবে না। কারণ তারা সকলেই নাকি কমিউনিস্ট। এরা কিছু আওয়ামী লীগের জেলখাটা সদস্য আর কিছু গণতান্ত্রিক দলের সদস্য। ... এদের দাবি এমন পর্যায়ে চলে গেল যে, নিঃস্বার্থ কর্মী ও নেতাদের নমিনেশন না দিয়ে যারা মাত্র চার-পাঁচ মাস পূর্বেও মুসলিম লীগ করেছে অথবা জীবনে রাজনীতি করে নাই, তাদেরই নমিনেশন দিতে হবে। মাঝে মাঝে হক সাহেবের কাছ থেকে ছোট্ট ছোট্ট চিঠিও এসে হাজির হয়। তাঁর চিঠিকে সম্মান না করে পারা যায় না" (৮/২৫৩)।

উল্লেখ্য যে, অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৬ইং নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপুল বিজয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রভূত সহায়ক হয়েছিল, তখন সোহরাওয়ার্দী ছিলেন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম লীগের সভাপতি। তার কিছুকাল আগেই শেরে বাংলা মুসলিম লীগ ছেড়ে 'কৃষক প্রজা পার্টি' গঠন করে, 'হিন্দু মহাসভা'র সাথে 'কোয়লিশন' মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রীত্ব করায় প্রবল সমালোচিত হয়েছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকায় এসে তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকার চিন্তায় খাজা নাজিমুদ্দিন এবং নুরুল আমিন সরকারের অধীনে 'এ্যাডভোকেট জেনারেল' পদে চাকুরিতে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তথাপি পরবর্তী সময়ে, রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে তিনি হঠাৎ করেই 'কৃষক শ্রমিক পার্টি' গঠন করেছিলেন। কেএসপি'র নেতা-কর্মীদের সম্পর্কে শেখ মুজিবের মন্তব্য ছিল, "আদতে তারা মনেপ্রাণে মুসলিম লীগ"। সব মিলিয়ে ফজলুল হকের পক্ষে রাজনৈতিক দুদোল্যমানতা কাটিয়ে উঠা কখনো সম্ভব হয়নি। তবে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময়ই প্রতিপন্ন হয়েছিল যে, ভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নিয়ে, মতভেদ-বিবাদ ছাড়াই আপন লক্ষ্যে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার একধরণের বিরল দক্ষতা ছিল মুজিবের। এমন দক্ষতার কারণেই বঙ্গবন্ধু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে কতিপয় চিহ্নত দালাল-রাজাকার ছাড়া বাংলাদেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন, তাদের পেশা-পরিচয় এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিন্নতা সত্বেও।

২১-দফা 'ম্যানিফেস্টো'র ভিত্তিতেই যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ইং নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করেছিল। ঐতিহাসিক সেই ২১-দফার ('পরিশিষ্ট-২') প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অপরিহার্য যে, শুধু যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনই নয়, পরবর্তী সকল আন্দোলনে-সংগ্রামেই ২১-দফাকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেই আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কর্মসূচী এবং রাজনৈতিক ঘোষণা প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৯৬৬ইং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ছ'দফা, ১৯৬৯ইং গণ-অভ্যুত্থান-কালে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঘোষিত '১১-দফা' এবং সবিশেষ উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ইং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা আর ১৯৭২ইং প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানেও ২১-দফার প্রতিফলণ লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় বলা যেতে পারে, ঘটনাক্রমে আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধু মুজিবের পূর্বাপর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের রূপরেখা আঁকা হয়েছিল যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা ইশতেহারে।

আবুল মনসুর আহমদ ২১-দফা প্রণয়নের পটভূমি প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, "আমি ইতিপূর্বেই আওয়ামী লীগের ৪২ দফার একটি নির্বাচনী ইশ্‌তাহার রচনা করিয়াছিলাম। উহাকেই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশ্‌তাহার করিবার কথা মওলানা সাহেব বলিলেন। কৃষক-প্রজা পার্টির নেতারা বলিলেন ... ঐ ইশ্‌তাহারে দফার সংখ্যা বড় বেশি। ... দেখিলাম যে ৪২ দফাকে কমাইয়া ২৮ দফা করিলেই তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ... রাষ্ট্র-ভাষা আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য শহীদ মিনার নির্মান, ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ছুটির দিন ঘোষণা এবং তৎকালীণ প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার সেবা-কেন্দ্র করার প্রস্তাব আওয়ামী লীগের ৪২দফায়ও ছিল। এই তিনটি দফাকে যুক্তফ্রন্টের ইশতাহারে অন্তর্ভুক্ত করিতে কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতারাও রাযী হইয়াছেন।

... ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব বাংলার ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন। কাজেই ২১ ফিগারটাকে চিরস্মরণীয় করিবার অতিরিক্ত উপায় হিসাবে যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীকে ২১ দফার কর্মসূচী করিলে কেমন হয়? ... এই একুশ দফা মেনিফেস্টো পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার ছাত্র-জনতার জীবন-বাণী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল" (২/৩২১)। বঙ্গবন্ধু নিজেই লিখেছেন, "আবুল মনসুর আহমদ সাহেব বিচক্ষণ লোক ... তাড়াতাড়ি কফিলুদ্দিন চৌধুরীর সাহায্যে একুশ দফা প্রোগ্রামে দস্তখত করিয়ে নিলেন হক সাহেবকে দিয়ে। তাতে আওয়ামী লীগের স্বায়ত্বশাসন, বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা, রাজবন্দিদের মুক্তি এবং আরও কতকগুলি মূল দাবি মেনে নেওয়া হল" (৮/২৫১)।

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসনের দাবির কথা বলতে গিয়ে ১৯৫৫ইং পাকিস্তান গণ-পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "We have given 21-point programme to the people of East Bengal in which we had categorically mentioned that only defence, foreign affairs and currency should remain with the central government and the rest should be transferred to the province". উল্লেখ্য এসব দাবিকেই আরো তীব্র-তীক্ষ্ণ করে ১৯৬৬ইং বঙ্গবন্ধু ছ'দফা ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৬৫ইং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধকালীণ সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে ছ'দফাতে তিনি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়টিকে কার্যকরভাবে প্রাদেশিক পর্যায়ে পূণর্বিন্যাসের দাবি করেছিলেন। তবে প্রসঙ্গতই এখানে, তদানিন্তন রাজনৈতিক মত-পথের নানা দিক অবহিত হওয়ার জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠনের পশ্চাদপটের আরো কিছু কথা একটু বিস্তারিতভাবেই উল্লেখ করা দরকার।

খোকা রায় লিখেছেন, ১৯৫৪ইং অনুষ্ঠিতব্য "নির্বাচনের ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের মুসলিম লীগ-বিরোধী দল ও সংস্থাগুলি কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিল। ... তখন পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ছিল : আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম, কংগ্রেস এবং তপশিলী ফেডারেশন। ... ঐ দলগুলির ভিতরে নেজামে ইসলামের রাজনৈতিক চরিত্র স্বতঃসিদ্ধভাবেই গণ-বিরোধী ছিল। ... কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য সরকার-বিরোধী সমস্ত শক্তির ব্যাপক ... ঐক্য সৃষ্টি করা কমিউনিস্ট পার্টি রাজনৈতিকভাবে নীতিসম্মত মনে করেছিল। ... কিন্তু গোলমাল বাঁধিয়েছিল নেজামে ইসলাম দল। ঐ ধর্মান্ধ দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল ধূঁয়া তুলেছিল যে 'কমিউনিস্টরা ধর্মবিরোধী তাই তাদের যুক্তফ্রন্টে নেওয়া যাবে না। কমিউনিস্টদের যুক্তফ্রন্টে নেওয়া হলে নেজামে ইসলাম সে ফ্রন্টে থাকবে না' ইত্যাদি। ... পরিস্থিতি জটিলতর করে তুলেছিলেন ফজলুল হক সাহেব। তিনি ইতিমধ্যে নেজামে ইসলামের সাথে আলাদা এক আঁতাত গড়ে তুলেছিলেন। ... অন্যদিকে, আওয়ামী মুসলিম লীগ, গণতান্ত্রিক দল প্রভৃতি যুক্তফ্রন্টে কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে ছিল। ... সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়ে এসে ঘোষণা করেছিল যে, কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়েও অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও বিরোধী দলগুলি যদি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম

লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় তা হলেও কমিউনিস্ট পার্টি ... যুক্তফ্রন্টকে সর্বোতভাবে সহায়তা করবে। ... পার্টি নিজ শক্তি অনুসারে কয়েকটি কেন্দ্রে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। ঐ সব কেন্দ্রে পার্টি যুক্তফ্রন্টের সমর্থন কামনা করেছিল" (৪/১২২-১২৫)।

"নির্বাচনী প্রচার অভিযানে যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ - প্রধানতঃ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি এলাকায় ব্যাপক গণসংযোগ করেন। আর এই নির্বাচনী প্রচারণার ফলে শেখ মুজিব বিশাল জনগোষ্ঠীর সাথে আরো নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। তাঁর সাংগঠনিক শক্তি ও দক্ষতার ব্যাপক বিকাশ ঘটে এই নির্বাচনী অভিযানে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অবিশ্বাস্য সাফল্য পাকিস্তানি শাসকদের দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। মুসলিম লীগ সম্পূর্ণ ধরাশায়ী হয় এবং তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে" (১(১)/১৩৫)। উল্লেখ্য যে, তখনো ধর্ম-ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। "যুক্তফ্রন্ট শুধু মুসলিম আসনেই কনটেস্ট করিয়াছিল। ২৩৭টি মুসলিম সীটের মধ্যে ২২৮টিই দখল করিয়াছিল। এই ২২৮টির মধ্যে আওয়ামী (মুসলিম) লীগ ১৪৩, কৃষক-শ্রমিক ৪৮, নিযামে ইসলাম ২২, গণতন্ত্রী ১৩ ও খিলাফতে-রবাবানী ২ জন পাইয়াছিল। নিজামে ইসলাম কার্যত হক সাহেবের পৃষ্ঠপোষিত দল বলিয়া ... হক সাহেবের নিজস্ব মেম্বর ছিলেন ৭০জন" (২/৩৩১)। মুসলমান-অমুসলমান এবং মহিলাদের সংরক্ষিত আসন মিলিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে তখন মোট আসন-সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের প্রাপ্ত মোট ২২৮টি আসন বাদে ৯টি মাত্র আসন পেয়েছিল মুসলিম লীগ। উন্মুক্ত সাধারণ আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্টের সহযোগী কংগ্রেস এবং তফশিলী ফেডারেশন ৪২টি এবং কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি আসনে বিজয়ী হয়েছিল। বাদ-বাকি ২৬টি আসন পেয়েছিলেন নির্দল প্রার্থী এবং সংরক্ষিত আসনের মহিলারা। উল্লেখ্য যে, কম্যুনিস্ট পার্টি মুসলমান আসনে ৩টি এবং অমুসলমান আসনে ৫টি মিলিয়ে মোট ৮টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৪টি অমুসলমান আসনে বিজয়ী হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের সাথে কম্যুনিস্ট পার্টির সমঝোতার বরখেলাপ করে "যুক্তফ্রন্ট-ভুক্ত হয়েও ধর্মান্ধ এবং ঘোরতর কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী নেজামে ইসলাম তিনটি মুসলিম আসনেই ... প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। অমুসলমান ৫টি আসনেও কমিউনিস্ট প্রার্থীদের বিরুদ্ধে নুরুল আমিন সরকারের অর্থপুষ্ট বিভিন্ন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের প্রার্থী ছিল" (৪/১২৯)।

সমগ্র প্রশাসন যন্ত্রকেই নুরুল আমিন সরকার নির্বাচনী কাজে লাগিয়েছিল, হাজার হাজার 'সবুজ শার্ট' স্বোচ্ছাসেবক নিযুক্ত করা হযেছিল। গোপালগঞ্জ, বরগুণা, শর্ষিণার বিখ্যাত পীরগণকেও শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ওয়াহিদুজ্জামানের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাণায় নামানো হয়েছিল। পূর্ব বাংলার "৬০ হাজার মসজিদকে তাহাদের নির্বাচনী প্রচার-কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর জন্য অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচনী প্রচারণার কাজে মোল্লাদের ব্যবহার করতে শুরু করে। এমনকি তারা পবিত্র হাদিসের অপব্যাখ্যা দিয়ে

একটি বিকৃত ফতোয়া পর্যন্ত সে-সময় প্রচার করেছিলো ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায়। ফতোয়াটি ছিলো, 'যুক্তফ্রন্টে ভোট দেয়া মাত্রই ঘরের বিবির প্রতি তালাক-এ-বাঈন আরোপিত হবে ... '। ... এতসব কিছু সত্বেও ... মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এবং কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী ওয়াহিদুজ্জামান যথাক্রমে ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজ এবং তরুণ আওয়ামী (মুসলিম) লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট এমনই শোচনীয় পরাজয় বরণ করে যে, তাদের উভয়েরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়" (৩/৬৯-৭০)।

রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন এবং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সাফল্যের মাধ্যমেই পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পথটি রচিত হয়ে গিয়েছিল এবং এ পথ ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ। কিন্তু কী হতে পারতো, এ দুটি সাফল্য অর্জিত না হলে? প্রখ্যাত সাংবাদিক আবেদ খান 'শেখ মুজিবই বাংলাদেশের ঠিকানা' নিবন্ধে লিখেছেন, "সাতচল্লিশের (ভারত-ভাগ) অব্যবহিত পরে পাকিস্তানকে অস্বীকার করা কিংবা জিন্নাহ অথবা মুসলিম লীগ সম্পর্কিত সামান্যতম শব্দ উচ্চারণ করাও ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। সে সময় থেকেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠি শেখ মুজিবকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করেছিল। ... উনিশ শ' বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন যদি সফল না হত এবং চুয়ান্নর নির্বাচনে যদি মুসলিম লীগের ভরাডুবি না হত, তাহলে বোধ হয় আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ হত এবং শেরে বাংলা, ভাসানী বা সোহরাওয়ার্দী এবং অবশ্যই শেখ মুজিব, তাজউদ্দিনের জন্য অপেক্ষা করতো অন্ধ কারাপ্রকোষ্ঠ কিংবা ফাঁসির দড়ি। লক্ষ্য করার ব্যাপার, পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠির রোষানল থেকে শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী কোনও না কোন সময় রক্ষা পেয়েছিলেন, কিন্তু শেখ মুজিবের জন্য নিস্কৃতি ছিল না। ... কিন্তু এতকিছুর পরেও শেখ মুজিব ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়েছেন" (১(২)/৮০২-৮০৩)।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের (৮-১২মার্চ, ১৯৫৪ইং) বিপুল বিজয় এবং পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেও লক্ষণীয়.যে, সরকারী মুসলিম লীগ পরাজিত রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অবশ্যই যুক্তফ্রন্টের, বিশেষভাবে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতি অধিকতর শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগের শত্রু ছিল যুক্তফ্রন্টের ভিতরেও। যুক্তফ্রন্ট সরকার সফলতা কিংবা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি, এর পেছনে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রবল ষড়যন্ত্র যেমন ছিল, তেমনি দায়ি ছিল যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ বিবাদ-দুর্বলতাও। পরবর্তী সময়ের পাকিস্তান বিশেষত পূর্ব বাংলার রাজনীতির ইতিহাস কার্যতই পাকিস্তানের সেনা-আমলাচক্রের বহুমুখী ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। তবে অনস্বীকার্য যে, সেনা-আমলা চক্রের প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের সহজ সুযোগ মিলেছিল প্রথমত এবং প্রধানত যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ বিভেদ-দুর্বলতা থেকেই। এখানে প্রসঙ্গতই যুক্তফ্রন্ট গঠনের আগে 'জগা-খিচুরী রাজনীতি' সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর উক্তিটি স্মরণীয়, "আদর্শহীন লোক নিয়ে ক্ষমতায় গেলেও দেশের কাজ হবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার হতে পারে"।

আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের পরে ভোটার-জনগণের "আশা ও আস্থার মর্যাদা নেতারা দিতে পারিলেন না। লিডার নির্বাচনের দিন

হইতেই, বরঞ্চ আগে হইতেই, আমাদের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। এই ফাটল রোধ করার চেষ্টা একমাত্র শহীদ (সোহরাওয়ার্দী) সাহেব ছাড়া আর কেউ করেন নাই। ... কৃষক শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে, আরও নির্দিষ্ট করিয়া বলিলে হক সাহেব ও শহীদ সাহেবের মধ্যে, মনের অমিল আগে হইতেই ছিল। ... কারণ এই দুই মহান নেতার নিচে উভয় দলের আরও অনেক নেতা ছিলেন"। আওয়ামী লীগের তরুণ নেতাকর্মীরা যুক্তফ্রন্টের সংসদীয়-নেতা নির্বাচনের আগেই কিছু শর্ত আরোপের প্রস্তাব করলে সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, হক সাহেবের ওপর "কোনও শর্ত আরোপ করা চলে না। করিলে এটা হইবে হদ্দ বেইমানি। প্রস্তাবকরা অবশ্যই বলিলেন : তাঁরা সত্যসত্যই হক সাহেবকে ছাড়া অন্য কাউকে লিডার নির্বাচন করিতে চান না। শুধু চাপ দিয়া একটা সর্বদলীয় উঁচুস্তরের মন্ত্রিসভা গঠন করিতে চান। ... বিনা-শর্তে হক সাহেবকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিলে লিডার নির্বাচিত হওয়ার সংগে-সংগে তিনি পার্শ্ব-চরদের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হইবেন। ... হক সাহেবের রাজনীতিক জীবনের ইতিহাস হইতে তাঁরা একাধিক নযির দিলেন। তাঁদের যুক্তি শহীদ সাহেবের মনঃপূত হইল না। ... তিনি আশ্বাস দিলেন, অতীতে যাই হইয়া থাকুক, জীবন-সন্ধ্যায় হক সাহেব আর ভুল করিবেন না। যাঁরা শহীদ সাহেবের আশ্বাস ... মানিলেন না, শহীদ সাহেব ধমকাইয়া তাঁদেরে চুপ করাইলেন। ... তরুণদের ... প্রায় সার্বজনীন অসন্তোষের মধ্যে ... সভা ভংগ হইল (২/৩৩১-৩৩২)।

প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "নির্বাচনে জয়লাভ করার সাথে সাথে আমাদের কানে আসতে লাগল, জনাব মোহাম্মদ আলী বগুড়া হক সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করছেন পুরাণো মুসলিম লীগারদের মারফতে - যারা কিছুদিন পূর্বে হক সাহেবের দলে যোগদান করে এমএলএ হয়েছেন কৃষক শ্রমিক দলের নামে। ... সকালবেলা (২ এপ্রিল,'৫৪ইং) আওয়ামী লীগ সদস্যদের সভা (দলীয় কার্যালয়ে) আর বিকালে বার লাইব্রেরি হলে সমস্ত দল মিলে যুক্তফ্রন্ট এমএলএদের সভা। আওয়ামী লীগের সভায় শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব উপস্থিত ছিলেন। সভায় রংপুরের আওয়ামী লীগ নেতা খয়রাত হোসেন সাহেব প্রস্তাবের মাধ্যমে বললেন, 'জনাব একে ফজলুল হক সাহেবকে নেতা নির্বাচন করার পূর্বে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব তাঁর সাথে পরামর্শ করে মন্ত্রীদের লিস্ট ফয়সালা করা উচিত। একবার তাঁকে যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি দলের নেতা করলে তাঁর দলবলের মধ্যে এমন পাকা খেলোয়াড় আছে, যারা চক্রান্তের খেলা শুরু করতে পারে। আর একজন ডেপুটি লিডার আমাদের দল থেকে করা উচিত, কারণ আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যুক্তফ্রন্টের মধ্যে'। শহীদ সাহেব বললেন, 'তিনি নিশ্চয়ই আমাদের দুইজনের সাথে পরামর্শ করবেন মন্ত্রীদের নাম ঠিক করার পূর্বে। বৃদ্ধ মানুষ এখন তাঁকে আর বিরক্ত করা ঠিক হবে না'। ভাসানী সাহেবও শহীদ সাহেবকে সমর্থন করলেন। আমি জনাব খয়রাত হোসেন সাহেবের সাথে একমত ছিলাম। কিন্তু ... জোর করলাম না। ... যুক্তফ্রন্ট এমএলএদের সভা হল। শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেব তাতে উপস্থিত ছিলেন। ... হক সাহেবকে সর্বসম্মতিক্রমে নেতা করা হল" (৮/২৫৯)।

আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "আওয়ামী লীগের তরুণ এমএলএ'রা যা আশংকা করিয়াছিলেন তাই হইল। মন্ত্রিসভা গঠন লইয়া হক সাহেবের সাথে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের মতান্তর হইল। ... সে মতভেদও মাত্র দুই দলের দুইজন তরুণের মন্ত্রিত্ব লইয়া। ... তার একজন হক সাহেবের প্রিয়পাত্র, অপরজন শহীদ সাহেবের। ... হক সাহেব তাঁর লোকটির নাম প্রস্তাব করায় শহীদ সাহেবও তাঁর লোকটির নাম করেন। ... নইলে শহীদ সাহেবের লোকটিকে মন্ত্রী করার ইচ্ছা শহীদ সাহেবের নিজেরই ছিল না। বস্তুতঃ ঐ দিনই সকালের দিকে কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগ-কর্মী ঐ লোককে মন্ত্রী করার দাবি করাতে শহীদ সাহেব কর্মীদের ত ধমকাইয়া দেনই, উপরন্তু তাঁর প্রিয়পাত্রটিকেও ধমকাইয়া দেন। ... যা হোক শহীদ সাহেব তাঁকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া বিদায় করেন যে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি করা তিনি আগে হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন" (২/৩৩৩-৩৩৪)।

১৯৫৪ সালের ঘটনার কথা ১৯৭০ সালে লিখতে গিয়েও আবুল মনসুর আহমদ শহীদ সাহেবের প্রিয়পাত্র এবং হক সাহেবের প্রিয়পাত্র পরিচয়ের যে-দু'টি নাম আড়ালে রেখেছেন, নানা তথ্য-সূত্রে নাম দু'টি অজানাও থাকেনি। শহীদ সাহেবের প্রিয়পাত্র শেখ মুজিবুর রহমান এবং হক সাহেবের প্রিয়পাত্র তাঁরই ভাগিনেয়, সৈয়দ আজিজুল হক, নান্না মিয়া। উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেই মুজিব ইত্তেফাক-সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মাণিক মিয়ার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন। মাণিক মিয়া লিখেছেন, "He (Mujib) informed me that in Faridpur Mohan Mian and Abdus Salam had been reported as saying that on no account would Mujib be allowed to become a minister ... and that they would ensure his exclusion ... Mujib said that he was not interested in becoming a minister but now it had become a matter of prestige with him. He requested me to have a word with Shaheed Suhrawardy. When I told Suhrawardy about this, he was astounded" (৭/৫৭-৫৮)।

প্রায় একই সময়ে সোহরাওয়ার্দীর সাথে সাক্ষাত-আলোচনার একটি বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু নিজেই, "আমি যখন ... নির্বাচনের পরে ফিরে আসি, শহীদ সাহেব আমাকে একাকী ডেকে বললেন, 'তুমি মন্ত্রিত্ব নেবা কি না'? আমি বললাম, 'আমি মন্ত্রিত্ব চাই না। পার্টির অনেক কাজ আছে, বহু প্রার্থী আছে, দেখে শুনে তাদের করে দেন'। শহীদ সাহেব আর কিছুই আমাকে বলেন নাই" (৮/২৫৯)। মাণিক মিয়া এবং বঙ্গবন্ধুর লিখিত দু'টি ভিন্ন বিবরণ থেকে অন্ততপক্ষে একটি সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, মন্ত্রিত্ব চাওয়া-পাওয়া নিয়ে মুজিব-সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে মত-ভিন্নতার কিংবা সোহরাওয়ার্দীর 'প্রিয়পাত্রটিকে ধমকাইয়া' দেবার মতও কিছুই ঘটেনি। অথচ 'রাজনৈতিক ইতিহাস' নামে এমন অনেক কথাই অনেকে 'বাজার-চালু' করেছেন। প্রসঙ্গত একথাও স্মরণ করা যেতে পারে যে, পরবর্তী সময়ে মুজিব স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই পার্টি সংগঠনের প্রয়োজনে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ (১৯৫৭ইং) করেছিলেন।

নেজামে ইসলামি নামক সাম্প্রদায়িক দলটিকে যুক্তফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন

শেরে বাংলা নিজে। তাঁর ওপর দলটির প্রভাব এবং দলটির ওপর তাঁর নির্ভরতার কারণে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময় যেমন, তেমনি নির্বাচনী বিজয়ের পর মন্ত্রীসভা গঠনের সময়ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের মূল শক্তি ছিল আওয়ামী (মুসলিম) লীগ এবং নির্বাচনেও তাদের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ছিল কে.এস.পি-নেজামে ইসলামীর সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি। শেখ মুজিব ছিলেন তখন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং যুক্তফ্রন্টের অন্যতম প্রভাবশালী সংগঠক। কিন্তু "নির্বাচনে জয়লাভ করার সংগে সংগে যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরমে ওঠে। ফজলুল হকের কৃষক প্রজা (শ্রমিক) দল এবং নেজামে ইসলাম দল আওয়ামী লীগের সংগে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে নারাজ হয়" (৬/২৭৩)। শেরে বাংলা নিজেও আওয়ামী লীগকে, বিশেষত শেখ মুজিবকে মন্ত্রীসভায় নিতে অনীহা প্রকাশ করেন। তাঁর মূল পার্শ্বচর নেজামে ইসলাম ধূঁয়া তুলেছিল শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অনেকেই কম্যুনিস্ট, সুতরাং মন্ত্রীসভায় নেয়া চলবে না। এবিষয়ে কেএসপি-প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন বিজয়ী মোহন মিয়া প্রমুখেরও যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল। শেখ মুজিব কম্যুনিস্ট - একথা পাকিস্তানী শাসকদের ওপর মহলে ভালোভাবেই ছড়ানো হয়েছিল। অপরদিকে সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী প্রমুখ আওয়ামী লীগের পক্ষে বলেছিলেন, কারা মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত হবে, সেটা স্থির করবে আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রীপদে মনোনীত ব্যক্তিবর্গকে একসাথেই মন্ত্রীসভায় নিতে হবে। কিন্তু এ.কে ফজলুল হক ৩ এপ্রিল, ১৯৫৪ইং তারিখে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়েই একক উদ্যোগে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন।

সেই মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী এ কে ফজলুল হক কেএসপি'র আবু হোসেন সরকার ও সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া এবং নেজামে ইসলাম দলের আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ মাত্র তিনজন মন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাতে নির্বাচন-বিজয়ী জনগণ চরম হতাশ এবং বিভ্রান্ত হয়েছিল। মাণিক মিয়া লিখেছেন, "The general public was not aware of the wrangling and when they saw the list of three cabinet ministers did not include any Awami Leaguer, they lost their enthusiasm about the electoral victory... ... At last a compromise was reached on 15 May and Awami League joined the government." (৭/৫৮)। ১৫ মে তারিখে সম্প্রসারিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় মোট ১৫জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অর্জিত জনগণের বিজয়কে রক্ষা করতেই আওয়ামী লীগকে সেদিন মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে হয়েছিল। আবু জাফর শামসুদ্দিন লিখেছেন, "দেড় মাস পরে চাপের মুখে বাধ্য হয়ে ১৫ই মে তারিখে আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবুর রহমান এবং আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয়"। প্রশ্ন জাগতেই পারে, কেন ফজলুল হক মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন?

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের সাথেসাথেই ষড়যন্ত্রকারীরা তৎপর হয়ে উঠেছিল। ২৩মার্চ চন্দ্রঘোনা কাগজ কলে বাঙালি ও উর্দুভাষীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা লাগিয়ে এরই একটা 'রিহার্সাল' তারা সম্পন্ন করেছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা প্রথমেই শেরে

বাংলার বিপুলজনপ্রিয়তাকে খর্ব করতে চেয়েছিল। আর প্রধান লক্ষ্য ছিল কেএসপি'র সাথে আওয়ামী লীগের বিভেদ-বৈরিতা বাড়িয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে জনগণের কাছে অগ্রহণযোগ্য করে তোলা। এমন পরিস্থিতিতেই পূর্ব বাংলার গভর্ণর চৌধুরী খালিকুজ্জামান চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের দাঙ্গার দোহাই দিয়ে শেরে বাংলাকে ২রা এপ্রিলের মধ্যে মন্ত্রীসভা গঠনের তাগাদা দিলেন। আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে মাত্র তিনজন মন্ত্রী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ অনষ্ঠিত হলো ৩ এপ্রিল তারিখে। আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া শহীদ সাহেব করাচি গেলেন। ... একই বিমানে প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব তাঁর মন্ত্রী ও অনেক কৃষক-শ্রমিক মেম্বর লইয়া কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে করাচি গেলেন। মওলানা ভাসানী ক্ষুন্নমনে মফস্সলের বাড়িতে গিয়া বসিলেন। যুক্তফ্রন্টে বড় রকমের ফাটল ধরিল। আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে যাতে এই ফাটল বৃদ্ধির কোনও কাজ না হয়, সেজন্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকিয়া আমরা সর্ব অবস্থায় হক মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করিবার প্রস্ত াব গ্রহণ করিলাম" (২/৩৩৪-৩৩৫)। ২ মে তারিখে পুলিশ অকারণে গুলি করায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকের সামনে ৬/৭ বছরের একটি বালক মারা যায়। প্রতিবাদ মুখর শেখ মুজিবুর রহমান মিছিল নিয়ে জেল গেটে উপস্থিত হন। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। কিন্তু পরক্ষণেই জনগণের চাপে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

করাচি থেকে ঢাকায় ফিরবার পথে কলকাতায় ৪ মে, ১৯৫৪ইং শেরে বাংলা বলেছিলেন, "Politicians have partitioned the territories, but the common mass should ensure, that everybody live peacefully. Language proved to be the most unifying factor in history and the people of two Bengals, bound together in common language, should forget political divisions and feel themselves to be one" (৬/২৭৪)। ৫ মে তারিখে এটি প্রকাশিত হয় ঢাকার 'মর্ণিং নিউজ' পত্রিকায়। মুসলিম লীগ মহল তোলপাড় লাগিয়ে ফজলুল হককে কোণঠাসা করে ফেলে। পূর্ব বাংলা কিংবা পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগাররা একবারও ভাবলেন না যে, শেরে বাংলা ছিলেন পাকিস্তানের প্রস্তাবক, তিনি ১৯৪৬-'৪৭ইং সময়কালে 'যুক্ত বাংলা'র দাবিতে কোনোভাবেই যুক্ত ছিলেন না। এমনকি ভাষা আন্দোলনেও তিনি জড়িত হননি। ফজলুল হককে রাজনৈতিক বিপাকে ফেলাটাই ছিল শাসকচক্রের লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "সুযোগ বুঝে মোহাম্মদ আলী বগুড়া এবং তাঁর দলবলেরা হক সাহেবের বিরুদ্ধে তাই নিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। ... এই বিপদের মুহূর্তে আওয়ামী লীগ নেতা বা কর্মীরা হক সাহেব ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধাচরণ করলেন না। তাঁরা জানিয়ে দিলেন যে, তাঁরা হক মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করবেন। হক সাহেব এই অবস্থায় আওয়ামী লীগারদের সাথে আলোচনা করে পুরা মন্ত্রীসভা গঠন করতে আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। এই সময় হক সাহেবের আর এক ভাগিনেয় জনাব মাহবুব মোর্শেদ বার এট ল' (পরবর্তীতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি) হক সাহেবের সাথে পরামর্শ করে আতাউর রহমান খান ও মানিক মিয়াকে অনুরোধ করলেন যাতে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভায় যোগদান করে" (৮/২৬২)।

"১০ই মে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শেরে বাংলাও উপস্থিত ছিলেন এবং ঘোষণা করেন মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত করে আওয়ামী লীগকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে" (৫/২৮)। পরবর্তী প্রসঙ্গ-কথা বঙ্গবন্ধুর লেখা থেকে : "মওলানা সাহেব ও আমি টাঙ্গাইলে এক কর্মী সম্মেলনে বক্তৃতা করছিলাম। এই সময় টাঙ্গাইলের এসডিও ... জানালেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে ঢাকায় যেতে অনুরোধ করে রেডিওগ্রাম পাঠিয়েছেন। ... মওলানা সাহেব বললেন, 'দরকার হলে তোমাকে মন্ত্রীসভায় যোগদান করতে হবে। তবে শহীদ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে নিও ... বোধহয় হক সাহেবের দল কোনো মুশকিলে পড়েছে, তাই ডাক পড়েছে" (৮/২৬২)। বঙ্গবন্ধু ঢাকা থেকে টেলিফোনে আলোচনা করলে সোহরাওয়ার্দী সম্মতি দিয়েছিলেন। সেদিনই মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু, আতাউর রহমান খানসহ কয়েকজন নেতা এবং মাহবুব মোর্শেদ জিপে টাঙ্গাইল গিয়ে মওলানা ভাসানীরও সম্মতি নিয়েছিলেন। অতঃপর শেরে বাংলা মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত (১৫ মে, '৫৪ইং) করলেও শেষ রক্ষা হযনি।

পাকিস্তান সরকারের সহযোগিতায় তখন এগিয়ে এসেছিলেন মার্কিণ রাষ্ট্রদূত হিলড্রেথ।তাতে অবশ্য মার্কিনীদের স্বার্থও জড়িত ছিল। "নির্বাচনের পরে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকারের পদত্যাগের যে জোর দাবি উঠেছিল, সে সম্পর্কে হিলড্রেথ প্রকাশ্য বিবৃতিতে বলেছিলেন যে, 'পূর্ব বঙ্গের নির্বাচন ছিল নেহাৎ একটা প্রাদেশিক ব্যাপার। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের পদত্যাগের কোন প্রশ্নই ছিল না। ঐ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের জনগণ পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধেও কোন রায় দেয় নাই'। হিলড্রেথের ঐ বিবৃতি ছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের নগ্ন হস্তক্ষেপ" (৪/১৩৫)। উল্লেখ্য যে, যুক্তফ্রন্ট সংসদীয় দলের প্রথম সভার দ্বিতীয় সিদ্ধান্তেই বলা হয়েছিল, ইতোপূর্বে গঠিত গণপরিষদ থেকে পূর্ব-বঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু ফজলুল হক গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেননি। বরং হক সাহেবকে করাচিতে পূর্ব বাংলার সদস্যরা যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তাঁরা পদত্যাগ করবেন কিনা', তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তিনি নিজেই পদত্যাগ করেন নাই, আর তাঁদের করতে হবে কেন"? (৮/২৬১)। এতকাল পরেও মনে হয়, সেদিন গণ পরিষদের সদস্যরা পদত্যাগ করলে, গণ-পরিষদের অবর্তমানে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের টিঁকে থাকা সম্ভব হতো না এবং ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকান্ডগুলি অনেকাংশেই দুর্বল হয়ে পড়তো।

"On 15 May, as the United Front Ministry was expended to include the Awami League and other Front members, pre-planned riots between Bengali and non-Bengali workers broke out at the Adamjee Jute Mills ... Bengalis who had voted for the Front suffered most of the casualties." (৭/৫৮)। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "আমরা যখন শপথ নিচ্ছি ঠিক সেই মুহূর্তে দাঙ্গা শুরু হওয়ার কারণ কি? বুঝতে বাকি রইল না, এ এক অশুভ লক্ষণ ! হক সাহেব আমাদের নিয়ে সোজা রওনা করলেন আদমজী জুট মিলে। ... আমাকে একটা পুলিশের জিপে করে (মিলে) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দাঙ্গা তখন অল্প অল্প চলছিল। ... রাস্তায় রাস্তায়

বস্তিতে বস্তিতে মরা মানুষের লাশ পড়ে আছে। অনেকগুলি লোক চিৎকার করছে সাহায্য করার কেউই নাই। ইপিআর পাহারা দিতেছে, বাঙালি ও অবাঙ্গালিদের আলাদা আলাদা করে দিয়েছে। ... কিছু সংখ্যক লোক পাওয়া গেল, তাদের সাহায্যে ... আহত লোকগুলিকে এক জায়গায় করে পানি দিতে শুরু করলাম। ... এই সময় মোহন মিয়া সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। আমার মনে বল এল। ... মোহন মিয়া ও আমি সকাল এগারটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় তিনশতের মত আহত লোককে হাসপাতালে পাঠাতে পেরেছিলাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে বাঙালি জনসাধারণ জমা হচ্ছিল ... তাদের শান্ত করলাম। যদি তারা সঠিক খবর পেত তাহা হলে আমার কথা শুনত কিনা সন্দেহ ছিল। ... পাঁচশতের উপর লাশ আমি স্বচক্ষে দেখলাম। আরও শ'খানেক পুকুরের মধ্যে আছে, তাতে সন্দেহ নাই" (৮/২৬৩-২৬৪)।

বঙ্গবন্ধু আরো লিখেছেন, আদমজী মিল থেকে "সোজা চিফ মিনিস্টারের বাড়িতে ... যেয়ে শুনতে পারলাম তিনি আমার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ... আমাকে কেন দাঙ্গা এরিয়ায় রেখে সকলে চলে এসেছে। আমি তার কাছে গেলে তিনি আমাকে খুব আদর করলেন। আমাকে বললেন, 'ক্যাবিনেট মিটিং এখনই শুরু হবে, তুমি যেও না'। রাত সাড়ে দশটায় ক্যাবিনেট মিটিং বসল। মিটিং শুরু হওয়ার পূর্বে দেখলাম, মন্ত্রীদের মধ্যে দু'একজনকে এর মধ্যে হাত করে নিয়েছেন দোহা (পুলিশের আইজি) সাহেব। ... এরপর ক্যাবিনেট আলোচনা শুরু হল ... সে কথা আমার পক্ষে বলা উচিত না, কারণ ক্যাবিনেট মিটিংয়ের খবর বাইরে বলা উচিত না। মিটিং শেষ হবার পর যখন বাইরে এলাম, তখন রাত প্রায় একটা। ... অনেক অবাঙালি নেতা দাঁড়িয়ে আছেন। ... বললেন এখনই ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বের হতে। খবর রটে গেছে যে বাঙালিদের (আদমজীতে) অবাঙালিরা হত্য করেছে। যেকোনো সময় অবাঙালিদের ওপর আক্রমণ হতে পারে। ... কয়েকজনকে নিয়ে আমি বেড়িয়ে পড়লাম। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভিড় জমে আছে ... বক্তৃতা করে সকলকে বুঝাতে লাগলাম এবং অনেকটা শান্ত করতে সক্ষম হলাম। ... এই দাঙ্গা যে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এবং দুনিয়াকে নতুন সরকারের অক্ষমতা দেখাবার জন্য বিরাট এক ষড়যন্ত্রের অংশ সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ নাই। ... কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে ... ও পশ্চিমা শিল্পপতিদের যোগসাজশে যুক্তফ্রন্টকে ভাঙতে চেষ্টা করছিল, আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভায় যোগদান করায় তা সফল হল না। ... এ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারত না, যদি প্রথম দিনই যুক্তফ্রন্ট পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীসভা গঠন করে শাসন ব্যবস্থাকে কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করত" (৮/২৬৫-২৬৬)।

'পাক-মার্কিণ অস্ত্র চুক্তি' স্বাক্ষরের দশ দিনের মাথায় "১৯৫৪ সালের ২৯শে মে তারিখে পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল (গোলাম মোহম্মদ) যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করেন। প্রদেশে জারি হয় '৯২-ক' ধারা। ... সাম্রাজ্যবাদের দালাল ইসকান্দর মীর্জা বাংলাদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হন। বাংলাদেশে পদার্পন করেই তিনি নেতাদের গুলি করে হত্যা করার সংকল্প প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, যেখানে পারো ভাগো, ... 'Go while going is good'। পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তির মাত্র ২০ দিনের পরের এ ঘটনা

প্রমাণ করে যে, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদকে সন্তুষ্ট করার জন্যই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা বাতিল করা হয়েছিল। ... গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগের অসংখ্য কর্মী ও নেতাকে। ... বিরানব্বই-ক ধারা প্রবর্তনের পর কিছুদিন বাংলার রাজনীতি স্তব্ধ হয়ে যায়। বাঙালিকে সন্তুষ্ট করার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে জরুরি ভিত্তিতে ... নিয়ে আসা হয়। ... মাঝপথে আসার পর ... তাকে জানানো হয়, তোমাকে প্রধানমন্ত্রী হতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ করার পর তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষায় এক গরম বক্তৃতা করেন। ... বললেন, Fazlul Huq is a traitor –এই দম্ভপূর্ণ উক্তি শুনে যতটা না বিস্মিত হয়েছিলাম, তার চেয়ে বেশি হয়েছিলাম ক্রুদ্ধ। ... ফজলুল হক বয়সে তাঁর পিতৃতূল্য। দু'জনের বিদ্যাবুদ্ধির কোনো তূলণা হয় না। সেই লোকের এই দম্ভ" (৬/২৭৪-২৭৬)।

চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে এবং আদমজী পাটকলে বাঙালি-অবাঙ্গালি প্রাণঘাতী দাঙ্গা ঘটানো ষড়যন্ত্রকারীরা জানতো, আওয়ামী লীগসহ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় রেখে অনেক চক্রান্তই বাস্তবায়িত করা যাবে না। তেমনি একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত ছিল পাক-মার্কিণ সামরিক চুক্তি। ১৯মে তারিখে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে করাচিতে ডেকে পাঠালো কেন্দ্রীয় সরকার। একই দিনে করাচিতে স্বক্ষরিত হলো 'পাক-ইউএস আর্মস্ প্যাক্ট' (পাক-মার্কিণ অস্ত্র চুক্তি)। অতঃপর ২৩শে মে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় পাকিস্তান থেকে প্রেরিত জন. পি. কালাহান নামক এক সাংবাদিকের একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে বলা হয় যে, ফজলুল হক, 'তাঁর প্রদেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করছেন'। শেরে বাংলা অবশ্য ঐ রিপোর্টটিকে 'Perversion of truth' - 'সত্যের বিকৃতি' বলে ক্ষুব্ধ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা, কালাহানের রিপোর্টটিরই প্রয়োজন ছিল পাকিস্তানি চক্রান্তকারীদের, এটার সত্য-মিথ্যা বিচারের প্রয়োজন ছিল না। "পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রীর আনুগত্য যাচাই করা হইল একজন বিদেশী রিপোর্টারের উক্তির দ্বারা। ... হক সাহেব ও তাঁর সহকর্মী মন্ত্রীরা করাচি হইতে ঢাকায় ফিরিবার আগেই ৯২-ক ধারা-বলে গবর্ণরের শাসন প্রবর্তন করা হইল। গবর্ণর চৌধুরী খালিকুজ্জামান ও চিফ সেক্রেটারি হাফিয ইসহাকের বদলে শক্তিশালী গবর্ণর রূপে ইসকান্দর মীর্জাকে ও শক্তিশালী চিফ সেক্রেটারি রূপে মিঃ এন এম খাঁকে পাঠান হইল। ... খুব বিশ্রী ও অভদ্রভাবে ৯২-ক ধারা জারি করা হইয়াছিল। ... ৯২-ক ধারা জারি করিবার সংগে-সংগে অন্যতম মন্ত্রী আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকারী মন্ত্রী-ভবন হইতে গেরেফতার করা হইল। আমাদের বাড়ি হইতে সরকারী গাড়ি, টেলিফোন, পিয়ন চাপরাশী গার্ড সবই তুলিয়া নেওয়া হইল। ... পরদিন ... যুক্তফ্রন্ট পার্টির এক সভা ডাকা হইল। ... একজন অফিসার আসিয়া আমাদিগকে জানাইলেন : যুক্তফ্রন্ট আফিস তালাবদ্ধ করা হইয়াছে। এখানে কোনও সভা করিতে দেওয়া হইবে না" (২/৩৩৬-৩৩৮)।

১৯ মে, ১৯৫৪ইং মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক কেন্দ্রীয় সরকারের ডাকে করাচি যাবার সময় শেখ মুজিবসহ বেশ ক'জন মন্ত্রীকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "সেখানে মোহম্মদ আলী বেয়াদবের মত হক সাহেবের সাথে কথা বলতে আরম্ভ

করলেন। আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করছিল। এমন সময় মুহম্মদ আলী আমাকে বললেন, 'কি মুজিবর রহমান, তোমার বিরুদ্ধে বিরাট ফাইল আছে আমার কাছে'। এই কথা বলে, ইয়াংকিদের মত ভাব করে পিছন থেকে ফাইল এনে টেবিলে রাখলেন। আমি বললাম, 'ফাইল তো থাকবেই, আপনাদের বদৌলতে আমাকে তো অনেক জেল খাটতে হয়েছে। আপনার বিরুদ্ধেও একটা ফাইল প্রাদেশিক সরকারের কাছে আছে'। তিনি বললেন, 'এর অর্থ'। আমি বললাম, 'যখন খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন তখন আপনাকে মন্ত্রী করেন নাই। আমরা যখন ১৯৪৮ সালে প্রথম ভাষা আন্দোলন করি, তখন আপনি গোপনে দুইশত টাকা চান্দা দিয়েছিলেন, মনে আছে আপনার? পুরানা কথা অনেকেই ভুলে যায়'। ... আমি এক ফাঁকে, হক সাহেবের সাথে যে সে বেয়াদবের মত কথা বলেছিল, সে সম্বন্ধেও দু'এক কথা শুনিয়ে দিয়েছিলাম" (৮/২৬৭-২৬৮)।

২৮ মে, ১৯৫৪ইং করাচিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রাদেশিক মন্ত্রীদেরকে নিয়ে গভর্ণর জেনারেলের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহম্মদ "যে কামরায় শুয়ে শুয়ে দেশ শাসন করতেন, ... আমাদের নিয়ে যাওয়া হল।তিনি খুবই অসুস্থ,হাত-পা সকল সময়ই কাঁপে। ... তিনি হক সাহেবের সাথে আলাপ করলেন। আমার নাম ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, উপস্থিত আছি কিনা ! ... আমি আদাব করলাম। তিনি আমাকে কাছে নিয়ে বসালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকে বলে, আপনি কমিউনিস্ট, একথা সত্য কি না?' আমি তাঁকে বললাম, 'যদি শহীদ সাহেব কমিউনিস্ট হন, তাহলে আমিও কমিউনিস্ট'। ... তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, 'আপনি এখনও যুবক, দেশের কাজ করতে পারবেন। আমি আপনাকে দোয়া করছি। আপনাকে দেখে আমি খুশি হলাম'। কথাগুলি বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছিল, কারণ কথা তিনি পরিষ্কার বলতে পারেন না। মুখটাও বাঁকা হয়ে গেছে ... আল্লাহ সমস্ত বুদ্ধি আর মাথাটা ঠিক রেখে দিয়েছেন" (৮/২৬৮-২৬৯)।

গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহম্মদের ষড়যন্ত্র আগেই শুরু হয়ে গেছে। পরের দিনই শেখ মুজিব এবং আতাউর রহমান প্রমুখ জেনে গেলেন, এমন আলোচনা চলছে যে, মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় জরুরী আইনে গভর্ণর শাসন জারি করা হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের প্রথম চেষ্টা ছিল, যুক্তফ্রন্ট নেতৃবর্গ যেন পূর্ব বাংলায় ফিরতে না পারেন, বিমানের টিকিট না পান। কিন্তু তখন করাচিতে অবস্থানরত প্রাদেশিক চিফ সেক্রেটারি (পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ) হাফিজ ইসহাকের আপত্তির কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে এমন 'অসহযোগিতা' করার কারণে তাঁকে চাকুরি জীবনে যথেষ্ট মূল্য দিতে হয়েছিল। পূর্ব বাংলার বাঙালি আইজি দোহাও তখন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গী হিসেবে করাচিতেই ছিলেন। ইসহাক-দোহা উভয়েই মুখ্যমন্ত্রীর সাথে একই বিমানে ঢাকায় ফিরেছিলেন। শেখ মুজিবের পর্যবেক্ষণ, আইজি দোহা কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন।

করাচি থেকে বিমানে ঢাকায় ফেরার সময়ের একটি কৌতুহলোদ্দীক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, "কলকাতা পৌঁছাবার কিছু সময় পূর্বে জনাব দোহা হক সাহেবকে

যেয়ে বললেন, 'স্যার আমার মনে হয় আপনার আজ কলকাতা থাকা উচিত। কি হয় বলা যায় না, ... রাতেই ইস্কান্দর মির্জা এবং এন. এম. খান ঢকায় মিলিটারি প্লেনে রওয়ানা হয়ে গেছেন। যদি কোনো কিছু না হয়, তবে আগামী কাল প্লেন পাঠিয়ে আপনাদের নেওয়ার বন্দোবস্ত করব'। ... আমার কাছে দোহা সাহেব এসে ঐ একই কথা বললেন। আমি ... বলে দিলাম, 'কেন কলকাতায় নামব? কলকাতা আজ আলাদা দেশ। যা হয় ঢাকায়ই হবে'। নান্না মিয়াও একই জবাব দিলেন। আমার বুঝতে বাকি থাকল না ... পাকিস্তানি শাসকচক্র দুনিয়াকে দেখাতে চায়, হক সাহেব দুই বাংলাকে এক করতে চান, তিনি পাকিস্তানের দুশমন, রাষ্ট্রদ্রোহী। আর আমরা তাঁর এই রাষ্ট্রদ্রোহী কাজের সাথী। ... কলকাতা এয়ারপোর্টে ... আবার দোহা সাহেব এসে বললেন, 'টেলিফোন করে খবর পেলাম, সমস্ত ঢাকা এয়ারপোর্ট মিলিটারি ঘিরে রেখেছে। চিন্তা করে দেখেন, কি করবেন?' ... বললাম,আমাদের তাতে কি, আমরা ঢাকায়ই যাব। ... ভাবলাম, দোহা সাহেব পুলিশে চাকরি করেন, তাই নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করেন। আমরা রাজনীতি করি, তাই এই সামান্য চালাকিটাও বুঝতে পারি না ! ঢাকায় এসে দেখলাম, বিরাট জনতা আমাদের অভ্যর্থনা করার জন্য অপেক্ষা করছে" (৮/২৬৯-২৭০)।

২৯ মে তারিখে রাতে করাচি থেকে দিল্লি-কলকাতা হয়ে ৩০ তারিখ দুপুরে হক সাহেব ঢাকায় ফিরলেন আর সেদিনই বিকাল চারটায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করে পূর্ব বাংলায় জারি করা হলো (৯২-ক ধারা) গভর্ণরের শাসন। কেন্দ্রীয় ডিফেন্স সেক্রেটারী ইস্কান্দর মীর্জা জরুরী ক্ষমতার অধিকারী নতুন গভর্ণর এবং এন. এম খান প্রদেশের চিফ সেক্রেটারি হিসাবে, হক-মুজিবের আগেই মিলিটারি বিমানে ঢাকায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। "Mirza lost no time ... Under Public Safety Act, which allowed preventive detention and arrest of people without trial, more than 1600 people were rounded up within the first twenty four hours. Most of them belonged to the Awami Muslim League ... Among those arrested were Mujib and forty other legislators. Fazlul Huq was interned in his home. Section 144....was imposed throughout the province. Pro-Awami League *Ittefaq* was subjected to pre-censorship" (৭/৬০)।

আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, আবু হোসেন সরকারের সরকারী বাড়িতে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীবর্গ এবং প্রায় দেড় শ' এমএলএ'র এক 'ইনফরমাল' সভায় (৬জুন, ১৯৬৫৪ইং) "কেন্দ্রীয় সরকারের এই অনিয়মতান্ত্রিক ৯২-ক ধারা প্রবর্তনের নিন্দা করিয়া, পার্টি লিডারকে নযরবন্দী ও অন্যতম মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে গেরেফতার করার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হইল। অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারের এই আদেশ অমান্য করিয়া ... সমবেতভাবে কারাবরণ করার ... কর্ম-পন্থায় অধিকাংশের সমর্থন দেখা গেল। ... এখানেও পুলিশের হামলা হইল। ... আমরা বেশ কয়েকজন তখন হক সাহেবের সংগে দেখা করিয়া সমস্ত অবস্থা ও আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানাইলাম এবং আইন অমান্যে আমাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ

করিলাম। ... হক সাহেব ... আমাদিগকে ... এলাকায় গিয়া জনগণকে বিপ্লবী বেআইনী ধবংসাত্মক কাজে নিয়োগ করিবার ... পরামর্শ দিলেন। আমরা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বুঝিয়া আসিলাম শেরে বাংলা বেশ একটু ভয় পাইয়াছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে একটা আপোস করিবার জন্য চেষ্টা তলে-তলে করিতেছেন। কাজেই আমরা কেউ কিছু করিলাম না। কিন্তু হক সাহেব ও যুক্তফ্রন্টের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিলেন (২/৩৩৮-৩৪০)।

প্রাসঙ্গিক আরো কিছু ঐতিহাসিক তথ্য, বঙ্গবন্ধুর লেখা থেকে : ৩০মে তারিখে ঢাকায় পৌঁছানোর কিছু পরেই "আমি তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে আতাউর রহমানের বাড়িতে এসে তাঁকে নিয়ে হক সাহেবের বাড়িতে গেলাম এবং তাঁকে অনুরোধ করলাম ক্যাবিনেট মিটিং ডাকতে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই অন্যায় আদেশ আমাদের মানা উচিত হবে না। তিনি বললেন, কি হবে বুঝতে পারছি না, অন্যদের সাথে পরামর্শ কর। ... মনে হল সকলেই ভয় পেয়ে গেছেন। আতাউর রহমান সাহেব রাজি ছিলেন, যদি সকলে একমত হতে পারতাম। মন্ত্রীদের পাওয়া গেল না, হক সাহেব দোতলায় বসে রইলেন। ... আওয়ামী লীগ অফিসে যেয়ে দরকারি কাগজপত্র সরিয়ে বের হওয়ার সাথে সাথে অন্য পথ দিয়ে পুলিশ অফিসে এসে পাহারা দিতে আরম্ভ করল। আমি আবার নান্না মিয়ার বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে আমাকে জানাল, বড় বড় পুলিশ কর্মচারীরা আমাকে খুঁজতে এসেছিল। বাড়িতে ফোন করে জানলাম সেখানেও গিয়েছিল। ... বিদায় (নান্না মিয়ার বাড়ি থেকে) নেওয়ার সময় অনেককে বললাম, ... আপনারা এই অন্যায় আদেশ মাথা পেতে নেবেন না। ... দেশবাসী প্রস্তুত আছে, শুধু নেতৃত্ব দিতে হবে আপনাদের। জেলে অনেকের যেতে হবে, তবে প্রতিবাদ করে জেল খাটা উচিত" (৮/২৭০-২৭১)।

"পূর্ব বাংলায় গভর্ণর শাসন জারি করার দিন প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) যে বক্তৃতা রেডিও মারফত করেন, তাতে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেবকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' এবং আমাকে 'দাঙ্গাকারী' বলে আক্রমণ করেন। আমাদের নেতারা যারা বাইরে রইলেন, তাঁরা এর প্রতিবাদ করারও দরকার মনে করলেন না। দেশবাসী ৬ই জুনের (যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির সভা) দিকে চেয়েছিল, যদি নেতারা সাহস করে প্রোগ্রাম দিত তবে দেশবাসী তা পালন করত। ... অনেক কর্মীই চেষ্টা করে গ্রেফতার হয়েছিল। যদি সেইদিন নেতারা জনগণকে আহ্বান করত তবে এতবড় আন্দোলন হত যে কোনদিন আর ষড়যন্ত্রকারীরা সাহস করত না বাংলাদেশের উপর অত্যাচার করতে। ... একমাত্র আতাউর রহমান খান কয়েকদিন পরে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। ... দেড় ডজন মন্ত্রীর মধ্যে আমিই একমাত্র কারাগারে বন্দী। যদি ৬ই জুন সরকারের অন্যায় হুকুম অমান্য করে (হক সাহেব ছাড়া) অন্য মন্ত্রীরা গ্রেফতার হতেন তা হলেও স্বতঃস্ফুর্তভাবে আন্দোলন শুরু হয়ে যেত। দুঃখের বিষয়, একটা লোকও প্রতিবাদ করল না। ... ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পারল যে, যতই হৈচৈ বাঙালিরা করুক ... যতই জনসমর্থন থাকুক ... এদের দাবিয়ে রাখতে কষ্ট হবে না। পুলিশের বন্দুক ও লাঠি দেখলে এরা পালিয়ে গর্তে লুকাবে" (৮/২৭৩)।

পাকিস্তানের প্রাসাদ চক্রান্তের তখন প্রধান কৃৎ-কুশলীরা ছিলেন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহম্মদ, প্রধানমন্ত্রী মোহম্মদ আলী বগুড়া, চৌধুরী মোহম্মদ আলী, সেনা-প্রধান আয়ুব খান এবং পূর্ব-বাংলার গভর্ণর ইস্কান্দর মির্জা প্রমুখ। তাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে সরাসরি মিথ্যা বলেছেন, কথা দিয়ে কথা রাখেননি, আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে বরখেলাফ করেছেন, এমনকি কোরাণ-ছুঁয়ে শপথ করেও প্রয়োজনমত ভুলে গেছেন। গণ-পরিষদ 'বাতিল' করে দেয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট তমিজুদ্দিন খান এবিষয়ে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করে লাহোর 'চিফ কোর্ট'এ একটি আপিল-মামলা করেছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের ভয় ছিল, আপিলের রায় সরকারের বিপক্ষে গেলে, 'স্থগিদ' আইন পরিষদ পূণর্বহাল হবে এবং আবার যুক্তফ্রন্ট তথা আওয়ামী লীগেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গতই বলা দরকার, তদানিন্তন বাঙালি রাজনীতির তিন-প্রধান হক-ভাসানী-সোহরাওয়াদী কখনো ষড়যন্ত্রী 'পাওয়ার-ক্লিক' দ্বারা চরম অপমানিত হয়েছেন, আবার কখনো তাদের ষড়যন্ত্রের জালে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় জড়িয়েও পড়েছেন। বঙ্গবন্ধু মুজিবের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য-বলিষ্ঠতা এবং বিশেষত, 'রাজনৈতিক একাকীত্ব' উপলব্ধি করার জন্যই ১৯৫৪ইং পরবর্তী ষড়যন্ত্রমূলক পাক-রাজনীতির বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করা দরকার, কিছুটা সংক্ষেপে হলেও।

৩০ মে, ১৯৫৪ইং সন্ধ্যায় পূর্ব বাংলার মন্ত্রী শেখ মুজিবকে ঢাকায় তাঁর সরকারী বাসা থেকে গ্রেফতার করে দাঙ্গা বাঁধানো, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি বেশ কয়েকটি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ধারাগুলি খুব যুৎসই বা মজবুত নয় এবং আদলত থেকে জামিনে মুক্ত হয়ে যেতে পারেন, এমন আশংকায়, দু'তিন দিন পরেই তাঁকে 'নিরাপত্তা বন্দী' ঘোষণা করা হয়। তখন নিরাপত্তা আইনে, যেকোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকাল বন্দী করে রাখার 'আইনগত' সুযোগ ছিল। এ-যাত্রায় মুজিব বন্দী ছিলেন ১৯৫৪ইং ডিসেম্বর মাসের শেষ দিক পর্যন্ত। মুজিবের বন্দীত্বকালেই 'মুক্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ' - বিশেষত, হক সাহেব এবং সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ এমন কিছু কাজ করেছিলেন, যাতে মুজিবের পক্ষে হতাশ এবং ক্ষুব্ধ হওয়া ছাড়া কিছুই করার ছিল না। কারাবন্দী মুজিব খবর পেলেন, হক সাহেব দোষ স্বীকার করে সরকারের কাছে একটি আবেদন-পত্র জমা দিয়েছেন।

"Fearful of being charged of treason ... unless he apologized, ...Fazlul Huq issued a statement on 30 May ending with these lines : 'I sincerely regret having made utterances which reflected on my loyality to Pakistan. On account of my old age, I am retiring from public life" (৭/৬০)। দেখা যাচ্ছে, পূর্ব বাংলায় গভর্ণরের শাসন জারি করে হক সাহেবকে গৃহবন্দী করার দিনই তিনি অমন 'মুচলেকা' দিয়েছিলেন এবং রাজনৈতিক সহকর্মীদের সাথে আলোচনাও করেননি। আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ হক সাহেবের গোপন আবেদনের কথা না জেনেই, প্রতিবাদ সংগঠনের জন্য তাঁর সাথেই আলোচনা করেছেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "গৃহবন্দী ... ফজলুল হক সাহেবকে দিয়ে তাঁর সমর্থকেরা এক বিবৃতি দিয়েছিলেন। তাতে তিনি অন্যায় স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করলেন। তিনি যুক্তফ্রন্টের

নেতা, তাঁর এই কথায় আমাদের সকলের মাথা নত হয়ে পড়ল। ... তিনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তাঁর মনে দুর্বলতা আসতে পারে। যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁরা কি করলেন ! হাজার হাজার কর্মী কারাগারে বন্দী। ... স্থির করলাম এই 'কৃষক শ্রমিক দলে'র সাথে আর রাজনীতি করা যায় না। ... খবর পেতে লাগলাম যে, কৃষক শ্রমিক দলের কয়েকজন নামকরা নেতা গোপনে মোহাম্মদ আলীর (পাক প্রধানমন্ত্রী) সাথে আলোচনা চালিয়েছেন কিভাবে আবার মন্ত্রীত্ব পেতে পারেন। দরকার হলে আওয়ামী লীগের সাথে কোনো সম্পর্ক তাঁরা রাখবেন না" (৮/২৭৭-২৭৮)।

অচল-অসুস্থ অবস্থাতেও গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহম্মদের পরিকল্পনা অব্যাহত ছিল। তিনি ভাবলেন, ফজলুল হক রাজনীতি থেকে বিদায় নিলে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ প্রবল হয়ে উঠবে, পাকিস্তানের শক্তি-কাঠামো অধিকতর হুমকিতে পরতে পারে। সুতরাং ফজলুল হকের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় একটা সমর্থনের ভিত্তি তৈরি করে রাখা দরকার, সেই সাথে দরকার আওয়ামী লীগকে যুক্তফ্রন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফজলুল হকের মাধ্যমেই সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা। গোলাম মোহম্মদ এটাও জানতেন যে, শেরে বাংলার সবটুকু রাজনৈতিক শক্তিই পূর্ব বাংলায় আর সোহরাওয়ার্দী হচ্ছেন একমাত্র রাজনীতিবিদ, যিনি পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় সমভাবেই প্রভাবশালী। সুতরাং কাউকেই হারানো চলবে না। তাই, পূর্ব বাংলার রাজনীতির বিভেদ-ষড়যন্ত্রের খেলায় যখন যাকে প্রয়োজন কাজে লাগাবার পরিকল্পনাগুলি গোলাম মোহম্মদ যথেষ্ট ভেবেচিন্তেই শুরু করেছিলেন।

১৯৩৫ইং প্রবর্তিত 'ভারত শাসন আইন' তখনো পাকিস্তানের শাসন-ভিত্তি। সেই আইনে উল্লেখ ছিল, 'গভর্ণর জেনারেল প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করবেন'। সেই 'সাংবিধানিক আতঙ্ক' দূর করতেই ২৪ অক্টোবর, ১৯৫৪ইং গভর্ণর জেনারেল সারা পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা জারি করে গণ-পরিষদ ভেঙ্গে দিলেন। অতঃপর যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া এবং সেনা-প্রধান আয়ুব খানকে দ্রুত করাচিতে ফিরিয়ে এনে নতুন ছক সাজিয়ে 'Ministry of Talents' – 'প্রতিভাধরদের মন্ত্রীসভা' গঠন করে বলা হলো, দল-পরিচয় নয়, মন্ত্রীদের দক্ষতা-প্রতিভাই বিবেচ্য বিষয়। গভর্ণর জেনারেল অতঃপর চৌধুরী মুহম্মদ আলীকে 'অপসারণ' করে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসালেন মোহম্মদ আলী বগুড়াকে, দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল আয়ুব খান, পূর্ব বাংলার গভর্ণরের পদ ছেড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন ইস্কান্দর মীর্জা। গোলাম মোহম্মদের ডাকে, জুরিখে চিকিৎসা-গ্রহণ শেষে দেশে ফিরে, তাঁরই অনুরোধে 'সাংবিধানিক সংকট' মোকাবেলার দায়িত্ব নিয়ে ২১ ডিসেম্বর, ১৯৫৪ইং আইনমন্ত্রী হলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

প্রসঙ্গতই উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারত ভাগের আগে বাংলার প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অধীনে চাকুরী করেছেন যে মোহম্মদ আলী, এবার তিনিই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আর তার অধীনে আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহম্মদ একদিকে বলেছেন, সংবিধান প্রণয়নের জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সোহরাওয়ার্দীর চেয়ে যোগ্যতম লোক নেই পাকিস্তানে। অপরদিকে তিনিই পবিত্র

কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করেছেন, সোহরাওয়ার্দীই থাকবেন 'ডি-ফেক্টো' প্রধানমন্ত্রী, তাঁকে না জানিয়ে মন্ত্রীসভায় কিছুই করা হবে না। অথচ কেএসপি'র আবু হোসেন সরকারকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করা হয়েছিল (৪ জানুয়ারি) সোহরাওয়ার্দীর অজান্তেই। কিন্তু তখন সোহরাওয়ার্দীর আর কিছুই করার ছিল না। নবাব দরবারে যাকে খুশি মন্ত্রী-আমাত্য বানানোর এবং বিদায় করে দেবার রীতি ছিল, ভারতে বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাটরাও অনেকেই তেমনি মানসিকতায় দরবার চালাতেন, পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহম্মদ কার্যত সেই ধারাটিই বহাল করেছিলেন।

গোলাম মোহম্মদ এবং জুরিখে চিকিৎসাধীন সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে সমঝোতার দূত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান খান। অপরদিকে মোহম্মদ আলী বগুড়া মন্ত্রীসভা গঠনের আগে, নভেম্বর মাসে ঢাকা সফরে গিয়ে শেরে বাংলার সাথে 'আপোষ রফা' করে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন। মোহম্মদ আলী এবং ফজলুল হকের সমঝোতার শর্ত ছিল, "Huq would be rehabilitated politically provided he co-operated with the power structure in West Pakistan and their Bengali henchman Mohammad Ali Bogra. In fact, Bogra had secretly made a deal with Fazlul Huq to make his nominee Chief Minister of East Bengal in exchange for Huq's promise to challenge Suhrawardy's credentials to represent the people of East Bengal" (৭/৬২)।

করাবন্দী বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "খবরের কাগজে দেখলাম, আতাউর রহমান খান সাহেব জুরিখ যাচ্ছেন, শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করতে। ... করাচিতে আতাউর রহমান সাহেব গোলাম মোহম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক ছিলেন তখন মাহমুদুল হক ওসমানী। তিনিও গোলাম মোহম্মদের সাথে সাক্ষাৎ করে পূর্ব বাংলায় এসে আতাউর রহমান সাহেব, মানিক ভাই ও আরও অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। বুঝতে পারলাম কিছু একটা চলছে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের জড়িয়ে পড়া উচিৎ হবে না। আমি তো বন্দী, কেইবা আমার কথা শুনবে? ... আতাউর রহমান সাহেব জুরিখ থেকে ফিরে আসলেন। ... এমএলএ'রা ও কর্মীরা জেলে। আওয়ামী লীগের সভাপতি (ভাসানী) বিলাতে, জেনারেল সেক্রেটারি কারাগারে বন্দী। অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা ঝুলছে। এই অবস্থায় কি করে গোলাম মোহম্মদকে রাজকীয় সংবর্ধনা দেবার বন্দোবস্ত করার জন্য ... একটা ফুলের মালা নিয়ে আতাউর রহমান সাহেব, আরেকটা মালা নিয়ে হক সাহেব তেজগাঁ এয়ারপোর্টে ... দাঁড়িয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত গোলাম মোহম্মদ সাহেবের গলায় দুইজনই মালা দিলেন। ... আওয়ামী লীগ একটা সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান -সেই প্রতিষ্ঠানের নেতারা কি করে এই অগণতান্ত্রিক ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ... আমি ও আমার সহবন্দীরা খুবই মর্মপীড়ায় ভুগছিলাম। ... আমাদের নেতারা কি পরামর্শ শহীদ সাহেবকে দিয়েছিলেন জানি না, তবে শহীদ সাহেব ভুল করলেন, লাহোর ও ঢাকায় না যেয়ে, দেশের অবস্থা না বুঝে মন্ত্রীত্বে যোগদান করে। ... ঢাকায় এসে যদি যুক্তফ্রন্ট পার্টির সভা ডাকতেন এবং সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে

... কিছু করতেন তাহলে কারও কিছু বলার থাকত না। ... জনগণ চারিদিকে অন্ধকার দেখছিল। তাদের একমাত্র ভরসা ছিল শহীদ সাহেব দেশে ফিরে আসবেন এবং পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব নিবেন। ... আমি নিজে কিছুতেই তাঁর আইনমন্ত্রী হওয়া সমর্থন করতে পারলাম না" (৮/ ২৮১-২৮৩)। এ সবই বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব চিন্তা এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট পরিচয়বাহী।

জুরিখ থেকে করাচি ফেরার পর, "Following face-to-face talks with Ghulam Mohammed, lasting several days, Suhrawardy accepted the offer only after Ghulam Mohammed swore on the Holy Koran that promises made to him would be kept. Still Suhrawardy wanted to go to Dhaka for consultations with his colleagues before joining the Cabinet. Ghulam Mohammed requested him not to do so because it could complicate matters ... Suhrwardy gave in" (৭/৬২)। ২১ ডিসেম্বর তারিখে সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী হিসাবে 'মিনিস্ট্রি অব ট্যালেন্টস্'এ যোগ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ গোলাম মোহম্মদের কথা মেনেই সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের প্রাতিষ্ঠানিক প্রধান হিসাবে ঢাকায় এসে দলীয় এবং ফ্রন্ট-ভুক্ত নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছিলেন।

"Before joining the Cabinet, Suhrwardy used his influence to secure the release of Mujib from prison on `compassionate grounds', because his father was ill. Five days later Mujib was on his way to Karachi for talks with his leader" (প্রাগুক্ত)। এক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর লিখিত বিবরণটা একটু ভিন্নতর। "রেনু (বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী, তখন ঢাকায় ছিলেন) টেলিগ্রাম পেয়েছে, আব্বার শরীর খুব খারাপ, তাঁর বাঁচবার আশা কম। ... একটা দরখাস্তও করেছে সরকারের কাছে, টেলিগ্রামটা সাথে দিয়ে। তখন জনাব এন. এম. খান চিফ সেক্রেটারি ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে পাকিস্তান হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। রাত আট ঘটিকার সময় আমার মুক্তির আদেশ দিলেন। নয়টার সময় আমাকে মুক্তি দেওয়া হল। ... বিদায় নেবার সময় (সহ-বন্দীদেরকে) বলে গেলাম 'হয় তোমরা মুক্তি পাবা, নতুবা আবার আমি জেলে আসব" (৮/২৮৪-২৮৫)। নিজের মুক্তির বিষয়ে সোহরাওয়ার্দীর প্রভাব কার্যকর হয়ে থাকলে, মুজিব জানবেন না, কিংবা 'আত্মজীবনী'তে উল্লেখ করতে ভুলে যাবেন, এটা কেমন জানি, মুজিব-চরিত্রের সাথে আদৌ মেলে না।

করাচিতে মুজিব-সোহরাওয়ার্দী সাক্ষাৎকার খুব প্রীতিকর হয়নি। করাচিতে পৌঁছানোর রাতে তিনি নেতার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাননি, মুজিবের দুশ্চিন্তা ছিল: "দেখা হলে কি অবস্থা হয়, বলা যায না ! আমি তাঁর সাথে বেয়াদবি করে বসতে পারি"। পরের দিন সকালে শহীদ সাহেব "আমাকে দেখে বললেন, 'গত রাতে এসেছ শুনলাম, রাতেই দেখা করা উচিত ছিল'। আমি বললাম, 'ক্লান্ত ছিলাম, আর এসেই বা কি করব, আপনি তো এখন মোহম্মদ আলী সাহেবের আইনমন্ত্রী'। তিনি বললেন, 'রাগ করেছ, বোধ হয়'। বললাম, 'রাগ করব কেন স্যার, ভাবছি সারা জীবন আপনাকে নেতা মেনে ভুলই করেছি কি না?' তিনি ... বললেন, 'বুঝেছি, আর বলতে হবে না,

কাল বিকাল তিনটায় এস, অনেক কথা আছে" (৮/২৮৬)। পরের দিন দীর্ঘ আলোচনায় সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ইতিবৃত্ত শোনালেন 'প্রিয়-শিষ্য' মুজিবকে। কিন্তু মুজিব বললেন, "পূর্ব বাংলায় যেয়ে সকলের সাথে পরামর্শ করে অন্য কাউকেও তো মন্ত্রীত্ব দিতে পারতেন। আমার মনে হয় আপনাকে ট্র্যাপ করেছে। ফল খুব ভাল হবে না, ... যে জনপ্রিয়তা আপনি অর্জন করেছিলেন, তা শেষ করতে চলেছেন। তিনি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন এবং বললেন, 'কিছু না করতে পারলে ছেড়ে দেব, তাতে কি আসে যায '! আমি বললাম, এই ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে আপনার যোগদান করা উচিৎ হয় নাই, আপনি বুঝতে পারবেন। তিনি আমাকে পূর্ব বাংলায় কখন যাবেন তার প্রোগ্রাম করতে বললেন। আমি বললাম, ভাসানী সাহেব দেশে না এলে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দিয়ে আপনার ঢাকায় যাওয়া উচিত হবে না। তিনি রাগ করে বললেন, 'তার অর্থ তুমি আমাকে পূর্ব বাংলায় যেতে নিষেধ করছ'। আমি বললাম, কিছুটা তাই। ... আমি থাকতে থাকতে দেখলাম, আবু হোসেন সরকার সাহেবকে হক সাহেবের নমিনি হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বে (স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ৪ জানু, ১৯৫৫ইং) গ্রহণ করা হয়েছে। শহীদ সাহেব কিছুই জানেন না। এবার তিনি কিছুটা বুঝতে পারলেন যে খেলা শুরু হয়েছে" (প্রাগুক্ত)।

আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "১৯৫৪ সালের ১১ই ডিসেম্বর সুহরাওয়ার্দী সাহেব করাচি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ইতিপূর্বেই করাচিতে ঐ তারিখে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের একটি বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন। ... যথাসময়ে আওয়ামী লীগের বর্ধিত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসিল। শহীদ সাহেব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া মূল্যবান বক্তৃতা করিলেন। তিনি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবেন কিনা, সে সম্বন্ধে মেম্বরদের পরামর্শ জিগগাসা করিলেন। উভয় পাকিস্তান হইতে যাঁরা বক্তৃতা করিলেন, তাঁদের প্রায় সকলেই বলিলেন, শহীদ সাহেব একমাত্র প্রধানমন্ত্রী রূপেই মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিবেন, অন্যথায় নয। তাছাড়া একথাও কেউ কেউ বলিলেন যে, মৌঃ তমিযুদ্দিন সাহেবের রীট দরখাস্ত তখনও সিন্ধুর চিফ কোর্টে বিচারাধীন রহিয়াছে। কাজেই অনিশ্চিত পরিবেশে শহীদ সাহেবে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। এইভাবে শহীদ সাহেব আওয়ামী নেতাদের মতামত জ্ঞাত হইয়া গবর্ণর-জেনারেলের সাথে দেখা করিতে গেলেন" (২/৩৪৪-৩৪৫)।

পরের দিন সোহরাওয়ার্দীর জানালেন: "বড়লাটের মতে শহীদ সাহেবকে ... সাধারণ মন্ত্রী হিসাবেই মোহম্মদ আলী-কেবিনেটে ঢুকিতে হইবে। তারপর অল্পদিন মধ্যেই শহীদ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া মন্ত্রীসভা পূনর্গঠিত হইবে। ... শহীদ সাহেব আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, প্রধানমন্ত্রীত্বটা বড় কথা নয়, বড় কথা শাসনতন্ত্র রচনা। কিন্তু মেম্বররা শহীদ সাহেবের সহিত একমত হইলেন না। তখন তিনি প্রস্তাব দিলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ... ৪জন করিয়া নেতৃস্থানীয় আওয়ামী-নেতা লইয়া তিনি গোপন পরামর্শ করিবেন। আমরা তাতেই রাযী হইলাম। ... শহীদ সাহেব যেসব কথা বলিলেন তার সারমর্ম এই: (১) বড়লাট গোলাম মোহাম্মদ তাঁকে কসম খাইয়া বলিয়াছেন যে শহীদ সাহেব কেবিনেটে ঢুকার তিনদিন (মতান্তরে তিন সপ্তাহ)

মধ্যেই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করিয়া মন্ত্রীসভা পূনর্গঠিত করিবেন; (২) ঐ সময়ে আওয়ামী লীগ হইতে আরও দুইজন মন্ত্রী নেওয়া হইবে; (৩) শাসনতন্ত্র রচনার ভার শহীদ সাহেবকে দেওয়া হইবে; (৪) ছয় মাসের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনার কাজ শেষ করিয়া ... ইন্টারিম কনস্টিটিউশন রূপে প্রয়োগ করা হইবে; (৫) ... এক বছরের মধ্যে দেশময় সাধারণ নির্বাচন করা হইবে; (৬) ঐভাবে নির্বাচিত পার্লামেন্টের শাসনতন্ত্র যেকোনো রূপে সংশোধন করার পূর্ণ অধিকার থাকিবে" (২/৩৪৫-৩৪৬)।

বৈঠকটি একটানা বেশ কয়েকদিন চলেছিল এবং সেটি অসমাপ্ত রেখেই আবুল মনসুর আহমদকে ময়মনসিংহে ফিরতে হয়েছিল। তখন সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে তিনি নিজস্ব ৮-দফা মতামত লিখে দিয়েছিলেন, ৪নং ক্রমিকে ছিল, "যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার নির্বাচনী ওয়াদার ১৯নং দফা অনুসারে ৩ বিষয়ের কেন্দ্রীয় সরকারের বিধান শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে বড়লাট ও মন্ত্রীসভার সংগে এখনই বোঝাপড়া করিতে হইবে"। আর ৮নং ছিল, "মন্ত্রীসভায় প্রবেশের আগেই শহীদ সাহেবকে একবার পূর্ব-বাংলা সফর করিতে এবং যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সাথে আলোচনা করিতে হইবে" (২/৩৪৭)। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী কেনো পরামর্শই মানেননি। ততোধিক বিস্ময়কর ছিল: মন্ত্রীসভায় সোহরাওয়ার্দীর প্রবেশের পর শেখ মুজিব যখন করাচিতে দেখা করে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন, তখন সোহরাওয়ার্দী এসব কথা মুজিবকে জানাননি।

আগেই বলা হয়েছে, সোহরাওয়ার্দীকে না জানিয়েই আবু হোসেন সরকারকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় নেয়া হয়েছিল। "Mujib, however, was so angry at this deliberate insult of his leader that he left Karachi on 5 January....On arrival...in Dhaka, Mujib accused Fazlul Huq of challenging the leadership of Suhrawardy. He proposed to the Awami Leaguers that Fazlul Huq should be removed from his position of leader of the Parliamentary Party of the United Front" (৭/৬৩)। শেখ মুজিব করাচিতেই জেনেছিলেন, হক সাহেব নিজেই এক সাংবাদিকের কাছে বলেছেন, তিনিই যুক্তফ্রন্টের নেতা, সোহরাওয়ার্দী যুক্তফ্রন্টের কেউ নন। অথচ একথা কারোই অজানা ছিল না যে, যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগই ছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ, অন্য সকলে মিলেও তার সমান নয়।

শেখ মুজিব করাচিতেই আরো জেনেছিলেন, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে "কৃষক-শ্রমিক দলের নেতারা কথা পেয়েছেন, পূর্ব বাংলায় সরকার তাঁদেরই দেওয়া হবে। আওয়ামী লীগ দল থেকে কিছু লোক তাঁরা পাবেন, এ আশ্বাসও তাঁরা পেয়েছেন"। বঙ্গবন্ধু আরো লিখেছেন, "যদিও শহীদ সাহেবের সাথে তাঁর মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার ব্যাপার নিয়ে একমত হতে পারি নাই, তবু অন্য কেউ তাঁকে অপমান করুক এটা সহ্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল। আমি শহীদ সাহেবকে বললাম, যখন হক সাহেব প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন, আপনি যুক্তফ্রন্টের কেউ নন, তখন বাধ্য হয়ে প্রমান করতে হবে, আপনিও যুক্তফ্রন্টের কেউ। ... আমরা অনাস্থা দিব হক সাহেবের বিরুদ্ধে। ... শহীদ সাহেব বললেন, 'যতদিন আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টে আছে ততদিন তো সত্যই

আমি কেউ নই। হক সাহেব যুক্তফ্রন্টের নেতা, ... (ফ্রন্টের সকল দলের) পক্ষে কথা বলতে পারেন" (৮/২৮৭)। অর্থাৎ সোহরাওয়ার্দী পরোক্ষভাবে হলেও মুজিবকে যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ঢাকায় ফিরেই যুক্তফ্রন্ট ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডেকে, হক সাহেবের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন শেখ মুজিব। প্রথমেই আলোচনা হলো আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ এবং মানিক মিয়া প্রমুখের সাথে। "তিনজনই প্রথমে একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। অনাস্থা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি নাই, তবে পারা যাবে কিনা ... আমি বললাম, না পারার কোনো কারণ নাই। নীতি বলেও তো একটা কথা আছে। ... আমি ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করলাম। ওয়ার্কিং কমিটির প্রায় সকলেই একমত, কেবল সালাম সাহেব ও হাশিমউদ্দিন সাহেব একমত হতে পারলেন না। তবে একথা জানালেন যে, তাঁরা ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই মানতে বাধ্য। ... হক সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে কে অনাস্থা প্রস্তাব প্রথমে পেশ করবে, সে প্রশ্ন হল। অনেকেই আপত্তি করতে লাগলেন, আমার নিজেরও লজ্জা করতে লাগল। তাঁকে তো আমি সম্মান ও ভক্তি করি। কিন্তু এখন কয়েকজন নেতা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। তাঁকে তাঁদের কাছ থেকে শত চেষ্টা করেও বের করতে পারলাম না। ... ঠিক হল, আমিই প্রস্তাব আনব আর জনাব আব্দুল গণি বার এট ল' সমর্থন করবেন" (৮/২৮৭-২৮৮)।

আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারি মুজিবুর রহমান সাহেব হক সাহেবের বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাব আনিলেন। ... বলিলেন : 'এ অনাস্থা প্রস্তাব আওয়ামী লীগের তরফ হইতে নয়, যুক্তফ্রন্টের তরফ হইতে'। ... 'ইত্তেফাক' সম্পাদক মানিক মিয়া সাহেব ও আমি এই অনাস্থা প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিলাম। ... শহীদ সাহেব ঢাকা না আসায় ও মওলানা সাহেবের (ইউরোপ সফরের পর কলকাতায় অবস্থান করছিলেন) বিরুদ্ধতার কথা জানাজানি হইয়া যাওয়ায় জয়ের সম্ভাবনা কমিয়া গেল। আমি আপোসের চেষ্টা করিলাম। বন্ধুবর আব্দুস সালাম সাহেবই এ আপোস করাইয়া দিতে পারিতেন। কারণ তিনি পঁচিশজনের মত আওয়ামী মেম্বর লইয়া হক সাহেবের সমর্থন করিতেছিলেন। ... ১৯৫৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ... যুক্তফ্রন্টের এই ঐতিহাসিক (ওয়ার্কিং কমিটির) বৈঠক বসিল" (২/৩৫০-৩৫১)।

"Although Mujib did not get a wholehearted endorsement from Awami Muslim League legislators for his motion, he was hopeful of picking up support of a number of dissident KSP and Nizam-e-Islam legislators ... On the other hand, as many as thirty five members of the Awami League, led by Abdus Salam Khan of Faridpur, did not vote in support of the ... motion; worse still, some of them, enticed by various inducements deserted the party to join the KSP. Mujib did not despair. To him the defection of a few self-seeking opportunists would not amount to any tangible loss for Awami League. Quite the contrary, he argued, the party would emerge out of this seemingly disheartening experience as a more determined, ideologically

cohesive body" (৭/৬৩)। আওয়ামী লীগ এমএলএ'গণকে স্বাধীন বিবেক-বুদ্ধিমত ভোট প্রদানের অধিকার দেয়াতে অনেকেই দলীয় প্রস্তাবের বিপরীতে ভোট দিয়েছিলেন, যা দৃশ্যতই পার্টির জন্য বিপর্যয়কর হয়েছিল। অপরদিকে কেএসপি-সদস্যগণ সকলেই একযোগে মুজিবের প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। এখানে প্রাসঙ্গিকতার বিবেচনাতেই অনেক পরবর্তী সময়ের দুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭০ইং নির্বাচনে কার্যত যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন অপেক্ষাও বিপুলতর বিজয়ের পরে, বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত দলীয় সংসদ-সদস্যগণকে প্রকাশ্য জনসভায় দলীয় সিদ্ধান্ত মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন। আর তাই দেখা যায়, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় একজন মাত্র সদস্য দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। আর স্বাধীন বাংলাদেশের ১৯৭২ইং জারিকৃত সংবিধানে দলীয় প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়াকে সাংবিধানিক রীতি-বিধানের পরিপন্থী (৭০ ধারা অনুসারে) ঘোষণা করা হয়েছিল।

আ.লীগের অনাস্থা প্রস্তাবের ব্যর্থতার অল্প দিনের মধ্যেই, ১৯৫৫ইং বছরের প্রথম দিকে আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিল। হক-সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে বিভেদ-বিরোধ সৃষ্টির ব্যাপারে গোলাম মোহম্মদ-মির্জা-মোহম্মদ আলী প্রমুখেরা আপাতত সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন। আবু জাফর শামসুদ্দিনের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "ষড়যন্ত্রের রাজনীতি বড় নোংরা জিনিস। কুকুরের মত উদগীর্ণ খাদ্যও পুনরায় গিলতে হয়। বাংলায় আওয়ামী লীগকে একঘরে করার প্রয়োজন ছিল। তাই 'ট্রেটর' ফজলুল হককে কিছুকাল পরেই পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করার প্রয়োজন হলো। এ সময়ে ষড়যন্ত্রের রাজনীতির আবর্তের মধ্যে পথ হারালেন পূর্ব বঙ্গের অনেক নেতা। প্রাদেশিক আইন পরিষদে কৃষক-প্রজা পার্টির (প্রকৃতপক্ষে কৃষক-শ্রমিক পার্টির) নেতা আবু হোসেন সরকার নিজামে ইসলামীর সহযোগিতায় মন্ত্রীসভা গঠন করেন" (৬/২৭৬)। "যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া গেল। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের বড় শরিক আওয়ামী লীগ ... কোনো সুবিধা উপভোগ করিতে পারিল না। বরঞ্চ ছোট শরিক কেএসপি দৃশ্যতঃ এবং স্পষ্টতঃ সব সুবিধা লুটিতে লাগিল। ... শহীদ সাহেব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকার দরুণ আওয়ামী লীগের কোনও সুবিধা ত হইলই না, বরঞ্চ প্রতিপদে বেকায়দা হইতে লাগিল" (২/৩৫২)।

গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক গণ-পরিষদ ভেঙ্গে দেবার প্রতিবাদে গণ-পরিষদের প্রেসিডেন্ট তমিজউদ্দিন খান লাহোর চিফ কোর্টে ৯ নভেম্বর ১৯৫৪ইং তারিখে একটি মামলা করেছিলেন। ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৫ইং চিফ কোর্টের প্রদত্ত রায়ে গভর্ণর জেনারেলের কাজটি আইন বহির্ভূত এবং অবৈধ ঘোষিত হয়েছিল। তখন আইনমন্ত্রী সোহরাওয়াদীর উদ্যোগে উচ্চতর আদালতে আপিল করলে গভর্ণর জেনারেলের সিদ্ধান্তই বৈধতা পেয়েছিল। অতঃপর গভর্ণর জেনারেল জরুরী অবস্থা জারি করে নিজেকেই সংবিধান প্রণয়নের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী ঘোষণা করলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট অন্য এক মামলার রায়ে গভর্ণর জেনারেলের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণকেও বেআইনী বলে ঘোষণা করলেন। তখন আইনের পথে চলা ছাড়া গভর্ণর জেনারেলের আর কোনো উপায়

রইলো না। ২৮ মে, ১৯৫৫ইং গভর্ণর জেনারেল ঘোষণা করলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে 'প্যারিটি' মেনে ৪০ জন করে নির্বাচিত সদস্য নিয়ে সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণ-পরিষদ গঠন করা হবে।

১৯৫৫ইং জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব-বঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের ভোটে শেখ মুজিবুর রহমান গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। "Mujib was now a member of both the East Bengal Assembly and the Constituent Assembly. Working as a parliamentarian at both.....Assemblies.....he was quick to learn the rules and conventions of the parliamentary system. His long association with Suhrawardy was no doubt of great help to him in his new role" (৭/৬৬)। শেখ মুজিবুর রহমানের পার্লমেন্টারি ভূমিকা বা বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনার আগে, অপরিহার্যভাবেই আরো কিছু কথা বলা প্রয়োজন।

ধর্ম-সাম্প্রদায়িক 'পৃথক নির্বাচন' বিধান অনুসারে গণ-পরিষদে পূর্ব-বঙ্গের মুসলিম আসন ছিল ৩১টি। তার মধ্যে যুক্তফ্রন্টের বিজয় হয়েছিল ১৬ আসনে, যুক্তফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে-আসা আওয়ামী মুসলিম লীগ পেয়েছিল ১২টি আসন আর একটি করে আসনে বিজয়ী হয়েছিলেন মুসলিম লীগ, কম্যুনিস্ট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। মুসলিম লীগ থেকে বিজয়ী হয়েছিলেন মোহম্মদ আলী বগুড়া আর কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে সরদার ফজলুল করিম। বাকি নয়টি অ-মুসলিম আসনে কংগ্রেস পেয়েছিল পাঁচটি এবং তফশিলী ফেডারেশন চারটি। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়েছিল ২৬টি আসনে। সবমিলিয়ে গণপরিষদের মোট ৮০টি আসনের ২৭টি পেয়েছিল মুসলিম লীগ, অর্থাৎ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও, মুসলিম লীগই গণ-পরিষদে বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গণ-পরিষদ নির্বাচনের দল-ভিত্তিক ফলাফলে মুসলিম লীগ-কেএসপি'র মধ্যে ঐক্য-বোঝাপড়া দৃশ্যতই বেড়ে গিয়েছিল। তখন পূর্ব বাংলায় কেএসপি-দলীয় আবু হোসেন সরকার প্রধানমন্ত্রী, অথচ ফজলুল হক স্বায়ত্বশাসনসহ যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা দাবিগুলি এড়িয়ে চলছিলেন। অপরদিকে আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এবং নেতৃবৃন্দের বহুমুখী দাবিদাওয়া যথাসম্ভব সমন্বিত করেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমঝোতার লক্ষ্যে 'প্যারিটি' প্রবর্তনের উদ্যোগটি সোহরাওয়ার্দীই শুরু করেছিলেন। এমন পরিস্থিতিতেই শাসনতন্ত্র প্রণয়নের আলোচনার জন্য গণ-পরিষদের প্রথম বৈঠক ১৯৫৫ইং ৭-১৪ জুলাই পশ্চিম পাকিস্তানের মারি শৈল-শহরে অনুষ্ঠিত হযেছিল। কিন্তু তার আগে অনানুষ্ঠানিক আলোচনাতেই 'প্যারিটি'র প্রশ্নে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবে মারিতে প্রথম দু'দিনের আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর শাসনতন্ত্রের নিম্নলিখিত পাঁচ-দফাভিত্তিক (২/৩৬৪) সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১. পশ্চিম পাকিস্তানে 'এক ইউনিট',
২. 'পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন',

৩. সকল ব্যাপারে দুই অঞ্চলের মধ্যে 'সংখ্যা-সাম্য' ('প্যারিটি')
৪. 'যুক্ত নির্বাচন' এবং
৫. 'বাংলা-উর্দু রাষ্ট্রভাষা'।

উক্ত চুক্তি-নামায় "প্রধানমন্ত্রী মোহম্মদ আলী, নবাব গুরমানী (পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর) ও জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দস্তখত হওয়ার পর ... হক সাহেব দস্তখত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ... হক সাহেব শহীদ সাহেবকে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি মনে করেন না। কাজেই তাঁর সাথে তিনি পূর্ব বাংলার পক্ষে দস্তখত করতে রাযী নন। ... হক সাহেব শহীদ সাহেবকে অপদস্থ করিবার মতলবেই একথা বলিয়াছেন, এতে আমাদের কোনও সন্দেহ রহিল না" (২/৩৬৫)। এখানে পূর্বোল্লেখিত মির্জা-হক 'গোপন-সমঝোতা'র বিষয়টি স্মরণ করা যেতে পারে। তবে সোহরাওয়ার্দী তখন বিচক্ষণভাবেই পরিস্থিতি সামাল দিয়ে পূর্ব বাংলার পক্ষে আতাউর রহমান ও আবুল মনসুর আহমদকে দিয়ে চুক্তিটি স্বাক্ষর করিয়েছিলেন এবং অতঃপর স্বাক্ষর করেছিলেন ফজলুল হক। চক্রান্তের রাজনীতিতে জড়িয়ে শেরে বাংলা ফজলুল হক সোহরাওয়ার্দীকে পূর্ব বাংলার প্রতনিধিত্বকারী হিসাবে অস্বীকার করেছিলেন, অথচ অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইস্কান্দর মির্জাকে 'রাজকীয় বংশোদ্ভূত বাঙালি' বলে ঘোষণা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, সিরাজউদদৌলার আত্মীয় এবং প্রধান সেনাপতি মীরজাফরের সরাসরি উত্তরপুরুষ ছিলেন ইস্কান্দর মির্জা।

মোটামুটি এ-সময়টাতেই ষড়যন্ত্র-কুশলী গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহম্মদের হাতে গড়া মির্জা-আয়ুব-বগুড়ার প্রাসাদ ষড়যন্ত্রেই অপমানকর প্রস্থান ঘটলো তাঁর। ১৯৫৫ইং আগস্ট মাসের প্রথম দিকেই এবারের ষড়যন্ত্রীরা গোলাম মোহম্মদকে তাঁর স্বাস্থ্যগত অক্ষমতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। গভর্ণর জেনারেল হলেন ইস্কান্দর মীর্জা নিজে। আর নিজের ছেড়ে আসা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে বসালেন ফজলুল হককে। ফজলুল হকের পছন্দে মনোনীত কেএসপি'র আবু হোসেন সরকার, ক'মাস আগে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী, তাঁকে বানানো হলো পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এবারের পরিবর্তনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল সোহরাওয়ার্দীর, কিন্তু ডিফেন্স মিনিস্টার আয়ুব খানের চরম অপছন্দনীয় হওয়াতে মন্ত্রীসভাতেই স্থান পেলেন না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে আবার ফিরে এলেন চৌধুরী মোহম্মদ আলী। কেএসপি এবং কংগ্রেস ও তফসিলীদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় নতুন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ১৯৫৫ইং ১০ আগস্ট শপথ গ্রহণ করেছিল।

নতুন গভর্ণর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা পূর্বোল্লেখিত 'মারি চুক্তিপত্র'এর 'ট্রু-কপি' হিসেবে টাইপ করা এবং স্বাক্ষর-বিহীন যে কাগজটি আলোচনার জন্য উপস্থাপন (২/৩৭৭) করেছিলেন, তাতে ছিল :

১. ওয়ান ইউনিট,
২. রিজিওন্যাল অটনমি,
৩. প্যারিটি ইন রিপ্রেজেন্টেশন,

৪. জয়েন্ট ইলেক্টরেট উইথ রিজার্ভেশন ফর শিডিউল্ড কাস্ট হিন্দুজ ফর টেন ইয়ার্স এবং
৫. টু স্টেট ল্যাঙ্গুযেজেজ্ - উর্দু এন্ড বেংগলি

আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "আমরা অবাক হইলাম, প্রতিবাদ করিলাম, এটা 'মারি-চুক্তি'র ট্রু-কপি নয়, ... দুই নম্বর দফায় 'রিজিয়ন্যাল অটনমি'র আগে 'ফুল' কথা ছিল, সেটা বাদ দেওয়া হইয়াছে। তিন নম্বর দফায় প্যারিটির পরে 'ইন অল রেসপেক্টস'এর স্থলে 'ইন রিপ্রেজেন্টেশন' লেখা হইয়াছে। চার নম্বর দফায় 'উইথ রিজার্ভেশন' কথা নূতন যোগ করা হইয়াছে। এইসব পরিবর্তন কে করিল? ... স্বাক্ষরিত চুক্তি-নামায় কোনও পরিবর্তন করার অধিকার কারও নাই। ... বড়লাট মির্যা সাহেব উক্ত নকলের খাটিত্ব লইয়া আমাদের সাথে তর্ক করিলেন না। ... তফসিলী হিন্দুদের জন্য রিজার্ভেশনের প্রয়োজনীতার উপর বক্তৃতা করিলেন"। প্রসঙ্গতই স্মরণীয় যে, ঠিক একইভাবে ১৯৪০ইং লাহোর প্রস্তাবে গৃহীত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ 'স্টেটস্' কথাটি ১৯৪৬ইং দিল্লিতে মুসলিম লীগ সম্মেলনে জিন্নাহ 'স্টেট' হিসেবে পরিবর্তন করে সকলকে মানতে বাধ্য করেছিলেন। ১৯৫৫ইং সংবিধান প্রণয়নের চুক্তি-নামায় ইস্কান্দর মির্জা ঠিক সেই কায়দাটিই অনুসরণ করেছিলেন।

এবার নজর ফেরানো যাক পূর্ব বাংলার দিকে। "Abu Hossain Sarker as Chief Minister of East Pakistan ….did not have a majority in the legislature and he refused to call it into session. To shore up his position, Fazlul Huq was sent as Governor in March (1956) and the two of them, ... did their best to prolong the life of the Sarker Ministry. In order to buy the support of the legislators, Sarker restored to the practice of issuing permits for them to get rice from government godowns cheaply, which could then be sold in the open market at an exorbitant price. This officially sanctioned profiteering by legislators supporting the Sarker Ministry made the already grave food situation worse" (৭/৭২-৭৩)। অনস্বীকার্য যে, পূর্ব বাংলার চরম খাদ্য-সংকটের পরিস্থিতিতে কৃষক-প্রজা পাটি এমএলএ'দের সমর্থন ক্রয়ের উপায় হিসেবেই লাইসেন্স-পারমিট বেচা-কেনার 'রাজনীতি' শুরু করেছিল। স্মরণ করা যেতে পারে, সংসদীয় কার্যক্রমে 'ভোট কেনা-বেচার' অপ-রাজনীতি বন্ধ করার জন্যই ১৯৭২ইং রচিত বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ নং ধারায় 'ফ্লোর ক্রসিং' বা দল-বিরোধী ভোট দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

পূর্ব বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি দ্রুতই দুঃসহ হয়ে ওঠায় আবু হোসেন মন্ত্রীসভার জনপ্রিয়তা বলতে কিছুই বাকি থাকলো না। সরকারের দুঃশাসন এবং অযোগ্যতায় খাদ্য-সংকটের প্রতিবাদে ভাসানী অনশন শুরু করলেন। মুজিব ঢাকার রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করলেন। মুজিবের দাবি ছিল দু'টি : চরম খাদ্য-সংকটাপন্ন জেলাগুলিকে দুর্ভিক্ষ-এলাকা বলে ঘোষণা করতে হবে আর প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জরুরি ত্রাণ-সহায়তা প্রেরণের আহ্বান জানাতে হবে। মুজিব এবং তাঁর

সহকর্মী-সহযোগীরা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের পাশে এসে দাঁড়ালেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা থেকে বাদ পড়ে যাওয়ার পর, সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলায় এসে বিভিন্ন এলাকায় জরুরি পরিদর্শন করে স্বচক্ষে দেখা সংকটজনক খাদ্য-পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে গভর্ণর জেনারেল মীর্জাকে চিঠি লিখলেন। "Unconstitutional conduct on the part of the rulers breeds unconstitutional reaction on the part of the people" এমন প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়ে হুশিয়ারি জানালেন, গণ-বিরোধী কেএসসপি-সরকারের পতনের জন্য শীগগীরই আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে।

আবু জাফর শামসুদ্দিন তখনকার পরিস্থিতির কয়েকদিনের বিবরণে লিখেছেন : "আজ ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬। ভুখ মিছিল এলো নদীর ওপারের এবং মাতুয়াইল অঞ্চলের ... কাচারিতে হাজার হাজার লোক জমায়েত হলো। পুলিশ কাচারির বারান্দায় মিছিলকারীদের ওপর লাঠি চালাল। কয়েকজন আহত হলো। সংবাদ পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমান, মহিউদ্দিন এমএলএ, ইয়ার মোহম্মদ খান এমএলএ, আতাউর রহমান খান এমএলএ, আবুল মনসুর আহমদ এবং আমিও ঘটনাস্থলে গেলাম। মিছিলকারীরা ধ্বনি তুলছে : চাউল চাই, রেশনিং ব্যবস্থা চাই। ... ৪ঠা সেপ্টেম্বর ... গতকাল সন্ধ্যায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ধারা জারি করেছে ভুখ মিছিলের ভয়ে। ... বেলা সাড়ে এগারোটা ... খবর এলো পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর গুলি ছুড়েছে। কাজী ইদরিসকে নিয়ে ঘটনাস্থলে চকবাজারে গেলাম। তিনজনকে খুন করেছে পুলিশ। একজনের লাশ পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছে স্থানীয় জনসাধারণ ... মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান আসতেই ... জনতা সেই লাশ নিয়ে মিছিল করল। ১৫হাজারের মিছিল। ... শেখ মুজিব, ইয়ার মুহম্মদ খান লাশসহ মিছিলের পুরোভাগে। মিছিল সদরঘাটে পৌঁছতেই আবার গুলি চললো -নিহত হলো একজন এবং কয়েকজন আহত। মানুষ তবু দমে না, মিছিল তবু চলে। ... ৫সেপ্টেম্বর ... গতকাল জনতার মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার ভাব দেখেছি - করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। সোয়ারিঘাটে একটি সাধারণ লোক, ... পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে ঘেরাও লোকদের দিকে গুলি চলার পর সে বলছিল, ভাত চান, তবে যান না এগিয়ে ... এমনিতে মরতে হবে তার চেয়ে গুলি খেয়ে মরো। সে নিজেও যাচ্ছিল। ... সারাদিন তুমূল বিক্ষোভ মিছিল চললো। ... বিকেলে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে বিরাট জনসভা হলো। শেখ মুজিবও বক্তৃতা করলেন। ... ৬-৯-৫৬ আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করেছেন" (৬/২৭৬-২৭৮)।

খাদ্য-সংকট সম্পর্কে সোহরাওয়ার্দীর চিঠি এবং প্রকাশ্য বিবৃতি গভর্ণর জেনারেল মীর্জাকে যথেষ্টই দুর্ভাবনায় ফেলেছিল। ঢাকার সেনা-সদরের মাধ্যমেও তিনি নাজুক পরিস্থিতির খবর পাচ্ছিলেন, বিষয়টা আর এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না। আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে ইস্কান্দর মীর্জা পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ফজলুল হক, আবু হোসেন সরকার এবং সোহরাওয়ার্দীকে করাচিতে ডেকে পাঠালেন। এ আলোচনাতেই স্পষ্ট হলো গভর্ণর "Fazlul Huq had no option but to ask the Awami League to form a government. He invited Ataur Rahman Khan to do so immediately" (৭/৭৩)।

পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার ঃ
খাদ্য সংকট মোকাবেলা এবং ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর মতভেদ

পূর্ব বাংলায় সংকটাপন্ন খাদ্য পরিস্থিতিতে সরকার গঠনের বিষয়ে আওয়ামী লীগের ভিতরে দু'টি ভিন্ন মত ছিল। একপক্ষের মত ছিল, দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষাবস্থায় সরকার গঠন করা হবে আত্মহত্যার শামিল, কারণ এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, আওয়ামী লীগ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারবে। শেখ মুজিবসহ অন্যরা চাইছিলেন, অবশ্যই দুঃসময়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সংকটাপন্ন জনগণের পাশে দাঁড়াতে হবে, অনুকুলভাবে সরকার পরিচালনার সক্ষমতা আছে আওয়ামী লীগের। এঁদের সাহসী সিদ্ধান্তক্রমেই ৫সেপ্টেম্বর গভর্ণর ফজলুল হকের সাথে সাক্ষাতের পরদিন আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যবর্গ ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, মাহমুদ আলী (গণতন্ত্রী পার্টি) এবং কফিলউদ্দিন চৌধুরী (কেএসপি'র বিদ্রোহী সদস্য) প্রমুখ। সুতরাং এটা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে প্রকারান্তরে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাই ছিল। তখন পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ ছিল 'সরকারী দল' আর কেন্দ্রে 'বিরোধী দল'। তবে এক সপ্তাহ পরেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, তখন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সদস্য আবুল মনসুর আহমদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন।

"The Awami League government faced the food crisis with great determination. Ataur Rahman, the Chief Minister, directed his ministers to treat the food emergency as a top priority....The Awami League had passed its first test in administration with flying colours" (৭/৭৫)। শিল্প, বাণিজ্য, পল্লী-উন্নয়ন মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব অক্লান্ত উদ্যোগে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে দেশজুড়ে দলীয় নেতাকর্মীদেরকে রিলিফ কাজে সক্রিয় করে তুলেছিলেন। বার্মা থেকে দ্রুত চাল আমদানি এবং সকল দুর্গত এলাকাতে লঙ্গরখানা পরিচালনা করায় খাদ্য-পরিস্থিতির লক্ষণীয় উন্নতি ঘটছিল। অনস্বীকার্য যে, যুক্তফ্রন্টের ভেতরে কেএসপি-আওয়ামী লীগ মতবিরোধ, যুক্তফ্রন্ট থেকে আওয়ামী লীগের বেরিয়ে যাওয়া, আওয়ামী-দলীয় বেশ ক'জন এমএলএ দলত্যাগ করে কেএসপি'র পক্ষাবলম্বন এবং দেশজুড়ে নানামুখী রাজনৈতিক টানা-পড়েনের ফলে ইতোপূর্বে আওয়ামী লীগ প্রতিকুলতার মুখে পড়েছিল। কিন্তু দেশের সংকটের সময় সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার গঠন এবং খাদ্য-পরিস্থিতি মোকাবেলার দক্ষতা ও সাফল্যে হারানো জনপ্রিয়তার লক্ষণীয় পূণরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিল। ফলে পরবর্তী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাতটি আসনের উপ-নির্বাচনে ছ'টিতেই জয়ী হয়েছিল আওয়ামী লীগ।

সে-সময়টাতেই কেন্দ্রীয় সরকারে পরিবর্তনের ফলেও আওয়ামী লীগের সুবিধা হয়েছিল। পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পরদিনই গভর্ণর জেনারেল মির্জার কৌশলে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহম্মদ আলী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তখন

সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানালে তিনি সম্মত হয়েছিলেন। ইস্কান্দর মির্জার পরোক্ষ উদ্যোগে-সমর্থনে গঠিত রিপাবলিকান পার্টির সহায়তায় ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ইং সোহরাওয়ার্দী কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের কেউ কেউ এটাকে দেখেছেন সোহরাওয়ার্দীর 'মন্ত্রীত্বের প্রতি লোভ' হিসেবে আবার কেউবা বলেছেন, 'অস্বাভাবিক ঝুঁকি নেয়া'। কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ ছিল সংখ্যালঘু, তাই বিচক্ষণ পর্যবেক্ষক মানিক মিয়ার চিন্তা ছিল, ষড়যন্ত্রী-রাজনীতির পাকা খেলোয়ার মির্জা নিজের সুবিধামতই সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার পতন ঘটাতে পারবেন। এ-সব বিষয়েই সোহরাওয়ার্দী সচেতন ছিলেন এবং পাকিস্তানের গণতন্ত্র-বিরোধী শক্তির প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কাও তাঁর অজানা ছিল না। তবু পূর্ব বাংলার খাদ্য সংকটের দ্রুত সমাধান এবং যথাশীঘ্র দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যেই, নানা দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও তিনি এ দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের তিনদিনের মাথায় সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলায় এসে বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করে খাদ্য-সংকট মোকাবেলার জন্য তিন কোটি টাকার বিশেষ তহবিল মঞ্জুর করেন। ফলে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে সংকট মোকাবেলা করা অনেকটাই সহজ হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য 'প্রশংসনীয় কাজ' সম্পর্কে খোকা রায় লিখেছেন, "তিনি সংবিধান সংশোধন করে পৃথক নির্বাচন প্রথার বদলে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে যুক্ত নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন" (৪/১৬১)। তবে পাকিস্তানের দু'টি অংশের মধ্যে 'প্যারিটি' প্রতিষ্ঠা এবং মার্কি প্রভাবিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সামরিক চুক্তিতে পাকিস্তানকে জড়িয়ে ফেলার জন্য সোহরাওয়ার্দী তীব্রভাবেই সমালোচিত হয়েছেন। পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ (সংখ্যাগরিষ্ঠ কোয়ালিশন) সরকার সকল রাজবন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা করেছিল। আর কেন্দ্রের আওয়ামী লীগ (সংখ্যালঘু কোয়ালিশন) সরকার সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা বাতিল করে যুক্ত-নির্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। সব মিলিয়ে এসময় পাকিস্তানের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির লক্ষণীয় উন্নতি ঘটে।

প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আওয়ামী সরকারের সমন্বিত উদ্যোগে পূর্ব বাংলার চরম খাদ্য-সংকটের দ্রুত নিরসন হয়। বিশেষত উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে বিরুদ্ধ-পক্ষীয় কেউই আওয়ামী লীগ সরকারের অদক্ষতা কিংবা অসততার কোনো অভিযোগ আনতে পারেনি। কিন্তু অভিযোগ এনেছিলেন স্বয়ং আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী। প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণের পরেই সোহরাওয়ার্দী পূর্ব বাংলার খাদ্য পরিস্থিতি সরজমিনে যাচাই করতে এসেছিলেন, সঙ্গে এনেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আমজাদ আলী এবং বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাকে। ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সম্বর্ধনা-সভায় সভাপতি ভাসানী প্রকাশ্যেই অশোভন অভিযোগের তীর ছুঁড়েছিলেন : "the people had expected the Prime Minister to bring a planeload of foodgrain – he has brought instead a plane load of women...If he did not perform his job properly, he would be dragged down by the ear from his seat of power" (৭/৭৫)। এখানেই শেষ নয়, খাদ্য-সংকট উত্তরণে সফল প্রাদেশিক সরকারের প্রতিও

তাঁর অভিযোগ ছিল, এখনো জুয়া-খেলা, ঘোড়দৌর বন্ধ হয়নি কেন? এখনো পতিতালয়গুলি কিভাবে বাঁধাহীন চালু রয়েছে? সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্র-নীতির জন্যও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, যেক্ষেত্রে ভাসানীর কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। উল্লেখ্য যে, সে-সময় ভাসানীকে ঘিরে রাখতেন, "young leftist leaders with intellectual pretensions" (প্রাগুক্ত)।

"প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তারই উপস্থিতিতে মওলানা ভাসানীর এমন বিরূপ সমালোচনায় খুবই বিব্রত এবং মর্মাহত হন। ঐ সভায় বসেই জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, 'আমি পদত্যাগ করবো'। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর বিরোধ দানা বেঁধে উঠে। সে সময় এই দুই নেতার বিরোধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন মাত্র নেতা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা ভাসানীকে এক মঞ্চে রাখা যায়। যাতে করে এই দুই প্রতিভাবান ব্যক্তিকে ... পূর্ব পাকিস্তানের নিপীড়িত বঞ্চিত জনতার মুখপাত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। ... সোহারাওয়ার্দী যে মুহূর্তে পদত্যাগের কথা উচ্চারণ করলেন, সেই মুহূর্তেই শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'স্যার আপনাকে আমরা ছাড়ব না, ছাড়তে পারি না" (৩/৯৪)। সোহরাওয়ার্দী-ভাসানীর মনান্তরের "সুযোগ গ্রহণ করে পশ্চিম পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রী শাসক-শ্রেণী। প্রধানমন্ত্রী থাকতে হলে মওলানা ভাসানী এবং তাঁর পক্ষীয় লোকদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। অপরদিকে মওলানা ভাসানীর কাছে বিভিন্ন সূত্র মারফত বার্তা পাঠানো হয় যে, সোহরাওয়ার্দীর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করা হলে মওলানা ভাসানীর জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য বিপুল অর্থ সাহায্য করা হবে" (৬/২৮৩)। শেখ মুজিব কেমন জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝেও আপন অবস্থান এবং লক্ষ্য অবিচল রেখেছিলেন, তার উপলব্ধির জন্যই এসকল গুরুত্বপূর্ণ পার্শ্ব-প্রসঙ্গগুলি মনে রাখা দরকার।

শেখ মুজিব তখন প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় গণপরিষদের সদস্য। 'এক ইউনিট' ব্যবস্থার মূল প্রস্তাবক ছিলেন মুহম্মদ আলী বগুড়ার মন্ত্রীসভার আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু ১৯৫৫ইং ১০ আগস্ট গঠিত চৌধুরী মুহম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় সোহরাওয়ার্দীর স্থান হয়নি, অর্থাৎ গণ-পরিষদে আওয়ামী লীগ তখন বিরোধী দলে ছিল। ১৯৫৫ইং ২৫ আগস্ট গণ-পরিষদে প্রথম ভাষণেই মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানে 'এক ইউনিট' প্রবর্তনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রশ্ন তুলে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই বলেছিলেন : "Sir, they want to place the word 'East Pakistan' instead of 'East Bengal'...The word Bengal has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted.....whether they accept it ... the question of One Unit ... can come into the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One Unit with all these things. So I appeal ... allow the people to give their verdict in any way, in the form of

referendum or in the form of plebiscite. Let the people of the frontier say that they want One Unit. At the moment they say they are against it ... Similarly in Sind....If you will force it upon us...we will have to adopt unconstitutional means. You must proceed constitutionally" (৭/৬৮)।

পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক আইন সভায় পয়লা অক্টোবর ১৯৫৬ইং 'যুক্ত নির্বাচনী বিল' উপস্থাপিত হলে বিলটির সমর্থনে প্রদত্ত তাঁর 'নীতি নির্ধারণী' বক্তব্যটি সমকালীন পরিস্থিতিতে সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। শেখ মুজিব "said that the opposition move to press for separate electorates on the basis of the two nation theory, would drive the minorities to a position from where they could justifiably demand a separate homeland within Pakistan. He also regretted that the post of the head of the state in Pakistan...researved for Muslims only ... such a communal provision in the constitution might have repercussions in India, where parties like Hindu Mahasabha might ... demand reservation of the post of President of India for Hindus only. Such a movement would not be a happy one for the forty millions of Indian Muslims" (৩/৯৩)। মূলতঃ তাঁর বক্তৃতার ভিত্তিতেই পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে যুক্ত নির্বাচন বিলটি "গৃহীত হওয়ার মাধ্যমেই ... রাজনীতি থেকে পাকিস্তানের জন্মলগ্নের প্রোথিত মৌল ভাবধারা কিছুটা হলেও অন্তর্হিত হয়ে নতুন এক ভাবধারা প্রবর্তিত হয়" (প্রাগুক্ত)। উল্লেখ্য যে, "প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর প্রচেষ্টায় ১১ই অক্টোবর যুক্ত-নির্বাচন বিল জাতীয় পরিষদে উত্থাপিত হয় এবং ১২ই অক্টোবর তা গৃহীত হয়" (৪/২৯)।

শেখ মুজিবের পার্লামেন্টারি তৎপরতা সম্পর্কে এস এ করিমের পর্যবেক্ষণ - প্যারিটি, জাতীয় রাজধানী, রাষ্ট্রভাষা, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, ট্রেড-ইউনিয়ন অধিকার, পার্লামেন্ট সদস্যগণের বিশেষ সুবিধা ইত্যাদিসহ সব বিষয়েই তিনি গণ-পরিষদে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করতেন। তবে পাকিস্তানের বিদেশ-নীতি সম্পর্কে তিনি কমই বলেছেন, কারণ, এ বিষয়টি পরিষদে প্রায় আলোচিতই হতো না। আলোচ্য সবগুলি বিষয়কেই তিনি বাঙালি জনগণের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করতেন এবং ... নবীন পার্লামেন্টারিয়ান শেখ মুজিব তাঁর বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবেই উপস্থাপন করতেন (৭/৬৯)। ২৯ নভেম্বর ১৯৫৫ইং গণ-পরিষদের স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছিলেন, আইনমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সময় পরিষদ সদস্যদের 'প্রিভিলেজ' হিসাবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, পরিষদ সদস্যগণ বৃটেনের কমন্স-সভার সদস্যদের মতই 'প্রিভিলেজ' ভোগ করবেন। কমন্স-সভার কোনো সদস্যকে স্পিকারের অবগতি ছাড়া গ্রেফতার করা চলে না। কিন্তু সম্প্রতি পূর্ব বাংলার দু'জন গণ-পরিষদ সদস্য - ফজলুল করিমকে ঢাকায় এবং মাহমুদ আলীকে করাচিতে স্পিকারের অবগতি ছাড়াই গ্রেফতার করা হয়েছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গণতন্ত্রী পার্টির মাহমুদ আলী মুক্তি পেয়েছিলেন কিন্তু কম্যুনিস্ট ফজলুল করিম মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯৫৬ইং মে মাসে।

চৌধুরী মুহম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়, ১৯৫৬ইং ফেব্রুয়ারি মাসে শাসনতন্ত্র বিল গণ-পরিষদে উত্থাপন করে ২৩ মার্চ তারিখে সদস্যদের ভোটে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান'এর প্রথম শাসনতন্ত্র 'পাশ' করা হলো। শাসনতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতা, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রবর্তন, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি না মানা এবং যুক্ত-নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন না করা ইত্যাদি বিবিধ কারণে অসন্তুষ্ট আওয়ামী লীগ সেদিন গণ-পরিষদ থেকে ওয়াক আউট করেছিল। শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের দিনই গভর্ণর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জাকে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয়। "Fazlul Huq, who had cooperated with the power brokers in Pakistan during the constitution making process, was duly rewarded with the post of Governor of East Bengal. ....A big celebration was held in the Governor's house.....but the Awami League boycotted it" (৭/৭০-৭১)।

১৯৫৪ইং যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা ম্যানিফেস্টোর ১৪ নং দফায় ছিল : "জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনা বিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে" (৩/৬৮)। স্মরণীয় যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেবার পর শেখ মুজিবকে নিরাপত্তা-বন্দী হিসেবে কারাগারে আটক (৩০ মে ১৯৫৪ইং থেকে ডিসেম্বর ৩য় সপ্তাহ, ১৯৫৫ইং) রাখা হয়েছিল। মুক্তি পেয়ে কারাগারের বাইরে আসার আগে সহবন্দীদেরকে বলে এসেছিলেন, 'হয় তোমরা মুক্তি পাবা, নতুবা আবার আমি জেলে আসব'। পূর্ব বাংলার আ.লীগ মন্ত্রীসভার প্রথম বৈঠকেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে "সকল রাজনৈতিক বন্দীদেরে মুক্তি দেওয়ার এবং সমস্ত নিরাপত্তা আইন-কানুন বাতিল করিবার প্রস্তাব পাশ হইল। ... আমরা মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জেলখানায় গেলাম। বন্দীরা নিজেদের খরচায় ও উদ্যোগ-আয়োজনে জেল কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আমাদেরে আপ্যায়নের জন্য জেলখানার ভিতরে মন্ডপ রচনা করিয়াছিলেন। ... মন্ত্রীদের সাথে রাজবন্দীদের সে মিলনে কি আনন্দ ! ... প্রধানমন্ত্রী সময়োপযোগী ছোট বক্তৃতা করিলেন। জেলখানার মধ্যে পাবলিক মিটিং ... নজিরবিহীন নিশ্চয়" (২/৪০০)। আরেকটি বর্ণনায় জানা যায় : "আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতা গ্রহণের পরে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েছিল। সভা, শোভাযাত্রার উপর থেকে সব বিধিনিষেধও ... তুলে নিয়েছিল। ... ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রসার হয়েছিল" (৪/১৫৮)।

আতাউর রহমানের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় শিল্প, বাণিজ্য এবং দুর্নীতি-দমন মন্ত্রী ছিলেন দলীয় সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। মোটামুটি দেড় বছর মন্ত্রীত্ব করার পর দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রমে পূর্ণ-সময় নিয়োজিত থাকার প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। একমাত্র তিনিই সাংগঠনিক কাজকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু মুজিবের সিদ্ধান্তকে মুখ্যমন্ত্রী এবং দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান বিশেষ ভালো চোখে দেখেননি। সেকথা পরে বলা যাবে, এখানে বলা যাক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান এবং শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী শেখ

মুজিবের উদ্যোগে মাত্র এক-দেড় বছর সময়ে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কিছু কাজের কথা। "ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা, ওয়াপদা, আইডব্লিউটিএ, ফিল্ম কর্পোরেশন, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন ইত্যাদি নয়া-নয়া শিল্প ও সংস্থা স্থাপন এবং খুলনা ও নারায়ণগঞ্জ ডক-ইয়ার্ড, কাপ্তাই পানি-বিদ্যুৎ এই ধরণের আরব্ধ স্কিমগুলি ত্বরান্বিত করণ, বর্ধমান হাউসে ... বাংলা একডেমি স্থাপন ইত্যাদি গঠণমূলক কাজ তাঁরা করিয়াছেন। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা ইঁহাদের পার্লামেন্টারি সদাচার। নির্বিচারে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তিদান,নিরাপত্তা আইনসমুহ বাতিলকরণ, নিয়মিতভাবে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান, নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করার উদ্দেশ্যে অফিসারদিগকে কঠোরভাবে রাজনীতিমুক্ত রাখা, নির্ধারিত সময়ে আইন পরিষদের বৈঠক ডাকা, বিনা-বাজেট-মনযুরিতে খরচ না করা ইত্যাদি সকল ব্যাপারে আদর্শ গণতান্ত্রিক ... কাজ করিয়াছেন" (২/৫৪৩)।"দেশের অর্থনীতিকে কৃষি-নির্ভরতা থেকে শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপলব্ধি থেকেই ... বঙ্গবন্ধু ... ১৯৫৭ সালে তৎকালীণ যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী থাকা কালে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের লক্ষ্যে তদানিন্তন গণপরিষদে বিল উত্থাপন করেন। ... একই বছর ৩০মে 'পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা স্বাধীনতা উত্তরকালে 'বিসিক' নাম ধারণ করে" (সূত্রঃ জনকণ্ঠ, ১২ জুলাই, ২০১২ইং)।

পূর্ব বাংলা সরকারের, বিশেষত আতাউর রহমান এবং শেখ মুজিবের কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাদির কথা বলার পরেই আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন, "এই সর্বাংগীন সদাচারের মধ্যে চাঁদের কলঙ্কের মতই ছিল আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত বিরোধ। এই বিরোধের সবটুকুই ব্যক্তিগত ছিল না, অনেকখানিই ছিল নীতিগত। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য অনেকেই দায়ী ছিলেন। কতকগুলি নীতিগত বিরোধও দায়ী ছিল। কিন্তু সবার চেয়ে বেশী ও আশু দায়ী ছিল মুজিবুর রহমানের একগুয়েমি। ... যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়ার মূলেও ছিল মুজিবুর রহমানের কার্য-কলাপ। মুজিবুর রহমানের নিজের কথা ছিল ... পাঁচমিশালী আদর্শহীন 'ম্যারেজ-অব-কনভিনিয়েন্স' যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া আওয়ামী লীগকে প্রকৃত গণ-প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাঁচাইয়া তিনি ভালই করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অনেকের মত, আমার নিজেরও, যুক্তফ্রন্ট ভাংগিয়া তিনি পূর্ব-বাংলার বিপুল ক্ষতি করিয়াছেন। যুক্তফ্রন্ট ভাংগা যদি দোষের হইয়া থাকে তবে সে দোষের জন্য মুজিবুর রহমানই প্রধান দায়ী। ... যদি প্রশংসার কাজ হইয়া থাকে তবে সমস্ত প্রশংসা মুজিবুর রহমানের। ... তবু এর বিচারের জন্য ইতিহাসের রায়ের অপেক্ষা করিতে হইবে" (২/৫৪৩-৫৪৪)।

আজ এতকাল পরে, অনস্বীকার্য যে, ইতিহাসের রায় সর্বোতভাবেই গেছে মুজিবের পক্ষে। সেদিনের বঞ্চনার শিকার পূর্ব বাংলা হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু মুজিব সেই স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। কিন্তু তবু অতীত ইতিহাসের পুরণো পাতাগুলি খুলে দেখা দরকার কোন নীতির জোরে কাদের সাথে মুজিব পেরিয়ে এসেছিলেন তাঁর রাজনীতি সমর্পিত জীবনের সুদীর্ঘ বন্ধুর পথ। বঙ্গবন্ধু মুজিবকে সঠিকভাবে চিনে নেবার জন্য তাঁর সম্পর্কে সতীর্থ-সহযাত্রীদের সমালোচনা

এবং বিরূপতার কথাগুলিও অপরিহার্য তাৎপর্য বহন করে। একটা বিষয় অবশ্যই লক্ষণীয় যে, ১৯৫৪ইং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক পরিমন্ডলে কিছু বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়েছেন, সম্ভবত এজন্যই যে, তখন তিনি দ্রুতই অনেককে পেরিয়ে রাজনীতির মূল-মঞ্চে উঠে আসছিলেন এবং তাঁর পরিচয় দাঁড়িয়েছিল একাধারেই সংগঠক এবং নীতি-নির্ধারকের।

আতাউর রহমান এবং মুজিবুর রহমানের মতান্তর সম্পর্কে এস. এ. করিমের অন্যতর একটি পর্যবেক্ষণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শেখ মুজিবই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দলের সাংগঠনিক প্রয়োজনকে বড় মনে করে, মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। "Mujib's prestige within the Awami League ... improved considerably because of his decision to quit the Cabinet in late May (1957) in order to continue to function as the General Secretary of the party. He had been the only Cabinet Minister to resign.Chief Minister Ataur Rahman Khan was apparently not pleased with this decision of Mujib, which boosted his profile as the only Awami Leaguer in the Cabinet to put the interest of the party above all other considerations" (৭/৮০-৮১)। এক বছর পরে, ১৯৫৮ইং আওয়ামী লীগের সম্মেলনে আতাউর-মুজিব বিরোধটা প্রকাশ্য আলোচনায় উঠে এসেছিল। সাধারণ সম্পাদক মুজিব বলেছিলেন, প্রাদেশিক সরকার দল এবং জনগণের প্রত্যাশা মিটাতে পারছে না। ক্ষমতাসীন সরকার অতিমাত্রায় আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, ফলে মফস্বল এলাকার পার্টি-কর্মীরা হতাশ হচ্ছে। আগামী নির্বাচনের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হবে। অপরদিকে আতাউর রহমান বলেছিলেন, দলীয় নেতা-কর্মীদের চাপে সরকার চালাতে অসুবিধা ঘটছে। দলের প্রতি মুজিব অতি-সংবেদনশীল হয়ে পড়েছেন। "Mujib resented the remarks....and tendered his resignation as the AL General Secretary. But he was persuaded by the party leaders to withdraw his letter of resignation" (৭/৮৬-৮৭)।

পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে দ্বিধা-দ্বৈরথ ছিল শুরু থেকেই। পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন থেকেই জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির কথা বলেছে। অপরদিকে সোহরাওয়ার্দী আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন, "So long as there was an ongoing confrontation with India over Kashmir, Pakistan could not efford the luxury of following a non-aligned course internationally" (৭/৭৬)। খোকা রায় উল্লেখ করেছেন, "দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় সামরিক জোটে (সিয়াটো) পাকিস্তান যোগ দিয়েছিল ১৯৫৪ সনের ৮ সেপ্টেম্বর, ... বাগদাদ চুক্তিতে সই করেছিল ১৯৫৫সনের ২৩ সেপ্টেম্বর। ... ঐ যুদ্ধজোটে পাকিস্তানের যোগদান কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। ... মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠি বরাবরই সাম্রাজ্যবাদ ঘেঁসা ছিল। ... বিশেষতঃ কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সাথে পাকিস্তানের একটা বৈরিতা দেখা দিয়েছিল। সে অবস্থায়, পাকিস্তান প্রথম থেকেই ধনবাদী-সাম্রাজ্যবাদী

দেশগুলির সহিত বন্ধুত্বের নীতি গ্রহণ করেছিল এবং ভারতের বিরুদ্ধে 'শক্তিশালী মিত্র' লাভের জন্য মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে দহরম-মহরম শুরু করে" (৪/১৩৮)।

তবে একথাও সত্য, সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্র-নীতির যত সমালোচনাই থাক, তিনিই প্রথম পররাষ্ট্র নীতিকে, প্রধানত পূর্ব বাংলায় জনগণের পর্যায়েও আলোচনার বিষয় করে তুলেছিলেন। জোটবদ্ধ পররাষ্ট্রনীতির প্রতি সোহরাওয়ার্দীর আস্থার কারণেই সাধারণভাবে আওয়ামী লীগ এবং বিশেষভাবে শেখ মুজিবের বহু সমালোচনা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নাসের ১৯৫৬ইং সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করায় পশ্চিমা শক্তির তীব্র অসন্তোষের প্রেক্ষাপটে বৃটেন-ফ্রান্স-ইসরায়েলের ত্রি-শক্তি অক্টোবর মাসে মিশর আক্রমণ করে। ঢাকার বিক্ষুব্ধ জনতা নভেম্বর মাসের ৩ তারিখে বৃটিশ কাউন্সিল ভবনটি পুড়িয়ে দেয়। মিশরের প্রতি সংহতি প্রকাশের জন্য ৭ নভেম্বর 'মিশর দিবস' পালনের ঘোষণা দিয়ে মওলানা ভাসানী সরকারী ছুটি ঘোষণার আহ্বান জানান। "According to Oli Ahad, Mujib wanted to oppose this, but refrained from doing so because of `pressure in circumstances' and a holiday was declared" (৭/৭৬)। ১৯৫৬ইং পূর্ব বাংলায় আতাউর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ কোয়ালিশন সরকারে শেখ মুজিব ছিলেন শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রী। কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সংখ্যালঘিষ্ট কোয়ালিশনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সোহরাওয়ার্দী। অপরদিকে পূর্ব বাংলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন মওলানা ভাসানী এবং সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিব 'মিশর দিবস' পালণের বিরোধী ছিলেন, অলি আহাদের এমন মন্তব্য সত্বেও আবু জাফর শামসুদ্দিনের একটি মন্তব্য লক্ষণীয়, "আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের স্বার্থে সকল প্রকার সামরিক জোটের বিরোধী ছিল। ১৯৫৩, ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় সামরিক জোটভূক্ত হওয়ার বিরুদ্ধে যথারীতি প্রস্তাব গৃহীত হয়" (৬/২৮১)।

আবু জাফর শামসুদ্দিন লিখেছেন, "পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীরূপে শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রথম ঢাকায় আসেন ... ১৯৫৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে। ... পল্টন মাঠে এক বিরাট জনসভার আযোজন করা হয়। ... সভাপতি মওলানা ভাসানী। প্রধান বক্তা শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সভাপতির বক্তৃতায় মওলানা ভাসানী অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, আওয়ামী লীগের ম্যান্ডেট পূরণ না করলে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভাকে লাথি মেরে বিতারিত করা হবে। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখন একই মঞ্চে পাশাপাশি বসা। ... অশালীন উক্তি আমার ভালো লাগেনি। ... দেশের ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কাবোধ করেছিলাম। ... সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের আনুগত্য ছিল সন্দেহাতীত। দলে শেখ মুজিবুর রহমানের রিক্রুটদের সংখ্যাধিক্য হয়তো ছিল। কিন্তু মওলানা ভাসানীর প্রতি অনুগত কর্মীদের সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। শেষোক্তদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শে বিশ্বাসী লোকজনও ছিলেন" (৬/২৮২)। ভাসানী এ জনসভাতেই সোহরাওয়ার্দীর প্রতি আরো কিছু অশোভন উক্তি করায় অপমানিত-ক্ষুব্ধ সোহরাওয়ার্দী জনসভাতে বসেই বলেছিলেন, "আমি পদত্যাগ করবো"। শেখ মুজিবই তাৎক্ষণিকভাবে সবিনয় অনুরোধে সোহরাওয়ার্দীকে শান্ত

করেছিলেন, এসব কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রকাশ্য সভায় স্ব-দলীয় প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করে মওলানা ভাসানী কোন মহৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চেয়েছিলেন এবং পেরেছিলেন , এটা যথার্থই রাজনৈতিক গবেষণার বিষয় হতে পারে। তবে খুব সাধারণভাবেই মনে হয়, পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক পরিমন্ডলে একটা সংখ্যালঘু কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-নীতি পাল্টে দেয়া সম্ভব ছিল না। তিনি অবশ্যই পদত্যাগ করতে পারতেন, পরবর্তী সময়ে (১৮ অক্টোবর, ১৯৫৭ইং) পদত্যাগ করতেও বাধ্য হয়েছিলেন। তবে তার আগে পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তানে যথাসাধ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাদি প্রবর্তনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি পদত্যাগ করে মির্জা-বগুড়া-আইয়ুব চক্রের জন্য আগাম এবং বাড়তি ফায়দা লাভের পথ করে দিতে চাননি, একথাও অস্বীকার করা চলে না।

মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে কাগমারী সম্মেলন ঃ
আওয়ামী লীগ-ন্যাপ বিভাজন

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে মওলানা ভাসানী স্থির করেন যে, ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি কাগমারীতে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন আহ্বান করবেন। অপরদিকে, আগেই নির্ধারিত ছিল, ৭-৮ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং দলীয় সভাপতি মওলানা ভাসানীই উক্ত সম্মেলনের স্থান নির্ধারণ করেছিলেন তদানিন্তন ময়মনসিংহ (টাঙ্গাইল) জেলায় সন্তোষের কাছে অবস্থিত কাগমারী গ্রামে। দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের নির্ধারিত তারিখ নিয়ে সোহরাওয়ার্দীর মনে কিছু হলেও সংশয় ছিল, কারণ, "the date of the conference was choosen to coincide with the UN Security Council meeting on Kashmir despute : Egypt was a non-permanent member of the Council and it was a foregone conclusion that Egypt would vote against any resolution favourable to Pakistan" (৭/৭৬)।

আবু জাফর শামসুদ্দিন তাঁর 'আত্ম-স্মৃতি' (১মখন্ড) গ্রন্থে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রায় অনুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন যে শুধুই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ব্যতিক্রমধর্মী হয়ে উঠেছিল, তাই নয়, প্রায় যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন একটি গ্রামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনটির দৃশ্যমান সফলতাও সকলের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী সাহিত্যিক-শিল্পী-সংস্কৃতিসেবীদের অমন বড় মাপের সম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অব্যবহিত পূর্বগামী আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনের ওপর কোনোরকম রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির পরিকল্পিত অভিপ্রায় কারো ছিল কিনা সেটা হয়তো নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন পূর্ব বাংলার বিকাশমান জাতীতাবাদী গণতান্ত্রিক শিবিরে অনিবার্য বিভাজনের সূচনা করেছিল। তাই বঙ্গবন্ধুর জীবনের প্রাসঙ্গিকতায় কাগমারী সংস্কৃতি সম্মেলনের বিষয়টি কিছু বিস্তারিতভাবেই আলোচনার দাবি রাখে। উল্লেখ্য যে,

কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৭-৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ইং এবং আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৮ ফেব্রুয়ারি বিকাল থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি প্রায় সারা রাত ব্যাপি।

মওলানা ভাসানীর একান্ত নিজস্ব চিন্তাতেই কাগমারীতে সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। আবু জাফর শামসুদ্দিন লিখেছেন, "১৯৫৬ সালের শেষের দিকে কোনো একদিন আমরা কিছু লোক ইয়ার মোহাম্মদ খানের বাড়িতে ... মওলানা সাহেব একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন করার প্রস্তাব দিলেন। ... তিনি নিজেই আমাকে আহ্বায়ক করে একটি প্রস্তুতি কমিটি করে দেন। ... কমিটিতে অন্য সদস্যরা ছিলেন (১) কাজী মোহাম্মদ ইদরিস (২) খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস (৩) খায়রুল কবির (৪) ফকীর শাহাবুদ্দিন আহমদ (৫) ইয়ার মোহাম্মদ খান এবং (৬) সদরি ইস্পাহানী। শেষোক্ত দু'জনকে করা হয় যুগ্ম ট্রেজারার। আমরা মওলানা সাহেবকে কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালে তিনি রাজী হন। ... মওলানা সাহেব সম্মেলনকে একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পরিণত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমরা দু'রকমের পন্থা গ্রহণ করি। করাচিতে বিদেশী দূতাবাস ছিল। যার যার দেশের প্রতিনিধি পাঠাবার জন্যে আমরা ওদের কাছে অনুরোধ করে চিঠি পাঠাই। যেসকল বিদেশী সাহিত্যিক ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির ঠিকানা আমরা জানতাম, তাদের কাছে আমরা সরাসরিও চিঠি পাঠাই (৬/২৮৭-২৮৮)।

পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ সভাপতি ভাসানী কার্যত সর্বোতভাবেই সুপরিচিত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদরকে এমনকি দলীয় অফিসটিকেও দূরে রেখেই একটা বিরাট আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। 'ইত্তেহাদ' অফিসে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রাথমিক অস্থায়ি কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল, সে-সম্পর্কে কিছু তথ্য আবু জাফর শামসুদ্দিন উল্লেখ করেছেন: "বৈদেশিক নীতির প্রশ্নে যখন প্রবল মতবিরোধ চলছে, তখন উভয় পক্ষ চরম মিমাংসার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। ইতিপূর্বেই সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রদত্ত টাকায় ... তোফাজ্জল হোসেনের ... সম্পাদনায় দৈনিক 'ইত্তেফাক' প্রকাশিত হয়েছিল। দৈনিক ইত্তেফাক মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে। মওলানা ভাসানীর পক্ষে কোনো দৈনিক সংবাদপত্র ছিল না। মুসলিম লীগার এ্যাডভোকেট তোফাজ্জল আলীর ছোট ভাই ইসকান্দর আলী ... ঢাকা হতে দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পুণরায় প্রকাশ শুরু করেন। কাজী মোহাম্মদ ইদরিস সম্পাদক নিযুক্ত হন। ... পত্রিকাটি বন্ধ হওয়ার মুখে ইয়ার মোহাম্মদ খান তার নামস্বত্ব ক্রয় করেন। ... কাজী মোহাম্মদ ইদরিস সম্পাদক থাকলেন। ... 'ইত্তেহাদ' মওলানা ভাসানীকে সমর্থন করতো" (৬/২৮৩-২৮৪)।

"সম্মেলন উপলক্ষে টাংগাইল হতে কাগমারী পর্যন্ত অনেকগুলো সংবর্ধনা তোরণ নির্মিত হয়। মওলানা মোহম্মদ আলী তোরণ, মহাত্মা গান্ধী ... , সুভাষ বসু ... , চিত্তরঞ্জন দাশ ... , মওলানা শওকত আলী ... , সূর্যসেন ... , সিরজদ্দৌলা ... , ক্ষুদিরাম ... , বিধান রায় তোরণ প্রভৃতি নামের তোরণগুলোর কথা এখনো মনে পড়ে। মওলানা আজাদ তোরণও সম্ভবত তৈরী হয়েছিল" (৬/২৯২)। "Visitors coming to

Kagmari ... could not have failed to notice that the first ceremonial gate was named after President Iskander Mirza ... who, as Governor of East Bengal in 1954, had publicly threatened to shoot Bhasani, ... The man in charge of the Finance Committee was Sadri Ispahani, an industrialist friend of Iskander Mirza ... As an extremely crafty political operator, he (Mirza) could resort to any device to cause an internecine strife within the Awami League ... Iskader Mirza's ultimate target was Suhrawardy" (৭/৭৮)।

কাগমারী সম্মেলনের বিপুল ব্যয়ের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে আবু জাফর শামসুদ্দিন উল্লেখ করেছেন : "তিন দিনব্যাপী সম্মেলনে যোগদানকারী সকলের জন্যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা মওলানা সাহেব নিজেই করেছিলেন। তাঁর মুরিদান এবং ভক্তগণ গরু খাসী চাল ডাল মরিচ মসলা নিয়ে এসেছিলেন। ... ইয়ার মোহাম্মদের কাছে শুনেছি, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার কাগমারী সম্মেলনের জন্যে নাকি ৫০,০০০ টাকা দিয়েছিলেন। আতাউর রহমান তখন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। টাকাটা নাকি তাঁর কাছে এসেছিল। প্রস্তুতি কমিটির কাছে সে টাকা আসেনি। যুগ্ম ট্রেজারার সদরি ইস্পাহানি এবং ইয়ার মোহাম্মদ খান সে টাকা পেয়েছিলেন কিনা অথবা সে টাকা প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা নিজেরাই সম্মেলনের জন্য ব্যয় করেছিলেন নাকি মওলানা সাহেবকে ... দেওয়া হয়েছিল ... কিছুই অবগত ছিলাম না। সদরি ইস্পাহানি ৫০০০টাকা ব্যক্তিগত চাঁদা দিয়েছিলেন ... খায়রুল কবির পরে আমাকে জানিয়েছিলেন যে, প্রসিডেন্ট ইসকান্দর মির্জা নাকি সম্মেলনের জন্য মওলানা সাহেবকে আলাদাভাবে ২৫০০০ টাকা পাঠিয়েছিলেন। ... আমার ধারণা, টাকাটা সদরি ইস্পাহানির মারফত এসে থাকবে। আমার কাছে যে দশ হাজার টাকা মওলানা সাহেব জমা রেখেছিলেন, সেটাও নাকি সদরি ইস্পাহানি ... দিয়েছিলেন, পরে শুনেছিলাম" (৬/২৯২-২৯৩)।

উদ্যোগে-সফলতায় যথার্থই বিরাট কাগমারী সম্মেলনের মাধ্যমে মওলানা ভাসানী এবং পরিচিত বামপন্থীদের প্রকৃত কোনো উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কিনা, সেটা আদৌ স্পষ্ট নয়। তবে অব্যবহিত পূর্বগামী আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের ওপর একটা প্রবল মনস্তাত্বিক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, এ-সত্য মানতেই হয়। সম্ভবত একটা বাড়তি চাপ সৃষ্টির জন্যই মাত্র একমাস আগে, জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে "the left-wing elements both inside and outside the Awami League had organized a youth festival at Rangpur.....to rally support for a movement against the `imperialist pacts'. But if Bhashani and his leftist adhearents had hoped that they would carry the day at the Kagmari conference, they were bitterly disappointed by the outcome" (৭/৭৭)। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের "ভাড়াটে লোকজন আওয়ামী লীগ কাউন্সিলারদের ভিতর সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার প্রতিক্রিয়াশীল বিদেশনীতির পক্ষে নানাভাবে প্রচার চালিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটে পাকিস্তানের যোগদানকে যুক্তসঙ্গত বলে জাহির করার জন্য ঢাকাস্থ মার্কিন ইনফরমেশন সার্ভিস (ইউসিস) সোভিয়েত-বিরোধী কুৎসাপূর্ণ কয়েকটি চলচ্চিত্র কাগমারীতে প্রকাশ্যে

প্রদর্শনের আয়োজনও করেছিল" (৪/১৬২)। অর্থাৎ দৃশ্যতই জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রবল ডান-বাম চাপের মধ্যেই আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

কাগমারীতে ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রায় সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, পরের দিন কাউন্সিল সভার 'প্ল্যানারি সেসন'এ বিতর্কিত বৈদেশিক চুক্তিগুলির বিষয় আলোচনায় তোলা হবে না। কিন্তু কাউন্সিল-সভার উদ্বোধনী অধিবেশনে "Bhashani denounced the pacts and warned that if the central government failed to ensure autonomy to the eastern wing.....East Pakistan would be obliged to say *Assalamu Alaikum,* ... `good-bye' to Pakistan. Rhetoric aside, Bhashani took no steps to raise formally the issue of Pakistan's membershib of the military pacts (৭/৭৭)। সম্ভবত ভাসানী বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। প্রদেশে এবং কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সরকারের যথেষ্ট জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ভাসানী অবহিত ছিলেন। সুতরাং আওয়ামী লীগের মূল-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ঝুঁকি তিনি নিতে চাননি। স্মরণযোগ্য যে, কাগমারীতে (১৯৫৭ইং) পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে 'আস্ সালামু আলায়কুম' বললেও ১৯৬৩ইং সেনা-শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত জনগণকে তিনিই বলেছিলেন, "ডোন্ট ডিস্টার্ব আয়ুব'।

পূর্ব বাংলা এবং কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রিয়তার মূল রূপকার ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং 'ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া। পরবর্তী সময়ে সোহরাওয়াদী তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, "Sheikh Mujibur Rahman, one of my star organizers whose claim to prominence was because he was a good field worker in touch with both the workers and leaders in the province, and.....Manik Mian whose powerful pen swayed mass opinion through the Bengali daily, *Ittefaq,* accepted my views and supported me. Thereafter,I toured the province and obtained mass approval" (৭/৭৭)। এস এ করিমের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, সোহরাওয়ার্দীকে অধিকাংশ সময় করাচিতেই থাকতে হতো। তাই সোহরাওয়ার্দীর প্রতি মুজিব এবং মানিক মিয়ার অব্যাহত সমর্থন না থাকলে, কাগমারী সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দীকে অবমূল্যায়ন করার ব্যাপারে ভাসানী হয়তো সফল হতেও পারতেন।

কম্যুনিস্ট পার্টি উপলব্ধি করেছিল যে, কাগমারী "কাউন্সিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিদেশ নীতির সরাসরি বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব গ্রহণ না করে, '৫৩ সনের শেষে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বৈঠকে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটে পাকিস্তানের যোগদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার প্রতি পুনরায় সমর্থন জানিয়ে কাগমারী কাউন্সিল বৈঠকে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা রাজনৈতিকভাবে যুক্তিসঙ্গত হবে। তখন শোনা গিয়েছিল যে, মওলানা ভাসানী একটি প্রস্তাব আকারে বা বক্তৃতা দান কালে বিদেশ নীতি প্রসঙ্গে এরূপ একটা বক্তব্য ঐ কাউন্সিল বৈঠকে রাখবেন। ... কিন্তু মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের ঐ কাউন্সিল বৈঠকে বিদেশ নীতি সম্পর্কে কোন প্রস্তাব বা বক্তব্য পেশ করেন নাই। আওয়ামী

লীগের কাউন্সিল বৈঠকে সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিদেশ নীতির পক্ষে বা বিপক্ষে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই" (৪/১৬৩)।

দৃশ্যতই মনে হয়, অনুগত বামপন্থী তাত্বিকদের সমর্থন-সহায়তায় কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে এবং আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে সোহরাওয়ার্দীকে অবমূল্যায়ন কিংবা পাকিস্তানের পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্তন, কোনো দিক থেকেই মওলানা ভাসানী সফল হতে পারেননি। তবে কাগমারী কাউন্সিল অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণেও তিনি রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতার বাইরে গিয়েই ব্যক্তিগত কটাক্ষে সোহরাওয়ার্দীকে বিব্রত করেছিলেন। বক্তৃতার এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে ভাসানী বলেছিলেন, "আপনারা যারা দলের মেরুদণ্ড, গরীবের রক্ত জল করে যারা দল গড়েছেন, তারা বড় না এই ভদ্রলোকটি বড়? আপনারা শহীদকে প্রধানমন্ত্রী করেছেন, তাই শহীদ আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আপনারা পেছন থেকে সরে গেলে এ ভদ্রলোককেও সরে যেতে হবে। তাই আপনাদের নির্দেশ, পার্টির সদস্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে মানতেই হবে" (৩/৯৫)। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের বা পাকিস্তান সরকারের বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত কোনো সুস্পষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন না করলেও দলীয় নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয়টাকে ভাসানী সামনে তুলে এনেছিলেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কাগমারী আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পাকিস্তান, ভারত, বৃটেন, আমেরিকা, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশের জ্ঞানী-গুণীজনেরা ছিলেন। অথচ সম্মেলনের পরেই, করাচির 'ডন' এবং ঢাকার 'আজাদ' পত্রিকায় "মওলানা ভাসানী এবং সম্মেলনের বিরুদ্ধে দ্বিখন্ডিত বাংলাকে যুক্ত বাংলা করার অভিযোগ উত্থাপিত হলো ... প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সাহেব করাচি ফিরে ১৫ ফেব্রয়ারি তারিখে এক সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খন্ডন করলেন। দৈনিক 'ইত্তেহাদ' (ভাসানী সমর্থক) পত্রিকায় ১৯৫৭ সালের ১৬ই ফেব্রয়ারি ... পূর্ণ বিবৃতিটি ছাপা হয়" (৬/২৯৬)। সোহরাওয়ার্দীর মূল কথাটি ছিল "মওলানা ভাসানী কখনই পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি প্রদান করেন নাই"। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, বারা বার স্থূলভাবেই রাজনৈতিক কটাক্ষ-অপমানের শিকার হলেও সোহরাওয়ার্দী কখনো ভাসানীর প্রতি রাজনৈতিক দায়িত্ব এবং সৌজন্য-শোভনতা এড়িয়ে যাননি।

ইস্কান্দর মির্জার এজেন্টরা সোহরাওয়ার্দী এবং ভাসানী- উভয়ের সাথে সর্বদাই প্রকাশ্য এবং গোপণ যোগসূত্র রক্ষা করে চলছিল। কাগমারী সম্মেলনের আহ্বায়ক আবু জাফর শামসুদ্দিন অনেক বছর পরে একটি তাৎপর্যবহ মন্তব্য করেছিলেন, "সম্মেলন শেষ হওয়ার পর বিষয়টা নিয়ে ভেবেছি। নানা সূত্র থেকে অনেক তথ্য কানে এসেছে। সম্মেলন পরবর্তী ঘটনাবলীও দেখেছি। আজ নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, ভাসানী সোহরাওয়ার্দী উভয় গ্রপের মধ্যে শত্রুপক্ষের এজেন্ট ছিল। ওরা ... ডবল এজেন্টের কাজ করেছিল। অবশ্য কিছু কিছু সৎ অতি-উৎসাহী কর্মীও ছিলেন। যারা কোন সময় কতটা অগ্রসর হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সজাগ ছিলেন না" (৬/২৯৭)। কাগমারী সম্মেলনের 'ব্যর্থতা' ভাসানীকে যথার্থই ত্যক্ত-বিরক্ত করেছিল। বিষয়টা উপলব্ধি করে

মুজিব চিন্তিত ছিলেন, ভাসানী এমন কিছু করে বা বলে ফেলতে পারেন, যাতে পরিণামে দল ক্ষতিগ্রস্থ হবে, এমনকি আসন্ন ২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচীও বিঘ্নিত হতে পারে। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মুজিব ১৬ ফেব্রুয়ারি ভাসানীর সাথে সাক্ষাৎ করতে তাঁর সন্তোষের বাড়িতে গিয়ে, 'হুজুর' সম্বোধন করে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কিন্তু স্থায়ি সুফল মেলেনি। শহীদ দিবসের (২১ ফেব্রুয়ারি) পরেই অলি আহাদ তৎপর হয়ে ভাসানীকে বুঝাতে পেরেছিলেন যে, "It was Mujib's control of the party apparatus as General Secretary that was largely to blame for the rout of the Bhashani camp at Kagmari. Once Mujib was removed from his position as General Secretary, the Bhashani faction would be able to regain the initiative and fight with renewed strength for their objectives" (৭/৭৯)।

উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের গঠণতন্ত্রের বিধান ছিল, একই সাথে কেউ দলের নির্বাহী কমিটি এবং মন্ত্রীসভার সদস্য হতে পারবে না। আতাউর রহমান এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকেই দলীয় বিধান লঙ্ঘণ করে উভয় পদে নিয়োজিত ছিলেন। এখন শুধু তাঁদেরকে নিজ পছন্দে যেকোনো একটি পদ বেছে নেবার কথা বলা দরকার। অলি আহাদ নিঃসংশয় ছিলেন যে, মুজিব সাধারণ সম্পাদকের পদ ছেড়েই মন্ত্রীত্ব করবেন। সেই পদটি তখন সহজেই অলি আহাদ পেয়ে যাবেন। ভাসানীকে নিজের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে অলি আহাদ ৬-১৭মার্চ,১৯৫৭ইং দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করে দলীয় সভায় সোহরাওয়ার্দীর বৈদেশিক নীতি এবং মন্ত্রীদের দুর্নীতি সম্পর্কে প্রচারণা চালিয়ে ফিরে এলেন। ভাসানীর সাথে দেখা করতে গিয়েই অলি আহাদ জেনে বিস্মিত হলেন যে, ভাসানী ইতোমধ্যে দলীয় সভাপতি হিসেবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। "Bhashani handed him a resignation letter addressed to the General Secretary, but oddly enough, asked him to deliver it to Zahur Hossain Choudhury, the editor of the daily *Sangbad,* a supporter of Bhashani" (৭/৮০)।

"আওয়ামী লীগের মধ্যে অন্তর্বিরোধ জমাট বাঁধিয়া উঠিল। প্রেসিডেন্ট (সভাপতি) মওলানা ভাসানীর সাথে বাহ্যতঃ এবং প্রধানতঃ বৈদেশিক নীতি লইয়া ভিতরে-ভিতরে বিরোধ ছিলই। কাগমারী আওয়ামী লীগ সম্মেলনে এই বিরোধ উপরে ভাসিয়া উঠে। আতাউর রহমান মন্ত্রীসভার প্রতিও মওলানা সাহেব বিরূপ হইয়া উঠেন। বিভিন্ন সভা-সমিতেতে তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিতেন যে, আতাউর রহমান মন্ত্রীসভা ২১-দফার খেলাফ কাজ করিতেছেন। কথাটা সত্য ছিল না। ... মওলানা সাহেব স্বভাবতঃই সরকার-বিরোধী মনোভাবের লোক বলিয়া মাত্রা-ছাড়া ভাবে তিনি নিজের দলের সরকারের নিন্দা করিতেন। তাতে আতাউর রহমান সাহেব ত অসন্তুষ্ট হইতেনই শহীদ সাহেবও হইতেন। ... এই বিরোধে ইন্ধন যোগাইবার লোকেরও অভাব ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে ... এক শ একজন একশ এক উপলক্ষে উহা বাড়াইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কেন্দ্রে যিনি এটা করিতেন, তিনি একাই একশ। ইনি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা" (২/৪৮৭-৪৮৮)।

এসময় প্রেসিডেন্ট মির্জা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করার জন্য প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলায় এবং কেন্দ্রে যখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন, তখন পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ সভাপতিকে গ্রেফতার করিয়ে দলটিতে চূড়ান্ত বিভেদ-ভাঙ্গন ধরানোই ছিল মির্জার লক্ষ্য। আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "মির্জা শহীদ সাহেবকে দিয়া মওলানাকে আক্রমণ করাইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি মওলানাকে দিয়া শহীদ সাহেবকে আক্রমণ করাইবার আয়োজন করিলেন। ... হঠাৎ মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতির পদে ইস্তাফা দিলেন। মওলানা সাহেবের ঘনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত দুইজন আওয়ামী-নেতা একজন পূর্ব-পাকিস্তানী শিল্পপতিসহ ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্টের (দলীয় সভাপতি, মওলানা ভাসানী) সাথে দেখা করিয়া গিয়াছেন। ... মওলানা সাহব মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই ফেলিয়াছিলেন যে, হয় তিনি সোহরাওয়ার্দী-হীন আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব করিবেন, নয় ত তিনি আলাদা পার্টি করিবেন।" (২/৪৯০-৪৯১)।

মওলানা ভাসানী "পদত্যাগের ঘোষণাটি করিয়াছিলেন নযিরবিহীন গোপণীয়তার সাথে। ... আতাউর রহমান-মুজিবুর রহমান কাউকে না দেখাইয়া বামপন্থী খবরের কাগজে পৌঁছাইয়া দিবার ওয়াদা করাইয়া তিনি উহা মিঃ অলি আহাদের হাতে দেন। মিঃ অলি আহাদ সরল বিশ্বস্ততার সাথে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেন। একাজে তিনি মওলানা সাহেবের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য দেখাইয়া থাকিলেও প্রাতিষ্ঠানিক আনুগত্য ভংগ করিয়াছেন, এই অপরাধে মিঃ অলি আহাদকে সাসপেন্ড (৩১ মে, ১৯৫৭ইং) করা হয়। প্রতিবাদে ৯জন ওয়ার্কিং কমিটি মেম্বর পদত্যাগ করেন। ... মওলানা সাহব তখন হাসপাতালে। আমিও। ... প্রধানত আমারই প্রস্তাবে মওলানা সাহেবকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিয়া (ওয়ার্কিং ও পার্লামেন্টারি কমিটির যৌথ বৈঠকে) সর্ব-সম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কখনো আমি ও মুজিবুর রহমান একত্রে, কখনো আমি একা মওলানা সাহেবকে ইস্তাফা প্রত্যাহারের অনুরোধ-উপরোধ করি। পদত্যাগী ওয়ার্কিং কমিটি মেম্বরদের এবং মিঃ অলি আহাদ সম্পর্কে মওলানার ইচ্ছা মত কাজ হইবে, এ আশ্বাসও আমরা দেই। কিন্তু মওলানা অটল। যা হয় কাউন্সিল মিটিংএ হইবে, এই তাঁর শেষ কথা" (২/৪৯১-৪৯২)।

কাগমারী সম্মেলনের পরে মওলানা ভাসানী বগুড়াতে এক কৃষক সম্মেলনে বলেন যে, "পূর্ব পাকিস্তানে কৃষকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এদের ভোটেই বর্তমান সরকার নির্বাচিত হয়েছে, অতএব যদি খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বাড়ে, তাহলে ১লা জুন তারিখ থেকে আমি অনশন শুরু করবো"। ১লা জুন থেকেই মওলানা ভাসানী দুর্ভিক্ষ ও অভাবের জন্য আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে অনশন শুরু করেছিলেন। দলের এই ভারসাম্যহীন পরিস্থিতিতে ৫ই জুন তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, ১৩-১৪ জুন ঢাকায় আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হবে। বর্ধিত সভায় দলীয় সভাপতির ক্ষমতা-হ্রাস, ২৫ জন নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা এবং দলীয় গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রস্তাব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। "এ

পর্যায়ে মওলানা ভাসানী দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে অবহিত করেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বিদেশী শক্তির সাথে গাঁটছড়া বেঁধে দলের আদর্শকে বার বার লংঘন করে চলেছে। সে কারণে তিনি সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করবেন এবং নিজের পথে নিজেই চলবেন, তাতে ফল যাই হোক" (৩/৯৬)।

"কাউন্সিল মিটিং-এ তিনি (ভাসানী) জয়লাভ করিবেন, এটা তিনি আশা করিলেও নিশ্চিত ছিলেন না। সেজন্য আগেই তিনি মিয়া ইফতিখারুদ্দিন ও জি এম সৈয়দ প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানী বামপন্থী নেতৃবৃন্দ ও শহীদ সাহেব কর্তৃক বিতাড়িত সাবেক আওয়ামী লীগ (নিখিল পাকিস্তান) সেক্রেটারি মিঃ মাহমুদুল হক ওসমানীর সাথে গোপন পরামর্শ করিতে থাকেন। ... একদিন হাসপাতালে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা ... মওলানা সাহেবের সাথে পরামর্শ করিয়া গিয়াছেন। এটা চলে পর-পর কয়দিন" (২/৪৯২)। "At this special conference, held in Dhaka in mid-June (13-14th) 1957, both Suhrwardy and Bhashani spoke at length about their ideas on foreign policy. The conference approved Suhrwardy's foreign policy by an overwhelming majority.This did not satisfy Bhashani and he insisted upon another vote. This time Surhwardy won by a much greater margin of votes : 800 to 35" (৭/৮০)। তখন কাউন্সিলারদের ওপর মুজিবের বিপুল প্রভাব ছিল, কারণ, মাত্র সপ্তাহ দুয়েক আগে সার্বক্ষণিকভাবে দলীয় সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন।

"কাউন্সিল মওলানাকে ইস্তাফা প্রত্যাহারের অনুরোধ করেন। মওলানা তদুত্তরে ন্যাপ গঠন করেন। ন্যাপ গঠনে প্রেসিডেন্ট মির্জার হাত ছিল, এতে আমার কোনও সন্দেহ নাই" (২/৪৯২)। ভাসানী অনুগত অলি আহাদও পরবর্তী সময়ে মন্তব্য করেছেন, "Around that time he (Bhashani) was so full of rage against Suhrwardy that it blotted out all reason and he succumbed to an amorous embrace with Iskander Mirza. And because of this he did not hesitate to take one disastrous step after another. This is how the split in the Awami League was brought about" (৭/৭৮-৭৯)। এভাবেই সর্বাধিক গণ-ভিত্তিসম্পন্ন দলটি বিভক্ত হয়ে মূল-ধারাটি রইলো আওয়ামী লীগ নামেই আর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন অংশটি পরিচিত হলো 'ন্যাপ' (National Awami Party – NAP) নামে। ইতিহাসের ধারাপথ বেয়ে আওয়ামী লীগ এখনো এদেশের মূলধারার অগ্রসরমান রাজনৈতিক শক্তি আর ক্রমাগত বিভক্তি-বিচ্ছিনতায় 'ন্যাপ' হারিয়ে গেছে বলাটাই যথার্থ। তবু প্রশ্ন জাগতেই পারে : আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব কি সেদিন যথোচিত ভূমিকা পালন করেছিলেন, নাকি রাজনৈতিক ভ্রান্তি-বিচ্যুতি ছিল তাঁর ভূমিকাতেও?

আওয়ামী লীগের ভিতরেই "লক্ষ্যাদর্শের সংঘাত ছিল। মওলানা ভাসানীর সংগে ছিলেন সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যাদর্শে বিশ্বাসী কিছু যুবকর্মী। অবশ্য ভন্ড সমাজতন্ত্রীদেরও অনেকে স্থান করে নিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দী সাহেব ছিলেন বৃটিশ-টাইপ পুঁজিবাদী

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ... আওয়ামী লীগের ভাঙ্গন এবং ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টির উদ্ভবের মধ্যে ছদ্মবেশী মোনাফেকদেরও বড় রকমের ভূমিকা ছিল। ... অবশ্য ইতিহাসের বিধান এড়ানো যেতো না। মত ও পথের মেরুকরণ ১৯৪৮ সালেই শুরু হয়" (৬/২৯৭-২৯৮)। বামপন্থী রাজনীতির দোহাই দিয়ে গঠিত 'ন্যাপ' (জুন, ১৯৫৭ইং) এক বছর পরেই ডানপন্থীদের সাথে মিলে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভার পতন ঘটাতে পেরেছিল। "১৯৫৮সনের জুন মাসে কে.এস.পি. নেতা আবু হোসেন সরকার পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দিয়েছিলেন। সেই সময় ঢাকাতে মওলানা ভাসানী, খান আব্দুল গফ্ফার খান, জি.এম. সৈয়দ প্রমুখদের উপস্থিতিতে ন্যাপের ... বৈঠক হতে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে ... ভোট দেওয়ার জন্য আইন সভার ন্যাপ সদস্যদের প্রতি এক নির্দেশ জারি করা হয়েছিল। ... কেএসপি, নেজামে ইসলাম, মুসলিম লীগ জোট এবং তার সাথে আইন সভার ন্যাপ সদস্যদের ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। ইস্কান্দর মির্জার চক্রান্তে (পূর্ব বাংলায়) আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছিল। ১৯৫৮ সালের ১৯শে জুন পূর্ব পাকিস্তানে আবার গণ-বিরোধী আবু হোসেন সরকার মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় বসেছিল" (৪/১৬৮)। উল্লেখ্য যে অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটাভুটিতে আতাউর রহমান মন্ত্রীসভার পক্ষে ছিল ১২৪টি ভোট আর বিপক্ষে ১৩৬টি, অর্থাৎ ১২টি ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছিল।

আতাউর রহমান মন্ত্রীসভার পতনের পরেই কম্যুনিস্ট পার্টি উপলব্ধি করে যে, পার্টির বিচারে আওয়ামী-রাজনীতির কিছু নেতিবাচকতা থাকা সত্বেও ইতিবাচক রাজনৈতিক অবদান অনস্বীকার্য। খোকা রায় লিখেছেন, "আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারী শাসন-প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচন বানচাল করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার চক্রান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ... পূর্ব পাকিস্তানে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রসার করেছিল এবং সারা পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল। ... আওয়ামী লীগ ছিল প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্তের দল। ... বস্তুনিষ্ঠভাবে জনস্বার্থের অনুকুল ছিল। ... কম্যুনিস্ট পার্টি তখন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা কায়েম থাকা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেছিল। তাই মন্ত্রীসভার পতনের পরেই ... কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী ... কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সাথে এক বৈঠকে ... আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভাকে আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। ... সে সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরপর ২১জুন তারিখে প্রাদেশিক আইনসভায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবু হোসেন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে এক অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছিল" (৪/১৬৯-১৭০)। তাতেই মাত্র দু'দিনের মাথায় আবু হোসেন মন্ত্রীসভার পতন ঘটেছিল। অপরদিকে কেএসপি'র উদ্যোগে পূর্ব বাংলায় আতাউর রহমানের মন্ত্রীসভার পতন ঘটানোয় ক্ষুব্ধ সোহরাওয়ার্দী সঙ্গে-সঙ্গেই পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহারের চাপ প্রয়োগ করায়, নুন পূর্ব বাংলার গভর্ণর পদ থেকে ফজলুল হককে সরিয়ে হামিদ আলীকে গভর্ণর বানিয়েছিলেন।

"প্রকৃতপক্ষে প্রাদেশিক আইনসভার ২১/২২জন কম্যুনিস্ট সদস্যদের ভোটেই আবু হোসেন মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে পাল্লাটা ভারী হয়ে গিয়েছিল। ... পূর্ব পাকিস্তানে আবার আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা কায়েম হয়েছিল (প্রাগুক্ত)। লক্ষণীয় যে, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং পূর্ব বাংলার জন্য আওয়ামী লীগ-রাজনীতির অপরিহার্যতার দিকটা সুপরিচিত প্রগতিশীলেরা কখনো উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন আবার দ্রুতই যথার্থ উপলব্ধিতে ফিরেছেন। কিন্তু তাতেই, প্রকাশ্য রাজনীতির মঞ্চে টালমাটাল ঘটে গেছে। দলীয় সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব কখনো দল ভাংতে চাননি, ভেঙ্গে গেলেও ঐক্য-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, জোড়াতালির বা সুবিধাবাদিতার ঐক্য বিশ্বাস ছিল না তাঁর। মুজিবের বিশ্বাস ছিল সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মসূচীর ঐক্যে এবং শুরু থেকেই তিনি দৃঢ়-সংবদ্ধ একটি ঐক্যবদ্ধ দল গড়তে চেয়েছেন।

আওযামী লীগ-ন্যাপ বিভাজন সম্পর্কে কেউ বলেন, এটা ছিল ভিন্নমুখী রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত, আর কেউ এজন্য দায়ি করেন মুজিকেই। যদিও "Mujib had always kept his line of communication open with Maulana Bhashani, for whom he had considerable respect. For his part, Bhashani had always shown fondness towards Mujib and had even referred him publicly as his 'son'. Mujib felt that Bhashani's heart was in the right place, on the side of the oppressed peasantry and workers, and if he occasionally slipped into a wrong track, it was mostly due to the counsel from his young advisers. Mujib called them 'Theoriticians' ... Barely had Bhashani returned (from tour of Egypt) to Dhaka on 11 sept. (1957) he issued a public rebuke to Suhrwardy and promised that `in no time his name would be obliterated' ... Mujib persisted nevertheless, with Surhwardy's blessing. Mujib's initiative paid off. In mid-September not only Bhashani, on be half of NAP, but Mahmud Ali of the leftist Ganatantri Dal, announced that they were in accord with the Awami League on all basic issues" (৭/৮৮)। এখানে প্রসঙ্গতই মূল আলোচনা মূলতুবি রেখে, শেখ মুজিব সম্পর্কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দীর বিভিন্ন সময়ের কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করলে, মতভেদ-মতান্তর সত্বেও মুজিবের রাজনৈতিক অবস্থান এবং তাঁদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটা উপলব্ধি করার সহায়ক হতে পারে।

শেখ মুজিব এবং হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী ঃ
পারস্পরিক আস্থা ও মূল্যায়ন

১৯৫৩ সাল, শেরে বাংলা ফজলুল হক সরকারী এ্যাডভোকেট জেনারেলের চাকুরি ছেড়ে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার উদ্যোগ নিয়ে নুরুল আমিনের কাছে পরাজিত হন, তখনও নতুন দল কৃষক-শ্রমিক

পার্টি গঠন করেননি। শোনা যাচ্ছিল, তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দিতে পারেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "আমি হক সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে আওয়ামী লীগে যোগদান করতে অনুরোধ করলাম। চাঁদপুরে আওয়ামী লীগের এক জনসভায় তিনি যোগদানও করলেন। সেখানে ঘোষণা করলেন, 'যারা চুরি করবেন, তাঁরা মুসলিম লীগে থাকুন। আর যারা ভাল কাজ করবেন তাঁরা আওয়ামী লীগে যোগদান করুন'। আমাকে ধরে জনসভায় বললেন, 'মুজিব যা বলে তা আপনারা শুনুন। আমি বেশি বক্তৃতা করতে পারব না, বুড়া মানুষ'। এ বক্তৃতা খবরের কাগজেও উঠেছিল" (৮/২৪৪)।

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ের পর, শেরে বাংলার নেতৃত্বে সম্প্রসারিত মন্ত্রীসভা গঠনের সময়কার বর্ণনায় বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "আওয়ামী লীগারদের যেন ভাল দপ্তর দেওয়া না হয, সে চেষ্টা চলছে। এক মহা বিপদে পড়া গেল। ... আমি হক সাহেবের কাছে আবার হাজির হয়ে বললাম, 'নানা, ব্যাপার কি? এ সমস্ত কি হচ্ছে, আমরা তো মন্ত্রী হতে চাই নাই। আমাদের ভিতরে এনে এ সমস্ত ষড়যন্ত্র চলছে কেন'? তিনি ... বললেন, 'করবার দে, আমার পোর্টফলিও তোকে দিয়ে দেব, তুই রাগ করিস না, পরে সব ঠিক করে দেব'। বৃদ্ধলোক, তাঁকে আর কি বলব, তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতে শুরু করেছেন। দরকার না হলেও আমাকে ডেকে পাঠাতেন। তিনি খবরের কাগজের প্রতিনিধিদের বলেছেন, 'আমি বুড়া আর মুজিব গুড়া, তাই ওর আমি নানা, ও আমার নাতি'। ... তিনি আমাকে যে কাজই করতে বলতেন, আমি করতে লাগলাম। তাঁর মনটা উদার ছিল, যে কারণে তাঁকে আমি ভক্তি করতে শুরু করলাম। ষড়যন্ত্রকারীরা যখন তাঁর কাছে না থাকত তখন তিনি উদার ও অমায়িক" (৮/২৬৭)।

এবার মওলানা ভাসানীর কথা। জ্যেতি সেন 'ইক্লিপস্ অব পাকিস্তান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "মওলানা ভাসানী দুর্নীতিমুক্ত যুব সমাজের মধ্য থেকে জনপ্রিয় নেতৃত্ব গঠনের কাজে ব্রতী হয়েছেন। মওলানা শেখ মুজিবুর রহমান নামে একজন ছাত্রনেতার উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। ... আশা প্রকাশ করেছিলেন, আমার মুজিবুর যখন পরিপূর্ণ মানুষ হবে তখনই পাকিস্তানের অগ্রগতি হবে" (৩/৫৭)। তিনি মন্তব্যটি করেছিলেন, ১৯৪৯ইং আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন বা অব্যবহিত পরিবর্তী সময়ে। প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের সময় (১৯৬৯ইং) পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, "আমার তিনটি সন্তানের চাইতেও মুজিবুর উত্তম। মুজিবুর মিয়ার যদি কিছু হয়, তবে পাকিস্তান বলো আর যাই বলো কিছুই থাকবে না" (প্রাগুক্ত)। এসময় 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিব ঢাকা কেন্টনমেন্টে বন্দী ছিলেন। ১৯৭১ইং ৯ মার্চ, বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে উত্তাল পূর্ব বাংলা। ভাসানী বিবৃতিতে বললেন, "আপোসের আর কোনো পথ খোলা নেই। শেখ মজিবরের প্রতি বাঙালিরা আস্থা রাখুন। মজিবর তুমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দরকার নেই, তুমি ৭ কোটি বাঙালির বীর নেতা হিসাবে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনো" (১(৩)/১২৫১)।

আবুল মনসুর আহমদ বিভিন্ন প্রসঙ্গেই, কটাক্ষ-ক্ষোভ মিশিয়ে, শেখ মুজিবের উল্লেখ করেছেন সোহরাওয়ার্দীর প্রিয়পাত্র হিসেবে। তিনি সোহরাওয়ার্দীর 'প্রিয়পাত্র মুজিব' আর শেরে বাংলার 'প্রিয়পাত্র নান্না মিয়ার' মধ্যে একটা নেতিবাচক সরল

সমীকরণও টেনেছেন। ১৯৫৪ইং যুক্তফ্রন্টের প্রথম মন্ত্রীসভা গঠনের সময় হক-সোহরাওয়ার্দী টানা-পড়েনের প্রসঙ্গটির বর্ণনায় তিনি লিখেছেন, "মন্ত্রীসভা গঠন লইয়া হক সাহেবের সাথে শহীদ সাহেব ও ভাসানী সাহেবের মতান্তর হইল। এই মতান্তর শুধু দুর্ভাগ্যজনক ছিল না, লজ্জাজনকও ছিল। ... এটা ছিল নিছক যিদাযিদির ব্যাপার" (২/৩৩৩)। এমন পর্যবেক্ষণের রাজনৈতিক যথার্থতার প্রশ্নটি এখানে আলোচ্য নয়। তবে শেখ মুজিব যখন গোপালগঞ্জে সোহরাওয়ার্দীর প্রথম সান্নিধ্যে এসেছিলেন (১৯৩৭ইং) তখন থেকে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু (১৯৬৩ইং) পর্যন্তই প্রিয়পাত্র ছিলেন মুজিব, এ-সত্য অনস্বীকার্য।

১৯৫৭ইং মওলানা ভাসানীর উদ্যোগে আয়োজিত কাগমারী সম্মেলনের পরবর্তী সময়ে সোহরাওয়ার্দী তঁর স্মৃতিকথায় শেখ মুজিবকে 'one of my star organizers' হিসেবে সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। ১৯৫৭ইং মাঝামঝি থেকে মির্জা-বগুড়া-আয়ুব চক্র সোহরাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অপসারণের নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সংখ্যালঘিষ্ঠ আওয়ামী লীগের সাথে ইস্কান্দর মির্জার সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান পার্টির কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ছিল কেন্দ্রীয় ক্ষমতায়। রিপাবলিকান পার্টি তখন মওলানা ভাসানীর নবগঠিত ন্যাপের সাথে সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দীর প্রবর্তিত পররাষ্ট্র নীতি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক-ইউনিট ব্যবস্থার সমালোচনা শুরু করায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দীর অবস্থান যথার্থই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে শেরে বাংলার কেএসপি'র নান্না মিয়া এবং মোহন মিয়া প্রমুখ আওয়ামী লীগের সাথে নিঃশর্ত সহযোগিতার প্রস্তাব করলে স্বাভাবিকভাবেই সোহরাওয়াদী আগ্রহী হয়েছিলেন। করাচিতে কেএসপি-আওয়ামী লীগ সহযোগিতার খসড়া চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চুক্তি চুড়ান্ত হয়নি। ঢাকার 'মর্নিং নিউজ' জানিয়েছিল, "the draft that had been prepared for Suhrawardy had not been approved by Abul Mansur Ahmed and Sheikh Mujibur Rahaman and that Sheikh Mujib had snatched the statement from Suhrawardy's hand and torn it to pieces. Shaheed Sahib had left that night for Japan" (৭/৮২)। শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরেই পত্রিকার রিপোর্টটিকে চরম অসত্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। তথাপি প্রশ্ন করা যেতেই পারে, এমন অভিযোগ কি আসলেই সত্য ছিল? 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' নামক গ্রন্থে আবুল মনসুর আহমদ তৎকালীণ রাজনীতির অনুপুঙ্খ বিবরণ দিলেও এমন কোনো ঘটনা আদৌ উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত, নান্না মিয়া ঢাকায় ফিরেই অমন কোনো ঘটনার উল্লেখ ছাড়াই জানিয়েছিলেন, "talks would continue"। অপরদিকে জাপান সফর শেষে সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় ফিরে কেএসপি-আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়েই সহযোগিতার আলোচনা শুরু করেছিলেন। তখন তিনি মুজিবকে সাথে নিয়ে সিলেট, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি শহরে রাজনৈতিক সফরে গিয়েছিলেন।

সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় ফেরার পর, আতাউর রহমান, আবুল মনসুর আহমদসহ অপরাপর নেতৃবৃন্দসহ মুখ্যমন্ত্রীর পলিটিক্যাল সেক্রেটারি জমিরুদ্দিনের বাসায় এক

বৈঠকে বসেছিলেন। মানিক মিয়া লিখেছেন, তিনি জানতেন না, মুজিব এ বৈঠকটি সম্পর্কে আগে থেকে অবহিত ছিলেন কিনা। আকস্মিকভাবেই মুজিব সেখানে এসে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। সভার নীরবতা ভঙ্গ করে সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, "My own party people are opposed to this and I can't make up my mind. Having said this, he proceeded to his car to go to (Dhaka Airport enroute to) Karachi" (৭/৮৩)। গাড়িতে মানিক মিয়াকে সোহরাওয়ার্দী বলেছিলেন, "I am just fed up with bickering within the party. এখন যা হয় হোক, আমি প্রধানমন্ত্রীত্বের প্রতি সকল আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি"। শুধু শেখ মুজিব নন, ঢাকার বাইরের নেতাকর্মীরাও কেএসপি-আওয়ামী লীগ সহযোগিতার বিষয়ে আপত্তি করেছিলেন। আবু জাফর শামসুদ্দিনের পর্যবেক্ষণ, "আওয়ামী লীগ কখনই ন্যাপের সঙ্গে ইলেকশনের ব্যাপারে কোনো সমঝোতায় আসবে না, কারণ মুজিব-সোহরাওয়ার্দী তা' চান না। যারা চান, তাদের কথার দাম নেই" (৬/৩২৮)। তথাপি প্রশ্ন জাগতেই পারে, দলের ভিতরে কলহ-মতভেদের কারণে সোহরাওয়ার্দী যে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন, তাতে কি ব্যক্তিগত ক্ষোভ ছিল মুজিবের প্রতি?

ইস্কান্দর মির্জার চক্রান্তে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৭ইং ১৮ অক্টোবর তারিখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পদত্যাগের আগেই "Suhrawardy saw to it that Mujib was appointed as the Chairman of the East Pakistan Tea Board. A sinecure, which assured him a cash flow without interfering with his more substantive function as party secretary" (৭/৮৪)। এপ্রিল ১৯৫৮ইং আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় এসেছিলেন। "He had long recognized Mujib as a rough diamond in need of some polishing. Mujib had been his most valuable political worker ... but he had only limited exposure to politics in the center and had practically no direct knowledge of the outside world.....Suhrawardy had something ... in mind for Mujib so that his political education could be complete and he would be ready to play a more meaningful role in national politics, as well as foreign affairs" (৭/৮৭)।

সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব অনুসারে এবং ওয়ার্কিং কমিটির অনুমোদনক্রমে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রায় দু'মাসের জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি এবং জাপান প্রভৃতি দেশে অভিজ্ঞতা অর্জনমূলক সফরে পাঠানো হয়েছিল। বিদেশে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কিছুকাল আগে, সোহরাওয়ার্দী অনুকুল মন্তব্যে মুজিব সম্পর্কে লিখেছিলেন, "There is some danger of the Awami League losing popularity through inactivity and the curb I have placed on it. Mujibur Rahman, in particular, is fretting very strongly.He is prepared to accept the objective of democracy for Pakistan ... He is ... ...deeply committed here, East Pakistan must work out its own destiny ... he is vitally interested in seeing that the

Awami League is not destroyed or overwhelmed either by opportunistic Muslim League....or the NAP with its strong leftist tendencies ... He believes that the party should be revived and organized properly" (৭/১১৪)।

সব মিলিয়ে বলা যেতেই পারে, হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ প্রবীণ নেতৃত্বের সাথে মুজিবের মতভেদ কখনো কখনো তীব্রভাবেই ঘটেছে। বিষয়গুলি মুজিব মুখোমুখী দাঁড়িয়েই প্রকাশও করেছেন। কিন্তু কখনো কারো সম্পর্কেই নিন্দা-ষড়যন্ত্রে যুক্ত হননি। অপরদিকে রাজনৈতিক মতভেদ-মতান্তর সত্বেও প্রবীণ নেতৃবৃন্দ সকল পর্যায়েই মুজিবের প্রতি আশা এবং আস্থা রেখেছেন।

পূর্ব বাংলার আইন পরিষদে-গোলযোগ ঃ
নিহত ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী

মুজিব-জীবনী আলোচনায় এ প্রসঙ্গটি উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। ১৯৬০-দশকের প্রথমার্ধে, আয়ুব-মোনেমের শাসনামলে ছাত্র এবং প্রবীণদের চায়ের টেবিলের রাজনীতি আলোচনাতে, আর পরবর্তী সময়েও নানা সূত্রে এ অঘটনটির জন্য আওয়ামী লীগের উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতিবিদেরকেই দায়ি করা হতো। কেউ কেউ সরাসরি শেখ মুজিবের নাম বলতেন। উল্লেখ্য যে, এ ঘটনাটিকেই পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির প্রধান অজুহাত হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছিল। আওয়ামী লীগ তখন পূর্ব বাংলায় ক্ষমতাসীন দল এবং অনস্বীকার্যভাবেই ছিল পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রধানতম প্রতিবাদী শক্তি। সুতরাং জনগণের মাঝে আওয়ামী লীগ-বিরোধী প্রচারণা চালানোর অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল ষড়যন্ত্রী সামরিক শাসকচক্র এবং সহযোগীদের।

এস. এ. করিম লিখেছেন, "on 23 September Shahed Ali, the Acting Speaker of the Assembly, was severly wounded by a flying object thrown at him by an opposition member. Shahed Ali was a diabetic. Three days later he succumbed to his wounds in a hospital. The death of the Acting Speaker was to provide an excuse for the military coup" (৭/৮৯)। উল্লেখ্য যে, উক্ত ঘটনার প্রায় দু'সপ্তাহ পরে, ১৯৫৮ইং ৮ অক্টোবর তারিখে পাকিস্তানে সেনা অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছিল। কম্যুনিস্ট নেতা খোকা রায় লিখেছেন, "১৯৫৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছিল। আইন সভার সে অধিবেশনকে বানচাল করার জন্য ইস্কান্দর মির্জার সমর্থন-পুষ্ট কে.এস.পি ও মুসলিম লীগ দল আইনসভার ভিতরেই মারপিট ও হাঙ্গামা বাঁধিয়ে দিয়েছিল। ... ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী গুরুতর রূপে আহত হয়েছিলেন। ... তিনি হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন। ইস্কান্দরী চক্রান্তে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা আবার জটিল আকার ধারণ করেছিল" (৪/১৭১)।

"২০শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৮ইং) ঢাকায় পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরু হলো। স্পীকার আব্দুল হাকিম যখন সভাগৃহে প্রবেশ করলেন তখন সকলে তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে

যথারীতি সম্মান দেখালেন। ... কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই সভাকক্ষ গরম হয়ে উঠলো। মুসলিম লীগ দলের জনাব হাশিমুদ্দিন আহমেদ ৬ জন আওয়ামী লীগ সদস্যের ... বহিষ্কার করার প্রস্তাব করলেন। স্পীকার বললেন যে, এবিষয়ে তিনি ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁর রুলিং দেবেন। এর প্রতিবাদে সভাকক্ষে তুমূল হৈ চৈ শুরু হলো। স্পীকার এসময় কয়েকজন সদস্যকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সদস্যবৃন্দ এ নির্দেশ অমান্য করে পরিষদ কক্ষের অভ্যন্তরে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। এ প্রবল উত্তেজনাকর মুহূর্তে ... দেওয়ান মাহাবুব আলী (ন্যাপ) অকস্মাৎ স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তুললেন। কিন্তু স্পীকার এ প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল ক্রুদ্ধ সদস্য স্পীকারের আসনের দিকে ধাবিত হলেন। তারা বললেন, স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, সুতরাং তাঁকে এই মুহূর্তে চলে যেতে হবে। আতাউর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমান এবং ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলীসহ অনেক সদস্য স্পীকারকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। সদস্যদের মধ্যে তখন হাতাহাতি শুরু হয়ে গিয়েছে। চেয়ার, টেবিল, পেপার ওয়েট, এমনকি মাইকগুলো পর্যন্ত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। ... অনেক বহিরাগত দর্শক গ্যালারী থেকে হাউসের সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করছেন। বিশৃঙ্খল অবস্থা আয়ত্বে আনতে না পেরে স্পীকার ... সভাকক্ষ ছেড়ে চলে গেলেন। ... ডেপুটি স্পীকার ... অধিবেশন মূলতুবি ঘোষণা করলেন। ... স্বনামখ্যাত কেএসপি সদস্য ... মোহন মিয়া এসময় উত্তেজিতভাবে শাহেদ আলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন" (৩/১০১-১০২)।

"২২শে সেপ্টেম্বর স্পীকারের প্যানেলভুক্ত সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিয়া সভার কাজ পরিচালনা করতে গেলেন। সরকারী দল আওয়ামী লীগ ও বিরোধী দল কেএসপি স্পীকার নির্বাচনে মতৈক্যে আসতে পারলেন না। কেএসপি বুঝতে পারলো পার্লামেন্টে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের কোন আশাই নেই। তাই তারা স্থির করলেন যে, পার্লামেন্টে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হবে যাতে প্রেসিডেন্টের শাসন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগ বিদ্বেষ তাদের কাছে এতই প্রবল ছিল যে, তারা প্রেসিডেন্টের শাসনকেই ... শ্রেয় মনে করেছিলেন" (৩/১০২)। "২৩শে সেপ্টেম্বর পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। পার্লামেন্ট হাউসে রাইফেলস্ ও পুলিশের কড়া প্রহরা বসানো হয়। বেলা তিনটায় অধিবেশন শুরু হলে ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলী আসন গ্রহণ করেন। সরকারী দল আওয়ামী লীগ তাকে স্বাগত জানায়। বিরোধী দলের সদস্যরা ডেপুটি স্পীকারকে কাল-বিলম্ব না করে চলে যেতে বলে। কেএসপি'র প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে এ সময় বলেন, 'আপনি যদি এই মুহূর্তে বেরিয়ে না যান তবে আমরা আপনাকে খুণ করে ফেলব। আপনার বিবি ও বাচ্চারা এবং আপনার সারা পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু শাহেদ আলী বিচলিত হলেন না। তিনি অনড় বসে রইলেন। পরিষদে হাঙ্গামা বেঁধে গেল। হঠাৎ সবেগে নিক্ষিপ্ত কোন বস্তু তাঁকে আঘাত করলো। তাঁর ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হলো। ... তিনি জ্ঞান হারিয়ে স্পীকার-এর আসনে লুটিয়ে পড়লেন" (প্রাগুক্ত)।

অতঃপর প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, আবুল মনসুর আহমদের লেখা থেকে। "ডেপুটি

স্পীকারের সভাপতিত্বে হাউস শুরু হইল। হাউস শুরু হইল মানে অপযিশন দলের হট্টগোল শুরু হইল। শুধু মৌখিক নয়, কায়িক। ... পেপার ওয়েট, মাইকের মাথা, মাইকের ডান্ডা, ... ডেপুটি স্পীকারের দিকে মারা হইতে লাগিল। শান্তিভঙ্গের আশংকা করিয়া সরকার পক্ষ আগেই প্রচুর দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁরা হাতে-চেয়ারে ডেপুটি স্পীকারকে অস্ত্র-বৃষ্টির ঝাপটা হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অপযিশনের কেউ কেউ মঞ্চের দিকে ছুটিলেন। তাঁদেরে বাঁধা দিতে আমাদের পক্ষেরও স্বাস্থ্যবান শক্তিশালী দু-চারজন আগ বাড়িলেন। ... নিজ জায়গায় অটল-অচল বসিয়া-বসিয়া ... এই মারাত্মক খেলা দেখিতে লাগিলাম। ... ভদ্রের ইতরতায় যেমন ব্যথিত হইলাম; বুদ্ধিমানের মুর্খতায় তেমনি চিন্তিত হইলাম। ... সে অবস্থায় আমার হাতে রিভলভার থাকিলে আমি নিজের আসনে বসিয়া আক্রমণকারীদেরে গুলি করিয়া মারিতে পারিতাম। ... নিরপেক্ষ দর্শকের দৃষ্টি দিয়াই দেখিয়াছি, হামলাকারীদের অনেকেই স্পন্টেনিয়াসলি, ... যেন শুধু দেখাদেখি পাটকেল নিক্ষেপ করিতেছেন। ... দেহরক্ষীরা চেয়ারের উপর চেয়ার খাড়া করিয়া ডেপুটি স্পীকারের সামনে প্রাচীর খাড়া করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সে প্রাচীরটা ভেদ করিয়া হামলাকারীদের পাটকেল ডেপুটি স্পীকারের মাথায়-নাকে-মুখে লাগিতেছিল। ... পরের দিন (মতান্তরে, তিন দিন পরে) হাসপাতালে তিনি ... মারা যান। এই হত্যাকান্ডের আদালতী বিচার হয় নাই। ... আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করিতে গিয়া শাহেদ আলী নিহত হইলে অপযিশনের ঢিল-পাটকেলে। অথচ পূর্ব বাংলার দুশমনরা তখনও বলিলেন এবং আজও বলেন ঃ আওয়ামী লীগই শাহেদ আলীকে হত্যা করিয়াছে। কোন্ পাপে এই মিথ্যা তহমত ! (২/৫৫৬-৫৫৮)।

ডেপুটি স্পীকার নিহত হওয়ার পরবর্তী দু'সপ্তাহের জটিল ঘটনাবলীর কিছুটা উল্লেখ করা একান্তই দরকার, প্রাসঙ্গিক ষড়যন্ত্র, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গী এবং শেখ মুজিবের রাজনৈতিক অবস্থান জানার প্রয়োজনেই। "সেই সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার আসনবণ্টন নিয়ে ফিরোজ খান নুনের সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের মতবিরোধ হয়েছিল। ১৯৫৮ সনের ২রা অক্টোবর আওয়ামী লীগ মন্ত্রীরা ফিরোজ খান নুনের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। ... ঐ অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা 'দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের' অজুহাত দেখিয়ে ১৯৫৮ সনের ৭ই অক্টোবর (প্রকৃতপক্ষে ৮ই অক্টোবর) দেশে সামরিক শাসন জারি করেছিলেন" (৪/১৭৩)। উল্লেখিত 'অজুহাত' এবং আওয়ামী মন্ত্রীবর্গের পদত্যাগের ছকটিও সাজিয়েছিলেন মির্জা-প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীরাই। পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত ছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ইং। তবে মির্জা এবং সহযোগীরা ঠিকই বুঝতে পারছিলেন, জাতীয় নির্বাচনে, বিশেষত পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের প্রবল প্রধান্য কমানো যাবে না বরং বৃদ্ধি পেতে পারে। সুতরাং তাঁদের দিক থেকে নির্বাচন বন্ধ করাই জরুরি ছিল। ডেপুটি স্পীকারের হত্যাকান্ডে পূর্ব বাংলায় একটা পরিস্থিতি তৈরির পর দরকার হলো কেন্দ্রেও একটা অজুহাত তৈরি করা।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা "সরল-সোজা আয়েশী প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ নুনকে দিয়া

বলাইলেন ঃ আওয়ামীদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় ঢুকিতে হইবে। মন্ত্রীসভার দায়িত্ব বহন করিতে হইবে। বাহির হইতে সমর্থন দিয়া ফপরদালালি, টপকা-মাতব্বরি করিতে দেওয়া হইবে না"। আবুল মনসুর আহমদ আরো লিখেছেন, "এসব কথায় আওয়ামী লীগ-নেতাদের কাণ না দেওয়া উচিৎ ছিল। আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনের আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় না যাওয়ার অনেক কারণ ছিল। তার মধ্যে প্রধান কারণ, আওয়ামী লীগ মন্ত্রীত্বে অংশ না নিয়াই নুন-মন্ত্রীসভার সমর্থন দিবে এই চুক্তি হইয়াছিল। এই ত্যাগের বদলা, যুক্ত-নির্বাচন প্রথায় আগামী সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হইয়াছে। ... আওয়ামী লীগকে লইয়া খেলা করিবার জন্যই মির্জা এই প্রস্তাব দেওয়াইয়াছেন, এটা সুস্পষ্ট ছিল। ... আতাউর রহমান, মানিক মিয়া ও আমি বিরোধিতা করিলাম। যতদূর জানি লিডারও (সোহরাওয়ার্দী) এসময় মন্ত্রীত্বে যাওয়ার বিরোধী ছিলেন। ... মুজিবুর রহমানও আমার সাথে একমত ছিলেন। কিন্তু ... মুজিবুর রহমান আমাদের কাউকে না জানাইয়া কয়েকজন হবু মন্ত্রী লইয়া হঠাৎ করাচি চলিয়া গেলেন। মন্ত্রীত্বের শপথ নিলেন। ভাল পোর্টফলিও পাওয়া গেল না বলিয়া চার-পাঁচ দিন পরে পদত্যাগ করিলেন। সেই রাত্রেই মার্শাল ল। ... প্ল্যানটা ছিল সুস্পষ্ট। স্বার্থান্ধ ছাড়া আর সবাই বুঝিয়াছিলেন। লিডারও বুঝিয়াছিলেন" (২/৫৫৯-৫৬০)।

সম্পূর্ণ অন্য রকম বিবরণ মেলে এস.এ. করিমের লেখায়। "Chief Minister Ataur Rahman was also of the view that Awami League....should also be there.....Suhrawardy was in quandary. But with elections only a few months away he thought it would be better for some Awami Leaguers to join the Noon Cabinet to prop it up against Mirza's manifest desire to bring it down. So, Suhrawardy directed Mujib to come to Karachi urgently to discuss ... Awami League participation in the Noon Ministry and election matters. Mujib arrived in Karachi with six Awami League aspirants....Chief Minister Ataur Rahman Khan and Manik Mian joined them the next day. After much hangling some Awami Leaguers were included in the Cabinet on 2 October; but unhappy with the distribution of Cabinet portfolios they resigned on 7 October. Mujib left for Dhaka in the evening" (৭/৯২)।

দেখা যাচ্ছে, সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশেই মুজিব আওয়ামী লীগ দলীয় মন্ত্রীত্ব প্রত্যাশীদেরকে নিয়ে করাচি গিয়েছিলেন। আতাউর রহমানেরও এবিষয়ে অনুকুল অভিমত ছিল। আতাউর রহমান এবং মানিক মিয়া প্রমুখ এসম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই করাচিতে এসে মুজিবের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। এস.এ.করিমের ভাষ্য : "some Awami Leaguers were included in the Cabinet "- এমন ধারণাও দেয় না যে, শেখ মুজিব নিজে নুন-মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন বা যোগ দিতে আগ্রহী ছিলেন। যিনি পার্টির প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক কাজ করার জন্য দু'বছর আগে স্বেচ্ছায় মন্ত্রীত্ব ছেড়েছিলেন, তিনি নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচনের মাত্র চার-পাঁচ মাস আগে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের 'স্বার্থান্ধ' চিন্তায় কাউকে না জানিয়ে, সোহরাওয়ার্দীরও অজান্তেই মন্ত্রীসভায়

যোগ দিতে করাচি গিয়েছিলেন, এমন বর্ণনাটি বিভ্রান্তিকর বলেই বিবেচনা করতে হয়। ইস্কান্দর মির্জা অত্যন্ত কুশলী পরিকল্পনায় পূর্ব বাংলায় এবং কেন্দ্রে গণতান্ত্রিক শাসন অবসানের অজুহাত সৃষ্টি করেছিলেন। ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ইং অর্থাৎ নুন-মন্ত্রীসভা থেকে আওয়ামী লীগ সদস্যদের পদত্যাগের দিনই রাত সোয়া দু'টায় (অর্থাৎ ৮ অক্টোবর) পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন ঃ
মামলায় জর্জরিত মুজিব

"১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর ... সেকান্দার মির্জা সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক আইয়ুব খান খান সহযোগে ... পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে দেশে মার্শাল ল জারি করেছেন। সমস্ত আইনসভা, পার্লামেন্ট, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট সব বাতিল করে বহাল আছেন কেবল সেকান্দার মির্জা। এজন্যই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। ... এর শেষ কোথায়! ঢাকার জীবন সাধারণ গতিতেই চলছে। ... রাজনৈতিক নেতারাও কেউ এর সঙ্গে যুক্ত আছেন কিনা কে জানে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, কাইয়ুম খান, ফিরোজ খান নুন সব কোথায় ! মুজিব ! কি কোনো কথা নেই-ত তাদের মুখে। মওলানা ভাসানী সম্ভবত হাসপাতালে চিকিৎসারত। ... ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া ১২ই অক্টোবর তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধে সামরিক শাসন সমর্থন করেছিলেন। ... আতাউর রহমান খান করাচিতে সেকান্দার মির্জার সাথে দেখা করেছেন কাল (১২ অক্টোবর, ১৯৫৮) , কেন, কি কথা হলো?" (৬/৩২৯-৩৩২)।

উপরোক্ত বক্তব্যে সংশয়-সন্দেহের তীরটা ছোঁড়া হয়েছিল মুজিবের দিকেও। অপরদিকে জানা যায়, ৭ অক্টোবর রাতে করাচি থেকে যাত্রা করে ৮ অক্টোবর সকালে ঢাকায় নেমেই শেখ মুজিব সামরিক শাসন জারির কথা জেনেছিলেন। স্বভাবতই তিনি আশংকা করেছিলেন, তাঁকে আবার অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারাগারে যেতে হবে। তাই তিনি পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের জন্য গোপালগঞ্জে রওনা হয়ে যান। সামরিক কর্তৃপক্ষ ১১ অক্টোবর প্রাক্তন আইজিপি, দুর্নীতির জন্য কুখ্যাত জাকির হোসেনকে পূর্ব বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করে। ১২ অক্টোবর তারিখে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে শেখ মুজিবকে গোপালগঞ্জ থেকে গ্রেফতার করে ঢাকায় আনা হয়। "ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, হামিদুল হক চৌধুরী, আবুল মনসুর আহমদ এবং আব্দুল খালেককে আলাদা আলাদাভাবে নির্জন প্রকোষ্ঠে বন্দি রাখা হয়। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, কোরবান আলী এবং নুরুদ্দিন আহমদও এসময় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন" (৩/১০৫)।

আবু জাফর শামসুদ্দিন লিখেছেন, "১৮ই অক্টোবর তারিখে আরো ... গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে ছিলেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ, দেওয়ান মাহবুব আলী, শহীদুল্লাহ কায়সার ... প্রমুখ। ... লোকের কথাবার্তা শুনে মনে হলো, বেশির ভাগ লোকের কাছে সামরিক শাসন ভালো বলে বিবেচিত হয়েছে। তাদের ধারণা জিনিসপত্রের দাম কমবে" (৬/৩৩৩)। পাকিস্তানে সেনা-শাসন জারির পর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (এবং

প্রধানমন্ত্রীও) আয়ুব খান ঢাকায় এসে ২২ অক্টোবর বিকালে স্টেডিয়াম মাঠে জনসভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। "তাকে দেখার জন্য রাস্তার দুধারে অসংখ্য লোক অপেক্ষা করাছিল। লাখখানিক লোক উপস্থিত ছিলেন। ... আয়ুব খান প্রেস কনফারেন্সও করেন। মওলানা ভাসানী সম্বন্ধে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে আয়ুব খান বলেন, যদি তিনি কোন অপরাধ করে থাকেন তবে প্রাদেশিক সরকার তার বিচার করবে। ... ব্যাপার কি! ভাসানী সম্বন্ধে কি তার ধারণা তাহলে ভালো? ... আশ্চর্যের বিষয়, পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীণ বিরোধী দলীয় রাজনীতিকদের মধ্যেও মার্শাল ল'র বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষোভ দেখিনি। ২৭শে অক্টোবর তারিখে রাত্রে এক জায়গায় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগারের সঙ্গে দেখা হয়। ১৯৭০-'৭১ সালেও তাদের অধিকাংশ আওয়ামী লীগার ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়ও তাদের গৌরবজনক ভূমিকা ছিল। তাদের অনেকেই আজ নেই ... । সেদিন রাতে তারা মার্শাল ল'র জন্যে আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকেই দায়ী করেছিলেন। হয়তো সেটা ছিল আত্মসমালোচনা" (৬/৩৩৪-৩৩৫)। প্রকৃত রাজনৈতিক উপলব্ধি থেকেই খোকা রায় লিখেছিলেন, "সামরিক শাসন জারির প্রথম দিকে সাধারণ মানুষের মনে যে মোহই সৃষ্টি হয়ে থাকুক না কেন, বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় সে মোহ ভেঙ্গে যাবে। ... এ নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমত উদ্বুদ্ধ করতে যত্নবান হয়েছিল (৪/১৭৬)।

যুক্তফন্ট মন্ত্রীত্বকালীন সময়ে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনে মুজিবের বিরুদ্ধে এসময় ৮টি পৃথক মামলা দায়ের করা হয়েছিল। বিশেষ সামরিক আদালতে একটি মামলা থেকে তিনি খালাস পেয়েছিলেন, কারণ সরকার পক্ষের দু'জন প্রধান সাক্ষী আদালতে স্বীকার করেছিলেন যে, পুলিশের চাপে তারা মিথ্যা জবানবন্দী দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আরো ছ'টি মামলাতেও তিনি নিরপরাধ প্রমানিত হয়েছিলেন। কিন্তু স্বজন-প্রীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহার সংক্রান্ত একটি মামলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত তাঁকে দু'বছরের কারাদন্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার শাস্তি প্রদান (সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ইং) করে। এ-সংক্রান্ত আপিল মামলায় হাইকোর্টে শেখ মুজিবের পক্ষে আইনজীবী ছিলেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। জুন, ১৯৬১ইং মামলাটিতে জেলা-কোর্টের রায় খারিজ হয়ে যায়। ডিসেম্বর, ১৯৫৮ইং মুজিব কারামুক্তি পেয়েছিলেন। তাঁকে গোয়েন্দা এবং পুলিশের নিবিড় নজরদারিতে রেখে ঢাকার বাইরে যাবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। "Mujib could have secured his release earlier had he agreed to sign a bond renouncing political activity as a number of detainees had done, but politics was in his blood and he had no intention of giving it up" (৭/৯৭)।

১৯৫৯ইং সেপ্টেম্বর মাসে মানিক মিয়াকে অল্পদিনের জন্য বন্দী করে শেখ মুজিবের সেলের কাছাকাছি রাখা হয়েছিল। তিনি মুজিবকে বেশ অসুস্থ এবং হতাশ দেখেছেন বলে জানিয়েছিলেন। মুক্তির পর মানিক মিয়া পাকিস্তানের সি-ইন-সি জেনারেল মুসা কর্তৃক ঢাকায় সংবাদপত্র সম্পাদকদের জন্য আয়োজিত এক নৈশভোজে

আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মানিক মিয়া সেই সুযোগে জেনারেল মুসাকে বলেছিলেন মুজিব যেন সুষ্ঠু বিচার পেতে পারেন। কারাগারে শেখ মুজিবের অসুস্থতা-হতাশার কথা মানিক মিয়া বললেও সম্পূর্ণ ভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন সহবন্দী আবুল মনসুর আহমদ। "মওলানা সাহেব ও মুজিবুর রহমানের জন্য আমার দুশ্চিন্তা ছিল নিতান্তই অনাবশ্যক। তাঁরা সকাল-সন্ধ্যা ... মরিচ-বেগুনের ও নানা প্রকারের মৌসুমী ফুলের চারা লাগাইয়া আনন্দেই কাল কাটাইতেছেন। ... মুজিবুর রহমান আর এক ধাপ আগাইয়া গিয়াছেন। ... একটা ফজলী আমের চারা (কলম নয়) জোগাড় করিয়া ... লাগাইয়াছিলেন। জেল-সুপারকে বলিয়াছিলেন, ঐ গাছের আম খাইয়া যাইবার জন্য তিনি মন বাঁধিয়াছেন। মুজিবুর রহমানের মনের বল দেখিয়া অফিসাররা অবাক হইয়াছিলেন" (২/৫৭১)। কারাবন্দী জীবনে কারোই সুস্থ-সুখী থাকার কথা নয়, তথাপি এ তথ্যটি থেকে মুজিবের মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় মেলে। বলাই বাহুল্য, শেখ মুজিব রাজনৈতিক জীবনের সকল পর্যায়ে, এমনকি ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ইং আততায়ীর বন্দুকের মুখে দাঁড়িয়েও চরম মানসিক দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছিলেন।

তৎকালীণ পাকিস্তানের সেনা-শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে। ৮ অক্টোবর, ১৯৫৮ইং সেনা-শাসন জারি করে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল আয়ুব খানকে বানিয়েছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং প্রধানমন্ত্রীও। আয়ুব খানই মাত্র ২০দিনের মাথায় ২৭ অক্টোবর মধ্য রাতে তিনজন জেনারেলকে পাঠিয়ে অস্ত্রের মুখে ইস্কান্দর মির্জাকে পদত্যাগ এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেছিলেন। এক্ষেত্রে আয়ুব খানের সহাযক ছিলেন আযম খান এবং পরামর্শদাতা ইয়াহিয়া খান। ২৭ অক্টোবর প্রধান সেনাপতি আয়ুব খান নিজেকেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করলেন। মির্জাকে হঠিয়ে আয়ুব মন্ত্রীসভা পূণর্গঠন করেছিলেন। মির্জার মন্ত্রীসভায় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন আয়ুব খান অপরদিকে আয়ুবের মন্ত্রীসভায় কোনো প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না। মির্জার মন্ত্রীসভার সকল সদস্যকে অপরিবর্তিত রেখেই তিনজন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে আয়ুবের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল।

ধারণা হতেই পারে, মির্জার মন্ত্রীসভার সামরিক এবং বেসামরিক সকল সদস্যই মির্জার অপসারণের ব্যাপারে আয়ুবের সাথে সমঝোতায় ছিলেন। মির্জা এবং আয়ুবের মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী আবুল কাশেম খান মুক্তিযুদ্ধ চলা-কালে গভর্ণর ডাঃ মালেকের অধীনেও মন্ত্রী হয়েছিলেন। আয়ুব যখন নিজের পছন্দমত নতুন সংবিধান রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তখন আইনমন্ত্রী হিসেবে বিচারপতি মুহম্মদ ইব্রাহিম পরামর্শ দিয়েছিলেন, পাকিস্তানের ভৌগলিক অবস্থানের কথা বিবেচনা করে একটি 'ফেডারেল শাসনতন্ত্র' প্রণয়ন করাই যুক্তিসঙ্গত হবে। কিন্তু সে-পরামর্শ আয়ুবের পছন্দ হয়নি, কারণ আয়ুব খান ততদিনে নিজের মনেই ভবিষ্যত সংবিধানের রূপরেখা তৈরি করে ফেলেছেন। উল্লেখ্য যে, আইয়ুব খানের অন্যতম বাঙালি মন্ত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, বিচারপতি ইব্রাহিম, আইয়ুবের শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। ১৯৬০ইং "২৩শে মার্চ তারিখ

উপলক্ষে আয়ুব বক্তৃতা দেন। তিনি ১৯৫৬ সালের সংবিধানকে বললেন 'amorphous, disjointed, centrifugal' (অবয়বহীন, অসংলগ্ন এবং অপ-কেন্দ্রীক) ইত্যাদি। জানালেন, শিগগিরই একটি গঠনতন্ত্র কমিশন গঠন করা হচ্ছে। তিনি নিজেও এবিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। ... সংবিধান হবে দেশবাসীর 'Genius' (মেধা) ও চরিত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। ... 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে সেটি জারি করা হয় (১মার্চ) ১৯৬২ সালে। তাতে সাত কোটি লোকের দেশে উভয় অংশে চল্লিশ চল্লিশ করে মাত্র ৮০ হাজার লোককে ভোটাধিকার দেয়া হয়" (৬/৩৪৬)।

স্মরণ করা যেতে পারে, আয়ুবের মৌলিক গনতন্ত্রী সংবিধান জারির পূর্ব পর্যন্ত ১৯৫৬ইং জারিকৃত শাসনতন্ত্র স্মরণে ২৩ মার্চ 'শাসনতন্ত্র দিবস' বা 'রিপাবলিক ডে' প্রতিপালিত হতো, আয়ুবের শাসনতন্ত্র জারির পর ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান দিবস' হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। দু'বছর 'কঠোর পরিশ্রম' করে আয়ুব যে সংবিধানটি রচনা করেছিলেন, সেটি ছিল রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা নিজের কুক্ষিগত রাখার নিমিত্ত তাঁর সমালোচিত 'অপ-কেন্দ্রীক' শাসনতন্ত্রের বদলে 'অতি-কেন্দ্রীভূত' শাসনতন্ত্র। 'মৌলিক গণতন্ত্র' বা 'বুনিয়াদী গণতন্ত্র' (Basic Democracy) ব্যবস্থায় দু'টি প্রদেশে মাত্র ৮০হাজার 'বিডি মেম্বার'দেরকে শুধু ভোটাধিকার দিযে এবং তাদেরকেই 'অডিট বিহীন' উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দের সুযোগ দিয়ে আয়ুব ধারণা করেছিলেন, এরাই উভয় প্রদেশে তার ক্ষমতার সমর্থক এবং রক্ষাকারী হবে। কিন্তু পূর্ব বাংলার উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান আয়ুবকে বিদায় নিতে বাধ্য করেছিল।

আয়ুব খান পূর্ব বাংলায় গভর্ণর বানিয়েছিলেন (জুন, ১৯৬০) জেনারেল আজম খানকে। আজম খান রুটিন দায়িত্ব এবং প্রথাগত সৈনিক-রীতির বাইরে গিয়েও জন-কল্যাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে একদিকে যথেষ্টই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন কিন্তু আমলা মহলের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। তখন আজম খানকে পদত্যাগে (মে, ১৯৬২) বাধ্য করে পশ্চিম পাকিস্তানী আমলা গোলাম ফারুককে গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু গোলাম ফারুক 'কর্তা-ভজা' মানসিকতার অভাবে আয়ুবকে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। তাঁকেও পদত্যাগে বাধ্য করে আয়ুব খান গভর্ণর পদে নিয়োগ (অক্টোবর, ১৯৬২ইং) দিয়েছিলেন ময়মনসিংহের উকিল আব্দুল মোনায়েম খানকে। একদা নুরুল আমিনের রাজনৈতিক শিষ্য মোনায়েম খানের কোনো সুখ্যাতি ছিল না বরং যথেষ্ট কুখ্যাতিই ছিল। "Monem Khan's principal characteristick was his unabashed servility toward Ayub Khan...In spite of black marks on his records, or perhaps because of them, he was considered a suitable Governor for East Pakistan" (৭/১০৫)। পূর্ব বাংলায় তদানিন্তন সময়টা মূলত 'আয়ুব-মোনায়েম আমল' পরিচয়েই কুখ্যাত হয়ে আছে।

গভর্ণর মোনায়েম খান রবীন্দ্রনাথ আর শেখ মুজিবকে স্থায়ি শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি এদেশের মানুষের গভীর অনুরাগ এবং রবীন্দ্র-সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কেও দারুণ আতঙ্ক ছিল তাঁর। মোনায়েম খানের বিচারে শেখ মুজিবকে শত্রু ভাবারও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। "In him (Mujib) Monem Khan

saw his principal political antagonist in East Pakistan. Mujib could not be tempted by inducements of office or material rewards to give up his opposition to the Ayub rgime (৭/১০৬)। কিন্তু মোনায়েমের বড় ভয় ছিল, মুজিবকে প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে, তিনি আয়ুবের আস্থা হারাবেন। মোনায়েম গভর্ণর হওয়ার আগেই সামরিক শাসন তুলে নেয়াতে মুজিবকে অনির্দিষ্ট কাল বন্দি করে রাখাও সম্ভব ছিল না। মোনায়েম ভেবেছিলেন, কেবলমাত্র ভয় দেখিয়েই মুজিবকে সামলাতে পারবেন। ১৯৬০-দশকের মধ্যভাগ থেকে মুজিব সামরিক শাসন-বিরোধী কর্মকান্ড জোরদার করতে থাকায় মোনায়েমও মুজিবের প্রতি সম্ভাব্য সকল প্রকার অত্যাচার-অপমান শুরু করলেন। মোনায়েম প্রায়ই বলতেন, " আমার প্রেসিডেন্টকে অপমান করবে, এমন কোনো মায়ের পুত নাই"।

পাকিস্তানের প্রথম সেনা-শাসনের ধরণ-চারিত্র্য আলোচনায় বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে আসা হয়েছে, এবার ফেরা যাক। সামরিক শাসনের শুরুতেই শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আটটি মামলা করা হয়েছিল, মামলা হয়েছিল অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধেও। এবিষয়ে আবুল মনসুর আহমদের একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য : "আমরা আসামীরা সবাই আওয়ামী লীগার। আওয়ামী লীগাররাই দুর্নীতিবাজ এটা দেখানোই এই সব কেসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত আদালতের বিচারে কারো বিরুদ্ধেই কোনো মামলা টিকে নাই। কথায় বলে, ভালরূপ কাদা ছুঁড়িতে পারিলে, কাদা গেলেও দাগ থাকে" (২/৫৭২)। এক্ষত্রে পাকিস্তানি সেনা-আমলা চক্রের চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না।

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চিন্তায় পরিবর্তন ঃ
কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে গোপন আলোচনা

১৯৬১ইং জুন মাসে কারামুক্তির পর থেকেই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক চিন্তায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সামরিক এবং বেসামরিক পর্যায়ে পাঞ্জাব-প্রভাবিত পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থাকার ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি গভীরভাবেই সন্দিগ্ধ এবং হতাশ হয়ে পড়েন। আয়ুবের গণতন্ত্র প্রবর্তনের উদ্যোগ এবং কথাবার্তা তাঁর কাছে নিতান্তই মেকী এবং 'শক্ত লোহার হাতে নরম ভেলভেটের দস্তানা' বলেই মনে হয়। কারামুক্তির পর থেকেই "He felt that the situation cried out for a radical approach. For the first time in his life he began to entertain seriously the thought of scession from Pakistan and the establishment of an independent government in East Pakistan.....So he needed like-minded allies outside his party to advance toward his objective. He decided to sound out the Communists to find out whether they were inclined to his way of thinking on the question of independence" (৭/৯৭)। একান্তই কৌতুহলোদ্দীপক এবং অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার সমর্থন এবং সহায়তার জন্য শেখ মুজিব কেন প্রথমেই কম্যুনিস্ট পার্টির কথা ভেবেছিলেন?

স্মরণ করা যেতে পারে, কম্যুনিস্ট পার্টই ছিল একমাত্র সর্বভারতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দল, যারা মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল। তবে একথাও সকলেরই জানা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে সবার আগেই তাদের মোহভঙ্গ ঘটেছিল। বৃটিশ আমলে এবং পাকিস্তানের শুরুতেও সরকারী রোষের কারণে 'আন্ডার গ্রাউন্ড' দল পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকায়, দল হিসেবে ছোটোবড় যা-ই হোক না কেন, জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষত, পল্লী-অঞ্চলে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রসারিত গণ-ভিত্তি ছিল। তাই, জনগণের চেতনা-চাহিদার বিষয়গুলি সম্পর্কে কম্যুনিস্ট নেতাকর্মীরা বিশেষভাবেই অবহিত থাকতেন। শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই শহর-গ্রামের ব্যাপক জনগোষ্ঠির সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠা এবং রক্ষায় অভ্যস্থ ছিলেন বলেই কম্যুনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গী এবং তৎপরতার কথা সম্যকরূপেই অবহিত ছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ যখন আওয়ামী লীগ নামে সংগঠিত হয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ দল হিসেবে সকলের জন্যই সদস্য পদ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল, তখন থেকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানাভাবেই আওয়ামী লীগ এবং কম্যুনিস্ট পার্টির যোগাযোগও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভাষা-আন্দোলনে এবং যুক্তফ্রন্ট গঠনেও 'গোপন' কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভূত অবদান ছিল। সর্বশেষ, ১৯৫৭ইং কেএসপি-ন্যাপ এম.এল.এ.দের সম্মিলিত অনাস্থা ভোটে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীসভার পতনের সঙ্গে-সঙ্গেই কম্যুনিস্ট পার্টি বাস্তব অবস্থার মূল্যায়ন করে সংসদে আওয়ামী লীগের পক্ষে কম্যুনিস্ট সদস্যদের ভোট দেবার সিদ্ধান্ত নেয়াতে দু'দিনের মধ্যেই আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা পূণর্বহাল হয়েছিল। সব মিলিয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহ একান্তই তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতাবোধের পরিচায়ক ছিল।

প্রসঙ্গক্রমেই কম্যুনিস্ট পার্টির তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তার দিকটিও উল্লেখ করা দরকার। "সামরিক শাসনাধীনে ব্যক্তি-স্বাধীনতা পদদলিত হয়ে যে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের ভিতর স্বৈরাচারী আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমে উঠেছিল। সামরিক শাসন জারির পর সাধারণ মানুষের মনে যে মোহ দেখা গিয়েছিল, সে মোহ ক্রমে ক্রমে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। ... কম্যুনিস্ট পার্টি এটাও উপলব্ধি করেছিল যে, বাস্তব অবস্থা আন্দোলনের অনুকুল হলেও পার্টির একার প্রচেষ্টায় তখন কোন আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টিসহ পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তিসমুহের ঐক্য, অন্ততঃ আওযামী লীগ ও কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতর ঐক্য বা সমঝোতা একান্ত প্রয়োজন ছিল" (৪/১৮১)। এক্ষেত্রে কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য হচ্ছে, উভয় পক্ষ একই সহযোগী-সূত্রে পরস্পরের সাথে যোগাযোগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এমন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তখন আদৌ সহজ কিংবা নিরাপদ ছিল না। একদিকে সামরিক শাসনের আতঙ্ক তো ছিলই, তাছাড়া, কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান নেতৃবর্গ আত্মগোপন অবস্থায় ছিলেন। তবু, সম্ভবত উভয় পক্ষের আগ্রহ এবং চিন্তার সামঞ্জস্যের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। শেখ মুজিব ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়াকে অনুরোধ করেছিলেন সংবাদ সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীর মাধ্যমে কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে

যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য। অপরদিকে কম্যুনিস্ট পার্টিও জহুর হোসেন চৌধুরীকেই অনুরোধ করেছিল মানিক মিয়ার মাধ্যমে শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগের জন্য। উভয় পক্ষের আগ্রহে-উদ্যোগে সেই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কয়েক সপ্তাহ সময়ে চার-পাঁচটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ের বিখ্যাত 'সংবাদ' সম্পাদক বজলুর রহমান উক্ত 'সিরিজ' সংলাপের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় লিখেছেন, "শেখ মুজিব তখনো ... পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের ... মূখ্য সংগঠক, বলতে গেলে প্রাণপুরুষ। শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখনো আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা। শেখ মুজিব তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন, মানতেন; তাঁর কথা ছিল তখনো আওয়ামী রাজনীতির শেষ কথা। তবু তরুণ প্রজন্মের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ছিল লক্ষণীয়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব তখনো ছিলেন সারা পাকিস্তানভিত্তিক আন্দোলনের মারফত 'গণতান্ত্রিক পাকিস্তানে'র চিন্তায় মোহাবিষ্ট। শেখ মুজিবুর রহমান কিন্তু তখনই বুঝে নিয়েছিলেন স্বাধীনতা ছাড়া বাঙালির মুক্তি নেই এবং সে লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রাজনীতির ধারা ঠিক করতে হবে। তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ছিলেন দুয়ের মাঝামাঝি। সোহরাওয়ার্দী সাহেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল নিঃশর্ত ও প্রশ্নহীন; কিন্তু গণতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসনের জন্য বাঙালির সংগ্রামকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার পথেই যেতে হবে, একথা শেখ মুজিবের মত তিনিও মনে করতেন" (১(৩)/১২৭৪-১২৭৫)।

খোকা রায় লিখেছেন, "সেই বৈঠক হয়েছিল ১৯৬১ সনের শেষ দিকে। সে সব বৈঠকে আওয়ামী লীগের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও মানিক মিয়া। কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে উপস্থিত ছিলাম মণি সিংহ ও আমি। ... প্রতিক্রিয়াশীল আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন গড়ে তোলা একান্ত দরকার সে বিষয়ে ... আমরা প্রথম বৈঠকেই একমত হয়েছিলাম। আন্দোলনের দাবী কি হবে, এবং আন্দোলন কিভাবে শুরু হবে, সে সম্পর্কে পরবর্তী ৩/৪টি বৈঠকে আলোচনা হয়েছিল। আলোচনার সময় শেখ মুজিবুর রহমান বারবার বলছিলেন যে, পাঞ্জাবের 'বিগ বিজনেস' যে ভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছিল ও দাবিয়ে রাখছিল তাতে 'ওদের সাথে আমাদের থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে; আন্দোলনের প্রোগামে ঐ দাবি রাখতে হবে' ইত্যাদি। তখন আমরা শেখ মুজিবকে বুঝিয়েছিলাম যে, কম্যুনিস্ট পার্টি নীতিগতভাবে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবী সমর্থন করে, কিন্তু সে দাবী নিয়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পরিস্থিতি তখনও ছিল না। 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান' দাবী নিয়ে ঐসব আলোচনার পরের বৈঠকে শেখ মুজিব আমাদের জানিয়েছিলেন, 'ভাই এবার আপনাদের কথা মেনে নিলাম। ... কিন্তু আমার কথাটা থাকলো' ইত্যাদি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬১ সন থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছিলেন" (৪/১৮২-১৮৩)।

আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রসঙ্গে 'আদর্শের ঐক্য' এবং 'কর্মসূচীর ঐক্য' ইত্যাদি কথা নিয়ে তুমূল তর্ক জমানো হয় এবং প্রায়শঃ আদর্শকে কর্মসূচীর ঐক্যের অন্তরায় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। অথচ লক্ষণীয় যে, অর্ধ-শতাব্দী

আগে একপক্ষে জাতীয়তাবাদী মুজিব এবং অপর পক্ষে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে অবিচল মনি সিং প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ আদর্শ বজায় রেখেই একসঙ্গে চলার চিন্তা করেছিলেন। "The communists proceeded from the assumption that the principal enemy on the world stage is imperialism and the fight against the Ayub regime was justified because it was an agent of imperialist powers ... Mujib....started from the premise that the Ayub regime represented the interests of the Punjabi `Big Business' which was exploiting the resources of East Bengal and must therefore, be confronted by every possible means" (৭/১০০)।

উভয় পক্ষে ঐকমত্যের ভিত্তিতে "সামরিক শাসনের অবসান, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি, ২১দফা কর্মসূচী মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তানের স্বয়ত্বশাসন, ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার, শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের জরুরী দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে এক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল। ঐসব দাবীর ভিত্তিতে ১৯৬২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের ছাত্রদের ভিতর থেকে আন্দোলন শুরু করার জন্য চেষ্টা শুরু করার সিদ্ধান্তও হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতর ঐ সমঝোতার কথা সারা প্রদেশে ঐ দুটি দলের কর্মীদের জানিয়ে দেওযা হয়েছিল" (৪/১৮৩)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা জোরদার আন্দোলন শুরু করার জন্য ছাত্রদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা একান্তই অপরিহার্য ছিল। "There were at this time two main student bodies at loggerheads with each other : the Students League which supported the Awami League and the Students Union, a left-wing organization. Both sides agreed to do their best to end the bickering between them to ensure the successful agitation" (৭/১০০)। শেখ মুজিবের উদ্যোগে কম্যুনিস্ট পার্টির সাথে আলোচনায় একদিকে অবিলম্বে একটা আন্দোলন সূচনা করার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তারচেয়েও বড় কথা, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর নতুন রাজনৈতিক চিন্তায় তিনি নিঃসঙ্গ নন এবং এক্ষেত্রেও আন্দোলন শুরু করলে একটি নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক শক্তির সহযোগিতা নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যাবে।

২১ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২ইং থেকে ছাত্র আন্দোলনের জন্য সক্রিয় ঐক্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতি শুরু করা হলেও জানুয়ারি মাসেই সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করায় সমগ্র পরিস্থিতি পাল্টে যায়। "সোহরাওয়ার্দী সাহেবের মুক্তির দাবীতে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের সম্মিলিত উদ্যোগ ও নেতৃত্বে ১৯৬২সনের ৩১শে জানুয়ারি হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছাত্রদের ঐ আন্দোলন ক্রমে ক্রমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন, সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি, শ্রমিক-কৃষকদের জরুরী দাবী-দাওয়া পূরণ প্রভৃতি দাবীতে এক বিরাট সংগ্রামের রূপ ধারণ করেছিল" (৪/১৮৩-১৮৪)। একটানা কয়েকদিন ঢাকা হয়ে উঠেছিল মিছিলের শহর। বহু জেলা শহরে বিশেষত, চট্টগ্রাম এবং রাজশাহীতেও আন্দোলনের প্রবল ঢেউ জেগেছিল।

সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তার ঃ
পূর্ব বাংলায় প্রবল ছাত্র-গণঅন্দোলন

আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রী-সংবিধান জারির সময় যতই এগিয়ে আসছিল, সোহরাওয়ার্দী ততই ১৯৫৬ইং সংবিধান পূণর্বহালের মাধ্যমে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করছিলেন। তাঁর জানা ছিল যে, আইয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভের সম্ভাবনা পূর্ব বাংলাতেই বেশি, কারণ, সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে এখানকার জনগণই সমধিক ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষ খুব তাড়াতড়িই উপলব্ধি করে যে, রাজনৈতিক দলের শাসন অপেক্ষা কোনো দিক থেকেই পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ঘটেনি। তদুপরি জনগণের ক্ষোভ-অভিযোগ জানানোরও কোনো সুযোগ নেই। সেনা-শাসনের শুরুতেই তূলণামূলকভাবে অনেক বেশি সংখ্যক বাঙালি আমলাকে চাকুরিচ্যুত করায় বাঙালি আমলাদের মধ্যেও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল। 'এবডো' (Elective Bodies Disqualification Order) জারি করে অনেক রাজনীতিককেই নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা করায় চরম ক্ষোভ ছিল রাজনীতিকদের মনেও। সব মিলিয়ে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি যথার্থই আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল।

আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই এবং পথ-পদ্ধতি নির্ধারণের জন্যই সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ইং জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ঢাকায় এসেছিলেন। ২৪ জানুয়ারি তারিখে আতাউর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমান, মানিক মিয়া, হামিদুল হক চৌধুরী, মাহমুদ আলী, আবু হোসেন সরকার প্রমুখ বিভিন্ন দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সোহরাওয়ার্দী এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। "They agreed to submerge their political differences and work for a common goal : the restoration of 1956 constitution. They all agreed to intensify their opposition to the Ayub Constitution expected to be promulgated soon" (৭/১০৩)। ঢাকা থেকে করাচিতে ফেরার পরই, সোহরাওয়ার্দীকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ২৯ জানুয়ারি (মতান্তরে ৩০ জানুয়ারি) গ্রেপ্তার করা হয়। এর মাত্র তিন-চারদিন পরেই ২ জানুয়ারি ঢাকাতে গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে। পরবর্তী পরিস্থিতিই প্রমান করেছে যে, এবার আইয়ুবের রাজনৈতিক চালে দারুণ ভুল হয়ে গিয়েছিল। "তিন বৎসরাধিক কাল ধরে বোবা হয়ে আছে এদেশের লোক - না খোঁচালে হয়তো আরো বেশ কিছুদিন বোবাই থাকতো। ... ঝড় কি তবে আসন্ন? আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকটা আপনা-আপনি ধর্মঘট হয়ে গেল। ... জগন্নাথ কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদিতে ষোলআনা ধর্মঘট হয়েছে। ... ভাল লক্ষণ নয় বলে মনে হয়" (৬/৩৫৯)। সামরিক সরকারের প্রবর্তিত 'পূর্ব পাকিস্তান' সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে ৩১ জানুয়ারি আইয়ুব খান ঢাকায় আসেন। স্মরণ করা যেতে পারে, আওয়ামী লীগ-কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্বোল্লেখিত গোপন সংলাপ-সমঝোতায় ছাত্র আন্দোলন শুরুর নির্ধারিত তারিখ ছিল ২১ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ইং কিন্ত সোহরাওয়ার্দীর

গ্রেপ্তারের খবরে সেটা শুরু হয়ে গিয়েছিল ৩১ জানুয়ারি তারিখেই, সেদিনই ঢাকায় এলেন আইয়ুব খান।

"আইয়ুব খাঁর মুখমন্ডলে দুশ্চিন্তার ছাপ স্পষ্ট দেখেছি। তাকে অভ্যর্থনা বা দর্শন করার জন্যেও পূর্বের মত লোকজন কোথাও জমাযেত হয়নি। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তার সম্বন্ধে তার উজিরসভার অন্যতম সদস্য আখতার হোসেন কোনো মন্তব্য করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বোঝা যায়, মন্ত্রীসভা এ ব্যাপারে একমত ছিল না" (প্রাগুক্ত)। 'প্রেস সেন্সরশিপ' থাকায় ছাত্র-ধর্মঘটের কোনো খবর ১ ফেব্রুয়ারির পত্রিকায় প্রকাশ করা যায়নি। ছাত্রেরা সেদিন ঢাকায় পত্রিকা পুড়িয়েছিল। ঢাকার দেয়ালে 'আইয়ুব খান মুর্দাবাদ' পোস্টার পড়েছিল। পরিস্থিতি এতটাই নাজুক হয়ে পড়েছিল যে, 'পাকিস্তান সপ্তাহ' উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান-সূচক 'ডি-লিট' ডিগ্রি গ্রহণের জন্য আইয়ুবের রাজশাহী যাওয়ার পূর্ব-নির্ধারিত কর্মসূচীও বাতিল করতে হয়েছিল। আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের কাছে 'প্রশ্নোত্তর বক্তৃতা' করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রদের প্রশ্নগুলি পত্রিকায় প্রকাশের নিশ্চয়তা দিতে না পারায় বক্তৃতা না করেই চরম অপমানিত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল।

৮ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান করাচি ফিরে গেলেন, কিন্তু আন্দোলন-গ্রেপ্তার থামেনি। আনুষ্ঠানিকভাবে আইয়ুব প্রণীত শাসনতন্ত্র জারি করা হয় ১ মার্চ, ১৯৬২ইং তারিখে, তার ক'দিন আগে থেকেই ঢাকাসহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আইয়ুবের শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল ছাত্র-গণআন্দোলন শুরু হয়। শাসনতন্ত্র জারির আগে থেকেই করাচিতে বন্দী ছিলেন সোহরাওয়ার্দী আর পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। এমন পরিস্থিতিতেই ১৬ই এপ্রিল থেকে ছাত্ররা তিনদিনের ছাত্র-ধর্মঘট ঘোষণা দিয়ে প্রথমবারের মত স্লোগান তুলেছিল 'আইয়ুবের রক্ত চাই'। ১৭ই এপ্রিল থেকে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়েছিল। "২১শে এপ্রিলের সংবাদপত্রে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিটি জেলখানা হতে প্রেরণ করা হয়েছিল। এটি ছিল তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারী অভিযোগের জবাব। সরকারী অভিযোগ যে কত দুর্বল ও হাস্যকর তার প্রমান জবাবে ছিল। পূর্বে যারা পাকিস্তানের বন্ধু ছিল শহীদ সোহরাওয়ার্দী নাকি সে-সব রাষ্ট্রকে শত্রু করে তুলেছেন" (৬/৩৬৪)।

২৭ এপ্রিল, ১৯৬২ইং তারিখে ঢাকায় মৃত্যু বরণ করলেন শেরে বাংলা ফজলুল হক। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জেলের ভিতরেই, কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সপ্তাহাধিক কাল কালো-ব্যাজ ধারণ করেছিলেন। "আমাদের সাথে অন্যান্য ওয়ার্ডের রাজবন্দীরা ... সাধারণ বন্দীরাও কলো ব্যাজ পরিলেন" (২/৫৭৮)। ২৮এপ্রিল পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত শেরে বাংলার জানাজা প্রসঙ্গে আবু জাফর শামসুদ্দিন লিখেছেন, "দুই লাখের বেশী লোক সমবেত হয়েছিলেন। ... গভর্ণর আজম খান জানাজাতে সামিল হয়েছিলেন। ... এত বড় জনসমুদ্র আমার জীবনে আমি আর কখনও দেখিনি। ... তিনি বাংলার লোকের আসল চরিত্র জানতেন এবং সকল প্রকার স্ববিরোধিতা সত্বেও ফজলুল হকের সত্যিকার রূপটিও সম্ভবত বাংলার লোক জানতো -

এবং ভালোবাসতো। ফজলুল হকের মৃত্যু উপলক্ষে সরকারী অফিস আদালত একদিন বন্ধ রাখা হয়েছিল (৬/৩৬৪-৩৬৫)।

"আয়ুব খানের সংবিধান ঘোষিত (১ মার্চ, ১৯৬২) হওয়ার পরে ১৯৬২ সনের এপ্রিল মাসে বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় পরিষদ ও মে মাসে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের এক প্রহসন করা হয়েছিল। ... কম্যুনিস্ট পার্টিসহ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ঐসব নির্বাচন বয়কট করেছিল। ... ১৯৬২ সনের ৮ই জুন রাওয়ালপিন্ডিতে তথাকথিত জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল। সেই দিন থেকেই দেশ থেকে সামরিক আইন উঠে গিয়েছিল" (৪/১৮৫-১৮৬)। পূর্ব পাকিস্তানের ৯জন নেতা আইয়ুবের জারিকৃত সংবিধানকে "অগ্রহণযোগ্য আখ্যায়িত করে এক যৌথ বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গণপরিষদ গঠনের দাবি জানানো হয়। এই ৯ নেতার অন্যতম ছিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ... কারামুক্তির পর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৯ নেতার বিবৃতির সাথে শেখ মুজিব একাত্মতা ঘোষণা করেন" (৫/৩১-৩২)। বিভিন্ন সূত্রে 'নয় নেতা'র মধ্যে ভাসানী, তর্কবাগিশ, আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান, মাহমুদ আলী, নুরুল আমিন এবং আবু হোসেন সরকার প্রমুখের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"১৯৬২ সালের ৮ই জুলাই তারিখে প্রায় সাড়ে তিন বছর (সামরিক শাসন জারির) পরে পুরানা পল্টন মাঠে পুনরায় এক বিরাট জনসভা হয়। পরদিন সংবাদপত্রের রিপোর্টে জনসংখ্যার পরিমান দু'লাখ বলা হয়। ... এ জনসভার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল, একই রঙ্গমঞ্চে ... মুসলিম লীগের নুরুল আমিন সভাপতি, বক্তা আবু হোসেন সরকার (কেএসপি) , আতাউর রহমান, মুজিবুর রহমান (উভয়ে আওয়ামী লীগ) , মাহমুদ আলী (ন্যাপ) প্রমুখ। সকলেরই দাবী বর্তমান Constitution বদলাও, রাজবন্দীদের ছাড়ো - ইত্যাদি" (৬/৩৬৬-৩৬৭)। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতপথের নানা ফারাক সত্বেও 'সাধারণ প্রতিপক্ষের' বিরুদ্ধে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার 'বাস্তব' রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীটি অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি।

ছাত্রসমাজের স্বার্থ-বিরোধী দু'টি সরকারী উদ্যোগ সেপ্টেম্বর মাসে ছাত্র আন্দোলনকে তুঙ্গস্পর্শী করে তুলেছিল। সেনা-শাসকের নিয়োজিত 'বিচারপতি হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন'এর রিপোর্ট তড়িঘড়ি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। রিপোর্টটি সম্পর্কে ছাত্রসমাজ আগে থেকেই ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল এবং সরকারের দিক থেকেও প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিবর্তনের আগে ছাত্র-জনগণ তো নয়ই, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সাথেও কোনো আলোচনা বা মতবিনিময় করা হয়নি। সরকারী 'ডিক্রি' জারির মাধ্যমেই রিপোর্টটি কার্যকর করা হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে আরেকটি সরকারী হুকুম জারি করে ছাত্র-রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। করাচিতে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব করেছিলেন, সমগ্র বিষয়টি জাতীয় সংসদে আলোচনা করা হোক। কিন্তু তাঁর 'নরম কথা'য় সরকার কর্ণপাত করেনি। উল্লেখ্য যে, ছ'মাসের অধিক কারাবন্দী রাখার পর, পূর্ব বাংলার "ছাত্রজনতার

আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১৯৬২ সালের ১৯শে আগস্ট শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়। ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকা আগমন করেন। বিমান বন্দরে লাখ লাখ লোকের সমাগম হয়" (৫/৩২)।

১৭ সেপ্টেম্বর "ঢাকাতে ... সেনাবাহিনী মোতায়েন সত্বেও ছাত্র-জনতার ... বিশাল শোভাযাত্রায় টঙ্গী, তেজগাঁ ও ডেমরা অঞ্চলের বহু শ্রমিক যোগদান করেছিলেন। ... টঙ্গীতে এক শ্রমিক মিছিলের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে সুন্দর আলী নামে একজন শ্রমিক নিহত হয়েছিলেন। ... '৬২ সনের ঐ ছাত্র আন্দোলন ছিল সামরিক শাসন জারির পরে প্রথম গণ-আন্দোলন। ঐ আন্দোলন সামরিক শাসন সম্পর্কে জনগণের ভয়ভীতি ভেঙ্গে দিয়ে আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে ... বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের দরজা খুলে দিয়েছিল। ইহাই ছিল '৬২ সনের ছাত্র আন্দোলনের বিশেষ তাৎপর্য" (৪/১৮৪-১৮৫)। বাষট্টির শিক্ষা কমিশন বিরোধী "হরতাল চলাকালীন পুলিশের গুলিতে তিনজন ছাত্র শহীদ হন। ... ২৯শে সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে এক ... জনসভায় তৎকালীন সময়ে 'বাঙালি জাতির কণ্ঠস্বর' বলে অভিহিত আওয়ামী লীগের কর্ণধার শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন" (৩/১১৫)।

"শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশব্যাপী ঝটিকা সফরের মাধ্যমে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ... জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (National Democratic Front) গঠিত হয়" (৫/৩২)। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের 'প্লাটফর্ম' হিসেবে 'এনডিএফ' গঠনের পর সোহরাওয়ার্দী করাচি ফিরে গেলেন। কিছুদিন আগের কারাবন্দীত্ব তাঁর দারুণ স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়েছিল। ১৯৬৩ইং জানুয়ারি মাসে তিনি পর পর দু'বার হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন। এসময়েই আইয়ুব শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী জারি করে রাজনৈতিক দল পূনরুজ্জীবনের সুযোগ সৃষ্টি করলেন। তবে তার আগেই তিনি মুসলিম লীগের একাংশের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় নিজস্ব 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' গঠনের ব্যবস্থা পাকা করে নিয়েছেন।

অনেকেরই অভিমত, সাধারণ জনগণের ভোটাধিকার হরণকারী মৌলিক গণতন্ত্র এবং নিজস্ব রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার পর, সামরিক উর্দি পরেই নিজেকে গণতান্ত্রিক শাসক প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়েই রাজনৈতিক দল পূণর্গঠনের সুযোগ দিয়েছিলেন আইয়ুব খান। এর ফলে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতান্তর বৃদ্ধির একটা অনিবার্য পরিস্থিতিও সৃষ্টি করা গিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রথমেই জামাতে ইসলামী দলটি পূণর্গঠিত হয়, অতঃপর অন্যান্য দল। বাস্তব পরিস্থিতি সোহরাওয়ার্দীর জন্য যথার্থই বিব্রতকর হয়ে পড়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক দল পূণরুজ্জীবনে তিনি বাধা দিতে পারছিলেন না, আবার পূর্ব পাকিস্তানে এনডিএফ ভেঙ্গে যাক বা দুর্বল হয়ে পড়ুক, এটাও মানতে পরছিলেন না। অপরদিকে, শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের তরুণ নেতাকর্মীরা দলের পূণরুজ্জীবনে একান্ত আগ্রহী ছিলেন। এসময় সোহরাওয়ার্দীর স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটায় চিকিৎসার জন্য বৈরুত হয়ে লন্ডনে চলে গেলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে নানা মত-পথের নেতাদের 'এনডিএফ'

ক্রমশই উদ্যমহীন এবং দুর্বল হয়ে পড়ছিল। সংগঠনটিকে সমন্বিত এবং সুসংগঠিত করার মত ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক দক্ষতা নুরুল আমিনের ছিল না। অপরদিকে মওলানা ভাসানী এনডিএফ'এর অংশীদার হওয়া সত্বেও সংগঠনটিকে জোরদার করার বদলে প্রকাশ্যেই 'নাথিং ডুয়িং ফ্রন্ট' বলে পরিহাস করতেন। তত দিনে তাঁর সাথে আইয়ুবের 'চীন-কেন্দ্রীক' যোগাযোগ গড়ে উঠছে।

আওয়ামী লীগ পূণরুজ্জীবনের ব্যাপারে সোহরাওয়ার্দীর সাথে আলোচনার জন্য ১৯৬৩ইং আগস্ট মাসে শেখ মুজিব লন্ডনে গেলেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী বললেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তানের এনডিএফ-নেতৃবৃন্দকে কথা দিয়েছেন, তাঁদের সাথে আলোচনা না করে আওয়ামী লীগ পূণর্গঠিত করা হবে না। সুতরাং মুজিবকে ব্যর্থ হয়েই ফিরে আসতে হলো। কিছুদিন পরেই, দল পূণর্গঠনে একান্ত আগ্রহী নেতা-কর্মীরা শেখ মুজিবকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন আবার লন্ডনে গিয়ে নেতার সম্মতি অর্জনের চেষ্টা করেন। তবে তার আগেই, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ইং বৈরুতের হোটেলে রহস্যজনক মৃত্যু ঘটে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর, যা আদৌ সংশয়ের উর্ধে ছিল না। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৪ইং জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তাঁর পাকিস্তানে ফেরা নির্ধারিত ছিল। "The timing and circumstances of Suhrawardy's death left no doubt in Mujib's mind that his leader's death was not natural. Who would benefit from his death? Only Ayub Khan. Mujib was therefore convinced that it was another case of `political murder' engineered by the Ayub regime." (৭/১১৫)।

আওয়ামী লীগের পূণরুজ্জীবন ঃ
অভ্যন্তরীণ মতভেদ সত্বেও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত

শেরে বাংলার মৃত্যু ঘটে ১৯৬২ইং এপ্রিল মাসে আর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু ১৯৬৩ইং ডিসেম্বর মাসে। "সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই দুই প্রবীণ নেতার মৃত্যুতে রাজনৈতিক অঙ্গনে শূন্যতার সৃষ্টি হয। ... শেখ মুজিব হয়ত-বা কিছুটা নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব অনুভব করেন। ... উপলব্ধি করেন যে, বাঙালির স্বার্থরক্ষা এবং অধিকার আদায়ের কঠিন সংগ্রামে এখন থেকে তাঁকেই আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে এবং তিনিই হয়ে পড়বেন পশ্চিমা শাসকদের প্রধান শত্রু - মূল টার্গেট। ... দলকে সুসংগঠিত করতে হবে আগামী দিনের কঠিন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য" (১(১)/১৩৭)। "He (Mujib) had to overcome the objections of old-time senior leaders of the party who argued that Suhrawardy's wishes should not be disregarded so soon....But Mujib had his support among the young party workers, ... They had no faith in the NDF's ability to shake off the yoke of the Ayub regime; ....Like Mujib, they wanted the struggle for the rights of Bengalis in various spheres to be continued simultaneously with the campaign for the restoration of democracy" (৭/১১৭)।

এ সময় আইয়ুব-মোনায়েম চক্র পেশাদার অবাঙালি খুণীদের ভাড়া করে পূর্ব

বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল। "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ... আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে 'দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেন। ১৬ই জানুয়ারি 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক দাঙ্গা-বিরোধী প্রচারপত্র বিলি করা হয়। এই অভিযোগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমদকে গ্রেপ্তার করে পরে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়" (৫/৩২)। উক্ত প্রচারপত্রের মূল বক্তব্য ছিল : "পূর্ব বাংলার মানুষের জীবনের উপর এই পরিকল্পিত হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে আমি পূর্ব বাংলার সকল মানুষকে আহ্বান জানাইতেছি। প্রতি মহল্লায় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করুন। ... খাদেম শেখ মুজিবুর রহমান" (৩/১১৮)। দৈনিক ইত্তেফাক প্রথম পৃষ্ঠায় বিশাল হরফে লিখেছিল : "দিকে দিকে নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস"। সরকারী চক্রান্তের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে "ঢাকার সমস্ত জাতীয় দৈনিক ... 'বাঙালি রুখিয়া দাঁড়াও' শিরোনামে একযোগে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল, তার ফলে ... বাঙালি জনগণের ভিতর দাঙ্গার বিরুদ্ধে এক মনোভাব জেগে উঠেছিল। ... ফলে দাঙ্গা ছড়াতে পারেনি। ... সরকারও দাঙ্গা দমনের জন্য বিলম্বে হলেও পুলিশী ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়েছিল" (৪/১৮৭)। ছাত্র লীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নসহ জাতীয়তাবাদী, প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলিও দাঙ্গা-বিরোধী বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অপরদিকে মোনায়েম খানের মদদপুষ্ট 'ন্যাশন্যাল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন - এন.এস.এফ' নামক কুখ্যাত ছাত্র সংগঠনটি বিপরীত ভূমিকায় নেমেছিল।

১৯৬৪ইং ২৫ জানুয়ারি মওলানা তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আওয়ামী লীগ পূণরুজ্জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সভায় আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত যুক্ত-সভায় মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ সভাপতি এবং শেখ মুজিবুর রহমান সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরবর্তী ৫ জুন ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভায় দলীয় ১১-দফা দাবীনামা (পরিশিষ্ট-৩) প্রণয়ন করা হয়। "শেখ মুজিব ১১-দফার মতো দুঃসাহসিক দাবীগুলো উত্থাপন করলে ওয়ার্কিং কমিটির অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ... এই ১১-দফাই যে ছিলো ৬-দফার ভিত্তিমূল, 'অবজারভার'-এর রিপোর্ট (৬জুন, '৬৪ইং) থেকে সে সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে ঃ The East Pakistan Awami League ... announced its 11 point draft manifesto ... for a long term planning based on two economy theory to remove the economic dispariry between the wings ... aimed at building up a happy and prosporous society, free from exploitation of the people by a few and ensure practice of unfattered democracy" (২৩/৩৯)।

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৭ইং আওয়ামী লীগের সভাপতি ভাসানী পদত্যাগ করে ন্যাপ গঠনের সময় থেকেই মওলানা তর্কবাগীশ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তখনই নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি মাহমুদুল হক ওসমানী পদত্যাগ করে ন্যাপে যোগ দিয়েছিলেন। পূণরুজ্জীবিত নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হলেন নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং সাধারণ

সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন জনাব জহিরুদ্দিন ও পরে এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান। দু'বছর পরে, ১৮ মার্চ, ১৯৬৬ইং অনুষ্ঠিত দলীয় কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান সভাপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ কাউন্সিলেই বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক '৬-দফা' অনুমোদিত হয়েছিল। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক রাজনৈতিক তত্বকথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্তিটি প্রাক্তন ফরাসী প্রেসিডেন্ট ভ্যালেরী জিসকার্ড দ্যেস্টাংএর, "অতীতের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকা ... কোনো রজনৈতিক নেতা বা দলের কাজ হতে পারে না। একজন সত্যিকার জননেতা বা দেশপ্রেমিক গণমুখী রাজনৈতিক দলের কর্তব্য হবে স্বপ্নময় সোনালী ভবিষ্যতের পানে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া" (৫/৭০)। নিঃসন্দেহে সেদিন আওয়ামী লীগ পূণরুজ্জীবনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন একটি লক্ষ্যের দিকেই জাতিকে অগ্রসর করে নিতে চেয়েছিলেন।

আইয়ুব-বিরোধী 'কপ' গঠণ ঃ
ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচন

আযুব খানের নিজস্ব রাজনৈতিক দল 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' গঠন করা হয়ে গেছে, রাজনৈতিক দল গঠন-পরিচালনার 'সামরিক নিষেধাজ্ঞা' প্রত্যাহারে পর পাকিস্তানের উভয় অংশে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই পূণরুজ্জীবিত হয়েছে। এখন তিনি 'সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্র-ক্ষমতা জবরদখলকারী' প্রেসিডেন্টের পরিচয় পাল্টে সম্পূর্ণ বেসমরিক বা 'সিভিল প্রেসিডেন্ট' নির্বাচিত হতে আগ্রহী হলেন। ১৯৬২ইং জারিকৃত 'মৌলিক গণতন্ত্রী' সংবিধান অনুসারে ভোটাধিকারী কেবল উভয় প্রদেশে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার বি.ডি. মেম্বার। সুতরাং 'আস্থাশীল' আইয়ুব খান সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ইং ঘোষণা দিলেন, ১৯৬৫ইং ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান তাৎক্ষণিকভাবে আয়ুবের ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করলেন, "কিসের মৌলিক গণতন্ত্র? প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন চাই" (৩/১১৯)। কিন্তু দ্রুতই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতির প্রসিডেন্ট নির্বাচন ঠেকানো যাবে না, বরং নির্বাচনের সুযোগটাকে কাজে লাগিযে দলীয় লক্ষ্য এবং আইয়ুব-বিরোধী বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়াটাই সময়োপযোগী হবে। তাই, আইয়ুবের বিরুদ্ধে একজন সর্বদলীয় প্রার্থী দাঁড় করাতে আওয়ামী লীগই প্রথম উদ্যোগী হয়েছিল। তখন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ঢাকাতেই অবসর-জীবন যাপন করছিলেন। পাকিস্তান আ.লীগের সভাপতি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহর মাধ্যমে যোগাযোপ করে তাঁকে আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সরকার-বিরোধী দলগুলির সমন্বয়ের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করা হয়। নাজিমুদ্দিন রাজি হলেও আপত্তি জানিয়েছিলেন দুজন নেতা সম্পর্কে। একজন মওলানা ভাসানী, যিনি আইয়ুবের সাথে ভেতরে-বাইরে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। দ্বিতীয় জন শেখ মুজিব, নাজিমুদ্দিনের দৃষ্টিতে একজন 'Street leader' মাত্র এবং গণতন্ত্রের সংগ্রামে অপরাপর নেতৃবৃন্দের পাশে চলার যোগ্য নন। তথাপি ঢাকায় পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন আহ্বান

করতে নাজিমুদ্দিনকে বিশেষভাবে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করা হয়েছিল।

১৯৬৪ইং ২৬ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনেই আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সমবেতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য গঠন করা হয়েছিল 'Combined Opposition Party – COP' বা 'সম্মিলিত বিরোধীদল'। "অতঃপর 'COP'-এর প্রধান নেতৃবৃন্দ মওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং নবাবজাদা নসরুল্লাহ খানের অনুরোধে মিস ফাতেমা জিন্নাহ (জিন্নাহর বোন) প্রার্থী হিসেবে তাঁর সম্মতি প্রদান করেন" (৩/১১৯)। ১৭ সেপ্টেম্বর মিস জিন্নাহর মনোনয়ন ঘোষণা করা হয়। 'কপ', বিশেষত মিস জিন্নাহর নির্বাচনী প্রচারণার সহযোগিতা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এগিয়ে এসেছিলেন পূর্ব বাংলার জনগণের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয় প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল আজম খান। 'কপ' গঠন, মিস জিন্নাহর প্রার্থিতা এবং নির্বাচনী প্রচারণায় আজম খানের যুক্ত হওয়া, সবকিছুই ছিল আইয়ুবের জন্য বিব্রতকর। এমন পরিস্থিতিতে "The regime had to resort to administrative pressure on the BDs and had to buy support whenever possible, using funds reserved for the works programme.....Having failed to brand Mujib and Abdul Gaffer Khan ('Frontier Gandhi') as Indian agents in the eyes of general public, Governor Monem Khan targeted Mujib especially for harassment in order to reduce his campaign appearances. (৭/১২২)। জনসভায় উত্তেজনামূলক বক্তৃতা করার অভিযোগে মুজিবকে গ্রেফতার করা হয় ৭ নভেম্বর তারিখে, জামিনে মুক্ত হয়ে তিনি মিস জিন্নাহর সাথে আলোচনার জন্য করাচি চলে গেলেন এবং ঢাকায় ফিরে আসার পর ৩ ডিসেম্বর তারিখে আবার গ্রফতার করা হয়। মুজিব এবারও জামিনে মুক্তি পেলেন।

"সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহর সমর্থনে সারা পূর্ব পাকিস্তানে এক ব্যাপক গণ-জাগরণ দেখা দিয়ছিল। অগণতান্ত্রিক পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা তথা মুষ্টিমেয় 'বুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের' ভোটে অনুষ্ঠিত সেই নির্বাচনে 'সম্মিলিত বিরোধী দলের' প্রার্থী মিস জিন্নাহ পরাজিত হয়েছিলেন বটে ... কিন্তু ... পূর্ব পাকিস্তানে ... প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আইয়ুব খান ও তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিলেন" (৪/১৮৮)। ভোটের পরিসংখ্যানে দেখা গেল, "পাকিস্তানের দুই অংশের ... ৮০,০০০ ভোটারের মধ্যে ৭৯,৭০০জন ... ভোট প্রদান করেন। ... মোহতারেমা ... জিন্নাহ ২৮, ৬৯১ ভোট পেয়ে পরাজিত হন এবং ... আইয়ুব খান ৪৯,৯৫১ ভোট পেয়ে জয়যুক্ত" (৩/১১৯) হন। পূর্ব বাংলায় ৪০,০০০ ভোটের মধ্যে আইয়ুব পেয়েছিলেন ২১,০১২ ভোট আর মিস জিন্নাহ ১৮,৪৩৪ ভোট, আইয়ুবের চেয়ে মাত্র ২,৫৭৮ ভোট কম। নির্বাচনী প্রথার বৈশিষ্ট্যে ও 'কপ'এর কোন কোন নেতার আন্তরিকতার অভাবে মিস জিন্নাহ পূর্ব বাংলায়ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অল্পের জন্য পেলেন না"।

"There could be no doubt that if the machinery of the government had not been blantly misused, Miss Jinnah would have been the victor in East Pakistan by a wide margin and most probably in Pakistan as a whole"

(৭/১২৩)। "উত্তরাঞ্চলে ... অর্থাৎ যেসব এলাকায় মওলানা ভাসানীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি বলে বিবেচিত হতো, সেসব এলাকায় আইয়ুব খান তূলণামূলকভাবে বেশি ভোট লাভ করেছেন। তাহলে কি ... তখন থেকেই মওলানা ভাসানী সন্তর্পণে মহাচীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর সাথে পরামর্শ শুরু করেছিলেন? এ সম্পর্কে ভাসানী সমর্থক গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ লিখেছেন, ... নির্বাচনের পর বিরোধী শিবির মিস জিন্নাহর পরাজয়ের জন্য ন্যাপ ও মওলানা ভাসানীকে দোষারোপ করে। সকল দক্ষিণপন্থী বিরোধী দল একমাত্র বামপন্থী ন্যাপকে সমালোচনা করার কারণ, ন্যাপ 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে' বিশ্বাসী এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে, সুতরাং ন্যাপ-নেতারা সর্বাত্মক প্রচার চালায়নি। কোন কোন মহল এ অভিযোগও করে যে, নির্বাচনের ঠিক আগে মওলানা ভাসানী নিস্পৃহ হয়ে পড়েন এবং সেজন্য উত্তরাঞ্চলের জেলাসমুহে ... আইয়ুব বেশি ভোট পেয়েছেন। এই দোষারোপ একেবারে সত্যি না হলেও মিথ্যাও নয়" (৩/১২০)।

প্রাসঙ্গিক মন্তব্য জহুর হোসেন চৌধুরীর, "মওলানা সাহেবের রাজনীতিতে দুটো পরস্পরবিরোধী ধারা সবসময়েই বিরাজ করেছে। ... তাঁকে দেশের যখন সবচেয়ে বেশি প্রযোজন নেতৃত্ব দেবার জন্য ঠিক তখনই তিনি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে মিস জিন্নাহ'র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় মওলানা সাহেব সফর করা ছেড়ে দিয়ে ট্াঙ্গাইলের বিন্নাফৈর যেয়ে বসে রয়েছেন। ... আমরা চারজন (জহুর হোসেন চৌধুরী, মানিক মিয়া, শহীদুল্লাহ কায়সার এবং ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল হক) বিন্নাফৈর পৌঁছে মওলানা সাহেবকে বহু অনুনয় করা সত্বেও তিনি অসুস্থতার কারণে নির্বাচনী প্রচারে নামতে রাজি হলেন না। ... ইলেকশনের ফলাফল বেরোবার পর দেখা গেল, মিস জিন্নাহ পূর্ব বাংলায় শতকরা উনপঞ্চাশটি ভোট পেয়েছেন আর পশ্চিম পাকিস্তানে ... শতকরা উনত্রিশটি। এতে মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। যদি মওলানা ভাসানী একটু চেষ্টা করতেন তহলে হয়ত অন্ততঃ পূর্ব বাংলার রায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিরুদ্ধে যেত" (৯/৪৩-৪৪)।

অনেকে আশা করেছিলেন, মওলানা ভাসানী তৎপর হলে পূর্ব বাংলার ভোটের সংখ্যা দিয়েই মিস জিন্নাহ সারা পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারতেন, আবার অনেকে একান্ত যুক্তিসঙ্গত সীমিত আশাই পোষণ করতেন যে, পূর্ব বাংলার নির্বাচনী-রায় অনিবার্যভাবেই আইয়ুবের বিরুদ্ধে যেতে পারতো। কী হতো তাতে? "পূর্ব বাংলার ভোটের ফলাফলের দিকে রাজনৈতিক মহল আগ্রহভরে তাকিয়েছিলেন। ... শেখ মুজিবুর রহমান এ মর্মে একটি বিবৃতি তৈরি করে রেখেছিলেন যে, পূর্ব বাংলা থেকে আইয়ুব খান তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতেমা জিন্নাহ থেকে কম ভোট পেলে তা আইয়ুব খানের প্রতি বাঙালিদের অনাস্থা হিসেবে গণ্য করতে হবে" (৩/১১৯)। শেখ মুজিবের হিসেবটা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, অপরদিকে আইয়ুবের হিসেবটা আশাতিরিক্ত সফল হয়েছিল। অতঃপর সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, "to set up a `patronage committee' to reward the people who worked for Ayub during the election campaign" (৭/১২৩)।

পাক-ভারত যুদ্ধ, ১৯৬৫ইং ঃ
নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ

পূর্ব বাংলা থেকে সহস্রাধিক মাইল দূরে সংঘটিত মাত্র ১৭ দিন স্থায়ি পাক-ভারত যুদ্ধটি পাকিস্তানের চলমান রাজনীতির গতিমুখ পাল্টে দিয়েছিল, বলা চলে, অপরিবর্তনীয় ভাবেই। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট স্বঘোষিত 'ফিল্ড মার্শাল' এবং স্তাবকদের কথিত 'লৌহ মানব' আয়ুব খান স্বতঃপ্রণোদিত পরিকল্পনায় কাশ্মির-কেন্দ্রীক যুদ্ধটি শুরু করায় যুদ্ধের পরে হয়ে পড়েছিলেন যথার্থই 'পরাজিত সৈনিক'। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতির ময়দানে আবির্ভূত হলেন আইয়ুবেরই অনুগ্রহপুষ্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো। আইয়ুবের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে রাতারাতি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক 'হিরো' হয়ে উঠলেন। আইয়ুবের পতন অনিবার্য, হিসেবে ভুল হয়নি ভুট্টোর, তাই আইয়ুব-বিরোধী রাজনীতিবিদের পরিচয়ে তিনি গভীর যোগাযোগ-সখ্যতা রক্ষা করেছেন, পরবর্তী সারির জেনারেলদের সাথে, তার মধ্যে প্রধান ছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান, পাকিস্তানের পরবর্তী সেনা-শাসক। অপরদিকে কিছুকাল যাবৎই পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবুর রহমানের জনসমর্থন এবং সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ-সমৃদ্ধ রাজনৈতিক বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা সংশয়াতীতভাবে বেড়ে চলছিল।

২৬ মে, ১৯৬৪ইং তারিখে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। নেহরুর অন্তেষ্টি-ক্রিয়ায় পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়েছিলেন আইয়ুবের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জেড. এ. ভুট্টো, সঙ্গে পররাষ্ট্র সচিব আজিজ আহমেদ এবং আই.এস.আই প্রধান ব্রিঃ. রিয়াজ হোসেন। এমন আকস্মিক দুর্ঘটনায় ভারতে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি ভুট্টোর মনোযোগ আকর্ষণ করেনি, তিনি বরং উপলব্ধি করেছিলেন, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী একজন দুর্বল ব্যক্তিত্বের মানুষ, তাঁকে নড়বড়ে করে ফেলা কঠিন কাজ হবে না। ভূট্টোর সহযাত্রীরাও এবিষয়ে একমত পোষণ করেন। "Their hawkish views influenced Ayub, ... to blunder into an adventure in Kashmir. In August (1965) Pakistan sent infiltritators into Kashmir in the expectation that Muslims there would join them and liberate Kashmir.....On 6 September this misguided operation escalated into a full-scale war when India retaliated by striking across the international border. 'Indians have you by the throat', warned the American Ambassador in Pakistan to Ayub.....In the field the Pakistan Army fared miserably...in the course of fighting a numeraically superior enemy" (৭/১২৬)।

বাঙালি মে.জে. মুহম্মদ খলিলুর রহমান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে 'আটক' ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর অব্যবহিত পরেই একদিন অফিসে তাঁর 'বস' জেনারেল ইরশাদ (যাকে জেনারেল খলিল খুবই সৎ এবং পান্ডিত্বপূর্ণ মনে করতেন) বলছিলেন, "১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে সমর সরঞ্জাম ছিল অপ্রতুল। ... ভারতের তূলণায় পাকিস্তানের সামরিক শক্তি কম। এই শক্তি

দিয়ে পাকিস্তানের দু'অংশেরই সম্যক প্রতিরক্ষা বিধান সম্ভব নয়। অতএব, আমাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা নির্ভর করবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতরক্ষার ওপর। এছাড়া উপায়ও নেই"। জেনারেল খলিলের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, "ইরশাদ যে কথা বলতে পারলেন না, তা হলো, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের ফলাফল, পাঞ্জাবিদের মতে কোন অজ্ঞাত কারণে, আর সমগ্র পৃথিবী জানে অবশ্যম্ভাবীরূপে, ... ঘটেছে চরম পরাজয়; কিন্তু ... ভারত তখন পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করেনি। হয়তো অহেতুক রক্তপাতের প্রয়োজন ছিল না। যুদ্ধবাজ আইয়ুবের নাক থেকে যথেষ্ট রক্ত পাঞ্জাবে (লাহোর ফ্রন্টে) ঝড়েছে এবং ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতি লাহোরের দরজার কাছ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে থামেনি" (১০/১৯)।

জেনারেল ইরশাদের কথাগুলি তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা-লব্ধ নয়। ১৯৬৫ইং যুদ্ধের সময়কার পাক-প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ছিলেন গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহম্মদের (১৯৫৪ইং) 'মিনিস্ট্রি অব টেলেন্টস্'এর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতিও। আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন, "লাহোর কর্পোরেশন প্রদত্ত মানপত্রেরে জবাবে আইয়ুব খান বলেছিলেন "ইস্ট পাকিস্তান ইজ ইনডিফেনসিব্‌ল। ডিফেন্‌স্ অব ইস্ট পাকিস্তান লাইয ইন ওয়েস্ট পাকিস্তান"। কয়েকদিন পরে এবিষয়ে আবুল মনসুসর আহমদ এবং আইয়ুব খানের প্রত্যক্ষ আলোচনা হয়, "প্রধান সেনাপতির মুখেও অবিকল কলিকাতার মুসলিম বস্তিওয়ালার কথাই শুনিলাম। ভারত যদি পূর্ব বাংলা আক্রমণ করে, তবে পাকিস্তান বাহিনী দিল্লির লালকেল্লা ও লোকসভার শিখরে পাকিস্তানি পতাকা উড্ডীন করিবে। হিন্দুস্তান অতঃপর পূর্ব পাকিস্তান ফিরাইয়া দিয়া আপোস করিবে" (২/৩৫৯-৩৬০)।

আবু জাফর শামসুদ্দিনের পর্যবেক্ষণ, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভেবেছিল "চীনের সঙ্গে যুদ্ধে ভারতের দুর্বলতা প্রমাণিত হয়েছে। এ সময়ে একটি ঝুঁকি নেয়া যেতে পারে। ... আইয়ুব খান ... বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকগণকে জেহাদী মুসলিমরূপে কাশ্মিরের ভারতীয় অংশের ভিতরে প্রেরণ করতে থাকেন ... কিছুদিনের মধ্যেই কৌশলটা ধরা পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনী শ্রীনগর বিপন্ন করে তুললে ভারত লাহোর ও করাচি ফ্রন্ট বেছে নেয়। দশ-পনর দিনের মধ্যে পাকিস্তানের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। ... পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গোলাগুলি অস্ত্রশস্ত্র যখন প্রায় নিঃশেষিত তখন আইয়ুব খান প্রমাদ গণেন। নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মিরের রাজনৈতিক সমস্যা এড়িযে গিয়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৫-০৯-'৬৫ তারিখে উভয় পক্ষ প্রস্তাব মেনে নেয়" (৬/৪০৪-৪০৫)। সোভিয়েত-মধ্যস্থতায় তাসখন্দে ১০জানুয়ারি, ১৯৬৬ইং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে স্বাক্ষরিত (যুদ্ধবিরতি) চুক্তিটি 'তাসখন্দ চুক্তি' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

আবু জাফর শামসুদ্দিনের প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ-মন্তব্য লক্ষণীয়, "কাশ্মির প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানি মুসলমান সমাজের দুর্বলতা ছিল। ভারতকেই আক্রমণকারীরূপে প্রতিপন্ন করার জন্যে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাওযা হচ্ছিল। ... সাধারণ মানুষ যতটা না বিভ্রান্ত হয়েছিল তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত হয়েছিল বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। ... কেউ কেউ বই লিখে 'তমঘা' পান। ... মওলানা ভাসানীসহ প্রায় সকল নেতা ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ

ঘোষণা করেন। একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ... তিনি যুদ্ধটাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেননি। ... ১৭দিন স্থায়ি পাক-ভারত যুদ্ধে রাজনৈতিক দিক থেকে সবচেয়ে লাভবান হন ... ভুট্টো। ... ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করার পরামর্শদাতাদের মধ্যে নাকি ভুট্টো ছিলেন শীর্ষস্থানে। ভুট্টো (যুদ্ধ প্রসঙ্গে) জাতিসংঘে গরম বক্তৃতা দিয়ে পাকিস্তানবাসীর মন আকর্ষণ করেন। পরাজয় তাঁর ইমেজ বৃদ্ধি করে, আইয়ুব খানের ইমেজ হ্রাস পায়। ... আমার বিবেচনায়, ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ব্যতীত পূর্ব পাকিস্তানের সকল শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবী 'simpleton' এর আচরণ করেছিলেন" (৬/৪০৫-৪০৬)।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে শেখ মুজিব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক দাবির মূল কথাগুলি ছিল ঃ "পূর্ব পাকিস্তানকে ১৭দিন যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে 'এতিমের' মতো অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যরা যদি দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত 'লেফট রাইট' করে হেঁটে যেতো, তবুও তাদের বাঁধা দেয়ার মত অস্ত্র বা লোকবল কিছুই পূর্ব বাংলার ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানও যেমন পাকিস্তানের একটি প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানও তেমনি একটি প্রদেশ। বরং ... পূর্ব পাকিস্তান লোক-সংখ্যাগরিষ্ঠ, একচোখা নীতির ফল ভালো হবে না। আমাদের ন্যায্য অধিকার আমাদের দিতে হবে" (৩/১২১)। আইয়ুব খান যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে ... আলোচনার জন্য ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৫ইং তারিখে ঢাকায় এসেছিলেন। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এসময় আলোচনার সুযোগে অধিকতর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানালেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

আইয়ুবের সাথে আলোচনার সময় "Mujib complained about the neglect of the defence of East Pakistan. He also faulted the government for inadequate economic development of the eastern wing as well as for repression of Bengali culture as evidenced by the ban imposed on Tagore Songs by the Radio Pakistan since the outbreak of the war. By this audacity and outspokenness he became a marked man. Hitherto he had been a subject of surveillance by the civil intelligence. From this time onwards, the Inter-Services Intelligence (ISI) began to take a close interest in his activities and started to assemble materials about him for possible use against him in future" (৭/১২৯)।

পাক-ভারত যুদ্ধ এবং তাসখন্দ চুক্তির পরিণামে খোদ পশ্চিম পাকিস্তানে আইয়ুবের জনপ্রিয়তায় ধ্বস নামে এবং আইয়ুব-বিরোধী প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ৩১ জানুয়ারি ১৯৬৬ইং প্রথমে লাহোরে এবং পরের দিন মূলতান ও রাওয়ালপিন্ডিতে প্রচন্ড ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়, পুলিশের গুলিতে মারা যায় অনেক ছাত্র। এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধের মূল পরামর্শদাতা ভুট্টোর প্রতি আইয়ুবের ক্ষোভ এবং ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ইং জুন মাসে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুট্টোকে বরখাস্ত

করলেন আইয়ুব। কিন্তু এটা ভুট্টোর জন্য যথার্থই 'শাপে বর' হলো। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে 'ঘাস খেয়ে হলেও হাজার বছর যুদ্ধ করা'র কথা বলে জনগণের 'হিরো' হয়ে যান। তাই মন্ত্রীত্ব থেকে বরখাস্তের বিষয়টাকেই আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এবং নিজস্ব জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে সফলভাবেই কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। ১৯৬৭ইং মাঝামাঝি ভুট্টো 'পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি-পিপিপি' নামে নিজস্ব দল গঠণ করে দলীয় আদর্শ ঘোষণা করলেন 'ইসলামিক সমাজতন্ত্র'। মওলানা ভাসানীও ইসলামী সমাজতন্ত্রেই আস্থাশীল ছিলেন। তাই চীনপন্থী ন্যাপের নেতাকর্মীরাও, বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যায় 'পিপিপি'তে যোগ দিয়েছিলেন।

পূর্ব বাংলায় সৃষ্টি হয়েছিল সম্পূর্ণ বিপরীত রাজনৈতিক দৃশ্যপটের। পূর্ব বাংলায় একমাত্র নুরুল আমিনই 'তাসখন্দ ঘোষণা'র বিরূপ সমালোচনা করলেন, অন্যরা এবিষয়ে কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাব দেখালেন। তবে উল্লেখ্য যে, দৈনিক ইত্তেফাকের 'মিঠেকড়া' উপসম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, "বিগত ছয় বৎসর আমরা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গের অনেক লম্বা লম্বা কথা শুনিয়াছি। ... বর্তমানে ... এমনসব কথাবার্তা বলা হইতেছে যেন বিরোধী দলগুলোর জন্য কাশ্মিরকে হাতের মুঠোয় আনা যাইতেছে না। ... ইতিহাসের কোন যুদ্ধই কোন সমস্যার সমাধান করে নাই। বরং প্রতিটি যুদ্ধই নতুন সমস্যার জন্ম দিয়াছে। এমতাবস্থায় আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের চিন্তাকে আমরা অবাস্তব বলিয়া গণ্য করিয়াছি" (৩/১২১)। তাসখন্দ ঘোষণার মাধ্যমে পাক-ভারতের জনগণের জন্য আশা এবং শান্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন আতাউর রহমান খান। ঢাকা বার এসোসিয়েশন, এনডিএফ এবং পূর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামীর পক্ষ থেকেও অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করা হয়েছিল।

১৮ জানুযারি, ১৯৬৬ইং তারিখে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিব একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিলেন ঃ "We are looking forward to the development of fraternal relations between our two countries. Therefore we have put forward our demand that the imergency imposed during wartime be lifted. It is unreasonable to expect that the people will be in a state of exultation and greet the Tashkent Declaration when they feel bound hand and feet by the emergency" (৭/১৩২)। অতঃপর পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে অন্যতম যুগান্তর সৃষ্টিকারী ঘটনা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের 'ঐতিহাসিক ছ'দফা ঘোষণা'।

ঐতিহাসিক ছ'দফা ঘোষণা ঃ
বাংলার রাজনীতির অব্যর্থ গতিমুখ

পাক-ভারত যুদ্ধের গ্লাণি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানী জনমনে সৃষ্ট তীব্র আইয়ুব-বিরোধী ক্ষোভকেই 'সুবর্ণ সুযোগ' হিসেবে কাজে লাগাতে উদ্যোগী হলেন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন মত-পথের অনুসারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক পরিস্থতির পর্যালোচনার জন্য তাঁরা 'অল পাকিস্তান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স' আহ্বান করলেন।

স্বাভাবিকভাবেই আহ্বায়কদের প্রত্যাশা ছিল ৫ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ইং লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ করবেন। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান নিজে ঢাকায় এসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে লাহোর সম্মেলনে যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করলেন। সম্মেলনে খোলামেলা বক্তব্য উপস্থাপনের কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না, এমন আশংকায় মুজিব লাহোর সম্মেলনে যেতে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু মানিক মিয়া জোর দিয়েই বলেছিলেন, "This will give you a chance to say whatever is on your mind. Jot down your thoughts on paper. It does not matter if they don't want to listen to you. Something good will come out of it anyway" (৭/১৩৪)। যদিও মুজিব জানতেন যে, পূর্ব বাংলার স্বার্থ বা কল্যাণ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ কখনো মনোযোগ দেন না, তথাপি মানিক মিয়ার পরামর্শটি অবশ্য মুজিবের পছন্দ হয়েছিল।

শেখ মুজিবের মনে তখন দু'টি ভিন্ন ধারার রাজনৈতিক চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল। "চৌষট্টি সালে দলের অতি বিশ্বস্ত, তরুণ ও সাহসী তিনজন নেতাকে নিয়ে গোপনে একটি 'নিউক্লিয়াস' গঠন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু, যাঁদের দায়িত্ব ছিল দলের ভেতর পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার সপক্ষে জনমত গঠন করা। ... সদস্য ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজুল আলম খান ও কাজী আরেফ আহমেদ। ... গোপন উদ্যোগের পাশাপাশি প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রণীত হয়েছিল ৬-দফা" (১(১)/৩৭৩)। প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক আলোচনার সুযোগ গ্রহণের জন্যই শেখ মুজিব লাহোর সম্মেলনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি স্থির করলেন, বিদ্যমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এমনভাবেই প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে, যাতে সমগ্র জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় এবং বিশেষত পূর্ব বংলার জনমনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। পরবর্তী ইতিহাসেই সপ্রমান যে, বঙ্গবন্ধুর উত্থাপিত ৬-দফা প্রস্তাবটি কার্যতই পাকিস্তানের, বিশেষত পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির যথার্থ গতিমুখ নির্ধারণ করে দিয়েছিল। অনস্বীকার্য যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের আগে পর্যন্ত ৬-দফার আন্দোলনই ছিল পূর্ব বাংলায় সর্বাধিক গণ-সম্পৃক্ত রাজনৈতিক কর্মসূচী।

শেখ মুজিবকে এবার একটি প্রকাশ্য রাজনৈতিক উদ্যোগের জন্যও অতি সংগোপনেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হলো। মাত্র তিনজনের কাছে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু জানালেন, সামগ্রিকভাবেই পূর্ব বাংলার ন্যায্য হিস্যা চাই। মুজিবের একান্ত আস্থাভাজন এবং পাক-প্রশাসনের অভ্যন্তরীন বিষয়ে অবহিত দু'জন 'সিএসপি' কর্মকর্তা, রুহুল কুদ্দুস এবং আহমেদ ফজলুর রহমান মূল আলোচনা-পত্রটি প্রস্তুত করলেন আর বঙ্গবন্ধুর একান্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তাজউদ্দিন আহমদ সেটি সম্পাদনা করলেন। সংক্ষেপে এই হলো ছ'-দফা প্রণয়নের পেছনের কথা। তবে উল্লেখ করা অপরিহার্য যে, প্রস্তুতি পর্বে পরম গোপনীয়তা থাকলেও উপস্থাপন পর্বে ঘটেছিল চরম

নাটকীয়তা। মওলানা ভাসানী ছাড়া পূর্ব বাংলার প্রায় সকল নেতৃবৃন্দই লাহোর কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। লাহোরে চৌধুরী মোহম্মদ আলীর বাসভবনে ৫-৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সম্মেলনের 'সাবজেক্ট কমিটি'র সভায় শেখ মুজিবুর রহমান ছ'-দফা প্রস্তাব উপস্থাপন করলে সমবেত সকলে এতটাই রুষ্ট হয়েছিলেন যে, প্রস্তাবটি সম্মেলনের মূল আলোচ্য-সূচীতেই গ্রহণ করা হলো না। শেখ মুজিব এবং তাজউদ্দিন প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রাসঙ্গিক একটি নাটকীয় বর্ণনা দিয়েছেন বর্তমান পাকিস্তানের বিখ্যাত মানবাধিকার-কর্মী, আইনজীবী আসমা জাহাঙ্গীর : "Awami League members from West Pakistan tried to persuade Sheikh to drop his idea of announcing the Six-points at the All-Party Conference ... He was undettered to soften his resolve. Suhrawardy's daughter was requested to ... bear pressure on Bangabandhu. After hours of pleading, the Sheikh stood firm ... had run out of patience. In order to avoid an unpleasant confrontation he ran out of the meeting room with a very heavy Ms. Suhrawardy chasing him.....Mujib....got into a parked jeep and drove off." (১(১)/৫৬২)।

"বঙ্গবন্ধুর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ... আইয়ুব ও তাঁর পশ্চিমা জান্তা বাংলাদেশের বিনিময়ে কাশ্মির চেয়েছিলেন, ... আইয়ুবের এই দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি এড়ায়নি বলেই যুদ্ধের পর থেকেই তাঁর কার্যকলাপের প্রবাহ সম্পূর্ণ নতুন খাতে বইতে শুরু করে" (১(২)/১০৩৮)। "বঙ্গবন্ধু যখন লাহোরে আনুষ্ঠানিকভাবে ৬-দফা উপস্থাপন করেন তখন নিশ্চিত জানতেন এর পরিণতি কী হবে। ... ৬-দফার রূপ আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও তিনি এর সার-সংকলন করেছিলেন তাঁর ভাষায় - 'কত নিছ, কবে দেবা, কবে যাবা' বলে" (১(১)/৩৭৩)। "যে লাহোরে ১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল জিন্নাহর দ্বিজাতি-তত্বের ভিত্তিতে, সেই লাহোরেই ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব ঘোষণা করলেন ছয়-দফা, যা আর কিছুই নয়, দ্বিজাতি-তত্বকে মিথ্যা প্রমাণিত করার তলোয়ার মাত্র" (১(১)/৪৬৯)। আইয়ুব-বিরোধী সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে উপস্থিত ন্যাপসহ কোনো রাজনৈতিক দলেরই সমর্থন না পাওয়াতে, ছ'-দফা কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনাও করা গেল না। অতীতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকাতার মুখে ক্ষুব্ধ হলেও মুজিব হতাশায় ভেঙ্গে পড়েননি, কখনো বদলে ফেলেননি প্রতিজ্ঞা-প্রস্তুতিও। সত্যিকার অর্থে এবারও তাই হলো, আর এবার তো প্রতিবন্ধকতার কথা জেনে-বুঝে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলেন। ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ইং শেখ মুজিব লাহোর বিমান বন্দরে এক অনির্ধারিত সংবাদ সম্মেলনে 'ছয়-দফা আমাদের বাঁচার দাবি' এই শিরোনামে ৬-দফা প্রস্তাব আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করেন।

৬-দফা প্রস্তাবে উপস্থাপিত দাবিগুলি ছিল (*) ঃ

১ম দফা : লাহোর প্রস্তাবের অনুসরণে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার-ভিত্তিক ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলির সংসদ প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে।

২য় দফা : শুধু বিদেশ নীতি ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ফেডারেল সরকারের দায়িত্বে থাকবে। বাকি সব বিষয় অঙ্গরাজ্যগুলোর এখতিযারভূক্ত হবে।

৩য় দফা : যদি এমন ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করা যায় যাতে দেশের এক অংশ থেকে অন্য অংশে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে বা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পুঁজি পাচার রোধ করা যাবে, তাহলে সারা দেশের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। অন্যথায় দু'টি আলাদা মুদ্রার ব্যবস্থা করা হবে।

৪র্থ দফা : কর নির্ধারণ এবং আদায় অঙ্গরাজ্যসমুহের এখতিয়ারে থাকবে। ফেডারেল সরকারকে নির্ধারিত অর্থ দেওয়া হবে।

৫ম দফা : অঙ্গরাজ্য দুটি আলাদা আলাদা বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য নিয়ন্ত্রণ করবে।

৬ষ্ঠ দফা : অঙ্গরাজ্যগুলো সমস্ত আধাসামরিক-বাহিনী গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

[* কাজী খলীকুজ্জামান আহমদের 'ছয়-দফা থেকে অসহযোগ ঃ বঙ্গবন্ধুর শ্রেষ্ঠতম সময়' (১(৩)/১৪৬৫-১৪৭৫) নিবন্ধ থেকে সংকলিত। নিবন্ধকার উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৬৬সনে প্রণীত বিভিন্ন দফা, ১৯৭০-এর নির্বাচনের সময় কোথাও কোথাও বাস্তব কারণেই কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল।]

পরবর্তী সময়ে '৬-দফা প্রস্তাব' নিয়ে যে প্রবল উচ্ছসিত আলোচনা এবং লেখালেখি হয়েছে, শুরুতে তার কিছুই ছিল না। প্রসঙ্গতই পূর্বাপর আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং শেখ মুজিবের আস্থাশীল প্রচার সহযোগী হিসেবে পরিচিত 'দৈনিক ইত্তেফাক'এ ছ'-দফা সংক্রান্ত প্রাথমিক 'নিউজ ট্রিটমেন্ট'এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, শেখ মুজিবকে লাহোর সম্মেলনে যাবার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুজিব সেখানে গিয়ে কি বলবেন বা বলতে পারেন, তা' অজানা ছিল মানিক মিয়ারও। চট্টগ্রামের বিখ্যাত সাংবাদিক মঈনুল আলম লিখেছেন, "বাস্তবিকপক্ষে লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিব ছয় দফা উপস্থাপন করা কালে ... উহা ছিল শেখ মুজিবের একটি ব্যক্তিগত বিবৃতি। ফলে আচমকা উত্থাপিত ছয় দফা প্রথম দিন দেশের সংবাদপত্রে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। ... লাহোর সম্মেলন ভেস্তে যাওয়ার সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল বিরাট করে। আর যে কারণে লাহোর সম্মেলন ভেস্তে গেল, অর্থাৎ শেখ মুজিব উত্থাপিত ছয় দফা, উহা প্রকাশিত হয়েছিল সিঙ্গেল কলামে 'লেগ আইটেম' ... রূপে। ছয় দফা বার্তাটি পরিবেশন করেছিল পাকিস্তানের সরকারী বার্তা প্রতিষ্ঠান এপিপি" (১১/২১৮-২১৯)।

মঈনুল আলম আরো লিখেছেন, "শেখ মুজিবের বিবৃতি এত ছোট করে ইত্তেফাকে প্রকাশিত হওয়াটা আশ্চর্যের ব্যাপার। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে টেলিফোনে সিরাজ ভাইয়ের (সিরাজউদ্দিন হোসেন, ইত্তেফাকের প্রধান বার্তা-সম্পাদক, একাত্তরের শহীদ

বুদ্ধিজীবী) সাথে কথা হল। বললাম, 'সিরাজ ভাই, ছয় দফা - এ আবার কি? দিলেন তো দিলেন, এত ছোট করে দিলেন কেন '? ... সিরাজ ভাই ত্যক্ত স্বরে বললেন, 'আর বলিস না। সে কারো সাথে আলাপ করেনি। লাহোরে বিবৃতিটি দিয়ে দিল। তার বিবৃতি বাদ তো দেওয়া যায় না। এখন কি ফ্যাসাদ বাধাল। সে ফিরে আসুক দেখি কি বলে'। কারো সাথে শলা-পরামর্শ না করে লাহোর সম্মেলনে 'আচানক' ছয় দফা পেশ করায় মানিক মিয়া শেখ মুজিবের ওপর অত্যন্ত চটে গিয়েছিলেন। ঢাকায় আতাউর রহমান খান, আব্দুস সালাম খান, মওলানা আব্দুর রশিদ প্রমুখ প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতারও অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন শেখ মুজিবের উপর"।

এখানেই শেষ নয়,বরং বলা চলে কেবল সূত্রপাত। "পরদিন বেলা ১১টার দিকে সিরাজ ভাই ... বললেন মঈনুল, এক কাজ করতে হবে। তোদের ওখানে আওয়ামী লীগ মহল থেকে ছয় দফার প্রতি সমর্থন দানের একটি নিউজ আজকেই পাঠাতে হবে'। আশ্চর্য হয়ে বললাম, সেকি সিরাজ ভাই? ... এটা কি রকম হল'? সিরাজ ভাই সংক্ষেপে বললেন, ও একটা কাজ করে ফেলেছে বটে। হয়ত সঠিক পদ্ধতিতে করেনি। কিন্ত ওর আন্তরিকতাতে কোন ফাঁক নেই। ওকে ত আমাদের সমর্থন করতেই হবে। তুই একটা সমর্থনের নিউজ পাঠিয়ে দে। ... আজিজ ভাইকে (চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) গিয়ে গোপনীয়ভাবে বললাম সিরাজ ভাইয়ের নির্দেশের কথা। ... সন্ধ্যার আগে আজিজ ভাই ... একটি 'প্রেস রিলিজ' দিলেন। ... নিউজটি ইত্তেফাকে পাঠিয়ে দিলুম। পরদিন ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল ... ছয় দফার প্রতি প্রথম আনুষ্ঠানিক সমর্থন দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম থেকে, চট্টগ্রামের অগ্নি-সন্তান এম এ আজিজের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে" (১১/২১৯-২২০)। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু আর চট্টগ্রামের এম. এ. আজিজের সম্পর্ক ছিল সম্যকরূপেই পারস্পরিকভাবে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে একান্ত আস্থা এবং অন্তরঙ্গ নির্ভরতার।

চট্টগ্রাম থেকে শেখ মুজিবের ছ'-দফার প্রতি জেলা আওয়ামী লীগের প্রেরিত সমর্থন-সূচক ঐতিহাসিক বিবৃতিটিতে "তাসখন্দ ঘোষণাকে স্বাগত জানানো হয়। ছয় দফার ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরা হয়। যার মূল কথা হলো, ছয় দফার ব্যাপারে কারো কাছে জবাব বা ব্যাখ্যা দিতে হবে না, এটা হচ্ছে জাতির ম্যাগনাকার্টা। ... এতে স্বাক্ষর ছিলো, এম এ আজিজ, হান্নান, আব্দুল্লাহ আল হারুন, জানে আলম দোভাষ এবং আবুল কাশেম সাবজজ-এর"। চট্টগ্রাম থেকে এম এ আজিজ ফোনে শেখ মুজিবকে বিবৃতিটি পাঠ করে শোনানোর পর তিনি (মুজিব) জানিয়েছিলেন, এবিষয়ে ইত্তেফাকের সিরাজউদ্দিন হোসেনের সাথে তাঁর কথা হয়েছে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার একটি দৈনিকের সম্পাদকীয় কলামে বলা হয়েছিল, "চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের বিবৃতিকে কেন্দ্র করে সারা দেশে একটি ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাইতেছে। আমাদের এখনো মন্তব্য করার সময় আসে নাই। পরে অবশ্য ইত্তেফাক পত্রিকা ভালো এবং কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো।" ২২ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সভায় "পঁচিশে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ চট্টগ্রামের লালদীঘিতে জনসভা ডেকে ছয় দফাকে জনগণের কাছে পেশ করা এবং এর পক্ষে আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শেখ সাহেবকে বলা হয়েছিলো, এ ঘোষণা ঢাকা থেকে দিতে। শেখ সাহেব বলেছিলেন, ছয় দফা চট্টগ্রাম থেকেই জাতির কাছে পেশ করা হবে। চট্টগ্রামে আজিজের মত নেতা আছে। চট্টগ্রাম সূর্য সেনের দেশ। চট্টগ্রাম বার আওলিয়ার দেশ। চট্টগ্রাম সংগঠিত। ... চট্টগ্রামের প্রতি বঙ্গবন্ধুর এ আস্থার পেছনে ছিলেন এম এ আজিজ। ... স্বাধীনতা যুদ্ধের পাঁচ বছর পূর্বেই, স্বাধীনতার সপক্ষে প্রথম পদক্ষেপ সূচিত হয়েছিলো" (১১/১৯৬-১৯৭)।

"মওলানা তর্কবাগীশ প্রমুখ প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে ছয় দফাকে 'ডিনাউন্স' করার জন্য ঢাকায় যে তোড়জোড় শুরু হয়েছিল ... চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের পূর্ণ সমর্থন দানের খবর সে তোড়জোড়ের মাথায় পানি ঢেলে দেয়। ... চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সমর্থন দানের খবর প্রকাশিত হওয়ার পরে অন্যান্য আওয়ামী লীগ সংগঠন হতে ছয় দফার প্রতি সমর্থন দান শুরু হয়। প্রথম দিকে দ্বিধার সাথে, ... শেষে বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের মতো সমর্থন আসতে থাকে ছয় দফার প্রতি" (১১/২২০)। "It had been a bold and risky move on the part of Mujib to put forward Six Points for deliberation by the Lahore Conference.....the Working Committee members of the East Pakistan Awami League would resent the fact that they had deliberately been kept in the dark by Mujib. The only clear knowledge they had of it was when the evenining newspaper *Awaz,* published the Six Points to coincide with its presentation to the Lahore Conference. Its owner Abdul Gaffar Choudhury had somehow got hold of the Six Points through his access to Mujib" (৭/১৩৬)।

বঙ্গবন্ধু প্রায়শ বলতেন, "ছয় দফার সাঁকো দিলাম স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতায় উন্নীত হওয়ার জন্য" (২২/৮১)। প্রকৃতপক্ষেই ১৯৬৬ইং ঘোষিত ৬-দফা প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত এক-দফা অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার রাজনৈতিক ভিত্তি রচনা করেছিল। তেমনি সত্য হচ্ছে, ৬-দফা ঘোষণার অব্যবহিত পরবর্তী সময়টাতে শেখ মুজিবকে প্রচন্ড প্রতিকুলতা মোকাবেলা করতে হয়েছে। প্রতিকুলতার তিনটি ধারাই প্রবল ছিল : নিজস্ব রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের একাংশ, সরকার এবং অপরাপর রাজনৈতিক দল। অবশ্য কোনোটিই তাঁর কাছে অজানা কিংবা অভাবিত ছিল না। আপন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞা এবং দলের বৃহদংশের, বলা চলে, তরুণতর অংশের নিঃশর্ত সহযোগিতা আর সর্বোপরি দেশের সাধারণ মানুষের প্রাণ ঢালা সমর্থনের জোরেই মুজিব সব প্রতিকুলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। ৬-দফা প্রস্তাব সংক্রান্ত ঘোষণা প্রণয়নের রাজনৈতিক ভিত্তি হিসেবে মুজিব ভেবেছিলেন, স্বদেশের জনগণের মনে একটা সচেতন স্বপ্ন রচনা করতে হবে। অনস্বীকার্যভাবেই বঙ্গবন্ধু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল হয়েছিলেন।

লাহোর বিমান বন্দরে সাংবাদিক সম্মেলনে ৬-দফা উপস্থাপন করে, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ইং শেখ মুজিব ঢাকায় ফিরে, বিমান বন্দরেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে লাহোর অভিজ্ঞতার বর্ণনা প্রসঙ্গে ৬-দফা প্রস্তাবকে 'বাঙালির মুক্তি সনদ' বলে

উল্লেখ করলেন। কিন্তু দৃশ্যতই অসন্তষ্ট দলীয় প্রবীণেরা প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য যথাশীঘ্র দলের ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করতে বললেন। ২১শে (মতান্তরে ২০শে) ফেব্রুয়ারি তারিখে আহুত ওয়ার্কিং কমিটির সভার আগেই মুজিব-অনুসারীরা ৬-দফার সমর্থনে প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন, দেয়ালে দেয়ালে লেখা হলো : 'বাঙালির প্রাণের দাবি ৬-দফা' এবং 'কেবল মাত্র ৬-দফার মাধ্যমেই পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসন অর্জিত হতে পারে'। আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আব্দুল মোমেন ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝে 'ছয়-দফা' শীর্ষক একটি ব্যাখ্যা-মূলক পুস্তিকা বিপুল সংখ্যায় বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

পুস্তিকাটিতে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়তার সাথেই বলেছিলেন,"পূর্ব পাকিস্তানিরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানিদের নয়, ছোটো বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানির। ... এমনি উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, ... এমন ইনসাফবোধই পাকিস্তানি দেশপ্রেমের বুনিয়াদ, এটা যার মধ্যে আছে, কেবল তিনিই দেশপ্রেমিক। ... দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দেহের দুই চোখ, ... দুই হাত, দুই পা; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে ... দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; ... তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। ... পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল অসাধারণ। আশা করি, আমার পশ্চিম পাকিস্তানি ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয় দফা কর্মসূচীর বিচার করবেন। ... দেখিতে পাইবেন, ... ছয় দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি" (৩/১৩৮-১৩৯)। মার্কিন গবেষকে লরেন্স জিরিংয়ের পর্যবেক্ষণ, "The West Pakistani opposition leaders rejected Mujib's plan interpreting it was secessionist and hence outside the purview of their deliberation.....the Awami League programme pointed up the semi-independent character of East Pakistan and the Six-Point demand was judged fundamental to a healthy relationship within and between the provinces.But... Ayub Government joined with the politicians in condemning the proposal" (১(৩)/১২৯০)।

বাঙালি জনগণ, সামরিক-বেসামরিক পরিচয় নির্বিশেষেই বঙ্গবন্ধুর ৬-দফার মধ্যে নিজেদের সুপ্ত স্বপ্নের সম্ভাবনাকে দেখেছিলেন। কর্ণেল শওকত আলী, বঙ্গবন্ধুর ৬-দফা ঘোষণার সময় ছিলেন তরুণ ক্যাপ্টেন, লিখেছেন, "ছয় দফা কর্মসূচীর অন্তর্নিহিত ভাবধারা আমাকে তাৎক্ষণিকভাবেই আকৃষ্ট করেছিল এবং আমার ধারণা হয়েছিল, বাঙালিরা এই কর্মসূচী আন্তরিকভাবে সমর্থন করবে ... অমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, মুজিব ভাইয়ের অন্তরে এক দফা অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্খা ক্রিয়াশীল এবং ছয় দফা উপযুক্ত পটভূমি হিসেবে ... স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করবে। অতি অল্প শব্দ ব্যবহার করে প্রস্তুত করা কর্মসূচীটি স্বাধীনতার সমর্থনে সরাসরি তেমন কিছুই ব্যক্ত করেনি। কিন্তু একথা বুঝতে কারোই অসুবিধা রইল না যে,

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার চুড়ান্ত লক্ষ্য সামনে রেখেই ছয় দফা কর্মসূচী দিয়েছেন। শুধু পাকিস্তানিদের তিনি একটা সুযোগ দিয়েছিলেন, ছয় দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে পাকিস্তানের অখন্ডতা আপাতত অক্ষুন্ন রাখতে" (১২/৮৮-৮৯)। উল্লেখ্য যে, তরুণ ক্যাপ্টেন শওকত আলী এবং সেনাবাহিনীর আরো কতিপয় বাঙালি কর্মকর্তা রাজনৈতিক যোগসূত্রহীনভাবে কিছু আগে থেকেই 'সশস্ত্র উপায়ে' পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন।

"পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৬৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি এক বৈঠকে ছয় দফাকে দলীয় কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করে। কমিটির বৈঠকের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন - ছয় দফা দাবি রাজনৈতিক দর কষাকষি বা স্ট্যান্টবাজির লক্ষ্যে দেযা হয়নি। বাংলাদেশের মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যেই প্রদত্ত হয়েছে। ছয় দফা দাবি পুস্তক আকারে ইংরেজী ও বাংলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রকাশের জন্য ... গঠিত ... উপ-কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। তাঁর সাথে আরো ছিলেন আব্দুস সালাম খান, জহির উদ্দিন, তাজউদ্দিন আহমদ, হাফেজ হাবিবুর রহমান এবং এ. কে. মুজিবুর রহমান। ১৮মার্চ অনুষ্ঠিত দলীয় কাউন্সিল সভায় এই পুস্তিকা বিতরণ করা হলে ১৪৪৩জন কাউন্সিলর ও ডেলিগেটদের মধ্যে তা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চার করে" (৫/৩৫-৩৬)।

তবে উক্ত কাউন্সিল সভাতেই কাউন্সিলরদের একাংশ তীব্র অনন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। "Abdur Rashid Tarkabagish, President of the Awami League, walked out of the session to register his protest against the highhanded conduct of Mujib. Although many of his followers also boycotted the session, Mujib was able to get the support of the conference for his Six Points without much difficulty" (৭/১৩৭)। এ কাউন্সিল অধিবেশনেই শেখ মুজিবুর রহমান দলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তাজউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক। অতঃপর দলের ভিতরে শেখ মুজিবের প্রতি আস্থা এবং জনপ্রিয়তার দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। যারা অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁরা একটা 'বিদ্রোহী' কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই কার্যকর রাজনীতি থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন। ততদিনে পূর্ব বাংলার জনগণের মনেও ছ'-দফার প্রতি আবেগ এবং আস্থা বেড়ে চলেছে।

২০মার্চ, ১৯৬৬ইং প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকায় এসেই হুমকি দিলেন, "দেশের অখন্ডতার বিরোধী কোনো প্রচেষ্টা সমর্থন করা হবে না। প্রয়োজন বোধে অস্ত্রের মুখে এর জবাব দেযা হবে"। আর সেদিনই বিকালে পল্টন ময়দানে লক্ষ লোকের সমাবেশে মুজিব বললেন, "৬ দফা' দাড়ি, কমা, সেমিকোলনসহ মেনে নিতে হবে। আমরা অনেক রক্তচক্ষু দেখেছি, আর নয়। ... কেবল শক্তিশালী কেন্দ্র নয়, দেশের উভয় অংশকে সমান শক্তিশালী করতে হবে। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ... শক্তিশালী কেন্দ্র থাকা সত্বেও পূর্ব পাকিস্তান নিতান্ত অসহায় এতিমের মত পড়েছিল। কেন সংকটের সময় পূর্ব পাকিস্তানকে নিরাপত্তা দিয়ে আশ্বস্ত করা যায়নি? কেন জাতীয় সংসদে

পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলতে হয়, চীনের জন্যই পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে? কেন আমরা অন্যের অনুগ্রহে বেঁচে থাকবো? অথচ পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আমরাই আয় করে থাকি" (৩/১৪৮)। পরবর্তী কিছুকালের ইতিহাস একই সাথে ছ'-দফার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা-কর্মীর প্রতি সরকারী নির্যাতনের ইতিহাস।

"১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসের শুরু থেকে ৮ই মে পর্যন্ত তিনি (শেখ মুজিব) প্রায় প্রতিটি জেলায় ... জনসভায় ভাষণদান করে ছয় দফার পক্ষে জনমত সংগ্রহ করেন। ... তদানিন্তন গভর্ণর মোনায়েম খানের নির্দেশে প্রায় প্রতিটি জেলায় বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এভাবে মোট বারটি মামলা হয়। প্রতিটি মামলায় তাঁকে কারারুদ্ধ করা হতো এবং জামিন নিতে হতো। অবশেষে ১৯৬৬ সালের ৮ই মে গভীর রাতে পাকিস্তান দেশরক্ষাবিধি অনুসারে ... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। ... এক কথায় আওয়ামী লীগের প্রথম কাতারের কোনো নেতাই তখন গ্রেফতার এড়াতে পারেননি। ... ছয় দফার পক্ষে তখন শক্ত ভূমিকা পালন করেছিল দৈনিক ইত্তেফাক। ... মানিক মিয়া তাঁর ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার মুখোশ উন্মোচন করে ছয় দফা আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে চলেছিলেন। ... পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২ (১) ধারা অনুযায়ী ইত্তেফাক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়" (৫/৩৬)। এসময় মানিক মিয়াকেও গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৬ইং সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে আওয়ামী লীগের মোট নয় হাজারের অধিক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গতই প্রদেশজুড়ে ৬-দফার প্রচার এবং জনমত গঠনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর ঝটিকা-সফরের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া যেতে পারে। "চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে (২৫ ফেব্রুয়ারি) , নোয়াখালি জেলার মাইজদী কোর্টে (২৭ ফেব্রয়ারি) , ১৮-২০মার্চ ইডেন হোটলে (ঢাকা) আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন। ৭ এপ্রিল পাবনায়, ৮ এপ্রিল বগুড়ায়, ৯ তারিখে রংপুরে, ১০তারিখে দিনাজপুরে, ১১ তারিখে রাজশাহীতে, ১৪ তারিখে ফরিদপুরে, ১৫ তারিখে কুষ্টিয়ায়, ১৬ তারিখে যশোরে, ১৭ তারিখে খুলনায় ... নারায়নগঞ্জের ... চাষাড়ায় জনসভা শেষে, ৮ মে ১৯৬৬ থেকে ১৭ মাস বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের একটি সেলে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখা হয়" (১(২)/১০৪০-১০৪১)। শেখ মুজিব যখন জেলায় জেলায় বক্তৃতা করে ফিরছেন আর মোনায়েম খান মামলার পর মামলা দিয়ে তাঁকে বিপর্যস্ত করছেন, তখন আইয়ুবের 'বিরাগভাজন' পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো ঢাকায় এসে আইয়ুবকে খুশি করার বাসনায় ৬-দফার ওপর প্রকাশ্য বিতর্কের চ্যালেঞ্জ দিলেন মুজিবকে। দেশজুড়ে সভা-সমাবেশ আর মামলা সামলানোয় ব্যস্ত মুজিব সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দায়িত্ব দিলেন ঘনিষ্ঠতম সহযোগী তাউজউদ্দিনকে। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাজউদ্দিন বলেছিলেন, ভুট্টো যেদিন যেখানে বলবেন সেখানেই ছ'-দফার ওপর বিতর্ক করতে তিনি প্রস্তুত আছেন। কিন্তু বিতর্কের নির্ধারিত দিনে জরুরি কাজের উছিলায় ভুট্টো ঢাকা ছেড়ে গিয়েছিলেন। জনমনে অনস্বীকার্য নৈতিক বিজয় হলো আওয়ামী লীগের।

ভুট্টো বলেছিলেন '৬-দফা বিচ্ছিন্নতাবাদের দলিল'। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে ভুট্টোর মতই ধারণা পোষণ করতো পাকিস্তানের (প্রায়) সমগ্র সেনা-আমলা চক্র। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালি ব্রিগেডিয়ার খলিলুর রহমানকে পাকিস্তানি জেনারেল ইরশাদ বলছিলেন, "মুশকিল হয়েছে মুজিবের ছয় দফা নিয়ে। ছয় দফা বাস্তবায়ন করা আর পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলা তো একই কথা, তাই না? ... যুদ্ধশেষে শেখ মুজিব প্রচন্ড চেচামেচি করে আকাশ ফাটাতে থাকলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। তাহলে আমরা বাঙালিরা কেন এই সামরিক বাহিনীর খরচ যোগাব? ছয় দফার এক দফা, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকবে পূর্ব পাকিস্তানি মিলিশিয়ার ওপর। আরও ইঙ্গিত, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর ব্যয়ভার পশ্চিম পাকিস্তানিরাই বহন করবে, পূর্ব পাকিস্তানিরা নয়। অতএব, আওয়ামী লীগ অর্থাৎ বাঙালিরা যদি পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে তবে তাদের প্রধান একটি কাজই হবে পাকিস্তানের অর্থাৎ পাঞ্জাবি সামরিক বাহিনীকে কাটছাঁট করে সাইজমতো করে দেয়া। এর অর্থ হলো কাশ্মির সমস্যা চিরদিনের জন্য সিকেয় তোলা। ... ছয় দফা তো প্রায় স্বাধীনতার সমান দাবী। পাকিস্তান তো পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দিতে পারে না" (১০/১৮-১৯)। বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের পরেও সেনা-আমলা চক্র এবং তাদের বাঙালি তাবেদার-দোসররাও উপলব্ধি করতে চায়নি যে, ছয়-দফা না মেনে 'অস্ত্রের ভাষায়' জবাব দেয়ার চেষ্টা থেকেই কার্যত পাকিস্তনের ভাংগনের সূচনা হয়েছিল।

শেখ মুজিবের গ্রেফতারের পর, ২০মে, ১৯৬৬ইং অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে, ৬-দফার পক্ষে জনমত গঠন এবং সরকারী দমন-নীতির প্রতিবাদে ৭ জুন প্রদেশব্যাপি হরতাল আহ্বান করা হয়। ৭ জুনের সর্বাত্মক সফল হরতাল এবং ছাত্র-শ্রমিক-জনগণের প্রতিবাদী বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে ৬-দফা আন্দোলনে এক অপ্রতিরোধ্য গতি সঞ্চারিত হয়েছিল। সাংবাদিক মুনিরুজ্জামানের পর্যবেক্ষণ : "১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ... ৬-দফার আন্দোলন শুধু নয়, সামগ্রিকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেই শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিকভাবে অংশগ্রহণ করে" (১৩/২২২)। হরতাল প্রসঙ্গে আবু জাফর শামসুদ্দিন লিখেছিলেন, "ঢাকা এবং নারায়নগঞ্জে আইয়ুব সরকার গুলি চালিয়ে, সরকারী প্রেসনোট মতেই দশজন লোক হত্যা করেছে। সংবাদপত্রগুলোকে তাদের নিজস্ব স্টাফ-রিপোর্টার আইটেম এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য ছাপতে দেয়া হয়নি। অর্থাৎ সত্য ঘটনা এবং তৎসম্বন্ধে মন্তব্য বরদাশত করতে চায় না Usurper আইয়ুব খান। প্রদেশের সমস্ত যানবাহন এমন কি রেলগাড়িও বন্ধ ছিল" (৬/৪০৭)।

উল্লেখ্য যে, ৬-দফা যখন দ্রুতই জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে, গভর্ণর মোনায়েম খান ১৯৬৬ইং এপ্রিল মাসে হুকুম জারি করেছিলেন, "পাকিস্তানের অখন্ডতা বা সার্বভৌমত্বের পক্ষে হানিকর কোন প্রসঙ্গ সংবাদপত্রে ছাপানো যাবে না এবং দেশের এক অংশ বা শ্রেণীবিশেষের দ্বারা অপর অংশের শোষণের বা উভয় অংশের মধ্যে কোন বৈষম্যের অভিযোগ তোলা যাবে না। ... ছাত্র ধর্মঘট, ছাত্র বিক্ষোভ, ছাত্র অসন্তোষ, ছাত্রসভা বা ছাত্রদের বিভিন্নমুখী অভিযোগ ও সে সংক্রান্ত

সরকারী যে কোন ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ বা বলবৎকৃত কোন বিধিসম্বলিত কোন সংবাদ সংবাদপত্রে ছাপানো যাবে না" (৩/১৫৪)।

২৩-২৪ জুলাই আওয়ামী লীগ ৬-দফা আন্দোলনের 'দ্বিতীয় পর্যায়' সংক্রান্ত কৌশল হিসাবে জেলা শাখাগুলিকে নির্দেশ প্রদান করে যে, "দেশের প্রতিটি গ্রামে জনমত সৃষ্টির জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ... সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী সভাপতি এবং মহিলা আওয়ামী লীগের সম্পাদিকাকে (আমেনা বেগম) অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আন্দোলন শুরু করার জন্য ঢাকার পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিলেও সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ১৯৬৬ সালের ১৭ আগস্ট চট্টগ্রামে এক জনসভায় ছয় দফা কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন শুরুর ঘোষণা দেওয়া হয়। অস্থায়ী আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং ... সম্পাদিকা দেশের প্রতিটি জেলা, এমনকি থানা পর্যায়ে সভা-সমাবেশ করে ছয় দফা কর্মসূচীর পক্ষে জনমত গড়ে তোলেন" (৫/৩৬-৩৭)। পাকিস্তানে তো বটেই, পূর্ব বাংলাতেও সরকারী এবং সরকার-বিরোধী প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই ছ' দফার কঠোর সমালোচনা করেছিল। ইসলাম বা ধর্ম-ভিত্তিক রাজনৈতিক দলসমুহ তখন ৬-দফার বিরোধিতা করে বলেছিল যে, "যেহেতু ৬-দফায় ইসলামী 'হুকমত'-এর কথা অনুপস্থিত; সেহেতু এর সমর্থন তো করা যায়ই না বরং এর বিরোধিতাই করতে হবে" (৩/১৫১)।

তবে সবচেয়ে বিস্ময়কর ছিল ছ'-দফার বিপক্ষে মওলানা ভাসানীর সক্রিয় অবস্থান। ৭ এপ্রিল, ১৯৬৬ইং প্রকাশ্য সভায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "৬-দফা দাবির মধ্যে মার্কিনীদের কাজ হাসিলের চেষ্টা করা হচ্ছে। ৬-দফার মধ্যে সমাজতন্ত্রের কথা নাই, তাই ৬-দফা দাবির প্রতি মওলানা ভাসানী সমর্থন দিতে পারে না"। আরো ন্যক্কারজনক কথা বলেছিলেন, ভাসানী-ন্যাপের সম্পাদক মোহাম্মদ তোয়াহা, "৬-দফা হচ্ছে সিআইএ প্রণীত দলিল" (৩/১৪৯)। মওলানা ভাসানীর 'চীন-পন্থী নীতি' এবং আওয়ামী লীগ বিরোধিতার একটি প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেছেন, মার্ক্সিস্ট গবেষক যুক্তরাজ্য প্রবাসী পাকিস্তানী তারেক আলী। ১৯৬৯ইং পূর্ব পাকিস্তানে তারেক আলীর সাথে সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকারে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, "মাও আমাকে বললেন, এখনও (১৯৬৩ইং) পর্যন্ত পাকিস্তানের সাথে চীনের সম্পর্ক নাজুক স্তরে রয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ভারত এ সম্পর্ক বিনষ্টের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। ... আপনি আমাদের বন্ধু এবং বর্তমান মুহূর্তে যদি আপনি আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন, তাহলে রাশিয়া, আমেরিকা আর ভারতের হাত শক্তিশালী হবে। ... আমরা আপনাদের এই মর্মে পরামর্শ দেব যে, মন্থরভাবে এবং সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হোন, আপনাদের সরকারের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিবিড় করার জন্য একটা সুযোগ দিন" (৩/১৫০)। ৭ জুনের হরতাল এবং বিক্ষোভের ১১ দিন পরে "He (Bhashani) justified his stand by saying that `East Pakistan finds itself in the vortex of imperialist intrigues in South-East Asia'. Many of Bhashani's followers were so disenchanted with his blatent pro-Ayub stance

that they split to form a rival NAP under the leadership of Professor Muzaffar Ahmed in East Pakistan and that of Wali Khan in West Pakistan towards the end of 1966" (৭/১৩৮)।

আওয়ামী লীগের ছ'-দফা প্রস্তাব সম্পর্কে কম্যুনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন ছিল : "৬-দফা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের স্বায়ত্বশাসনের অধিকারের দাবী আরও ব্যাপক ও পূর্ণ রূপ ধারণ করেছিল। ঐ কর্মসূচী ভিত্তি করে সারা পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৬সনের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে গণসংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। আইয়ুব সরকার ৬-দফা আন্দোলনকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' বলে আখ্যায়িত করেছিল। ... ৬-দফার সমর্থনে ... ৭ই জুনের সর্বাত্মক হরতাল সারা প্রদেশে বিরাট সাফল্য লাভ করেছিল। ... ৬-দফা ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-জাগরণের মধ্য দিয়ে প্রমানিত হয়েছিল যে, সাম্প্রদায়িক ও ভারত-বিরোধী প্রচার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় অধিকারের দাবীকে দাবিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না। ... কুৎসা প্রচার করে সরকার তখন শেখ মুজিবুর রহমানকে জনসমক্ষে 'দেশদ্রোহী' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু ... ঐসব প্রচার আইয়ুব সরকারের জন্য হয়েছিল এক 'বুমেরাং'। আইয়ুব সরকার ... যত বেশি প্রচার করছিল, শেখ মুজিবুর তত বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, ৬-দফার প্রতি জনগণের সমর্থনও তত বেড়ে যাচ্ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগের ৬-দফা আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল" (৪/১৯৫-১৯৬)। তবে খোকা রায় একথাও লিখেছেন যে, "আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে ৬ দফা কর্মসূচীকে যেভাবে 'বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ' বলে অভিহিত করা হচ্ছিল, কম্যুনিস্ট পার্টি তার সাথে একমত হতে পারেনি। ... ৬ দফা কর্মসূচীতে ১. সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটগুলির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, ২. আমূল ভূমি সংস্কার ও কৃষকের হাতে জমি, ৩. বৃহৎ শিল্পগুলির জাতীয়করণ ও ৪. শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনধারণের উপযোগী মজুরি ও মাহিনার গ্যারান্টি - এই চারটি দাবি অন্তর্ভূক্ত করে ঐ কর্মসূচীকে প্রকৃত অর্থে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদে পরিণত করার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদনও জানিয়েছিল" (প্রাগুক্ত)।

মওলানা ভাসানী এবং মোহম্মদ তোযাহা কর্তৃক ৬-দফা আন্দোলনের বিরূপ সমালোচনা এবং বিরোধিতা প্রসঙ্গে কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন খোকা রায়, তদানিন্তন রাজনীতির বাস্তবতার পরিচয় হিসেবে যা' উল্লেখ করা প্রয়োজন। "৬ দফা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহুত ৭ই জুনের হরতালের আগে ঢাকাতে ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠক হয়েছিল। ... সে বৈঠকে যাতে ৭ই জুনের হরতালের পক্ষে প্রস্তাব পাশ না হয় বরং ঐ হরতালের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয় সেজন্য আইয়ুব সরকার তৎপর হয়ে উঠেছিল। ... তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের সচিবসহ কেন্দ্রীয় সরকারের তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তখন ঢাকাতে চলে এসেছিলেন। এদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে ... কয়েকজন পিকিংপন্থী সদস্য ... হরতালের বিরোধিতা করে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ... বৈঠকের কয়েকদিন আগে মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ কয়েকজন আন্ডারগ্রাউন্ড নেতা, ৬-দফা আন্দোলনে তাদের বিরুদ্ধতার নীতি সরকারকে

জানিয়ে তাদের উপর থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ... ৬-দফা আন্দোলনে বিরোধিতার শর্তে প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের সাথে একটা গোপন 'সমঝোতা' করে ... মোহম্মদ তোয়াহা, অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন ও আব্দুল হক ... আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে প্রকাশ্যে বের হয়ে এসেছিলেন। ... পিকিংপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ... ঐ বৈঠকে ... ৬ দফা কর্মসূচী তথা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল" (৪/১৯৭-১৯৮)।

শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের প্রধান নেতৃবৃন্দ কারাবন্দী থাকায় ১৯৬৬ সনের শেষ দিক থেকেই ৬-দফার আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরাই ৬-দফার আন্দোলন টিকিয়ে রাখছিলেন। গভর্ণর মোনায়েম খান কয়েক বছর আগেই সরকারী মদদে অস্ত্র-অর্থসহ বিভিন্ন রকমের প্রলোভন দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ন্যাশন্যাল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন- এন.এস.এফ' নামক একটি আদর্শহীন পেটোয়া সংগঠন দাঁড় করিয়েছিলেন। ১৯৬৪ইং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৬৫ইং মৌলিক গণতন্ত্র পদ্ধতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং পাক-ভারত যুদ্ধের সময় নানাবিধ নেতিবাচক কাজকর্মের মাধ্যমে ছাত্র-জনসাধারণের মনে এন.এস.এফ যথেষ্ট ভীতি এবং বিতৃষ্ণারও সঞ্চার করেছিল। ১৯৬৭ইং বছরের শুরু থেকেই সংগঠনটি আক্ষরিক অর্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়ঙ্কর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করায় সরকার-বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ধারাটিও প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু অনস্বীকার্য যে, ছাত্র লীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি সংগঠনের নেতাকর্মীরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন। তারই ফলে সৃষ্টি হতে পেরেছিল ১৯৬৮ইং প্রবল ছাত্র-আন্দোলন এবং ১৯৬৯ইং গণ-অভ্যুত্থান।

পূর্ব বাংলায় ৬-দফার আন্দোলনকে দুর্বল এবং অকার্যকর করে দেবার 'অঘোষিত' অভিপ্রায়ে পাকিস্তান (কেন্দ্রীয়) আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান পাকিস্তানের বিভিন্ন বিরোধী দলের সমন্বয়ে ১৯৬৭ইং মে মাসে ঢাকাতেই গঠন করলেন 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট - পি.ডি.এম'। স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগকেও 'পিডিএম'এ যুক্ত করার উদ্যোগ শুরু হলো। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ এমনকি, আওয়ামী লীগের ভেতরেও যারা ৬-দফা পছন্দ করতেন না, সকলেই 'পিডিএম'এ যোগ দিতে থাকলেন। সাংগঠনিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলার উদ্যোগ হিসেবে "১৯৬৭ সালের ১৯শে আগস্ট অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে পিডিএম-এ যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বৈঠকে ৯৫০জন কাউন্সিলারের মধ্যে ৮৮৬জন উপস্থিত ছিলেন (৩/৩৭)। অতঃপর ২৭ আগস্ট তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে সভাপতি এবং এ.এইচ.এম কামরুজ্জামানকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি পূণর্গঠন করা হয়েছিল।

পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে পিডিএম-এর দাবি এবং এবিষয়ে আইয়ুবের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে এস.এ. করিমের পর্যবেক্ষণ ঃ "Autonomy envisaged in the PDM programme was more extensive than that provided in the 1956

Constitution but less than ... the Six Points...Some concessions on the question of autonomy would have enabled some Bengali politicians in the PDM to argue that it was better to be prudent rather than passionate ... But ... autonomy was such an anathema to the Ayub regime that no serious thought seems to have been given to woo them....They naively believed that a policy of treating the movement with an iron hand would put an end to the movement. (৭/১৩৯)।

ছ'-দফার আলোচনা আপাতত এখানেই শেষ করা যেতো, কিন্তু একান্ত কৌতুহলোদ্দীপক কিছু প্রসঙ্গিক তথ্য উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। সুপরিচিত মানবাধিকার কর্মী শাহরিযার কবির ২০০১ সালে একটি সম্মেলনে যোগ দিতে পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলন। ফিরে এসে শাহরিয়ার কবির 'পাকিস্তান থেকে ফিরে' নামক একটি বই লিখেছেন, তাতে 'পাকিস্তানে ছয় দফা, বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ' শিরোনামে তিনি উচ্চশিক্ষিত পশতুন যুবক এজাজ এবং পেশোয়ারের প্রয়াত আওয়ামী লীগ নেতা মাস্টার খান গুলের ছেলে, খ্যাতনামা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'শাহীন বুকস্'এর মালিক প্রায় ষাট বছর বয়সী মোস্তফা কামালের সাথে আলোচনার প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করেছেন। এজাজ মোস্তফা কামালের ছেলের বন্ধু, শাহরিযার তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "শেখ মুজিব সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? (এজাজের জবাব) পাঞ্জাবীরা তাঁর সম্পর্কে যা-ই বলুক, আমরা পশতুনরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আমাদের নেতা ওয়ালী খান তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন"।

শাহরিয়ার কবিরকে আলোচনা সূত্রে মোস্তফা কামাল বলেছিলেন, "সত্তরে পশ্চিম পাকিস্তানে যাঁরা নৌকা (আওয়ামী লীগের প্রতীক) নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, মাস্টার খান গুল তাঁদের ভিতর সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন। খুবই সামান্য ভোটের ব্যবধানে হেরেছিলেন তিনি। ... পেশোয়ারের অনেকে এখনো মনে করে সত্তরের নির্বাচনে তিনিই জয়ী হয়েছিলেন। ... তিরিশের দশকে (১৯৩০) তিনি খান আব্দুল গফফার খানের 'খোদাই খিদমতগার' আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ... বৃটিশ-বিরোধী, সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক সংগঠন ছিল সেটি। পাকিস্তান হওয়ার পর মাস্টার সাহেব আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। সাতান্ন সালে ... (মওলানা ভাসানী, ওয়ালী খান প্রমুখ) যখন 'ন্যাপ' করেন, ... তখন থেকে তিনি কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। সাতান্ন সাল থেকেই তিনি 'বাঙ্গে হারাম' প্রকাশ করতে থাকেন। উর্দু এই দৈনিকটি ছিল আওয়ামী লীগের মুখপত্র। বিশেষ করে ছেষট্টি সালে শেখ সাহেব যখন লাহোরে তাঁর বিখ্যাত 'ছয় দফা' কর্মসূচী ঘোষণা করেন মাস্টার সাহেব ছয় দফা সমর্থন করে প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন তাঁর পত্রিকায়। তিনি একা নন, ছয় দফার পক্ষে তখন অনেকেই এই পত্রিকায় লিখেছেন"।

শাহরিয়ারের প্রশ্ন : "ছয় দফাকে বলা হতো বাঙালির মুক্তিসনদ। আপনারা কোন যুক্তিতে ছয় দফা সমর্থন করেছিলেন"? মোস্তফা কামাল জবাব দিয়েছিলেন : "আমরা ছয় দফাকে বিবেচনা করেছি পাঞ্জাবী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত বাঙালি,

পশতুন, বালুচি ও সিন্ধি জাতির মুক্তিসনদ হিসাবে। পাকিস্তানে তখন থেকেই ফেডারেল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ছয় দফা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান একটি জাতি-রাষ্ট্র নয়। পাকিস্তানে অনেক জাতিসত্বা রয়েছে, যাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস সব ভিন্ন। এসব জাতিসত্বাকে এক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ধরে রাখতে হলে ফেডারেল সরকার ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই"। তিনি আরো বলেছিলেন, সত্তরের নির্বাচনে মাস্টার খানই "জিততেন। শেষ মুহূর্তে ওয়ালী ন্যাপ বিশ্বাসঘাতকতা করে পিপিপি-কে সমর্থন করায় তিনি জিততে পারেননি। ... তারা তখন ভুট্টোকে মনে করত সমাজতন্ত্রী হিসাবে। যেখানে তাদের প্রার্থী ছিল না, সেখানে তারা পিপিপি-কে সমর্থন করেছে। ... পাঞ্জাবীরা বলে শেখ মুজিব বিশ্বাসঘাতক, পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য দায়ী। পাকিস্তানের অন্য সব জাতিসত্বার কাছে শেখ মুজিব একজন মহান নেতা, পাকিস্তানে ফেডারেল রাষ্ট্রীয় কাঠামোর শাসনব্যবস্থার রূপকার, যার জন্য পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিসত্বা এখনও সংগ্রাম করছে (১৫/৬০-৬২)।

ফেরা যাক ৬-দফার প্রাসঙ্গিক আলোচনায়। ৮ মে, ১৯৬৬ইং থেকে 'দেশ রক্ষা আইন'এ বন্দী শেখ মুজিবকে প্রায় কুড়ি মাস পরে, হঠাৎ করেই ১৯৬৮ইং ৭ জানুয়ারি 'মুক্তি' দিয়ে জেলগেটেই তাঁকে পূণরায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরবর্তী প্রায় চারমাস কাল তাঁকে কেন নতুন করে গ্রেফতার করা হয়েছে, কোথায় রাখা হয়েছে, স্বজন-পরিজনেরাও তা' জানতে পারেননি। অতঃপর আইয়ুব সরকার শেখ মুজিবকে নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থাপিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ১৯শে জুন তারিখ বিচার শুরু করেছিল। সরকারী নথিপত্রে নতুন এ মামলাটির নাম ছিল "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য" কিন্তু সরকারী প্রচারযন্ত্রের প্রভাবে মামলাটির নাম হয়ে গিয়েছিল "আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা"।

তৎকালের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা এক স্মৃতিচারণে লিখেছেন, "পাকিস্তানি শোষণ ও বৈষম্যের ফলে ক্রমাগত বাঙালি চেতনায় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সঞ্চারিত হয়। ৬-দফা দাবী ছিল তারই এক সুস্পষ্ট রূপ। দেশব্যাপি হাজার হাজার ছাত্র-যুব-শ্রমিক-কৃষক এবং রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার মামলা ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে (সরকার) এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। বঙ্গবন্ধুসহ ৩৬ জনের নামে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে বিচারের প্রহসন শুরু করে। তখন পূর্ব বাংলার ... 'কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ঐতিহাসিক ১১-দফা দাবী ঘোষণা করে। এই ঐক্য গড়ে তোলাই ছিল এক কঠিন সংগ্রাম। কারণ সেই সময় ৬-দফা ছাড়া অন্যকোন দাবীতে আন্দোলন হতে পারে না। ৬-দফাই মুক্তি সনদ ... এই পরিস্থিতিতে ... ছাত্র ইউনিয়ন 'ঐক্য ও সংগ্রামের' নীতিতে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে ব্যাপকতম ছাত্র সমাজের মধ্যে ৬-দফাকে গণতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসনের ন্যায়সঙ্গত বাঙালির দাবী বলে প্রচারে নামে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলে যে, ৬-দফার সাথে ছাত্র-শ্রমিক ও কৃষকের দাবী যুক্ত করলে ৬-দফা দাবী দুর্বল হয় না, বরঞ্চ শক্তিশালী হয়। ... এ সমস্ত দাবীকে একত্র করে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে ... ৬-দফা দাবীতে যেখানে শ্রমিক মনু মিয়া প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন এবং মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদের মদদ পুষ্ট আইয়ুব শাহী ৬-দফাকে অস্ত্রের ভাষায় আক্রমণ করছে, সেখানে ৬-দফা গণতন্ত্র ও স্বায়ত্বশাসনের দাবি কি করে সিআইএ'র দাবী হয়? যারা ৬-দফার বিরোধিতা করে কার্যত তারাই সিআইএ'র সহায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ... অন্যদিকে ৬-দফার বিরোধিতাকারীরা সাধারণ ছাত্র সমাজ থেকে যতই বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, ততই তাদের মধ্যে বাস্তবের প্রভাব পড়তে থাকে। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাঙালিকে আরো ক্ষুব্ধ করে। এ সমস্তের পটভূমিতে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র লীগ, ছাত্র ইউনিয়নের অন্য অংশ (ভাসানী) মিলে ১১-দফা দাবী ঘোষণা করে। পরবর্তীতে এনএসএফ'এর একটি অংশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে যুক্ত হয় এবং ১১-দফা দাবী সমর্থন করে" (১৩/২৮৪-২৮৫)।

মওলানা ভাসানী এবং 'পিকিং পন্থী' নেতাদের ৬-দফার প্রতি বিরূপ সমালোচনা এবং প্রত্যক্ষ বিরোধিতার কথা আগেই বলা হয়েছে। বলা হয়েছে একারণে ন্যাপের ভাঙ্গনের কথাও। অনেক "পরবর্তীতে অবশ্য মওলানা ভাসানী তাঁর নিজের এবং দলের নীতি পরিবর্তন করে করে ৬-দফা দাবিকে অগ্রাধিকার দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে যখন ৬-দফা বাঙালির একমাত্র মুক্তির সনদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, সে সময় মওলানা ভাসানী ৬-দফার পক্ষে ... বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। কিন্তু যদি তিনি ১৯৬৬-তে ৬-দফার বিরোধিতা না করে শেখ মুজিবের পাশে এসে দাঁড়াতেন, যদি তিনি শেখ মুজিবের গ্রেফতারের পরবর্তীতেই আন্দোলনের নেতৃত্ব হাতে তুলে নিতেন, তবে হয়তো আজ ইতিহাস ভিন্ন সাক্ষ্যই বহন করত" (৩/১৫০)।

তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' ঃ
পরিণামে আইয়ুবের জন্য বুমেরাং

'আগরতলা মামলা'র অন্যতম অভিযুক্ত কর্ণেল শওকত আলী 'সত্য মামলা আগরতলা' নামক বইটির ভূমিকায় লিখেছেন, "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ... ঘোষিত 'ছয় দফা' আন্দোলনের ফলে বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা দেখে ভীতসন্ত্রস্থ ও ক্ষিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু একথা মোটেই ঠিক নয়, ... যে, ছয় দফা আন্দোলনের কারণে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তা যদি হতো, তাহলে ... সশস্ত্র বাহিনীতে কর্মরত সদস্যরা এবং সিএসপি অফিসারদের ওই মামলায় জড়িত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না" (১২/ভূমিকা)। প্রকৃতপক্ষেই আইয়ুব-মোনায়েম উপলব্ধি করেছিলেন যে, ৬-দফা সংক্রান্ত মামলায় মুজিবকে শাস্তি দেবার আইনগত কোনো সুযোগ নেই। কারণ, কার্যত 'লাহোর প্রস্তাব'এর ভিত্তিতেই ৬-দফা প্রস্তাব রচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্বায়ত্বশাসনের যে মাত্রাটা ৬-দফায় নির্দেশ করা হয়েছে, সেটা বহুলাংশেই যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল কাঠামোর অনুরূপ। সুতরাং মুজিবকে 'কঠিনতর' মামলায় জড়িয়ে 'শেষ করে' দেবার অভিপ্রায়েই পূর্বতন বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন করে বন্দী করা হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু মুজিবসহ বন্দীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র নামে প্রহসনমূলক বিচার এবং পূর্ব বাংলায় ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে প্রচন্ড নির্যাতনের প্রতিবাদে

আন্দোলনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানত ছাত্র লীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ উদ্যোগে ১৯৬৯ইং ৫ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ('Students Action Committee– SAC') গঠন করে প্রবল ছাত্র-গণ আন্দোলন পরিচালনা করে কার্যতই আইয়ুব শাহীর ভিত ভেঙ্গে ফেলেছিল। '১১-দফা আন্দোলন' নামে খ্যাত ছাত্র আন্দোলনেরই ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয়েছিল ১৯৬৯ইং ২৪ জানুয়ারি অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান। অতঃপর নিঃশর্ত মুক্তি পেয়েছিলেন বাংলার প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

কর্ণেল শওকত আলী বলেছেন, "মামলাটির রাষ্ট্রীয় নাম ছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য"। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের প্রচারযন্ত্রে মামলাটির শিরোনাম বিকৃত করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে প্রচার করা হয়। ফলে এখনো পত্রপত্রিকায় মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়ে থাকে। আজও মামলাটির প্রসঙ্গ এলে প্রায় সবাই 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বলে থাকেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আমরা যাঁরা মামলাটিতে অভিযুক্ত ছিলাম, 'ষড়যন্ত্র' শব্দটি তাঁদের জন্য খুবই পীড়াদায়ক। কারণ আমরা ... দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সম্মতি নিয়ে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেছিলাম। আমাদের পরিকল্পনা ছিল, একটি নির্দিষ্ট রাতে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা বাঙালিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সব কটি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নেব, তাদের বন্দী করব এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করব" (১২/ভূমিকা)।

কর্ণেল শওকত আলীর বইটিতে 'সশস্ত্র বিপ্লব' সংগঠনের লক্ষ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকা অবস্থায় তাঁর নিজের এবং অপরাপর কয়েকজন সেনা-কর্মকর্তার চিন্তা এবং প্রারম্ভিক প্রচেষ্টার বিবরণ পাওয়া যায়। এসব অনেক কথাই অজানা ছিল। কিন্তু তাঁর গ্রুপের দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ স্থাপন কিংবা সম্মতি গ্রহণের কোনো সময়-সুযোগ হয়নি বলেই প্রতীয়মান হয়। "১৯জুন ১৯৬৮ তারিখে আমাদের বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সামনে বিচারের জন্য হাজির করা হয়। ... বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তখনই প্রথম আমার সামনাসামনি দেখা হয়। পঞ্চাশের দশকে যখন কলেজের ছাত্র ছিলাম, দূর থেকে তাঁকে দেখেছি ... বক্তৃতা শুনেছি। কিন্তু কোনোদিন তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি" (১২/১২৮)। আলোচ্য মামলার অন্যতম অভিযুক্ত নৌবাহিনীর লেফটেনান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনও পৃথকভাবে এমন একটি উদ্যোগ শুরু করেছিলেন এবং তাঁর গ্রুপের সাথে কর্ণেল শওকত আলীর যোগাযোগ ঘটেছিল। শওকত আলী লিখেছেন, এক পর্যায়ে লে. ক. মোয়াজ্জেমের কার্যকর প্রস্তুতিহীন 'অতি উৎসাহ এবং অসাবধানতা'র কারণে, মোয়াজ্জেম গ্রুপেরই একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় সমগ্র উদ্যোগটির কথা পাকিস্তানের সেনা-গোয়েন্দা সংস্থা 'আই.এস.আই' জেনে যায়। কার্যত তারই পরিণামে এ মামলাটি পরিকল্পিত হয়েছিল বলে বইটি থেকে জানা যায়।

সরকারী অভিযোগনামার ৬নং অনুচ্ছেদে (১২/১৭৮-১৭৯) বলা হয়েছে :"১৯৬৪ সালের ... ১৫ থেকে ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেখ মুজিব (অভিযুক্ত-১) করাচি ভ্রমন করেন। ওই সময় কোনো একদিন ... করাচিতে কামাল উদ্দিন আহমদের (সাক্ষী-২) বাসভবনে একটি ... বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক) শেখ মুজিবুর রহমান (অভিযুক্ত-১) , খ) মোয়াজ্জেম (অভিযুক্ত-২) , গ) স্টুয়ার্ড মুজিব (অভিযুক্ত-৩) , ঘ) সুলতান (অভিযুক্ত-৪) , ঙ) নুর মোহাম্মদ (অভিযুক্ত-৫) , চ) আহমেদ ফজলুর রহমান, সিএসপি, (অভিযুক্ত-৬) এবং ছ) মোজাম্মেল (সাক্ষী-১)। ... বৈঠকে মোয়াজ্জেম (অভিযুক্ত-২) বলেন, নৌবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যরা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে একটি বিপ্লবী সংস্থা গঠন করেছে। এই সংস্থায় সেনা ও বিমানবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানি সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনিক সমর্থন ও সহযোগিতার প্রযোজনীয়তাও তিনি উল্লেখ করেন। ... শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একমতই পোষণ করেননি বরং বলেছিলেন, তাঁর নিজের ধারণার সঙ্গে বিপ্লবী সংস্থার পরিকল্পনার মিল রয়েছে। তিনি পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং প্রয়োজনীয় তহবিল প্রদানের দায়িত্ব নেন। ... তিনি 'ধীরে চল নীতি' অবলম্বন করতে বলেন। কারণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিরোধীদল জয়লাভ করলে এর দরকার হবে না"। ৭নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে : "শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর পুণরায় করাচিতে যান এবং ১৯৬৫ সালের ১৫ থেকে ২১ জানুয়ারি ... তারিখের ভেতর কোনো একদিন মোয়াজ্জেমের পূর্বোল্লেখিত বাসায় একটি বৈঠক হয়। ... শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, শুধু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার মাধ্যমেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে পারবে। তিনি পূর্ণ সমর্থন ও আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেন এবং মোয়াজ্জেমকে তাঁর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করতে এবং বিপ্লবী সংস্থার কাজ ত্বরান্বিত করতে অনুরোধ করেন" (১২/১৭৯)। মনে রাখা দরকার, সরকারী অভিযোগ-নামায় উল্লেখিত অভিযুক্ত (২) মোয়াজ্জেমের বক্তব্য মামলার প্রক্রিয়ায় সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়নি।

মামলার অভিযোগে উল্লেখিত সাক্ষাতের ঘটনার সত্যতা থাকলেও অন্যসূত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নতর বিবরণ মেলে। "Muazzem established contact with Mujib in Karachi in October 1964. There were two more meetings between Muazzem and the nucleus of his group and Mujib in the next four months. Mujib appears to have listened with sympathy to their grievances but did not commit himself to their plan of action" (৭/১৪০)। একজন অভিজ্ঞ রাজনীতি সচেতন মানুষ হিসেবে অমন ষড়যন্ত্রে যুক্ত না হওয়াই মুজিবের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। অপরদিকে মোয়াজ্জেমের মত 'আবেগ-নির্ভর বিপ্লবী'র পক্ষেও রাজনীতিবিদের পথ-পদ্ধতি উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। তাই দেখা যায়, মোয়াজ্জেম যখন জানলেন, ১৯৬৬ইং ফেব্রুয়ারি মাসে মুজিব লাহোরে স্বায়ত্বশাসন সংক্রান্ত রাজনৈতিক প্রস্তাব উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন, তখন সেটি মোয়াজ্জেমের মনঃপূত হয়নি। মোয়াজ্জেমের

স্বাভাবিক ধারণা ছিল, শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উদ্যোগ "would upset his plans for direct action". অর্থাৎ পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখলেও, মুজিব-মোয়াজ্জেম আদৌ এক পথের কিংবা এক মতের অনুসারী ছিলেন না।

এমন পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবের লাহোর যাবার উদ্যোগটি প্রতিহত করতে মোয়াজ্জেম যথার্থই সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। সরাসরি মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে বিষয়টি গোয়েন্দা নজরদারিতে পড়তে পারে ভেবেই মোয়াজ্জেম তড়িঘড়ি করে মধ্যস্থ যোগাযোগকারী হিসেবে আব্দুল গাফফার চৌধুরীকে পাঠিয়েছিলেন মুজিবে কাছে। গাফফার চৌধুরীর কাছে মোয়াজ্জেমের বার্তাটি ছিল, "Please request Sheikh Mujib not to reveal his demand at the Lahore conference because it will put the Ayub regime on its guard. Please beg him to remain silent for a while. Our preparations are almost complete. As soon as we are in possession of needed arms we will stage revolt....If Sheikh Mujib starts his movement now Ayub will be alerted and all our plans will be frustrated" (৭/১৪১)। এখানে উক্ত 'বিপ্লবী উদ্যোগ' সংগঠনে জড়িত সকলের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিযেও উল্লেখ করতে হয়, তাঁদের আবেগ এবং স্বপ্ন যত বড় ছিল, প্রস্তুতি আদৌ তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। কর্ণেল শওকত আলীর বইটি থেকেই জানা যায়, অস্ত্রের উৎসই তখনো নির্ধারিত হয়নি এবং মোয়াজ্জেম গ্রুপের অনেকেই অস্ত্রের ব্যবহারও জানতেন না, তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিপ্লব সাধনের উদগ্র আকাঙ্খা ছিল তাঁদের মনে। এবং 'বিপ্লবী মোয়াজ্জেম' শেখ মুজিবের ছ'-দফা উপস্থাপনের ঐতিহাসিক রাজনৈতিক উদ্যোগটিকেও প্রতিহত বা বিলম্বিত করতে চেয়েছিলেন।

কর্ণেল শওকত আলীর বক্তব্য : "আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করলাম, মোয়াজ্জেম হোসেন সিনিয়র বাঙালি অফিসারদের আমাদের পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করতে চাইছেন না। যেমন তিনি কর্ণেল ওসমানীর নেতৃত্বের বিষয়টি কৌশলে এড়িয়ে যেতেন। ... আমরা ভাবতে বাধ্য হলাম যে, মোয়াজ্জেম সম্ভবত তার নিজের নেতৃত্বের বিষয়ে বিষয়ে চিন্তিত ... আমার মাঝে মাঝে মনে হতো, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কেও মোয়াজ্জেম হয়তো একই মনোভাব পোষণ করেন। ... যদি এরকমই হয়, তাহলে আমি তা মেনে নিতে পারব না" (১২/১০২)। মোয়াজ্জেমের 'দেশপ্রেম এবং বিপ্লব আকাঙ্খা'র প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা রেখেই বলতে হয়, 'প্রস্তুতির অভাব এবং চিন্তার সংকীর্ণতা'ও ছিল তাতে।

এখন দেখা যাক, লে.ক. মোয়াজ্জেম এবং তাঁর বিপ্লবী উদ্যোগ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা বা সমর্থনের বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিল। গাফফার চৌধুরী যখন মোয়াজ্জেম হোসেনের বার্তাটি নিয়ে অতি দ্রুতই শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা করলেন, তখন শেখ মুজিব স্পষ্টতই বলেছিলেন : "I know him. I also know about his proposal. He has recently been hobnobbing with Manik Choudhury. I have told Manik not to have anything to do with this madness. I would also advise you not to get involved in it. Our struggle is for the establishment of

democracy and the realization of autonomy for the people of Bangladesh. I have always faught against the Pakistani military junta. It is not the purpose of my movement to replace it with Bengali military junta" (৭/১৪১-১৪২)।

সুতরাং মানতেই হয়, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তা এবং অবস্থানগত বিবেচনায় 'অগরতলা মামলা'টি যথার্থই একটি মিথ্যা মামলা ছিল, যদিও বেশ ক'জন বাঙালি সেনা-কর্মকর্তার উদ্যোগ-সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি ছিল সত্য। আপন অভিজ্ঞতা এবং উদ্যোগ-সংশ্লিষ্টতার বিচারে তাঁরা এটিকে 'সত্য মামলা' বলেও দাবি করতে পারেন। এবার আলোচ্য মামলাটিকে 'আগরতলা মামলা' হিসেবে চিহ্নিত করার পাকিস্তানি সামরিক চক্রের প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। তার আগেই, সংক্ষেপে উল্লেখ করা দরকার, চীন-ভারত যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার উদ্যোগে সহযোগিতা লাভের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধু নিজেই একবার (২৭ জানুয়ারি ১৯৬৩ইং) গোপনে আগরতলায় গিয়েছিলেন। তাঁর সে উদ্যোগ সফল হয়নি, কার্যত অব্যাহতও থাকেনি। সর্বোপরি এটা পাকিস্তানী গোয়েন্দাদেরও সম্পূর্ণ অজানাই রয়ে গিয়েছিল। তাই বাস্তব ক্ষেত্রে, 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' মামলাটিতেও প্রসঙ্গটির উল্লেখই নেই।

মামলাটিতে ষড়যন্ত্রমূলকভাবেই বঙ্গবন্ধুকে জড়ানো হয়েছিল। কর্ণেল শওকত আলী লিখেছেন, "২ জানুয়ারি ১৯৬৮তারিখে আমি করাচির ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা 'ডন'-এ আমাদের বিপ্লবী কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু তথ্য ফাঁস হওয়ার এবং নামোল্লেখ ব্যতীত কয়েকজনকে গ্রেফতারের খবর পড়ি। ... ৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ সন্ধ্যায় রেডিও পাকিস্তানের খবরে, সরকারের ভাষায়, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের তদন্তের অগ্রগতির আরও বিবরণ এবং তখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা ২৮জনের নাম প্রচার করা হয়, ... ওই ২৮জনের মধ্যে আমার নাম ছিল না (পরে ১০জানুয়ারি তারিখে ক্যাপ্টেন শওকত আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল)। ... বস্তুত ৩৫জন অভিযুক্তের তালিকা আরও পরে চুড়ান্ত করা হয়। ১৯জানুয়ারি ১৯৬৮তারিখের পত্রিকার খবর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্ভাব্য মামলার প্রধান অভিযুক্ত হবেন। ... পত্রিকার খবর পড়ে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, ... আইয়ুব খান বাঙালির আপোসহীন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে চুড়ান্তভাবে অপসারণের এ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি। ... বাঙালি জাতির ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য অব্যাহত রাখার আইয়ুব খানের বাসনার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন প্রকৃত বাধা। আইয়ুব খান হয়তো ভেবেছিলেন, মামলার নামের সঙ্গে আগরতলা শব্দটি যুক্ত করলে বঙ্গবন্ধু ... এবং অন্যান্য অভিযুক্তকে ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত করতে সুবিধা হবে এবং বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটবে" (১২/১৩-১৫)।

আবুল মনসুর আহমদের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, "আইয়ুবের সর্বশেষ ও সব চেয়ে আত্মঘাতী ভুল হইয়াছে, তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা। ... ঢাক-ঢোল

পিটাইয়া পুর্ব পাকিস্তানী (সেনা-বিমান-নৌ বাহিনীর) অফিসারদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা স্বাধীন করিবার অভিযোগে একটা রাজনৈতিক চাঞ্চল্যকর মামলা দাযের করা হইল। ... তদন্তাদি কার্য শেষ করিযা আসামীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট করিবার পর পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সর্বাপেক্ষা নির্যাতিত এবং তথাকথিত ঘটনার সময়ের আগা-গোড়া জেলখানায় বন্দী, তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নূতন করিয়া ... এক নম্বর আসামী করা হইল। এই একটি মাত্র ঘটনায় মামলাটির অন্তর্নিহিত দূরভিসন্ধি ধরা পড়িল। ... পরিবেশ ও সময়টাও ছিল বিস্ফোরক। ... গৃহযুদ্ধ ও অস্ত্রের যুক্তির ডর দেখাইয়া দুই পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে 'আমরা-তোমরা' মনোভাব তীব্র করিযাছিল। ... এই পরিবেশে আগরতলা মামলা দাযের করায় ... প্রতিক্রিয়া হইল যে, গোটা পুর্ব-বাঙালির বিরুদ্ধেই এই মামলা দাযের করা হইয়াছে" (২/৬১৩-৬১৫)।

কর্ণেল শওকত আলীর পর্যবেক্ষণ, "মামলাটির এরকম নামকরণ করার পক্ষে কেবল একটি যুক্তি রয়েছে। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী স্টুযার্ড মুজিবুর রহমান (অভিযুক্ত-৩) ও মোহাম্মদ আলী রেজা (অভিযুক্ত-৩৩) ১২ থেকে ১৫জুলাই ১৯৬৭ তারিখের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সম্ভাব্য ভারতীয় সাহায্যের বিষয়ে আলোচনার জন্য আগরতলা যান। সরকারী এই ভাষ্য সত্য হলেও আমাদের প্রতিনিধিদ্বয়ের আগরতলা সফরের ফলে কোনো ভারতীয় সাহায্য ... আসার কোনো প্রমান পাওয়া যাযনি" (১২/১৫)। অর্থাৎ আইয়ুব সরকারের সেনা-আমলা চক্রের ষড়যন্ত্রেই পরিকল্পিতভাবে 'আগরতলা' নামটি মামলায় যুক্ত করা হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে মামলাটির উৎসাহদাতা মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হলেও, প্রকৃতপক্ষে তৎকালীণ প্রধান সেনাপতি ইয়াহিযা ছিলেন মূল পরিকল্পনাকারী।

"Yahya Khan, the new C.-in-C... sensed a chance ... If the arrested conspirators could be induced or pressed to testify falsely that the plot had backing of India and that Mujib was ...involved in it, the popular support behind Six Points would vanish. Extreme punishment for Mujib...by a tribunal composed of handpicked judges would silence the clamour for autonomy, perhaps for ever" (৭/১৪২)। ইয়াহিয়ার নির্দেশে সামরিক তদন্ত-দলগুলির নিষ্ঠুর নির্যাতনে অনেক বন্দীই সেনা-চক্রের নির্দেশিত স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর, মামলা দাযের করার আগে আইয়ুবের সম্মতি গ্রহণের জন্য ইয়াহিয়া প্রচলিত সাধারণ আদালতে বিচারানুষ্ঠানের প্রস্তাব করলেন। সাধারণ আদালতের বিষয়ে আইয়ুবের অনাগ্রহ থাকলেও, মামলাটিতে বেসামরিক ব্যক্তিরাও অভিযুক্ত থাকায়, সামরিক আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তথ্য সচিব ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন যে, সাধারণ আদালতে বিচার করা হলে প্রচার-মাধ্যমে মামলার দুর্বল দিকগুলি বিশেষভাবেই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। ইয়াহিয়ার জবাব ছিল মামলাটি সম্পর্কে সংশয়াতীত (Full proof) প্রমান রয়েছে। আলতাফ গওহর, আইয়ুবকে জানিয়েছিলেন যে, যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য প্রমান ছাড়াই শেখ

মুজিবকে মামলায় জড়ানো হচ্ছে। এ পর্যায়ে আইয়ুবের হস্তক্ষেপে শেখ মুজিবের নাম বাদ দেয়া হয়েছিল।

তবু "Yahya had been able to persuade Ayub to change his mind ... to place the name of Mujib high on the list of accused. No decision of Ayub had such fateful consequence for him as this one. Far from isolating Mujib from the masses, the conspiracy trial served to popularize him (Mujib) as the heroic embodiment of Bengali nationalism... There could be little doubt now that it had failed as a propaganda exercise to influence opinion at home and abroad even before the commencement of the trial." (৭/১৪৫-১৪৬)।

ঢাকা সেনা নিবাসে স্থাপিত বিশেষ আদালতের প্রধান ছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এস. এ. রহমান এবং অপর দু'জন সদস্য ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতি এম. আর. খান এবং বিচারপতি মকসুমুল হাকিম। সরকার পক্ষে উকিল ছিলেন পাকিস্তানের বিশিষ্ট আইনজীবী, প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঞ্জুর কাদের। বঙ্গবন্ধু মুজিবসহ মোট ৩৫জন অভিযুক্ত এবং সরকার পক্ষে রাজসাক্ষী ছিলেন ১১ জন। পৃথক তালিকা ছিল ২১২জন সাধারণ সাক্ষীর। অভিযুক্তদের প্রত্যেকের জন্যই নির্দিষ্ট আইনজীবী ছিলেন। তবে সামগ্রিকভাবে মামলা পরিচালনায় অভিযুক্তদের পক্ষে প্রধান কৌঁসুলি ছিলেন ফৌজদারী আইনে বিশেষ পারদর্শী ঢাকার বিখ্যাত আইনজীবী আব্দুস সালাম। ইউরোপের প্রবাসী বাঙালিরা ইংল্যান্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের আইন-উপদেষ্টা টমাস উইলিয়াম 'কিউ.সি'কেও এ মামলার আইনজীবী হিসেবে ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতই উল্লেখ্য, "পশ্চিম পাকিস্তানের প্রখ্যাত আইনজীবী মাহমুদ আলী কাসুরী এবং জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো (পদত্যাগী পররাষ্ট্র মন্ত্রী) অভিযুক্তদের পক্ষে প্রতীকী অংশগ্রহণ করেছিলেন"। ধারণা করা চলে, স্বাভাবিক নিয়মেই মামলাটি অকার্যকর হয়ে পড়তো, কারণ সেনা-নির্যাতনে বাধ্য হয়ে যে যা-ই বলে থাকুন না কেন, আদালতে দাঁড়িয়ে অনেকেই যথার্থ সত্য কথা প্রকাশ করে দিচ্ছিলেন। সুতরাং আইনের ভিত্তিতে সংশয়াতীতভাবে মামলাটি প্রমান করা সম্ভব ছিল না। তবে পরবর্তী সময়ে, মামলাটি চলা-কালেই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কারণে, প্রবল গণ-আন্দোলনের চাপে আইয়ুব সরকার এক পর্যায়ে মামলাটি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল।

"সব অভিযুক্তের ডিফেন্স ছিল ... স্ট্রাটেজিক্যালি অবিভাজ্য। ... সব অভিযুক্তই যেন মুক্তি পান, সেই লক্ষ্যে আইনজীবীরা ঐক্যবদ্ধভাবে মামলা পরিচালনা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে মামলার জেরায় এবং অন্যান্য কৌশলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের, বিশেষ করে আইয়ুব খানকে বাঙালি জাতির শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। ... এই মামলা পরিচালনার মাধ্যমে ... আইনে যেটুকু সুযোগ পাওয়া যায়, তার সদ্ব্যবহার করে স্বাধীনতার ধারণা জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে হবে। ... সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আমরা অভিযুক্তরা আমাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরে নিজেদের 'নির্দোষ' দাবি করব" (১২/১৩৩-১৩৪)। কর্ণেল শওকত আলীর আরেকটি পর্যবেক্ষণও গুরুত্বপূর্ণ :"অভিযুক্তদের কেউ কেউ, বিশেষ করে সার্জেন্ট জহুরুল হক (অভিযুক্ত-১৭) , নিজেকে 'নির্দোষ' দাবি করার

বিপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। ... কিন্তু বঙ্গবন্ধু নিজে এবং আমাদের আইনজীবীরা তাঁদের নিবৃত্ত করেছিলেন ... কেউ কেউ বলতে পারেন, আদালতে নিজেদের 'নির্দোষ' দাবি করে এবং প্রকাশ্যে মামলাটিকে 'মিথ্যা' ... আখ্যায়িত করে, পরবর্তীকালে মামলার ঘটনাবলী বা অভিযোগগুলিকে সত্য বলে প্রচার করা নৈতিকতার পরিপন্থী কিনা। ... ট্রাইব্যুনালে উত্থাপিত অভিযোগগুলো স্বীকার করলে হয়তো অভিযুক্তদের শৌর্যের পরিচয় পাওয়া যেত, কিন্তু এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্থ হতো। ... মামলার বিচারকার্য প্রলম্বিত হতো না। ... ফয়েজ আহমদের 'ট্রাইব্যুনাল কক্ষে' শিরোনামে দৈনিক আজাদ-এ প্রকাশিত বিচারকার্যের সংবাদ থেকে জনগণ বঞ্চিত হতো। ... মামলার বিচারকার্যকে ঘিরে মানুষের মনে যে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল, তা' অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান হয়তো সম্ভব হতো না" (১২/১৩৪)। " ... সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ ছিল, মামলার বিরুদ্ধে শুধু আদালতেই লড়াই করা হবে না, লড়াই করতে হবে রাজনৈতিকভাবে দেশে-বিদেশে। ... বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন, ... মামলাকে কেন্দ্র করে একটি গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে। হয়েছিলও তা-ই" (১২/১৩২)।

মামলাটির প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার পরই অসুস্থ আইয়ুব খান চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য ১৯৬৮ইং জানুয়ারি শেষ সপ্তাহে লন্ডন গেলেন। "But it was not ... a period of rest and recreation for him. On the very day of his arrival in London, Bengali residents ... joined by students, staged a demonstration in front of his hotel demanding Mujib's release. ... Ayub was distressed to read the editorial comment of `The Times' that Mujib was `Being charged with complicity in a plot alleged to have been hatched while he was behind the bars" (৭/১৪৫-১৪৬)।

১৯ জুন, ১৯৬৮ইং বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্যের সূচনায় সরকারী কৌঁসুলী মঞ্জুর কাদের "৪২ পৃষ্ঠার মোট ১০০ অনুচ্ছেদের একটি অভিযোগনামা পাঠ করেন। ... অনেকের মতো আমিও ভেবেছিলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে এই মামলায় মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমার ধারণা ছিল, বঙ্গবন্ধু নিজে আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতেন না বা ... গভীরভাবে জড়িত ছিলেন না। ... কিন্তু ... ট্রাইব্যুনাল কক্ষেই একদিন একান্তে বঙ্গবন্ধুকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য কিনা। এর উত্তরে বঙ্গবন্ধু আমাকে কানে কানে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ'। ... আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলাম এবং গর্বে আমার বুক ভরে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ... আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'আমি জানি, তোমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগও সত্য। আমিও তোমার জন্য গর্বিত" (১২/১৩৫-১৩৭)। তথ্য-প্রমানে অবশ্য এমনটাই প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক চেতনা, দেশের পরিস্থিতি এবং দেশে-বিদেশে মামলাটির রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের গুরুত্বের দিকটি পরিপূর্ণ রূপে উপলব্ধি করেই তিনি (বঙ্গবন্ধু) সহবন্দীদেরকে মানসিকভাবে উজ্জীবীত রাখতে চেয়েছেন।

অনেক ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত-কৌশলে আইয়ুব-ইয়াহিয়ার যৌথ অভিপ্রায়ে পরিকল্পিত যে মামলাটি শেখ মুজিবকে রাজনৈতিকভাবে চূড়ান্ত অপমান এবং জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য সাজানো হয়েছিল, "সাক্ষীদের সত্যভাষণে সে মামলাটি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতে বসলো। ২নং আসামী লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন তাঁর জবানবন্দীতে আদালতে বললেন, 'আমাকে গ্রেফতার করার পর কর্তৃপক্ষ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই মর্মে বিবৃতি দিতে বলে যে, আমি শেখ মুজিবুর রহমান, আহম্মদ ফজলুর রহমান সিএসপি, রুহুল কুদ্দুস সিএসপিসহ অপরাপর আসামীদের চিনি এবং বলি যে, তারা সকলে স্বাধীন পূর্ব বাংলার আন্দোলনে জড়িত ছিল। বিবৃতিতে যেন আমি আরও উল্লেখ করি যে, কমান্ডো স্টাইলে বিপ্লব করার জন্যে শেখ মুজিবুর রহমান আমাকে সৈনিকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অতঃপর আমি আরো যেন উল্লেখ করি যে, পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত জনৈক মিস্টার ওঝার মারফত আমাদের অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্য দিচ্ছে। আমি এই মিথ্যা বিবৃতি দিতে অস্বীকার করলে কর্ণেল আমির আমার মুখে এমন জোরে ঘুষি মারেন যে আমার একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। ... কর্ণেল আমির আমাকে আরো বলেন যে, যদি আমি তাদের কথানুযায়ী বিবৃতি দেই তবে আমার অবসর গ্রহণের আবেদন মঞ্জুর করা হবে ... অন্যথায় আমাকেও শেখ মুজিবের সঙ্গে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে হত্যা করা হবে। ... 'তুমি মনে রেখ, বেসামরিক আদালতে শেখ মুজিব রেহাই পেলেও সামরিক আদালতে আমরা তার বিচার করবো ... শেখ মুজিবকে যে কোন প্রকারেই হোক আমরা শেষ করবোই'। ... মাননীয় আদালত, ভীতি এবং প্রলোভন সত্বেও আমি শেখ মুজিবুর রহমানের মত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিতে রাজি হইনি। শেখ মুজিব কখনো দেশদ্রোহী হতে পারেন না। তিনি দেশপ্রেমিক" (৩/১৭৪-১৭৫)।

তদন্তকারী সেনা-কর্মকর্তাদের কঠিন নির্যাতনের ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছিলেন আরো অনেকেই। প্রসঙ্গ সংক্ষিপ্তকরণের জন্য তন্মধ্যে দুয়েকটির উল্লেখই যথেষ্ট। বাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষী ... স্টুয়ার্ড মুজিব বলেছিলেন, "বিনা অপরাধে আমাকে কেন গ্রেফতার করা হয়েছে তা আমি জানতাম না। ... লেফটেন্যান্ট শরীফ আমার কক্ষে এলেন। তার হাতে কয়েক শিট টাইপ করা কাগজ ... বললেন, তুমি শুনে যাও আমি পড়ছি। ... তাতে বহু আর্মি অফিসার, সিএসপি অফিসার এবং রাজনৈতিক নেতার নাম উল্লেখ ছিল। ... আমাকে ঐ তৈরি স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি বিবৃতি দিতে বললেন। ... আমি বললাম, তা কেমন করে সম্ভব? আমি এদের প্রায় সবাইকে চিনি না। ... আমি শেখ মুজিবুর রহমানের নাম শুনেছি এবং জানি যে, তিনি ... একজন রাজনীতিবিদ। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কখনও আলাপ হয়নি এবং আমি তাঁকে ... কোনভাবে চিনি না। ... শরীফ দাঁড়িয়ে ... আমার কোমরের কিছু উপরে জোরে একটি লাথি মারলেন। ... বললেন, জানোয়ার তুমি চেনো না, তোমাকে চেনানো হবে" (৩/১৭৫-১৭৬)। স্টুয়ার্ড মুজিব যখন আদালতে "নিষ্ঠুর নির্যাতনের হৃদয়বিদারক ... বিবরণ প্রদান করছিলেন, তখন প্রত্যেক অভিযুক্তের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে ... মঞ্জুর কাদেরের দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে উচ্চস্বরে ক্রোধান্বিতভাবে বলেন, 'মিস্টার মঞ্জুর কাদের, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? আমি এর প্রতিশোধ নেব'।

আদালত কক্ষের প্রতিটি লোক হতবিহ্বল ... বিচারকেরা একে অপরের দিকে তাকালেন এবং মঞ্জুর কাদের ছিলেন নির্বাক। যে লোকটি রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অল্প দিনের মধ্যেই শাস্তিপ্রাপ্ত হবেন, রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌসুঁলির দিকে আঙ্গুল উঁচিয়ে তাঁর এই উক্তি ছিল অভাবনীয় এবং অকল্পনীয়" (১২/১২২)।

আরেকটি ঘটনা, তারিখ ২৯ জুলাই। সরকার পক্ষের প্রথম সাক্ষী লেঃ মোজাম্মেল হোসেন আদালতে বলেছিলেন, "It had been decided in January 1964 that Muazzem should contact Sheikh Mujib to bring him into the circle of conspirators…Then pointing at Mujib he said, `Would you kindly raise your hand, sir?' Visibly annoyed, Mujib stood up and said : `I am here ! Everybody knows me. It is for the court to ask me. He is an approver and he is talking all lies and nonsense. I have never seen him" (৭/১৫০)। আজ এতকাল পরেও আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবো যে, মোজাম্মেল বলেছিলেন, শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করার জন্য লেঃ কঃ মোয়াজ্জেমকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু মোজাম্মেল আদৌ দাবি করেননি যে, কখনো শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল কিংবা মুজিব সেই ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু মুজিব বিধিসম্মত এবং সাহসী অবস্থান থেকেই আদালতে উদ্ভুত পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছিলেন।

এ আদালতেই বঙ্গবন্ধুর আরেকটি সাহসী উক্তির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯ জুন, ১৯৬৮ইং ট্রাইব্যুনালে মামলাটি শুরুর দিন সাদা প্যান্ট-শার্ট পরিহিত মুজিব বসেছিলেন 'এ্যাকিউজড্ ডক'এ, পরিচিত কাউকে দেখা যায় কিনা, সেজন্য তিনি চারদিকে তাকাচ্ছিলেন। "Faiz Ahmed, the Chief Reporter of the Bengali daily *Azad*, was sitting behind him in the press gallery. He was sturtled to be addressed and proded by Mujib with his unlit pipe : 'Faiz, Faiz, Hey Faiz' ! Faiz whispered : Mujib Bhai, it is absolutely forbidden for us to speak. I can't even turn my head around. Or else, I'll be expelled'. Mujib said aloud, 'If you have to live in Bangladesh you'll have to talk to Mujib'. The tribunal chose to ignore this rude interruption in its proceedings.Mujib's courage was undimmed and he behaved with a great sense of dignity throughout the trial" (৭/১৪৯-১৫০)।

'আগরতলা মামলা'য় সেনা-চক্রের নির্যাতন এবং ষড়যন্ত্রের সব কথা আদালতেই প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকায় মামলাটি ক্রমশঃই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তবে সরকার পক্ষে আদালতে উপস্থাপিত (ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস) কামাল উদ্দিন আহমদের সাক্ষ্য গ্রহণের পরে মামলাটির সত্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতা কার্যতই সংশয়াপন্ন হয়ে পড়েছিল। সরকার পক্ষের প্রথম 'রাজসাক্ষী' লে. মোজাম্মেলের বক্তব্যকে জোরদারভাবে প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই অসামরিক ব্যক্তি কামাল উদ্দিন আহমদকে 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস' হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। "কিন্তু সরকার পক্ষের পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছিল। ... কামাল উদ্দিন আহমদ ... পরিকল্পিতভাবে ট্রাইব্যুনাল কক্ষে একটি নাটকের অবতারণা

করেছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল ১নং অভিযুক্ত বঙ্গবন্ধু ... কে Accused Dock-এ ... শনাক্ত করতে। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কামাল উদ্দিন আহমদের দীর্ঘদিনের চেনাজানা ছিল ... কিন্ত ... আহমদ এরকম ভান করলেন যে, তিনি বঙ্গবন্ধুকে কোনোদিনই দেখেননি। তিনি ... নাটকীয়ভাবে অভিযুক্ত-১৭ সার্জেন্ট জহুরুল হককে দেখিয়ে বললেন, 'ইনিই শেখ মুজিবুর রহমান"। একইভাবে তিনি আভিযুক্ত-২ লে.ক. মোয়াজ্জেম হোসেন, অভিযুক্ত- আহমেদ ফজলুর রহমান এবং অভিযুক্ত-৫ নুর মোহম্মদকেও শনাক্ত করতে 'ব্যর্থ' হলেন। সরকারী কৌঁসুলী মঞ্জুর কাদের তখন কামাল উদ্দিন আহমদকে 'বৈরী সাক্ষী' (Hostile Witness) ঘোষণা করে তাঁকে জেরা করার অনুমতি চাইলেন।

মঞ্জুর কাদেরের জেরার উত্তরে কামাল উদ্দিন আহমদ "অভিযোগনামায় উল্লিখিত সব অভিযোগ অস্বীকার করলেন এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের রোমহর্ষক বিবরণ তুলে ধরলেন। ... আরও বললেন, তাঁর মূল সাক্ষ্য বা Examination-in-chief-এ তিনি যা বলেছেন তা সত্য নয় ... সরকার পক্ষের আইনজীবী ও তদন্ত কর্মকর্তারা ভয়ভীতি ও প্রলোভন দেখিয়ে তাঁকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছেন। ... বিশেষ করে মেজর হাসান তাঁকে বাধ্য করেছিলেন। ... অভিযুক্তদের পক্ষে ঘটনাটি বিজয়ের সূচনা করেছিল। ... আমাদের আইনজীবীর মুখে প্রথম হাসি দেখা গেল। ... রাজনৈতিকভাবে বিষয়টির তাৎপর্য ছিল অকল্পনীয়। ... এর পর থেকে দেশে-বিদেশে বাঙালিরা এই মামলা সম্পর্কে এবং ট্রাইব্যুনাল কক্ষের ঘটনাবলী ও কার্যবিবরণী সম্পর্কে আরও আগ্রহসহকারে জানার চেষ্টা করে" (১২/১৪০)।

সরকার পক্ষে আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ 'সাজানো সাক্ষী' সাঈদুর রহমান যে সাক্ষ্য-বিবরণ দিলেন, তা' ছিল "full of inaccuracies and inconsistencies that any fair-minded person was bound to conclude that it had been fabricated. It had also became clear that the case had failed to achieve its objectives and indeed had become counter-productive…Even if Ayub realized that it was in his interest to drop it, he could not afford to do so when the Army insisted that its case was on strong grounds" (৭/১৫০-১৫১)।

১৯৬৯-এর ৬জানুয়ারি সকাল ৯টায় শেখ মুজিবুর রহমান জবানবন্দী দিতে আসামীর ডকে দাঁড়ালেন। লিখিত জবানবন্দী উপস্থাপনের আগে,"ধীর লয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গীমায় উচ্চারণ করলেন, 'পূর্ব বাংলা শোষিত হচ্ছে, একথা বলা কি অপরাধ? চাকরি-বাকরি, ব্যবসা বানিজ্য, উন্নয়ন, অর্থনীতি এমনকি দেশরক্ষা খাতেও বৈষম্য চলছে। একথা বলা কি দেশদ্রোহিতা? ডিকটেটরের কাছে তা হতে পারে। কিন্তু জনতার আদালতে আমি শেখ মুজিবুর রহমান সম্পূর্ণ নির্দোষ'। এই বলে তিনি তাঁর লিখিত জবানবন্দী আদালতের অনুমতিক্রমে পাঠ করা শুরু করলেন" (৩/১৭৮) শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থাপিত লিখিত জবানবন্দীটি সম্যকরূপেই তাঁর সুদৃঢ় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, পূর্ব বাংলার জনগণের স্বার্থের প্রশ্নে আপোষহীনতা এবং অকুতোভয় মানসিকতার পরিচয় বহন করে, আর তাই কিছুটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়া আবশ্যক।

"স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতীয় ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে আমার বিদ্যালয় জীবনের সূচনা হইতেই আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিয়াছি। ... স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। ... ১৯৪৯ সালে আমরা ... আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ ... একটি নিয়মতান্ত্রিকতার পথানুসারী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান। ১৯৫৪ সালে আমি প্রথম প্রাদেশিক পরিষদে এবং পরে জাতীয় সভায় নির্বাচিত হই। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রীত্ব লাভ করি। ... জনসাধারণের কল্যাণার্থে একটি নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠণ করার জন্য আমাকে ইতোমধ্যেই কয়েক বৎসর কারা-নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর হইতেই বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর ... জন-নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আমাকে গ্রেফতার করে ... দেড় বৎসরকাল বিনা বিচারে আটক রাখে। ... আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা দাযের করে, কিন্তু ... সকল অভিযোগ হইতে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ... মুক্তিলাভের পর আমার উপর কিছু কিছু বিধি-নিষেধ জারি করা হয়। ... গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা ... ছায়ার মত আমার পিছু লাগিয়া থাকিত"।

"১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারির প্রাক্কালে ... সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয় তখন আমাকেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে ... ছয় মাস বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। ... ১৯৬৪ সালে দেশের উভয় অংশে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পূণর্জীবিত করা হয় ... সম্মিলিত বিরোধী দল ... প্রেসিডেন্ট পদে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ... ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করে। ... সরকারি কর্তৃপক্ষও পূণরায় আমার বক্তৃতা সম্পর্কে কয়েকটি মামলা দায়ের করিয়া আমাকে মিথ্যা বিরক্ত ও লাঞ্ছিত করিতে থাকে। ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে যুদ্ধ চলাকালে যে সকল রাজনীতিবিদ ভারতীয় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন, আমি তাঁদের অন্যতম। ... যুদ্ধাবসানে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রদেশ ভ্রমনকালে আমিও ... আমন্ত্রিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। সেই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন প্রদান ও যুদ্ধকালে আমাদের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রদেশকে সামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই"।

"আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। ... ১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে ... আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধান, ছয়-দফা কর্মসূচী উপস্থাপন করি। ছয়দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান - উভয় অংশের জন্যই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি করা হইয়াছে। ... আওয়ামী লীগ ছয়দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং দেশের উভয় অংশের মধ্যকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূরীকরণের অনুকুলে জনমত যাচাই ও গঠনের জন্য ছয়দফার পক্ষে জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে প্রেসিডেন্টসহ ... সরকারী প্রশাসন যন্ত্র আমাকে 'অস্ত্রের ভাষায়' গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি হুমকি প্রদান করে এবং একযোগে এক ডজনেরও অধিক

মামলা দায়ের করিয়া আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করে। ... ১৯৬৬ সালের ... আটই মে ... রাত একটার সময় পুলিশ ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলস-এর ৩২ধারায় আমাকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে আমার প্রতিষ্ঠানের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে। ... পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক ইত্তেফাককেও ... নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ... ইহার ছাপাখানা বাজেযাপ্ত করে ... সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে দীর্ঘকালের জন্য কারারুদ্ধ রাখিয়া ... বেশ কয়েকটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করে"।

"আমাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমার প্রতিষ্ঠান ১৯৬৬ সালের ৭ইজুন সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। ... হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে ১১ব্যক্তি নিহত হয়। পুলিশ প্রায় ৮০০ লোককে গ্রেফতার করে ... । গভর্নর জনাব মোনেম খান প্রায়শঃই ... বলিয়া থাকেন যে যতদিন তিনি গদিতে আছেন, ততদিন শেখ মুজিবকে শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। ... প্রায় ২১মাস আটক রাখিবার পর ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ তারিখ রাত একটার সময় আমাকে তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রীয কারাগারের ফটক হইতে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রযোগ করিয়া আমাকে ঢাকা সেনানিবাসে লইয়া আসে এবং ... বহিঃজগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিযা নির্জনে রাখা হয় ... বিশ্ব হইতে যোগাযোগবিহীন আবস্থায় এইভাবে আমাকে দীর্ঘ পাঁচ মাসকাল আটক থাকিতে হয়। ... এই মানসিক অত্যাচার সম্বন্ধে যত অল্প প্রকাশ করিতে হয়,ততই উত্তম"।

"আমার উপর নির্যাতন চালাইবার জন্য এবং আমার দলকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও আমাদিগকে কুখ্যাত করিবার জঘন্য মনেবৃত্তি লইয়া আমাকে এই তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। ছয়দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকুররি সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা ও নিষ্পেষণ করাই ইহার মূল উদ্দেশ্য। এই আদালতে আসিবার পূর্বে আমি লেঃ কঃ মোয়াজ্জেম হোসেন ... ও এই মামলায় জড়িত অন্যান্য স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী কর্মচারদিের কখনও দেখি নাই। জনাব আহমদ ফজলুর রহমান, জনাব রুহুল কুদ্দুস ও জনাব শামসুর রহমান- এই তিনজন সিএসপি ... আমি মন্ত্রী হিসেব কার্যসম্পাদনকালে তাহাদিগকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম ... কিন্তু আমি তাহাদের সঙ্গে কখনো রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা করি নাই কিংবা কোন ষড়যন্ত্রেও ব্যাপৃত হই নাই। ... আমি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। ইহা একটি নিযমতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ... আমি অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে কদাপি আস্থাশীল নই। আমি দেশের উভয় অংশের জন্য ন্যায়বিচার চাহিয়াছিলাম ... দেশের জন্য যাহাই মঙ্গলকর ভাবিয়াছি সর্বদাই তাহা নিয়মতান্ত্রিক গন্ডির ভেতর জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি ... তাহারা আমাকে ও আমার প্রতিষ্ঠানকে দমন করিয়া পাকিস্তানের ... বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর শোষণ ও নিষ্পেষণ অব্যাহত রাখিতে চায়"।

"আমাকে প্রতিহিংসা বশতঃ মিথ্যা এই মামলায় জড়িত করা হইয়াছে। পাকিস্তান

সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ কর্তৃক ১৯৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে অভিযুক্ত বলিয়া ২৮ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিল এবং উহার মধ্যে আমার নাম ছিল না। উক্ত প্রচারপত্রে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল যে, সকল অভিযুক্তই অভিযোগ স্বীকার করিয়াছে - তদন্ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে-শীঘ্রই বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করা হইবে। একজন প্রাক্তন মন্ত্রী হিসেবে অর্জিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ... একথা জানাইতে চাই যে ... এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে হইলে প্রধানমন্ত্রী অথবা প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভ আবশ্যক (প্রেসিডেন্টের অনুমোদিত প্রচারপত্রে তাঁর নাম ছিল না, এটাই প্রতিপাদ্য)। ... আমি নির্দোষ এবং এ ব্যাপারে পরিপূর্ণরূপে অজ্ঞ। তথাকথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। ইতি স্বাক্ষর ঃ শেখ মুজিবুর রহমান" (৩/১৭৯-১৮৬)।

গণ-অভ্যুত্থানে মুজিবের মুক্তি ঃ
অতঃপর গণ-মানুষের প্রিয়নাম 'বঙ্গবন্ধু'

তথাকথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র ট্রাইব্যুনাল কক্ষে'র ভেতরের খবর যতই বাইরে জনসাধারণ জানতে পারছিল, দেশজুড়ে ক্ষোভও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তদুপরি মামলা পরিচালনার দীর্ঘসূত্রিতায় মানুষের ধারণা হচ্ছিল, আইয়ুব-মোনায়েম চক্র যেনতেন প্রকারে শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দেবারই ফন্দি-ফিকির করছে। এসময় পরপর দু'টি ঘটনার সমন্বিত প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত প্রবল গণ-অভ্যুত্থানে নতুন ইতিহাসের গতিপথ নির্ধারিত হলো। প্রথম ঘটনাটি হচ্ছে, বঙ্গবন্ধু যেদিন ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, তার আগের দিনই, ৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯ইং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত হয়েছিল 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' (Students Action Committee- SAC) , যা' আগেই, ছ'দফার আলোচনা-সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ক্যান্টনমেন্টে সেনা-প্রহরীর গুলিতে আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু।

মূলত ছাত্র লীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে গঠিত হলেও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে সক্রিয়ভাবেই যুক্ত হয়েছিল পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন এবং মোনায়েম খানের গঠিত-পালিত এনএসএফ-এর একাংশও। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ইং থেকে এযাবৎ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যে কাজটি পারেননি, তা-ই সম্ভব করেছিলেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ-নেতৃত্বে ছিলেন : ছাত্র লীগের সভাপতি আব্দুর রউফ, সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক, সাধারণ সম্পাদক সামসুদ্দোহা, ছাত্র ইউনিয়ন (পিকিং-পন্থী) সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক দীপা দত্ত এবং ডাকসু'র সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক নাজিম কামরান চৌধুরী (এন.এস.এফ)। নানা মত-পথ-আদর্শের অনুসারী ছাত্র নেতৃবৃন্দ যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ছাত্র-গণআন্দোলনকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে পেরেছিলেন, আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে দাবি আদায়েও সফল হয়েছিলেন। মূল দাবি

ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বাতিল এবং শেখ মুজিবের মুক্তি।

১৯৬৯ইং ১৭জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তার আগে ৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরীর প্রচেষ্টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বাসায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ন্যাপ (ওয়ালী খান) দলের নেতৃবৃন্দ, কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মমতাজ দৌলতানা, পিডিএম-এর নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। এ বৈঠকেই আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন জোরদার করার লক্ষ্যে ৮টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (Damocratic Action Committee) গঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের আহ্বান এবং ন্যাপ (ওয়ালী) সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেনের অনুরোধ সত্বেও ভাসানী 'ডাক' বর্জন করেছিলেন। "১৯৬৯-এর ১৫জানুয়ারি বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ ... 'মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হামলা'র প্রতিবাদে এক প্রতিবাদ সভার আযোজন করেন। শিল্পী জয়নুল আবেদীন, কবি সুফিয়া কামাল, ডঃ আহমদ শরীফ, সিকান্দর আবু জাফর, রণেশ দাশগুপ্ত, কে.জি. মোস্তফা, অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন প্রমুখ এ সভায় বক্তব্য রাখেন এবং জনতার আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন" (৩/১৯৯)।

স্মরণ করা যেতে পারে, আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত না হবার ইচ্ছা থেকেই মওলানা ভাসানী কয়েক বছর যাবৎ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে দূরে সরেছিলেন। এসময় শেখ মুজিব ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত একজন বিশ্বাসী সাংবাদিকেরে মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করার অনুরোধ জানিয়ে মওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। "The timing was perfect. ...Of late, however, the Chinese had ceased to look upon Ayub as the sole guarantor of friendly relations with China.....the Chinese had quietly let it be known that they were not averse to an alternative government in Pakistan so long it follows a pro-Chinese policy. Bhashani was now ready to make an about-turn in his attitude toward Ayub without any pangs of conscience. ... So Bhashani left his village home.....He held a big meeting at Paltan Maidan lambashing the Ayub regime for its misdeeds" (৭/১৫১)।

এ.বি.এম মূসা 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার বার্তা সম্পাদক, পরবর্তী সময়ে এবিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন 'মুজিব ভাই' শিরোনামের বইটিতে। শেখ মুজিব 'অবজারভার'এর সাংবাদিক আতাউস সামাদের মাধ্যমে মওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। মুজিবের বার্তা পেয়েই আতাউস সামাদ এবং সহকর্মী আব্দুর রহিম ইস্কাটনে সাইদুল হাসানের (একাত্তরের শহীদ) বাসায় দেখা করেছিলেন মওলানা ভাসানীর সাথে। পরবর্তী বর্ণনা 'মুজিব ভাই' থেকে : "হুজুর, শেখ সাহেব জানিয়েছেন আপনাকে তাঁর মুক্তির জন্য আন্দোলনে যেতে হবে'। মওলানা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আন্দোলন করব। তবে আইয়ুবের গোল টেবিলের পর'। আইয়ুব তখন

রাজনৈতিক নেতাদের গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছেন। মওলানা ও ভুট্টো সেই বৈঠক বর্জন করার আহ্বান জানিয়েছেন। সামাদ বলল, 'হুজুর, শেখ সাহেব ... বলেছেন, তিনি এগার বছর আপনার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। বলেছেন, 'এদেশে রাজনীতি করতে হলে তাঁর আমাকে প্রযোজন হবে, আমারও তাঁকে নিয়ে রাজনীতি করতে হবে'। মওলানা ... বলে উঠলেন, 'মজিবর একথা বলেছে? ঠিক আছে, তাকে মুক্ত করে ছাড়ব'। তার পরদিনই পল্টন ময়দানে মওলানা আঙুল তুলে হুংকার দিয়ে উঠলেন লক্ষ জনতার সমাবেশে, ... 'খামোশ'। ... ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নতুন স্লোগান যোগ হলো, 'জেলের তালা ভাঙব, শেখ মুজিবকে আনব'। শুরু হলো মওলানার সুখ্যাত বা কুখ্যাত সেই জ্বালাও পোড়াও আন্দোলন" (১৪/৫১-৫২)।

উপরোদ্ধৃত কোনো বর্ণনাতেই শেখ মুজিবের বার্তা প্রেরণের কিংবা পল্টন ময়দানে মওলানা ভাসানীর সমাবেশের কোনো তারিখের উল্লেখ নেই। তবে ভিন্ন সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় মওলানা ভাসানী ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ইং অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে "জ্বালাময়ী ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, 'আমার তিনটি সন্তানের চাইতেও মজিবর উত্তম, মজিবর মিয়ার যদি কিছু হয় তবে পাকিস্তান বল আর যাই বল কিছুই থাকবে না'। সরকারকে মাত্র দুই মাসের সময় ধরে দিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাত্রদের '১১ দফা' দাবি মেনে না নিলে খাজনা-ট্যাক্স সব বন্ধ করে দেযা হবে। তিনি আইয়ুব খানের গোল টেবিল বৈঠকের তীব্র বিরোধিতা করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করে মওলানা সাহেব মঞ্চ থেকেই এই স্লোগান তুলেন, চলো চলো ... সমবেত জনতা সমস্বরে স্লোগানের শেষ অংশ কণ্ঠে তুলে নিল ... ক্যান্টনমেন্ট চলো" (৩/২০৩)।

৫ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর প্রথম ১৭ জানুয়ারি থেকে আন্দোলনের মাত্রা ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে এবং শেখ মুজিবের মুক্তি পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য ধারায় চলতেই থাকে। ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলার ছাত্রসভার সিদ্ধান্তে তাৎক্ষণিকভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হয়। ঢাকা ও সলিমূল্লাহ মেডিক্যাল কলেজেও প্রতীক ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছিল। পুলিশের লাঠি-চার্জ ও কাঁদানের গ্যসে বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হযেছিলেন। কিছু ছাত্রকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। ১৮জানুয়ারি ব্যাপকতর মাত্রায় একই অবস্থা চলতে থাকে। ইপিআর বাহিনী ইকবাল হল, জিন্নাহ হলে ব্যাপক তল্লাশি চালায়। ২০ জানুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, দিনভর ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ চলে।"পুরনো কলাভবনের উল্টো দিকে ... প্রগতিশীল ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামানকে রিভলবারের গুলিতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। হাজার হাজার ছাত্র মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ... লাশ পাহারা দিয়ে রাখে। পক্ষান্তরে পুলিশের আইজিপি'র নেতৃত্বে ইপিআর ও সশস্ত্র পুলিশের বারংবার হামলায় লাশ দখলের চেষ্টা চালানো হয়। ... তোফায়েল আহমদের সভাপতিত্বে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় এবং শোক মিছিল নগরীর রাস্তায় নেমে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের একটি নগ্নপদ মিছিল এই হত্যার প্রতিবাদে বের হয়। চট্টগ্রামের রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ ও ছাত্রদের মধ্যে কয়েক

দফায় সংঘর্ষ ... রাজশাহীসহ প্রদেশের অন্যান্য শহরে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষুব্ধ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়" (৩/২০০)।

"সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবীতে ১৯৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি হয়"। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শাসুদ্দোহার বর্ণনা : "শহীদ মতিয়ুর শহীদ আসাদসহ অনেক শহীদের আত্মত্যাগে সৃষ্ট এই মহান গণঅভ্যুত্থান। ... লক্ষ লক্ষ মানুষের উত্তাল জনস্রোত ঢাকার রাজপথকে প্রকম্পিত করে। শহীদ মতিয়ুরের, শহীদ রোস্তমের লাশ নিয়ে যখন ক্ষুব্ধ জনতার মিছিল ক্যান্টনমেন্টে যেতে চায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ক্যান্টনমেন্টে বন্দী, জনতা সেই ক্যান্টনমেন্ট থেকে তাঁদের প্রিয় নেতাকে বের করে আনতে চায়, ঢাকা শহরের নানা স্থানে ... আগুন ... মিছিল, ... ক্ষুব্ধ জনস্রোত নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে আন্দোলনকে বিপথে পরিচালনার জন্য শাসকগোষ্ঠির উসকানিদাতাদের ষড়যন্ত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হতো। ... যে গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিয়ে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠির ভিৎ ভেঙ্গে দিচ্ছে - সেই গণ-সংগ্রামকে সঠিক পথে পরিচালনাই ছিল আমাদের কর্তব্য। তাই ক্ষুব্ধ জনস্রোত ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে বের করে আনতে গেলে 'হিতে বিপরীত' হতে পারে। ... তাৎক্ষণিকভাবে মিছিলের মধ্যেই সাইফউদ্দিন মানিক, আব্দুর রউফ, তোফায়েল আহমেদ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, মোস্তাফা জামাল হায়দার ও আমি পরামর্শ করে মিছিল ইকবাল হলে নিতে সিদ্ধান্ত নেই ... কিন্তু জনতাকে কি করে ইকবাল হলের মাঠে নেওযা যাবে? এমনি সময় মানিক ভাই বলে উঠলেন, শহীদদের লাশ আমাদের সাথে মিছিলে আছে। সবাই 'লা ইলাহা ইল্লালাহু মহাম্মদুর রসুলাল্লাহ' পড়ুন। ... ক্ষুব্ধ জনস্রোতের উত্তেজিত স্লোগান বন্ধ হয়ে যায়। মিছিলকে ... ইকবাল হলের মাঠে নিয়ে গিয়ে ... পরদিন বেলা দুইটায় পল্টনের জনসভা ঘোষণা করা হয় ... মুক্তিপাগল মানুষকে ক্ষণিকের জন্য শান্ত করা গেলেও সেই রাতেই ... কারফিউ ভেঙ্গে জনতার মিছিল রাতের ঢাকাকে আবারো ... স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলে। ... ৬৯-এর ২৪ জানুয়ারি সারাদিন এবং কারফিউর মধ্যে সারারাতের গণসংগ্রাম ঐতিহাসিক মহান গণঅভ্যুত্থানের দিন ... বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে অমর" (১৩/২৮৫-২৮৭)।

তোফায়েল আহমেদ উল্লেখ করেছেন, কিশোর ছাত্র মতিউরের পকেটে পাওয়া গিয়েছিল এক টুকরো কাগজ, "ওতে ওর নাম ঠিকানা লেখা ছিল। ... ঠিকানার উপরে গোটা গোটা অক্ষরে ... লেখা ছিল - 'মাগো, মিছিলে যাচ্ছি, যদি ফিরে না আসি মা, মনে করো তোমার ছেলে বাংলার মানুষের মুক্তির জন্য, শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য জীবন দিয়েছে'। ... কারফিউর মধ্যেই আমরা মতিউরের লাশ নিয়ে গেলাম ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের কলোনীতে। আমরা ওর পিতামাতার আকুল আর্তনাদের আশংকা করেছিলাম। ... কিন্তু শোকবিহ্বলতা ভেঙ্গে তাঁরা স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। মা, শুধু আঁচলে চোখ মুছে বললেন, 'আমার ছেলে চলে গেছে দুঃখ নেই, কিন্তু যে জন্য আমার ছেলে রক্ত দিয়ে গেল, সেই রক্ত দেয়া যেন বৃথা না যায়'। বৃথা যায়নি" (২৩/২২-২৩)।

তোফায়েল আহমদের সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিতেই গণআন্দোলনের যথার্থ বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায়। ক্ষুদিরাম-মতিউর-রোস্তম আমাদের অনুভবে একাকার, যেন আকস্মিক মৃত্যু নয়, দেশ-জনতা-জননেতার মুক্তির জন্য পরিকল্পিত আত্ম-বিসর্জন।

ঢাকা-নারায়নগঞ্জসহ বিভিন্ন শহরে সান্ধ্য-আইনের সময় এবং পুলিশী লাঠিচার্জ-গুলি-গ্রেফতার বাড়াতে থাকলে জনতার বিক্ষোভও প্রদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পরে। ২৮জানুয়ারি "পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ (ওয়ালী) অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদসহ বহু নেতা এবং ব্যক্তি গ্রেফতার হন। ... হাইকোর্ট বার সমিতির সভায় জনতার উপর গুলিবর্ষণ ও সান্ধ্য-আইন জারির তীব্র নিন্দা জানানো হয়। ৩১ জানুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লঙ্ঘনের তীব্র নিন্দা করা হয়। ... মুজিবের মুক্তির দাবিতে আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থান ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। মাদারিপুরের জজিরা থানার পুলিশের গুলিবর্ষণে একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়। ভেদরগঞ্জে ... পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। গোপালগঞ্জের জলিরপাড়ে ... পুলিশের গুলিবর্ষণে এক ব্যক্তি নিহত হয়। বগুড়ায় পূর্ণ-দিবস হরতাল পালিত হয়। বাগেরহাটে ছাত্র-মিছিলের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে" (৩/২০১)।

১ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিকদের ওপর পুলিশের বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে সাংবাদিকরা ২৪ঘন্টার ধর্মঘট পালন করেন। সেদিনই দৈনিক ইত্তেফাকের ওপর থেকে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। উত্তাল আন্দোলনের পরিস্থিতি সামাল দেবার লক্ষ্যে আইয়ুব খান ৫ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা করেন যে, ১৯ ফেব্রুয়ারি (পরিবর্তিত তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ইং) পিন্ডিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের এক 'গোল টেবিল বৈঠক' করা হবে। ৬ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই সান্ধ্য আইন শিথিল করায় ঢাকা-নারায়নগঞ্জের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল থেকে হাজার হাজার শ্রমিক-ছাত্র-জনতা ঢাকায় এসে পল্টন-মতিঝিল এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করে। "১০হাজার মারমুখী জনতার হামলায় ... মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান ছাড়াও ... আব্দূল গনি রোডে দু'জন মন্ত্রীর বাসভবন এবং রমনা গেটের নিকটবর্তী স্টেট গেস্ট হাউস ভস্মীভূত করা হয়। পুনরায় ঢাকা শহরে দুইদিনের জন্য সান্ধ্য অইন বলবৎ করা হয়। ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা কাপ্তান বাজারের ন্যাপ কার্যালয়ে মওলানা ভাসানী এক কর্মী সম্মেলনে জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেন" (৩/২০২)। ৯ ফেব্রুয়ারি "সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ১১দফা দাবি ছাড়াও ২১ফেব্রুয়ারি সরকারী ছুটি, গভর্ণর আব্দুল মোনায়েম খানের পদত্যাগ, এ পর্যন্ত নিহত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং বিভিন্ন স্থানে গুলিবর্ষণের বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানানো হয়। ... আইয়ুব নগরের নাম পরিবর্তন করে শেরে বাংলা নগর, আইয়ুব গেটের নাম ... আসাদ গেট এবং আইয়ুব চিল্ড্রেন্স পার্কের ... শহীদ মতিয়ুর রহমান পার্ক নামকরণের দাবি জানানো হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি ... সেনা নিবাসে সামরিক হেফাজতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্দয়ভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়" (৩/২০৩)।

"১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে সার্জেন্ট জহুরুল হক, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে

তাঁদের অন্য রুমমেট হাবিলদার মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বন্দীখানা থেকে বের করা হয়। সামরিক প্রহরায় তাঁরা যখন গণ-টয়লেটের দিকে যাওয়া শুরু করেন, তখন হাবিলদার মঞ্জুর ... খুব কাছ থেকে সার্জেন্ট জহুরুল ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হককে গুলি করে। ... তাদের অতি দ্রুত সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ... দু'জনেরই তাৎক্ষণিক অপারেশন প্রয়োজন ... কর্ণেল আলী (এম এম আলী) দুটো অপারেশনের দায়িত্ব নেন। সকাল আটটায় তিনি ফজলুল হকের অপারেশন শুরু করেন এবং সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে জহুরুল হকের অপারেশনও সম্পন্ন করেন। ... রাত নয়টায় সার্জেন্ট জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করেন। ... গুলির ঘটনা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা শহরের সর্বত্র প্রচার হয়ে যায়। জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে দুপুর ১২টায় রেডিও পাকিস্তানের সংবাদে জানানো হয়, সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সামরিক গার্ডরা তাদেরকে গুলি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ... কেউই এই খবর বিশ্বাস করেনি। ... পরদিন ঢাকা মহানগর প্রচন্ড বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে" (১২/১৪৪-১৪৬)

"An unarmed prisoner had died while in military custody and it was viewed by many as a political killing. Almost a million people joined his funeral procession. Emotions ran high and the situation went out of control.The police and the military watched helplessly as the full-throated crowds directed their fury at the symbol of military justice" (৭/১৫২)। "১৬ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে সব শ্রেণীর মানুষ রাজপথে বেরিয়ে আসে। জহুরুলের মৃতদেহ নিয়ে তাঁরা রাজপথ প্রদক্ষিণ করেন। অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে গণরোষ অচিন্তনীয় ঘটনা সংঘটন করে। বিক্ষুব্ধ জনতা স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান জাস্টিস এস.এ. রহমানের ... বর্ধমান হাউজের বাসভবনে হামলা চালায়। এস. এ. রহমান স্বভাবতই আতঙ্কিত হয়ে ... লাহোরগামী পরবর্তী বিমানে চড়ে বসেন। ... জহুরুল হক হত্যাকান্ড গণ আন্দোলনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে দেয়" (১২/১৪৬)।

১৭ জানুয়ারি থেকে অত্যুঙ্গ ছাত্র-গণআন্দোলন, সেনা-হেফাজতে সার্জেন্ট জহুরুল হকের হত্যা এবং পরবর্তী গণ-রোষের বহিঃপ্রকাশের পরিস্থিতিতেই ১৮ফেব্রুয়ারি "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ সামসুজ্জোহাকে সেনাবাহিনী (বিশ্ববিদ্যালয় গেটে) গুলি করে হত্যা করে। ... আরও একব্যক্তি নিহত ও অপর দুইজন আহত হয়। অপরাহ্ন থেকে রাজশাহীতে সান্ধ্য আইন বলবৎ করা হয়। ... সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ডঃ সামসুজ্জোহাকে হত্যার পর ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সান্ধ্য-আইনের কঠিন শৃঙ্খল এবং টহলদানকারী সকল বাহিনীর প্রতিরোধ ছিন্ন ভিন্ন করে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা ... রাজপথে (ঢাকায়) নেমে আসে। জনতা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' প্রত্যাহারের দাবিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। ... ১৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইনের যে মেয়াদ শিথিল করা হয়েছিল, তা' প্রত্যাহার করে পরবর্তী ২৮ ঘণ্টার জন্য পুণরায় বলবৎ করা হয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ... ঢাকা নগরী বিস্ফোরণোন্মুখ ... মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়।

লক্ষকণ্ঠের ... স্লোগান শুধু একটাই 'জেলের তালা ভাঙ্গবো - শেখ মুজিবকে আনবো'। এই দিন বিকালে শাহীন স্কুলের মোড়ে মাইক লাগিয়ে ঘোষণা করা হলো যে, পরদিন শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া হবে" (৩/২০৩-২০৪)।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য আইয়ুব খানের আহুত রাওয়ালপিন্ডি গোল টেবিল বৈঠকে (১৯ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ইং) যোগদানের জন্য মওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিব আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। "The Awami League was eager to participate in the RTC. An advance team of Awami Leaguers led by Tajuddin and Mushtaque Ahmed went to Islamabad ... They made it clear that the Awami League would not take part in the RTC while Mujib was in detention. But there was no.....provision for bail under the Ordinance ... to try the Agartala case" (৭/১৫২)। কিন্তু আওয়ামী লীগের যোগদানের ব্যাপারে আইয়ুবের আগ্রহ ছিল সমধিক। তিনি জানতেন, আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ এবং সম্মতি ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সিদ্ধান্তই কার্যকর করা যাবে না। তাছাড়া, ভাসানী এবং ভুট্টো গোল টেবিল বৈঠক বয়কটের ঘোষণা দেওয়ায় আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। সরকার প্যারোলে মুক্তি দিয়ে শেখ মুজিবকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যার পরে মুজিব কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে প্যারোলে মুক্ত হয়ে বৈঠকে যেতে অস্বীকার করেন।

"আওয়ামী লীগের অনেক কর্তাব্যক্তি, জাতীয় দৈনিক পত্রিকার বাঘা বাঘা সম্পাদক, সবাই প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রস্তাব অনুযায়ী প্যারোলে (মুজিবকে) মুক্তি নিয়ে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাদের বক্তব্য ছিল, "হিমালয়ের বরফ যখন গলতে শুরু করেছে, তখন প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ এবং তরুণ নেতৃবৃন্দ প্যারোলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির বিরোধিতা করেন" (১(২)/৯১৮)। "ফেব্রুয়ারির ১৭ বা ১৮ তারিখ থেকে বিভিন্ন মহল শেখ সাহেবকে প্যারোলে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে থাকে। ... এনডিএফের নেতা মৌলবী ফরিদ আহমদ সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে অনুরোধ জানান প্যারোলে মুক্তি নিতে। ... ঢাকার তাঁর অন্তরঙ্গ দুজন প্রভাবশালী সম্পাদক জেলে দেখা করে তাঁকে একই অনুরোধ জানান। ঢাকায় তখন তাঁর মুক্তির দাবিতে কারফিউ ভেঙ্গে রোজ রাতে মানুষের ঢল নামছে রাস্তায়। ... তারা প্রাণ দিচ্ছে, রক্ত দিচ্ছে প্রিয় নেতাকে মুক্ত করে আনার জন্য, মুচলেকা দিয়ে আইয়ুবের দরবারে যাওয়ার জন্য নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন যিনি, তিনিও ছিলেন দ্বিধাগ্রস্থ" (১৪/৩৭)।

এবিষয়ে একটি তথ্য জানিয়েছেন কর্ণেল শওকত আলী : "১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বন্দীশালার বারান্দায় আমরা যখন তাঁর সঙ্গে চা পান করছিলাম, তখন রেডিও পাকিস্তানের সংবাদ ... বলা হয়, মওলানা ভাসানী গোল টেবিল বৈঠকে ... আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বুলেটিন শেষ হতেই বঙ্গবন্ধু ... আমাদের বললেন, 'মামলা প্রত্যাহার হবে এবং শিগগিরই আমরা সকলে মুক্তি লাভ করব। ... সরকার

বৈঠকে মওলানা ভাসানীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে, যাতে আমার অনুপস্থিতিতেও তারা তাদের কাজ চালিয়ে যেতে পারে। ... কিন্তু যেহেতু মওলানা ভাসানী বৈঠকে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেহেতু আইয়ুব খানের পক্ষে মওলানার প্রদত্ত শর্তে বৈঠকে আমার উপস্থিতির নিশ্চয়তা বিধানের প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকবে না। যার অর্থ দাঁড়ায়, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা এবং আমিসহ আমার সব সহযোগী আসামিকে আটকাদেশ থেকে অব্যাহতি প্রদান। শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়। (১২/১৪৭-১৪৮)। তবে একথা ঠিক যে, মওলানা ভাসানী নিজে যেমন বৈঠকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন মুজিবও সেখানে যাবেন না। ভাসানীর বক্তব্য ছিল, আয়ুবের গোলটেবিল মানেই আপোষের আলোচনা। এবিষয়ে ভাসানী-মুজিবের প্রত্যক্ষ আলোচনা হয়েছিল আগরতলা মামলা থেকে শেখ মুজিবের মুক্তির অব্যবহিত পরেই। তবে তার আগে প্রাসঙ্গিক একটি ভিন্ন তথ্য।

বঙ্গবন্ধু পরিবারের দু'জন সুহৃদ এ.বি.এম মূসা এবং আব্দুল গাফফার চৌধুরী আর তৃতীয়জন বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য তোফায়েল আহমেদ, ভাষা-বয়ানগত কিছুটা তারতম্য ঘটলেও, তিনজনেই বঙ্গবন্ধুর প্যারোলে না যাওয়া প্রসঙ্গে একটি ব্যতিক্রমী তথ্য উল্লেখ করেছেন। এ.বি.এম মূসা লিখেছেন, মুজিব গোলটেবিলে যাবেন "মুচলেকা দিয়ে নাকি নিঃশর্ত মুক্তি - এই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন একজন নারী। মুজিবের সহধর্মিনী, যিনি রাজনীতি বুঝতেন না; কিন্তু নিজের স্বামীকে জানতেন। বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর স্বামীর মানসিক দ্বন্দ্ব। বন্দী স্বামীকে খবর পাঠালেন, ' ... প্যারোলে মুচলেকা দিয়ে আইয়ুবের দরবারে যেতে পারেন, কিন্তু জীবনে ৩২নম্বরে আসবেন না" (১৪/৩৭)। আব্দুল গাফফার চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, "বেগম মুজিব ... শুধু বলেছিলেন, 'আমি রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু মামলার অন্য সব আসামীদের রাইখা আপনি যদি পিন্ডি যান তাইলে আমি বটি দিযা নিজেই খুন হমু" (১(২)/৯১৮)। তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন, মুজিব-পত্নী স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন, "কোন্ স্ত্রী না চায় তাঁর স্বামী কারাগার থেকে মুক্তি পাক। কিন্তু প্যারোলে মুক্তি নয় - যা বাংলার মানুষ চায় না। আমাদের কথা ভাবতে হবে না। আজ তো সমগ্র বাংলাই আমার সংসার" (২৩/২৬)।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ২০ ফেব্রুয়ারি ক্যান্টনমেন্ট গেটে মাইকে বলা হয়েছিল, পরদিন শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে। তবে ২১ ফেব্রুয়ারি নয়, শেখ মুজিব মুক্তি পেয়েছিলেন ২২ ফেব্রুয়ারি। "On 21 February 1969, Shahid Day, Ayub announced his `final and irrevocable decision' not to contest the next presidential election. On the following day the Agartala case was withdrawn freeing Mujib and the other accused persons. The atmosphere in Dhaka was still tense" (৭/১৫৩)। ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বন্দীশালার প্রতিটি কক্ষে এসে আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে জানান যে, মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং সকালেই সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ... ১৯জুন ১৯৬৮ তারিখে বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিব আমাদের 'কিছুই হবে না' মর্মে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, মুক্তির প্রাক্কালে তা বিশেষভাবে আমাদের মনে পড়ে। কিছুক্ষন পর ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলী একটি জীপ নিয়ে আসেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাঁর ধানমন্ডির বাড়িতে পৌঁছে দেন। আমরা অবশিষ্টরাও মুক্তভাবে ... নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যাই। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ তাদের নিজস্ব রায় প্রদান করে" (১২/১৪৮)।

২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ইং ঢাকার রাজপথে লক্ষকন্ঠের গগণ বিদারী বিজয় উল্লাস : 'জেলের তালা ভেঙ্গেছি - শেখ মুজিবকে এনেছি' ... 'জেগেছে জেগেছে বাঙালি জেগেছে'। দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে "ষড়যন্ত্রের আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিব মুক্ত' শিরোনামে প্রথম পৃষ্ঠার প্রধান খবরে বলা হয়েছিল : "পূর্ব বাংলার মাটিতে অবশেষে বাস্তিলের কারাগার ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। জনতার জয় হইয়াছে। গণদাবির নিকট নতি স্বীকার করিয়া দোর্দন্ড প্রতাপ সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করিয়া পূর্ব বাংলার অগ্নিসন্তান, দেশগৌরব, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানসহ এই মামলায় অভিযুক্ত সকলকে কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনির বন্দীনিবাস হইতে গতকল্য মধ্যাহ্নে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হইয়াছে" (২২/৬৫)।

২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে 'ডাকসু' শেখ মুজিবের সংবর্ধনার আয়োজন করে। ... দূর দূর অঞ্চল থেকেও অনেকেই শেখ মুজিবকে দেখতে এবং তাঁর কথা শুনতে রেসকোর্স মাঠে হাজির হয়েছিলেন। সভা পরিচালনাকারী তোফায়েল আহমেদ সমাবেশে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতার অনুমতি নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' নামে অভিহিত করলেন। সমবেত জনতার মুখরিত স্লোগান : বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু -বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমি শেখ মুজিবুর রহমান গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাবো। আমার ৬-দফার সাথে আমার জনগণ এবং দল আছে। ... আমি যদি এদেশের মুক্তি আনতে এবং জনগণের দাবী আদায় করতে না পারি, তবে আন্দোলন করে আবার আমি কারাগারে চলে যাবো। বাংলার মাটিকে আমি ভালোবাসি আর বাংলার মাটিও আমাকে ভালোবাসে (৩/২১৭)।

সংবর্ধনা সভাশেষে রেসকোর্স ময়দান থেকে বেরিয়ে এলেন জনগণের প্রীতি-শ্রদ্ধায় অভিষিক্ত 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবুর রহমান। এখানে একটি 'অনালোচিত তথ্য' উদ্ধৃত করছি অধ্যাপক ড. মোহম্মদ আসলাম ভুঁইয়া'র 'বঙ্গ-শার্দুল থেকে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামের নিবন্ধ থেকে। "১৯৬২ সালে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ... সময় একটি স্লোগান দেয়া হতো, 'বঙ্গ-শার্দুল শেখ মুজিবের মুক্তি চাই'। আমি ... তাঁর মুক্তির জন্য রাজপথে মিছিল-শোভাযাত্রা করেছি। কিন্তু 'শার্দুল' শব্দের অর্থ আমার জানা ছিল না। তাই সিনিয়র একজন ছাত্রনেতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ... বললেন, ... 'শার্দুল অর্থ হচ্ছে বাঘ। তার মানে শেখ মুজিব বাংলার বাঘ'। ... যেহেতু এ.কে. ফজলুল হককে শেরে বাংলা বলা হতো, তাই শেখ মুজিবকে বঙ্গ-শার্দুল বলা হতো এবং এই উপাধি শেরে বাংলা ... নিজেই তাঁকে দিয়েছিলেন" (১(২)/১০০৫-১০০৬)।

পূর্বোল্লেখিত গোলটেবিল বৈঠক সংক্রান্ত আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় ভাসানী-মুজিব সাক্ষাৎকারের একটি 'নাটকীয়' বর্ণনা রয়েছে এম.আর. অখতার মুকুলের লেখা 'আব্বা হুজুরের দেশে' বইটিতে। "১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। ... রেসকোর্স ময়দানের গণ-সম্বর্ধনার পর ... বাংলা মোটরের কাছে যেয়ে (বঙ্গবন্ধুর) গাড়িটা পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। ... বুঝলাম, বঙ্গবন্ধু যাচ্ছেন ভাসানী ন্যাপের কোষাধ্যক্ষ জনাব সাঈদুল হাসানের বাসায়। ... এখানেই তখন মওলানা ভাসানী অবস্থান করছিলেন। ... শেখ সাহেব কদমবুচি করতে গেলে, মওলানা সাহেব বহুদিন পরে তাঁর 'মুজিবর মিঞা'কে বুকে জড়িয়ে আশীর্বাদ করলেন। ...

মওলানা : মুজিবুর মিঞা, তুমি আর.টি.সি.তে (গোলটেবিল বৈঠক) যাইয়ো না।
শেখ মুজিব : হুজুর, আমি তো কথা দিছি, মামলা উঠাইয়া নিলে রাওয়ালপিন্ডি যাব।
মওলানা : ভুট্টো যাইবো না। আমিও বয়কট করছি। তুমি না গেলেই আর.টি.সি. শ্যাষ।
শেখ মুজিব : তবু ওযাদা রাখতে দোষটা কি?
মওলানা : মুজিবর মিঞা, রাওয়ালপিন্ডি যাইয়া তুমি আর.টি.সি. ভাংবা? কেমন?
শেখ মুজিব : কিসের জন্য? আমি আমার ৬-দফার দাড়ি-কমা-সেমিকালন সবকিছু দুই হাতে জড়াইয়া রাখব। হুজুর, তাহলে তো গোল টেবিল শ্যাষ।
মওলানা : আর পিন্ডি যাইয়া লাভ আছে? প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তো এখন মরা লাশ।
শেখ মুজিব : হুজুর সেই মরা লাশের জানাজাডা পড়তে দোষ কি? আমারে দোয়া করবেন" (৩/২১৯-২২০)।

লক্ষণীয় যে, বঙ্গবন্ধু মুজিবের পিন্ডি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে মওলানা ভাসানী শেষ পর্যন্তই অনাগ্রহী ছিলেন।

গোল গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু ২৪ফেব্রয়ারি ঢাকা থেকে লাহোর হয়ে রাওয়ালপিন্ডি রওনা হলেন। লাহোর বিমানবন্দরে হর্ষোৎফুল্ল, কৌতুহলী বহু মানুষ দেখতে এসেছিলেন, দু'দিন আগে যে মানুষটি আইয়ুবের ফাঁসির দড়িতে মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলেন, তিনিই মাথা উঁচু করে আইয়ুবের সাথেই আলোচনা করতে চলেছেন। মুজিব পিন্ডি পৌঁছানের পরই আইয়ুবের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছিলেন, এটাই ছিল মুজিব-আইয়ুবের প্রথম একান্ত সাক্ষাৎ। ২৫ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন ঘোষনার পরই গোলটেবিল বৈঠক ১০মার্চ পর্যন্ত মূলতুবি করা হয়েছিল। প্রকাশ্য কারণ ছিল আসন্ন ঈদ উদযাপন আর অপ্রকাশ্য কারণ ছিল, নেতাদের জন্য নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সুযোগ তৈরি করা। বঙ্গবন্ধু সেদিনই ঢাকায় ফিরে দু'দিন পরেই পিতা-মাতার সাথে ঈদ উৎসব পালনের জন্য টুঙ্গিপাড়া চলে গেলেন। ঈদের আগেই একদিন আইয়ুব খানের প্রতিনিধি হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের অতি ধনাঢ্য পরিবারের ইউসুফ হারুণ ঢাকা থেকে সামরিক হেলিকপ্টারে টুঙ্গিপাড়ায় এলেন। উদ্দেশ্য, পিন্ডি গোলটেবিল আলোচনায় বঙ্গবন্ধু যেন ৬-দফার প্রশ্নে নমনীয় অবস্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু হারুণ পরিবারের সাথে পূর্বাবধি সৌজন্য-সৌহার্দের সম্পর্ক থাকা সত্বেও বঙ্গবন্ধু

ইউসুফ হারুণের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। অনস্বীকার্য যে, বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর অনড়-অবিচল অবস্থানই ৬-দফাকে শেষপর্যন্ত 'এক-দফা'য় পরিণত করেছিল।

১০ মার্চ, ১৯৬৯ইং গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু তাঁর ৬-দফা এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১-দফার উল্লেখ করে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনসহ ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার, এক লোক এক-ভোট ভিত্তিক সার্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিলের দাবি উপস্থাপন করলেন। বৈঠকে সমবেত নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিষয়ে একমত হতে পারলেও, আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানে সাব-ফেডারেশন (এক ইউনিট বাতিল করে পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চারটি ফেডারেল সাব-ইউনিট সমন্বয়ে একটি ফেডারেল ইউনিট গঠন এবং পূর্ব পাকিস্তান হবে অপর একটি ইউনিট) সম্বন্ধে তাঁরা একমত হতে পারেননি। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এসব প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারলেন না, তাঁর ধারণা ছিল, এগুলি কেন্দ্রীয় শাসন এবং সমগ্র সেনাবাহিনীকেও দুর্বল করে ফেলবে। ইতোমধ্যে পাকিস্তানের উভয় অংশের চলমান আন্দোলনের পরিস্থিতি নমনীয় করার প্রত্যাশায় মোনায়েম খানের স্থলে আইয়ুব পূর্ব পকিস্তানে গভর্ণর পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এন হুদাকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর পদে ইউসুফ হারুণকে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তব্যে অবিচল থাকলেন, "৬-দফা আমার বাঙালির বাঁচার দাবি। এতে কোনোরূপ রদবদল করা আমার বাঙালি জাতির প্রতি বেইমানী করার শামিল। আমি কোন অবস্থায়ই বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে আপোষ করতে পারবো না" (৩/২২৩)। এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর দাবির প্রতি সরাসরি বিরোধিতা এড়িয়ে আইয়ুব খান বলেছিলেন, পরবর্তী জাতীয় সংসদই হবে এসব বিষয় আলোচনার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু তাতেও বৈঠকে অগ্রগতি বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, কোনো সিদ্ধান্ত, এমনকি, পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠানের কোনো উল্লেখ ছাড়াই গোলটেবিল 'বৈঠক শ্যাষ' হয়ে যায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বৈঠকের সমাপনী অধিবেশনে বলেছিলেন, শুধু মাত্র পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া আর কোনো বিষয়েই তাঁর আগ্রহ নেই। কিন্তু প্রত্যাশিত এদু'টি কাজও তিনি করতে পারেননি।

ব্যর্থ গোলটেবিল বৈঠক থেকে বেরিয়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব-গঠিত ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি– 'ডাক'-এর সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। আওয়ামী লীগ-বিহীন 'ডাক'এর আকার্যকরতার বিষয়টি উপলব্ধি করেই আহ্বায়ক নবাবজাদা নসরুল্লাহ 'ডাক' ভেঙ্গে দিলেন। রাজনৈতিক জটিলতা অবসানের কোনো পথ না পেয়ে, পাকিস্তানের 'লৌহ-মানব' বলে কথিত আইয়ুব খান প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নিলেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৫৮ইং প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্যার নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকে দেশান্তরী করার ব্যাপারে আইয়ুবের প্রধান সহায়ক ছিলেন ইয়াহিয়া খান, এবার ইয়াহিয়া খানই বিদায় করলেন আইয়ুবকে।

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসন ঃ

১৯৭০ইং নির্বাচনে ছয়-দফার পক্ষে অভাবনীয় 'ম্যান্ডেট'

২৬ মার্চ, ১৯৬৯ইং প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ইতিহাসে দ্বিতীয় বারের মত সামরিক শাসন জারি করলেন। সেদিনই জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত বেতার-ভাষণে ইয়াহিয়া বলেছিলেন, সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী যথাযথ পরিবেশ পূণর্গঠন ছাড়া তাঁর আর কোনোই অভিপ্রায় নেই। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, "It is my firm belief that a sound, clean and a honest administration is a prerequisite for same and cnstructive political life and for the smooth transfer of power to the representatives of the people elected freely and impartially on the basis of adult franchise" (৭/১৬২)। কার্যত এমন বক্তব্যকেই ইযাহিয়ার সামরিক শাসনের যৌক্তিক ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছিল।

আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারির পরই রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করেছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সে-পথে গেলেন না। তিনি প্রকাশ্য সভা-সমাবেশের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করলেও, ঘরোয়া পর্যায়ে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালানোর অনুমতি দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী প্রায় তিন বৎসর (৮মে ১৯৬৬ইং থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ইং পর্যন্ত) বঙ্গবন্ধু বন্দী থাকায় স্বাভাবিক রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে দূরে ছিলেন। এখন 'ঘরোয়া রাজনীতি'র সুযোগে "বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্ম জোরোশোরে শুরু করেন। বিভিন্ন জেলায় সফর করে দলীয় নেতা ও কর্মীদের সাথে বৈঠক করে সাংগঠনিক তৎপরতা জোরদার করার তাগিদ দেন। ৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৯ইং সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু মুজিব বললেন, "এক সময় এদেশের বুক হইতে, মানচিত্র হইতে 'বাংলা' কথাটির শেষ চিহ্নটুকুও চিরতরে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইযাছে। ... একমাত্র 'বঙ্গোপসাগর' ছাড়া আর কোনো কিছুর সঙ্গে 'বাংলা' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ... আমি ঘোষণা করিতেছি, আজ হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'বাংলাদেশ' (১(১)/৯৩)। অতঃপর ১৯৭০ সালের ৬ জানুয়ারি (কাউন্সিল সভার মাধ্যমে) বঙ্গবন্ধু পূণরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম 'জয় বাংলা' স্লোগান উচ্চারণ করেন।" (৫/৩৯)।

অবিলম্বেই 'এক লোক এক ভোট' ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া। উল্লেখ করা দরকার, তখন অধিকাংশ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকই আইয়ুব-ইয়াহিয়ার মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বিপুল বৈপরিত্ব-ফারাকের কথা বলতেন। আইয়ুব ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ পরিশ্রমী একনায়ক আর ইয়াহিয়া কার্যত একনায়ক হলেও আয়েশী-বিলাসী এবং নিজের প্রত্যক্ষ অর্জন অপেক্ষা 'পরের ধনে পোদ্দারি' করার দিকটিই ছিল তাঁর পছন্দ। সুতরাং নির্বাচন ঘোষণার আগেই নিজস্ব 'সংবাদ সংগ্রাহক' সূত্রে তিনি অবহিত হয়েছিলেন যে, শেখ মুজিবের সাথে সংঘাতে

জড়ালে পাকিস্তানের দু'টি অংশের বিচ্ছিন্নতা ঠেকানোর কোনো উপায়ই থাকবে না এবং তাঁর নিজের পক্ষেও 'আরামে রাষ্ট্র পরিচালনা' অসম্ভব হয়ে পড়বে। সুতরাং তিনি নিজের বিবেচনা মত সব দিক আগে ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দা সূত্রের সংবাদে ইয়াহিয়া একথাই বিশ্বাস করেছিলেন যে, নির্বাচনে সারা পাকিস্তান-ভিত্তিক একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না কোনো দলই। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ বেশি সংখ্যক আসন পাবে আর ভুট্টোর পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানে। মুজিব-ভুট্টোর দু'জনে কিছুতেই একমত হয়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে পারবেন না। তখন 'কিং মেকার' হবে উভয় অংশের মুসলিম লীগ এবং অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলি। আর পদে পদে বহুমুখী বিবাদ-বিভ্রান্তি অনিবার্য হয়ে উঠার প্রেক্ষাপটে সমঝোতা-সুবিচারের দায়িত্ব নিতে হবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকেই এবং সেটাই হবে তাঁর সর্বময় প্রভূত্বের সহজ এবং নির্ভরযোগ্য উপায়। পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতি এবং নিজের শক্তির ভিত্তি হিসেবে তিনি মুসলিম লীগের ওপরই নির্ভর করার কথা ভেবেছিলেন। ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন, কাইয়ুম, দৌলতানা এবং ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে ত্রিধা-বিভক্ত মুসলিম লীগকে একীভূত করা কঠিন হবে না। এমন চিন্তা-ভাবনা থেকেই ইয়াহিয়া নির্বাচন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সংসদীয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জারি করলেন 'লিগেল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' (LFO-1969) ; ঘোষণা দিলেন যে, ১৯৭০ইং বছরের প্রথম দিন থেকেই রাজনৈতিক কার্যকলাপের ওপর থেকে সকল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে এবং একই বছরের শেষ দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

'এল.এফ.ও-১৯৬৯ইং' এর আওতায় ঘোষণা করা হলো যে, "Pakistan would be known as the Islamic Republic of Pakistan; the Islamic ideology, the basis for the creation of Pakistan would be preserved, and the Head of State must be a Muslim (Section 20) . The Constitution Bill as passed by the National Aasembly within 120days of its first meeting, would be presented to the President for authentication. The National Aasembly would be disolved if it failed to produce the Constitution or if the authentication was refused (Section 23) . Only the president was empowered to resolve any question or doubt as to the interpretation of any provisions of the Order. Such decisions would be final and not liable to be questioned by any court (Section 27) . (৭/১৬৪-১৬৫)। আগেই প্রকাশ পেয়েছিল যে, 'এল.এফ.ও'র মধ্যেই প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের সীমা এবং চারিত্র্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তখন বঙ্গবন্ধু মুজিব দৃঢ়ভাবেই গভর্ণর আহসানকে জানিয়েছিলেন যে, এর অর্থ হবে সকল সমঝোতামূলক উদ্যোগের পরিসমাপ্তি এবং সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। গভর্ণর আহসান যুক্তিসঙ্গত কারণেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে জানিয়েছিলেন যে, 'মুজিবের সাথে সংঘাতে গেলে 'এক পাকিস্তান' রক্ষা করা অসম্ভব হবে'। সুতরাং ইয়াহিয়া বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছিলেন। 'এল.এফ.ও'তে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যে,

যেকোনো সাংবিধানিক সিদ্ধান্ত সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বৈধতা পাবে। যদিও ইয়াহিয়া জানতেন, মুজিব-ভুট্টো সমঝোতা অসম্ভব বিধায়, কোনো বিষয়েই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা থাকবে না। কিন্তু এ সাংবিধানিক বিষয়টিতে রাজনৈতিক দলসমুহের আপত্তিরও কোনো সুযোগ ছিল না।

'এল.এফ.ও-১৯৬৯ইং' ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ন্যাপ (পিকিংপন্থী) এবং ন্যাপ (মস্কোপন্থী) উভয় পক্ষই প্রত্যাখ্যান করেছিল। আওয়ামী লীগের দিক থেকেও প্রবল আপত্তির যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল প্রধানত দু'টি, প্রথমত: 'এল.এফ.ও'তে আওয়ামী লীগের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির বিষয়টি সম্পূর্ণ বাতিল করে দেয়া হয়েছিল। এবং দ্বিতীয়ত, প্রেসিডেন্টের হাতে সর্বময় 'ভেটো' ক্ষমতা ন্যস্ত করে, কার্যতই ভবিষ্যতের সংবিধানকে প্রেসিডেন্টের খেয়াল-খুশির বিষয় করে তোলা হয়েছিল। কিন্তু নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবতাবোধ থেকে শেখ মুজিব বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিবেচনা করে নিজের সহকর্মীদেরকে নির্বাচন বয়কট না করার 'কারণ এবং গুরুত্ব' বুঝাতে পেরেছিলেন। ইয়াহিয়ার পরম আস্থাভাজন বাঙালি পরামর্শদাতা জি. এ. চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন গোয়েন্দা-সূত্রে ইয়াহিয়াকে জানানো হয়েছিল, "He (Mujib) was reported to have told them (Party collegues) his sole aim was to win the elections by capturing 99 per cent of the Bengali seats. Who would then.....ignore his plan for Bangladeh?" (৭/১৬৫)। এসকল বার্তা-ব্যাখ্যায় ইয়াহিয়া গুরুত্ব দেননি, কারণ, তাঁর নিজস্ব হিসেবটা ছিল একেবারেই অন্য রকম।

১৯৭০ইং ১ জানুয়ারি রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের পরের দিন সন্ধ্যাতেই আওয়ামী লীগ ঢাকায় এক বিশাল মশাল শোভাযাত্রার মাধ্যমে নির্বাচনমুখী আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের সূচনা করেছিল। মুজিবের চিন্তায় এটাও ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে কোনো দলই ছ'-দফা ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানায়নি। তাই তিনি আওয়ামী লীগের একক শক্তি-সামর্থ্যের ভিত্তিতেই আসন্ন নির্বাচন মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি অন্য কোনো দলের সাথে নির্বাচনী জোট গঠণেও স্পষ্টতই অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। অনস্বীকার্য যে, শুধু নির্বাচনের ফলাফলই নয়, পরবর্তী ঘটনাবলীও তাঁর সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছে। কার্যত তাঁর এ সিদ্ধান্তের ফলে আওয়ামী লীগ এককভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পেরেছিল। প্রসঙ্গতই এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৫৪ইং নির্বাচনের আগেও শেখ মুজিব 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের ব্যাপারে অনিচ্ছুক ছিলেন, নিশ্চিত ছিলেন আওয়ামী লীগের একক বিজয় সম্পর্কেও। একথা তিনি দলীয় সভাপতি মওলানা ভাসানীকেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ প্রবীণ নেতৃবৃন্দের কথাই তাঁকে সেদিন মেনে নিতে হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু মুজিব এবং আওয়ামী লীগের অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির খবরে ইয়াহিয়ার কোনোই দুশ্চিন্তা হয়নি, কারণ তিনি তাঁর 'গেম প্ল্যান' অনুসারে ততদিনে কাইয়ুম মুসলিম লীগ এবং অপরাপর কতিপয় ছোটো ছোটো দল ও ব্যক্তিবর্গকে 'নির্বাচনী

তহবিল' জোগাতে শুরু করেছিলেন। "সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়েছিল, আওয়ামী লীগ পূর্ব বাংলায় ৬০শতাংশের বেশি আসন পাবে না" (১(৩)/১৩০৩)। তাই শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ গণপরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে, এমন কোনো দুশ্চিন্তাও ইয়াহিয়ার ছিল না। নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে তাঁর না হলেও, ভাসানীসহ কতিপয় বাঙালি রাজনীতিবিদের যথেষ্টই দুশ্চিন্তা ছিল। গণসম্পৃক্ত রাজনীতির অভিজ্ঞতায় ভাসানী আসন্ন আগামীর পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছিলেন। "He recognized early on that Mujib's vast popularity was mainly due to his uncompromising demand for complete autonomy. He felt that Mujib could be thwarted from gaining outright majority in the polls, if Yahya could be induced to grant some measure of autonomy before the election, to deny Mujib the opportunity to exploit the issue. He made an appeal to Yahya in January (1970) to do so" (৭/১৬৮)। কিন্তু 'এল.এফ.ও-৬৯'র সর্বময় চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হাতে থাকায় এবং নিজের পরিকল্পনা অন্যরকম থাকায় ইয়াহিয়ার কাছে মওলানা ভাসানীর পরামর্শ গ্রহণযোগ্য হয়নি।

১৯৭০ইং ১লা এপ্রিল ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আওযামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ৭ জুন (ছ'-দফা দিবস) তারিখে প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে বিশাল গণ-র‍্যালীসহ রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। দলীয় সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষনা করলেন, আগামী নির্বাচন, পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন প্রকৃতপক্ষেই ছ'-দফার ওপর 'রেফারেন্ডাম' বা গণভোট হিসেবে গণ্য হবে। সম্ভাব্য সকল পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে সমবেত বিশাল শ্রোতৃমন্ডলীর প্রতি বঙ্গবন্ধু বললেন, "যারা ঢাকায় আছেন, শহরে আছেন, আপনারা বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনকে ছ' পয়সার একটা পোস্টকার্ড পাঠান, তাতে লিখে দিন, 'বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য সবাই যেন আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে ভোট দেয়। ... আমার উপর যদি আপনাদের আস্থা ও বিশ্বাস থাকে ... আমি নেতা নই, আমি আপনাদের মতই কর্মী। ... সোহরাওয়ার্দী ও শেরে বাংলা, তাঁরাই আমার নেতা'। ... বক্তব্য শেষ করলেন জয় সিন্ধু, জয় পাঞ্জাব, জয় বেলুচিস্তান, জয় সীমান্ত প্রদেশ, জয় বাংলা ও জয় পাকিস্তান বলে" (১(৩)/১২৪০)। ইতোপূর্বে 'ঘরোয়া' কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু প্রথম 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়েছিলেন আর এখানে রেসকোর্সের প্রকাশ্য সভায় স্লোগান তুললেন 'জয় বাংলা' বলে, যা নির্বাচনকালীন সময়ে এবং অতঃপর মুক্তিযুদ্ধের সময় জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত প্রধান 'রণধ্বণি' হয়ে উঠেছিল।

"আসন্ন নির্বাচন হবে ছয়-দফার পক্ষে গণভোট"- বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে পিডিএম-নেতা নুরুল আমিন বললেন, "যদি আসন্ন নির্বাচন ছয় দফা পক্ষে গণভোট হয় আর পশ্চিম পাকিস্তানে তা' কোনও সমর্থন লাভ না করে, তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় পশ্চিমের আর পূর্বের পৃথক হয়ে যাওয়া"। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "১৯৪৬ সালে আমরা গান্ধী, নেহরু ও বৃটিশদের বিরোধিতা সত্বেও গণভোটে বিজয় লাভ করেছিলাম,

এবারও আমরা নুরুল আমিন ও তার পাকিস্তানি প্রভূদের বিরোধিতা সত্বেও জয়লাভ করবো" (১(১)/৪৭১)। এদেশের সাধারণ ভোটার-জনগণ বঙ্গবন্ধুকে যতটা আস্থায় রাখতেন, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মানুষেরা অনেকেই ততটা পারতেন না। বঙ্গবন্ধুর প্রিয়ভাজন আব্দুল গাফফার চৌধুরীও তখন, সম্ভবত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর ওপর আস্থা রাখতে না পেরেই 'পূর্বদেশ' পত্রিকার 'তৃতীয় মত' কলামের একাধিক লেখায় সরাসরি প্রবল সমালোচনা করেছিলেন। একদিন লিখলেন, "শেখ মুজিব আন্দোলনের ডাক দিয়ে সব সময় বাক্সপ্যাটরা গুছিয়ে গ্রেফতারের আশায় বসে থাকেন",আরেকদিন লিখেছিলেন, "শেখ মুজিব বাঘের পিঠে সওয়ার হয়েছেন। তাকে বাঘ মেরেই নামতে হবে, না হয় তাকে যেতে হবে বাঘের পেটে'। উল্লেখ্য, বাঘ বলতে তিনি তখনকার জঙ্গি ও স্বাধীনতাকামী ছাত্রসমাজকেই বুঝিয়েছিলেন। ... হামিদুল হক চৌধুরীর ... 'অবজারভার' পত্রিকায়ও ... লেখা হয়, ... 'যখনই জয় বাংলা স্লোগান শুনি, তখনই মনে হয় কিছু স্বেচ্ছাসেবক লাঠিসোটা ও অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে" (১(৩) ১২৪১)।

এখানে একটু পেছনের কথা উল্লেখ করতে চাই। ২১ আগস্ট, ১৯৭০ইং ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সভা শেষে নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, তাঁরা 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব ৩২:১৩ ভোটে পাশ করেছেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, "তোরা স্বাধীনতা চাস, ভালো কথা। বাংলাদেশের মানুষকে প্রস্তুত হতে দে। মিটিংয়ে 'রেজুলেশন' নিয়ে তো স্বাধীনতা হয় না। গ্রামে-গঞ্জে যা, মানুষকে 'মটিভেট' কর, তাদের সাথে কাজ কর। আগে নির্বাচনে দেখি কি হয়। নির্বাচনেই যদি সব পেয়ে যাই, তাহলে কেন অহেতুক ভেজালে যাবো"? (১(৩)/১২৪২)। আজীবন জনগণের ওপর আস্থাশীল এবং গণতান্ত্রিক আদর্শে নিবেদিত মুজিব আসন্ন নির্বাচনের বিষয়ে পরম আশাবাদী ছিলেন, একথা সত্য। তবে একথাও সত্য যে, কোনো কুশলী রাজনীতিবিদ কিংবা সুদক্ষ সেনাপতি কখনো এক-রৈখিক পরিকল্পনায় অগ্রসর হন না। শেখ মুজিবও ১৯৫৪ইং নির্বাচনের বিজয় এবং পাক-ষড়যন্ত্রে সেই বিজয়ের কার্যাকারিতা বানচাল হয়ে যাবার অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে, ১৯৭০ইং নির্বাচনে বিজয়ের ব্যাপারে একান্ত আস্থাশীল থাকলেও, সম্ভাব্য ষড়যন্ত্র মোকাবেলার প্রস্তুতি রেখেই অগ্রসর হচ্ছিলেন।

নির্দিষ্ট ছিল যে, ৫ অক্টোবর, ১৯৭০ইং, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন একসাথেই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু পূর্ব বাংলায় আগস্ট মাসে প্রবল বন্যার কারণে তারিখটি পিছিয়ে করা হয়েছিল ৭ ডিসেম্বর। আবার ১২ নভেম্বর নজিরবিহীন প্রবল সামুদ্রিক ঝড়-জলোচ্ছাসে জান-মালের অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি হয় দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকুলবর্তী গ্রাম-জনপদে, প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। সব রকমের স্বাভাবিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় হেলিকপ্টার ছাড়া দুর্গত অঞ্চলে রিলিফ সামগ্রী পৌঁছানোর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু "No helicopter was made available for this purpose ... although as many as 59 were sitting idle in West Pakistan ... India....was quick to offer relief assistance in various

forms, including aircraft, but Pakistan was reluctant to accept it `out of pride and paranoia'. Permission was later given to India ... on condition that relief supplies should be sent overland, which delayed assistance to victims who needed it urgently" (৭/১৬৯)।

আওয়ামী লীগ তখনই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে নির্বাচনী প্রস্তুতি স্থগিদ রেখে দুর্গতদের ত্রাণ ও পূণর্বাসন কাজে নেমে পড়েছিল। "১৮নভেম্বর কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী সমাজ 'কাঁদো দেশবাসী কাঁদো' শীর্ষক ব্যানার নিয়ে ঢাকার রাজপথে মৌন মিছিল বের করলে শোক-বিহ্বল এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান সরকারের (অবহেলার) বিরুদ্ধে জনচেতনা এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত হয়" (১(১)/১৯৬)। বঙ্গবন্ধু নিজেও দুর্গত এলাকায় ব্যাপক সফর করে বিপন্ন মানুষের অবস্থা এবং ত্রাণ কাজ পরিদর্শন শেষে ঢাকায় ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে বাঙালির প্রতি অবহেলা-বঞ্চনার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বাংলার দক্ষিণাঞ্চলের দুর্গত মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহ এবং প্রেরণ করছে, কিন্তু পাকিস্তানের শাসকরা এগিয়ে আসেননি, নীরব-নিষ্ক্রিয় হয়ে আছেন পাকিস্তানের '২২ পরিবার'এর সম্পদশালী মানুষেরাও। অথচ এদের সবার সকল সম্পদের উৎস এই পূর্ব বাংলা। পাকিস্তানের 'স্বঘোষিত ইসলামের জিম্মাদার' মওদুদি-কাইয়ুম-দৌলতানা-নসরুল্লাহসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দেরও তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ক্ষুব্ধ মন্তব্য ছিল : "Power must be won by the people, whether it is through election, or if the elections are aborted, through the strength of an awakened people" (প্রাগুক্ত)।

এতবড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর, পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক মহলের অনেক বিখ্যাত মানুষও তখন স্লোগান তুলেছিলেন, 'ভোটের আগে ভাত চাই' এবং 'ব্যালট বাক্সে লাথি মার// বাংলাদেশ স্বাধীন কর' ইত্যাদি। তাতে সামরিক শাসন প্রলম্বিত হবে জেনেও তাঁরা উদ্বিগ্ন হননি। উল্লেখ্য যে, নির্বাচন ঘোষণার পরবর্তী দীর্ঘ সময়েও দলীয় দুর্বলতা-বিশৃঙ্খলার কারণে ভাসানী-ন্যাপের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণের দৃঢ় সিদ্ধান্ত কিংবা কর্মসূচী প্রণয়ন করাই সম্ভব হয়নি। "Bhashani was probably looking for a graceful exit, and the cyclone provided him ... excuse to withdraw from the electoral race" (৭/১৭০)। আলোচ্য সাইক্লোনের দু'সপ্তাহাধিক পরে, নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ আগে, ন্যাপ-নেতাকর্মীদেরকে নির্বাচন পরিত্যাগ করে রিলিফ-কাজে নিয়োজিত হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন ভাসানী। "অনেকে অবশ্য এখন বলে থাকেন যে, সত্তরের নির্বাচনে ভাসানী ন্যাপের অংশগ্রহণ না করা একধরণের চাল ছিলো, ... যাতে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে। কিন্তু একথা যে কোনও মতেই সত্য নয় তা বোঝা যায়" (১(১)/৪৭০) পূর্বাপর ঘটনাবলীর তথ্য-সত্য-বাস্তবতার বিচার থেকে।

২৬ নভেম্বর এক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, নির্বাচন বিলম্বিতকরণের যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে। "২৮ নভেম্বর ১৯৭০ শেখ মুজিব বলেন : ঘুর্ণিঝড়ে ১০লাখ মারা গেছে। স্বাধিকার অর্জনের জন্য বাংলার আরো ১০ লাখ প্রাণ দেবে" (১(১)/৯৩)।

সারা প্রদেশের নির্বাচন পিছিয়ে দিলে জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে শেখ মুজিব অপ্রতিরোধ্য ক্ষুব্ধতার প্রকাশ ঘটাতে পারেন আশংকা করে, সরকার প্রদেশব্যাপী (সাইক্লোন-কবলিত দক্ষিণাঞ্চল ছাড়া) নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখ ঠিক রেখে, শুধু উপদ্রুত অঞ্চলে ১০দিন পিছিয়ে দিয়ে ১৭জানুয়ারি নির্ধারণ করেছিল। প্রদেশ-জুড়ে ঝটিকা সফরের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারসভাগুলিতে বঙ্গবন্ধু মুজিব একদিকে সপ্রমান তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালির প্রতি পাকিস্তানি শাসকচক্রের অব্যাহত বঞ্চনার ইতিবৃত্ত উপস্থাপন করতেন এবং বলতেন, "এবারের নির্বাচন বাঙালিদের অধিকার আদায়ের জন্য আমার শেষ ভোটযুদ্ধ। ৬ দফা কায়েম করতেই হবে" (৫/৩৯)। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং আস্থার ভিত্তিতেই বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার জন্য নির্ধারিত কেন্দ্রীয় পরিষদের আসনগুলিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলিতেও বিপুল বিজয়ের আশা করছিলেন, শতকরা ৯৯টি আসনে বিজয়ের কথাও বলতেন। তখনো পর্যবেক্ষকরা কেউ সে সম্ভাব্য বিপুল বিজয়ের মাত্রাটা আন্দাজও করতে পারেননি।

পাকিস্তান গণ-পরিষদে (কেন্দ্রীয় পরিষদ) মোট ৩১৩ আসনের (সাধারণ আসন ৩০০ এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন ১৩টি) মধ্যে পূর্ব বাংলার জন্য ছিল ১৬৯টি আর পশ্চিম পাকিস্তানের ১৪৪টি। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের আসন ছিল ৩০০টি। গণ পরিষদে পূর্ব বাংলার ১৬৯টি আসনের (সাধারণ আসন ১৬২ এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন ৭টি) মধ্যে আওযামী লীগ প্রার্থীরা জয়ী হয়েছিলেন ১৬৭টি আসনে (সাধারণ আসন ১৬০ এবং মহিলা আসন ৭টি) , বাকি দু'টি আসন পেয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় এবং ময়মনসিংহের নান্দাইল আসনে নুরুল আমিন। উল্লেখ্য যে, রাজা ত্রিদিব রায়কে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নেবার প্রস্তাব দিলেও তিনি সম্মত হননি। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে পাকিস্তানে চলে যান। তিনি ভুট্টোর মন্ত্রীসভারও সদস্য হয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানেই মৃত্যুবরণ (২০১২ইং) করেছেন। পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসনে বিজয়ী হয়েছিল আওয়ামী লীগ। উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ইং নির্বাচন সম্পর্কে কোনো অভিযোগই উঠেনি জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক সংবাদ-মাধ্যমে। তবু একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর 'পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র'এ চরম মিথ্যাচার করে বলা হয়েছিল, "নির্বাচনে সন্ত্রাসবাদীদের কলা-কৌশলের সাফল্য শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দলের সাহস বাড়িয়ে দিলো" (১৬/৪০)।

পশ্চিম পাকিস্তানে গণপরিষদের ১৪০টি সাধারণ আসনের মধ্যে 'পিপিপি' জয়ী হয়েছিল ৮৩টিতে (এবং ৬টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৫টিতে) , অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বমোট ১৪৬ আসনের মধ্যে ভুট্টোর পিপিপি পেয়েছিল মোট ৮৮টি আসন, একটি ছাড়া সবগুলি ছিল পাঞ্জাব এবং সিন্ধু প্রদেশে। পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচন-জয়ী ভুট্টোকে অভিনন্দন-বার্তা প্রেরণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু ভুট্টোর এটা পছন্দ হয়নি, কারণ তাঁর মন তখন এক হঠকারী চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিল। ২০ ডিসেম্বর 'বিজয় উদযাপন' করেই ভুট্টো বলেছিলেন : "Punjab and Sind are the bastions of

power in Pakistan. Majority alone does not count in national politics. No government at the centre could be run without the cooperation of the PPP which controlled these two provinces. I have the key of Punjab assembly in one pocket and that of the Sind in the other" (৭/১৭১)। অর্থাৎ ভুট্টোর বক্তব্যের ঔদ্ধত্য আর হুমকিটাও আদৌ অস্পষ্ট ছিল না।

পরবর্তী ইতিহাস একদিকে ভুট্টো-ইয়াহিয়ার ষড়যন্ত্র এবং অপরদিকে বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্যভেদী রাজনৈতিক দৃঢ়তারও।"১৯৬৬ সাল থেকে তিনি বাংলার ও বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা ... ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ... বঙ্গবন্ধু ... কেন্দ্রে ও প্রদেশের বিপুল বিজয়ের মধ্য দিয়ে ... সারা বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিলেন যে, এই ভূখন্ডের একমাত্র নৈতিক ও রাজনৈতিক মুখপাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ নন। আইনগত বাধানিষেধের মধ্যে অনেকেই তাঁকে নির্বাচন পরিহারের কথা বলেছিলেন। তিনি তাঁর ... হুজুর মওলানা ভাসানীর কথাও শোনেননি। নিয়মতান্ত্রিক কিংবা সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন জরুরি ছিল, যা' তিনি শত বাধা-বিপত্তি বা প্রতিকুলতার মাঝে জয়ী হলেন" (১(৩)/১৫৯৮-১৫৯৯)। নির্বাচনে বিজয়ের পরই বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন, "ছয় দফা ও এগার দফা ভিত্তিতে সংবিধান অবশ্যই প্রণীত হবে"। ১৯৭১ ইং ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্সে নির্বাচনী বিজয় উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাদেশিক ও গণ-পরিষদ সদস্যদের জন্য ছয়-দফা বাস্তবায়নের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠানে জনতাকে সাক্ষী করে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আজ এদের আমি শপথ গ্রহণ করালাম। এদের কেউ যদি কোনদিন বাংলার মানুষের সাথে বেঈমানী করে, তাহলে তাদের জীবন্ত পুঁতে ফেলবেন। আমি আজ আপনাদের সেই ক্ষমতা দিলাম" (১(৩)/১২৪৫)। বঙ্গবন্ধু বলেন যে, "ছয়-দফা এখন আর আওয়ামী লীগের নয়, জনগণের সম্পত্তি। ছয় দফার সাথে আপোষের অধিকার এমনকি তাঁর নিজেরও নেই" (৫/৪০)। আরো বলেছিলেন, "আমি নিজেও যদি এই ওয়াদা খেলাফ করি, তবে আপনারা নিজ হাতে আমাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবেন" (১(১)/৪৭৩)। সেদিন 'জয় বাংলা' ও 'জয় পাকিস্তান' বলে তিনি ভাষণ শেষ করেছিলেন।

৪ জানুয়ারি, ১৯৭১ইং ছাত্রলীগের ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর বিশাল ছাত্র-জনসভা রমনা বটমূলে। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতেই ছাত্রলীগের ভিন্ন-বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী দু'টি গ্রুপের একাংশের স্লোগান ছিল : 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো- বাংলাদেশ স্বাধীন করো; মুক্তির একই পথ - সশস্ত্র বিপ্লব', মুক্তি যদি পেতে চাও - হাতিয়ার তুলে নাও ইত্যাদি। অপরাংশের স্লোগান : 'ছয় দফা মানতে হবে - নইলে গদি ছাড়তে হবে, শেখ মুজিবের মতবাদ - গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, তোমার আমার ঠিকানা - পদ্মা মেঘনা যমুনা'। বঙ্গবন্ধু ভাষণে বললেন, "তোমরা তোমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো বেগবান করো। তোমাদের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। ... তোমাদের অবশ্যই জেগে উঠতে হবে। গণতান্ত্রিক সংগঠনে মতভেদ থাকবে, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা থাকবে, নতুন নতুন স্লোগান আসবে, এগুলি গণতান্ত্রিক রাজনীতিরই

চলমান প্রক্রিয়া'। বঙ্গবন্ধু ... বক্তব্য শেষ করলেন 'জয় বাংলা' বলে, বললেন না 'জয় পাকিস্তান'। ... বঙ্গবন্ধু আর কোনোদিন 'জয় পাকিস্তান' উচ্চারণ করেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই ছাত্রদের স্লোগানই বাংলার নিপিড়ীত-শোষিত জনতার (যথার্থ) কণ্ঠস্বর" (১(১)/৩-১২৪৬)।

"১৯৬৬ সালে তাঁর ঘোষিত ছয়-দফার ফসল তিনি তুলেছেন নির্বাচনের (১৯৭০ইং) মধ্য দিয়ে; এই নির্বাচন ছিল মূলতঃ বাঙালির মনোভাব যাচাই, আর ছয়-দফা ছিল আসলে বাঙালির আত্মিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, শেখ মুজিব ... ১৯৭১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহীদ মিনারে ... বলেছিলেন, "বাংলার স্বাধীনতার ন্যায্য দাবিকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র চলছে। এখনো চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে, বাঙালিকে পায়ের নীচে দাবায়ে রাখার শক্তি পৃথিবীতে কারও নেই। ... আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের প্রয়োজনে আরও রক্ত দেব" (২২/৮১)। সেদিন বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবেই বলেছিলেন, "আজ এই পবিত্র শহীদ মিনারে দাঁড়িয়ে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৫২ সালের বাঙালি আর ১৯৭১ সালের বাঙালি এক নয়' - এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই একাত্তরে মিয়ানওয়ালি কারাগারে যখন তাঁর কবর খোঁড়া হচ্ছে তখনও তিনি ইয়াহিয়ার সঙ্গে সমস্ত আপোস-প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন - নিজের কবর ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যে তিনি শেষোক্তটিই বেছে নিয়েছেন" (১(১)/৪৬৮)।

ইয়াহিয়া-ভুট্টোর 'লারকানা ষড়যন্ত্র' ঃ পাকিস্তানের ভাঙ্গনের প্রেক্ষাপট

পাকিস্তান গণ-পরিষদের ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭ আসনে জয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় অনিবার্যভাবেই দেশে-বিদেশে সুস্থ-স্বাভাবিক চিন্তাশীল সকলেই ধারণা করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু বলতেই হয়, পাকিস্তানি রাজনীতির সতত-চর্চিত অস্বাভাবিকতা আর ষড়যন্ত্রের বিষয়গুলি সেদিন কারো বিবেচনায় ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে সর্বোতভাবেই পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ, ব্যবসার পণ্য, শিল্পের কাঁচামাল এবং নগদ উপার্জনের জোগানদাতা হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধেই ছিল বঙ্গবন্ধু মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালির ২৪ বছরের অনবরত সংগ্রাম। সুতরাং একটা নির্বাচনের ফলাফলে পাকিস্তানের সেনা-আমলাচক্রের মানসিকতায় পরিবর্তন ঘটবে, এমন প্রত্যাশায় আবেগ থাকলেও যুক্তি ছিল না। বিষয়টি পূর্বাপর নির্ভূল উপলব্ধি করতেন বঙ্গবন্ধু মুজিব, তাঁর প্রস্তুতিও ছিল দ্বিমুখী, যেমনটি সরাসরি বলেছিলেন ১২ নভেম্বর,১৯৭০ইং ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে, "ক্ষমতা জনগণের হাতেই ন্যস্ত করতে হবে, নির্বাচনের মাধ্যমে হোক কিংবা জনগণের সচেতন শক্তির সহায়তায়"।

১৯৭০ইং সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলে পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী ভীত-বিস্মিত হলেও ততোধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়েছিল। "Their attitude was tersely expressed by

a General close to the junta who came to Dhaka in late December and assured military officers...'Don't worry...we will not allow these black bastards to rule over us" (৭/১৭২)। তবে শুধু সেনা-আমলাচক্রই নয়, অনেক রাজনীতিবিদই প্রকৃত গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিস্থিতির বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পাকিস্তানের 'তাহরিক-ই-ইশতেকলাল' পার্টির প্রধান এয়ার মার্শাল (অব) আসগর খান একজন নীতিবান মানুষ এবং পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ ছিলেন। সেই আসগর খান করাচিতে ১৯৭০ সালে ঢাকার "দৈনিক সংবাদ' সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরীকে সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, "একটা কথা আমাকে পরিষ্কার এবং সত্য করে বলুন, শেখ মুজিবুর রহমান কি পাকিস্তান ভাঙ্গতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ"? জহুর হোসেন চৌধুরী বলেছিলেন, "প্রশ্নটা ঠিক হল না। ... আপনি কি জানেন না, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঞ্জাবি একটি চক্র, ব্যুরোক্রেসির একটি অংশ, ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের একটা অংশ এবং কিছু সংখ্যক রাজনীতিক সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের প্রহসনেরও কবর রচনা করে একচেটিয়া ক্ষমতা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত কুক্ষিগত রাখার পরিকল্পনা করছে? ... পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক জীবনে তার ন্যায্য অধিকার পুরোপুরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে না দিলে শেখ মুজিবুর রহমান যদি চেষ্টাও করেন পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানে রাখতে পারবেন না -সত্যটি আপনাকে উপলব্ধি করতে অনুরোধ করছি। ... শেখ মুজিব আজ পূর্ব বাংলার ... আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর জন্য প্রধানত কি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরাই দায়ী নয়?" (৯/১৮৯-১৯০)।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আলোচনার জন্য মুজিবকে রাওয়ালপিন্ডিতে আহ্বান জানালেন। শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সহকর্মীরা তাঁর পিন্ডি যাবার ব্যাপারে আপত্তি করলেন এবং তাঁরও স্মরণ ছিল যে, করাচিতে একবার তাঁর ওপর হামলা করা হয়েছিল, এমনকি সোহরাওয়ার্দীকেও হামলা করে হত্যার চেষ্টা হয়েছিল। সুতরাং মুজিব পিন্ডি না গিয়ে ইয়াহিয়াকেই আলোচনার জন্য ঢাকায় আসার অনুরোধ জানালেন। ১২ জানুয়ারি ইয়াহিয়া এলেন ঢাকায়, প্রথম দিন মুজিবের সাথে অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে তিনি খুশি হননি, তথাপি দ্বিতীয় দিন আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী এবং খন্দকার মোশতাক প্রমুখ প্রধান নেতৃবৃন্দ। আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে ছিলেন জেনারেল পীরজাদা এবং গভর্ণর আহসান প্রমুখ। পরে জেনারেল পীরজাদা সে বৈঠকের বিবরণ প্রকাশ করেছিলেন। নির্ধারিত বৈঠকটি সুস্থ-সুন্দর পরিবেশে শুরুর পর শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাখ্যসহ ছয়-দফা ঘোষণাটি উপস্থাপন করে প্রেসিডেন্টের সাথে আনুষ্ঠানিক প্রশ্নোত্তর পর্বের সূচণা করেছিলেন :

"MUjib : Sir, you know what the Six Points Programme is. Please tell me what objections you have to this programme?

Yahya : Sheikh sahib, I have no objection.....but you will have to carry the West Pakistan leaders with you.

Mujib : Of course, Sir, kindly call the Assembly as soon as possible.....

Ahsan : With an absolute majority in the Assembly, the Awami League can bulldoze the Constitution without bothering about West Pakistan interests.

Mujib : No, no. I am a democrat and the majority leader of all Pakistan. I can not ignore the interest of West Pakistan. I am not only responsible to the people of East and West Pakistan, but to the world opinion. I shall do everything on democratic principles....I hope you will arrive in Dhaka three or four days before the Assembly session. I will show you our draft Constitution. If you find objections, I will try to accommodate your wishes" (৭/ ১৭৪)।

বঙ্গবন্ধুর এমন ব্যাখ্যা এবং প্রত্যাশাও কোনো সুফল দেয়নি। বঙ্গবন্ধু প্রস্তাব দিয়েছিলেন, ইয়াহিয়া আগ্রহী হলে ভবিষ্যতে সংসদীয় গণতন্ত্রের পাকিস্তানে 'নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি' হতে পারেন। কিন্তু ইয়াহিয়া আগ্রহ না দেখিয়ে বলেছিলেন, একজন সৈনিক হিসেবে তিনি ব্যারাকেই ফিরতে চান অথবা অবসর জীবনে নিজের বাড়িতে। তবে এবিষয়ে কিছু ভাববারও সময় পাননি তিনি। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনার অল্প সময়ের মধ্যেই খবরটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছে গিয়েছিল। তখনই কয়েকজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তা এসে তাঁকে 'নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি' হওয়ার বিষয়টি বিবেচনার বাইরে রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় দৃশ্যত সন্তুষ্ট হয়েই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাওয়ালপিন্ডি ফিরে গেলেন। ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সন্তুষ্টির কথাই বলেছিলেন এবং শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবি প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও উল্লেখ করেছিলেন। জনৈক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, প্রেসিডেন্ট কি পিপিপি-নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথেও একইভাবে সাক্ষাৎ করবেন। সরাসরি জবাব এড়িয়ে ইয়াহিয়া বলেছিলেন, অচিরেই তিনি লারকানায় পাখি শিকার করতে যাবেন এবং তখন ভুট্টো সেখানে থাকলে অবশ্যই সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের এ বক্তব্যে ফাঁক ছিল, ফাঁকিও। আগেই ভুট্টো-ইয়াহিয়া যোগাযোগ হয়েছিল এবং ভুট্টোর আমন্ত্রনে পাখি শিকারের বিষয়টিও পূর্ব-নির্ধারিত ছিল। লারকানায় পাখি শিকারের ঘটনাটি ছিল একটি রাজনৈতিক চক্রান্ত প্রণয়নের চুড়ান্ত পর্যায়। অতঃপর এরই সুযোগে ভুট্টোর সমর্থন-সহায়তায় সেনা-আমলা চক্র পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রত্যক্ষ বিভাজন-বৈরিতার সূচনা করেছিল।

মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান লিখেছেন, সামরিক জান্তার "ধারণা ছিল চাপ দিলে মুজিব ছয় দফা থেকে মৌলিকভাবেই সরে আসতে বাধ্য হবে। অথবা সংঘাত অনিবার্য। এই সম্ভাব্য সংঘাত থেকে দেশকে বাঁচাবার চাবিকাঠি ছিল একমাত্র ভুট্টোর হাতে। ... ভুট্টো যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং দেশপ্রেমিক হতেন এবং পাকিস্তানের

সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা শেখ মুজিবের সাথে ... আলোচনার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে প্রয়াস পেতেন, তবে পাঞ্জাবি সামরিক জান্তার পক্ষেও সে সমাধান মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকতো না। শেখ সাহেবও হয়তো কোনো প্রান্তিক ছাড় দিয়ে দেশ ও গণতন্ত্র দুটো বাঁচিয়ে একটি রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হতে পারতেন। ... ইতিহাস প্রমান করেছে যে, ভুট্টো ছিলেন যেমনি বিবেকহীন হীন-চরিত্রের ব্যক্তি অর্থাৎ অমানব, তেমনি ছিলেন উচ্চাভিলাষ-তাড়িত স্বার্থান্ধ মনের অধিকারী। ... স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দেশ ও দেশবাসীর ধ্বংস ডেকে আনা তাঁর কাছে ছিল নিতান্তই ছেলেখেলা। অপরদিকে তিনি ছিলেন ক্ষুরধার মেধাশক্তির অধিকারী। ... তিনি দাওয়াত করেছেন সামরিক প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ... তাঁর গ্রামের বাড়িতে পাখি শিকার করার জন্য। ... ইতোপূর্বে ইয়াহিয়া খান দু'একবার ঢাকায় গিয়েছেন রাষ্ট্রীয় সফরে। ... শেষ সফরে তিনি খোলাখুলি বলেই দিয়েছিলেন যে, শেখই পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু লারকানায় শিকার সফরের পরে দেখা গেল ইয়াহিয়ার কণ্ঠে কিছুটা ভিন্ন সুর। তিনি নব-নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংবিধান রচনার বৈঠক পিছিয়ে দিলেন একাধিকবার। মনে হলো ভুট্টোর সাথে তাঁর আঁতাত হয়ে গেছে" (১০/২১-২২)।

ভুট্টোর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা রফি রাজা লিখেছেন, "He (Bhutto) at all times had a poor opinion of Mujibur Rahman.....as a coward and a rabble-rouser. Soon after the election, Bhutto had discussed with him (Rafi Raza) the post-election situation in which each of the principals –Mujib, Bhutto, Yahya – appered `fixed in a triangle' with little room to maneuver ... yet he (Bhutto) remarked, `I will ensure Yahya remains on my side." (৭/১৭৬)। লারকানায় 'পাখি শিকার' করার সুযোগে ভুট্টো সঠিক লক্ষ্যভেদ করেছিলেন। অতঃপর ইয়াহিয়া আর কখনো শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের 'ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী' বলে উল্লেখ করেননি।

ঢাকা থেকে ফিরে ভুট্টোর সাক্ষাতে ইয়াহিয়া, শেখ মুজিবের সাথে সৌজন্য-পূর্ণ, ফলপ্রসূ আলোচনার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, মুজিব তাঁর কাছে ছয়-দফা উপস্থাপন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি (ইয়াহিয়া) মনে করেন, ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করা যেতেই পারে। ভুট্টো ভেবেছিলেন, ইয়াহিয়া ছয়-দফার বিষয়টি সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করতেই পারেননি। "লারকানা ষড়যন্ত্র' নামে কুখ্যাত এই চক্রান্তে ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বাঙালির হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করলে পাকিস্তান থাকবে না। ভুট্টো এও বোঝালেন যে, যদিও ভুট্টো নিজে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ... তবুও তাঁর পক্ষে দেশের এতবড় ক্ষতি হতে দেযার চেয়ে সামরিক শাসনই অনেক ভালো এবং গ্রহণযোগ্য। অতএব, ভুট্টো ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনকেই সমর্থন দেবেন, মুজিবকে নয়। মুজিব এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন, তাতে কী? পশ্চিম পাকিস্তানে তো মুজিব একটি আসনও পাননি। পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা ভুট্টো। ... অতএব, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ তাঁর (ভুট্টোর) কথাতেই উঠবে-বসবে

এবং সামরিক শাসন মেনে নেবে। বলা বাহুল্য যে, এই কথাগুলি ইয়াহিয়াকে বোঝাবার প্রযোজন ছিল না। তিনি নিজেই চাচ্ছিলেন, যেভাবেই হোক, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত এই দুই নেতাকে আলাদা করা। ভুট্টো যদি ইয়াহিয়ার পক্ষে থাকেন, তবে মুজিব পাকিস্তানের নতুন সংবিধান রচনায় হয় পাঞ্জাব তথা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বর্তমান প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখবেন, নয়তো দেশদ্রোহী হিসেবে বন্দুকের নলের মুখোমুখী হবেন। হাঁ, হতে পারে, বাঙালিরা মুজিবের আদেশে আন্দোলনে নামবে। কিন্তু কঠোরভাবে রক্তপাতের মাধ্যমে তা দমন করলে বাঙালি এবার কেন, আগামী দু'তিন প্রজন্ম পর্যন্ত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না" (১০/২২)।

ইয়াহিযার 'হঠকারী' চিন্তার বিষয়টিও তাৎক্ষণিক নয়, এটি ছিল পাকিস্তানি শাসকচক্রের ধারাবাহিক চিন্তার ফসল। "১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতনের পরই পাকিস্তানি শাসকচক্র স্থির করে এদেশবাসীর মাজা ভেঙ্গে দিতে হবে, এদের এমন মার দিতে হবে যে, তারা যেন আর জন্মেও মাথা তুলতে না পারে। ... পাকিস্তানি শাসকরা ভেবেছিল হিন্দুদের হত্যা করতে শুরু করলেই তারা দলে দলে ভারতে চলে যেযে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাবে, যার ফলে অবাঙালি মুসলমানেরা লাখে লাখে এদেশে হিজরত করবে। ইতিমধ্যে বাঙালি মুসলমান যত পারা যায় মেরে তাদের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনা হবে। এদেশে ... যদি আর পঞ্চাশ লাখ অবাঙালি মুসলমান ভারত থেকে আমদানি করে হিন্দুদের জায়গায় বসানো যায, তবে বাঙালি মুসলমানেরা জীবনে কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না ... এই দানবীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যবস্থা চলতে থাকে প্রায় সারা ১৯৭০ সাল ধরে, যখন ইয়াহিয়া খান গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি অহরহ দিয়ে যাচ্ছেন। ... ভুট্টো যে এ পরিকল্পনার একজন প্রধান হোতা ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এ ব্যাপারে তিনি একা দোষী নন" (৯/১৬০)।

'বিবেকহীন ধূর্ত ভুট্টোর আসল পরিকল্পনা' প্রকৃতপক্ষে ইয়াহিয়ারও অজানা ছিল। জেনারেল খলিলের মন্তব্য, "রাষ্ট্রক্ষমতা সামরিক সরকারের কাছে গচ্ছিত রাখার জন্য তিনি একটি সুষ্ঠু নির্বাচনে এতো বড় বিজয় লাভ করেননি। ... রাজনৈতিক বিবেচনায় পূর্ব পাকিস্তান সব সময় একটি তিক্ততা সৃষ্টিকারী সমস্যাসঙ্কুল স্থান হিসেবে পাঞ্জাবের বুকের পাশে কাঁটার মতোই কাজ করবে। অতএব, একে বিদায় দেয়াই সর্বোত্তম। আর সেই সুযোগও এবার সৃষ্টি হয়েছে। ... ভুট্টো জানতেন যে, সামরিক বাহিনী শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জাগ্রত জনগণকে দাবিয়ে দেয়ার ... পথটি বেছে নেবে। কারণ অস্ত্রশক্তির ওপর তাদের প্রচন্ড আস্থা। ... অতএব, সমস্যা যাই হোক, সামরিক কিংবা রাজনৈতিক, গোলাই একমাত্র মহৌষধ। ধূর্ত ভুট্টো বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে পাকিস্তানের জেনারেলদের সাথে মেলামেশা ও ষড়যন্ত্র করে এসেছে। অতএব, এঁদের সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়ন ছিল অনেকটাই সঠিক" (১০/২৩-২৪)।

ইয়াহিয়ার ঢাকা সফর এবং ইয়াহিয়া-ভুট্টোর 'পাখি শিকার'এর পরেই ভুট্টো ২৭ জানুয়ারি শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য সদলবলে ঢাকায় এলেন। তিনদিনের আলোচনায় ভুট্টো বলেছিলেন, সাধারণভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ ছয়-দফাকে

পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার পরিকল্পনা মনে করলেও, তিনি তা' মনে করেন না। তিনি ছয়-দফার যথাসম্ভব অনুকুলেই থাকবেন। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সংশয়-ভীতি দূর করার জন্য অবশ্যই কিছুটা সময়ের প্রয়োজন রয়েছে। তাই, সংসদ অধিবেশন কিছুকালের জন্য পিছিয়ে দেয়াই ভালো হবে। "Mujib, suspicious from the start, turned the proposal down. He (Mujib) probably regarded the proposal as intended to give the vested interests of West Pakistan more time for their machinations against the Awami League ... Bhutto raised the question of power sharing ... as the Prime Minister would be from East Pakistan, the President must be from West Pakistan. Mujib had no objection to this. But when Bhutto suggested that as the majority leader of West Pakistan he would nominate the President, Mujib said, no." (৭/১৭৭)।

বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট করেই ভুট্টোকে জানিয়ে দিলেন, তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রেসিডেন্ট মনোনয়নে রাজি আছেন বটে, তবে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তিনিই প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দানের অধিকারী। বঙ্গবন্ধু এক্ষেত্রে ভুট্টোর সুচতুর অভিপ্রায়টা ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। এসময় রাও ফরমান আলী সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। রাও ফরমান উল্লেখ করেছেন, বঙ্গবন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, "You know Farman, what would have happened if I had allowed him to nominate the President? He would have nominated himself and dismissed me within ten days" (৭/১৭৭-১৭৮)। ভুট্টোর আলোচনা এবং বিভিন্ন প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধু এতটাই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, ভুট্টোকে বিদায় জানাতে তিনি তেজগাঁ বিমানবন্দরেও যাননি, পাঠিয়েছিলেন তাউজউদ্দিন আহমদকে।

ভুট্টো ঢাকা থেকে লাহোরে ফেরার আগের দিন (৩০-০১-'৭১ইং) দু'জন কাশ্মিরী যুবক ভারতীয় অভ্যন্তরীণ রুটের 'গঙ্গা' নামক একটি বিমান 'হাইজ্যাক' করে লাহোরে এনেছিল। লাহোরে নেমেই ভুট্টো সেই 'হাইজ্যাকার'দেরক 'মুক্তিযোদ্ধা' বলে অভিনন্দন জানালেন। এতেই উৎসাহিত হাইজ্যাকাররা ১ ফেব্রুয়ারি 'ডিনামাইট' দিয়ে 'গঙ্গা' উড়িয়ে দিল। "Mujib was under pressure to issue a statement in support of the two highjackers to prove his patriotism, but he denied to rush to judgement. He said that the matter should first be thoroughly investigated. Mujib was condemned by Bhutto for demanding an enquiry and feelings ran high against Mujib in the Punjab. An enraged mob burned the Awami Legaue office in Lahore" (৭/১৭৮)।

'গঙ্গা' হাইজ্যাকের ঘটনাটি দৃশ্যতই পশ্চিম পাকিস্তানে, বিশেষত পাঞ্জাবে ভুট্টোর জন্য অনুকুল পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেও পাকিস্তান সরকারের জন্য লক্ষণীয় প্রতিকুলতার কারণ হয়েছিল। বিমানটি ধবংসের পরেও হাইজ্যাকারদেরকে ভারতের কাছে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করায় ভারতীয় ভূখন্ডের ওপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান যোগাযোগ বন্ধ

করে দেয়া হয়। দু'সপ্তাহ পরে পাকিস্তানের দু' অংশের মধ্যে কলম্বো হয়ে বিমান যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করা হলেও দূরত্ব অনেক বেড়ে যায়, সময় এবং ব্যয়ও বেশি লাগে। ফলে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের প্রস্তুতিমূলক সামরিক উদ্যোগ বিঘ্নিত-বিলম্বিত হয়। এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে তাঁর পূর্বের আলোচনা-সূত্রে বললেন, "President should test the loyalty of Mujib by postponing the National Assembly session. If Mujib accepted the postponement he should be considered a loyal Pakistani and if he did not, then obviously he was disloyal" (৭/১৭৫)।

পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক দলীয় নেতা, যারা পূর্বে ছ'-দফার বিরোধিতা করতেন, তাঁদের অনেকেই শেখ মুজিবের সাথে সমঝোতার পথ খুঁজছিলেন। বিশেষত, পশ্চিম পাকিস্তানের ৫৭জন গণ-পরিষদ সদস্য পিপিপি-দলভুক্ত ছিলেন না এবং এঁদের সম্পর্কে ভুট্টোর যথেষ্টই দুশ্চিন্তা ছিল। তদুপরি পিপিপি-দলভূক্ত সদস্যদের একটা অংশও আওয়ামী লীগের সাথে সংঘাতের বদলে সমঝোতার আগ্রহ দেখাচ্ছিলেন। সুতরাং ভুট্টোর নিজের দিক থেকেও জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন পিছিয়ে দেবার অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল। সেনাবাহিনীর দিক থেকেও প্রস্তুতিমূলক বাড়তি সময়ের প্রয়োজন ছিল। ১১ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাত করে ভুট্টো পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি (ভুট্টো) যতদিন না পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সাথে প্রযোজনীয় আলোচনা শেষ করতে পারেন, ততদিন পর্যন্ত সংসদ অধিবেশন স্থগিদ করে রাখা হোক। কার্যত ভুট্টোর পরামর্শ তখন ইয়াহিয়ার কাছে 'অবশ্য পালণীয়' হয়ে উঠেছিল।

সারা দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষত পূর্ব বাংলায় সকলেই যখন অধীর আগ্রহে জাতীয় সংসদ অধিবেশনের অপেক্ষা করছে এবং ইয়াহিয়া ঘোষণা দিয়েছেন ৩মার্চ ১৯৭১ইং ঢাকায় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসবে, তখনই ভুট্টো তাঁর পরিকল্পিত 'রাজনৈতিক বোমা' ফাটালেন। নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে, গণতান্ত্রিক নিয়মে সারা পাকিস্তানের শাসন-কর্তৃত্বই বাঙালির তথা মুজিবের প্রাপ্য ছিল, কিন্তু ভুট্টো দাবি তুললেন, "We shall not sit in the opposition; we shall demand our due share in the government ... We refuse to wait for five years to get an absolute majority" এবং এমন আচানক দাবির যুক্তি হিসেবে ভুট্টো বলেছিলেন, "the future constitution could not be formed by one wing of the country and by the Awami League ... । এটাই ছিল পাকিস্তানের সেনাচক্র সমর্থিত ভুট্টোর 'গণতান্ত্রিক দাবি' ! অর্থাৎ সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনস্বীকার্য যে, পাকিস্তানের ভাঙ্গনের পথটা ভুট্টোই নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

মুজিব দাবি করছিলেন, সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের পথ ছেড়ে অবিলম্বে সংসদ অধিবেশন আহ্বান করতে হবে আর ভুট্টো বলছিলেন, পিছিয়ে দিতে হবে। এমন দ্বিমুখী চাপের পরিস্থিতিতেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রদত্ত ঘোষণায় ৩মার্চ, ১৯৭১ইং তারিখে ঢাকায় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। ইয়াহিয়ার আস্থাভাজন বাঙালি উপদেষ্টা জি ডব্লিউ চৌধুরী পরবর্তী সময়ে উল্লেখ

করেছেন, ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে সামরিক জান্তার এক গোপন সভায় প্রেসিডেন্টের মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, মন্ত্রীসভার চারজন বাঙালি এবং সেইসঙ্গে একজন অবাঙালি সদস্যও শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন পরামর্শ দিচ্ছেন, যাতে সমঝোতার পথ পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ছে। একই সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর বানিয়ে এ্যাডমিরাল আহসানকে অপসারণ করা হবে। অতঃপর বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া তাঁর মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিলেন। 'কট্টরপন্থী' জেনারেল হামিদ মন্ত্রীবর্গের বিদায়ী নৈশভোজে জি ডব্লিউ চৌধুরীকে বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানে একটা কিছু করার জন্য সৈনিকরা খুবই অধীর হয়ে উঠেছে। হামিদ গর্ব করেই বলেছিলেন যে, ৭২ ঘন্টার মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সামলে নেয়া সম্ভব হবে।

১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো 'অজুহাত' তুললেন, কিছুদিন আগের বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় একদিকে ভারতের সাথে সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটেছে, অপরদিকে ছ'-দফা ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্নে আওয়ামী লীগের একতরফা অনমনীয় মনোভাবের ফলে দেশজোড়া দারুণ সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। এমন অবস্থায় 'দ্বিমুখী জিম্মি' হবার আশংকার কারণে তিনি কিংবা তাঁর দলের কেউ সংসদ অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকায় যেতে রাজি নন। শুধু তাই নয়, তারপরেও যারা ভুট্টোর পরামর্শ না মেনে ঢাকায় গিয়ে অধিবেশনে যোগদান করতে আগ্রহী ছিলেন, ভুট্টো তাঁদেরকে পরোক্ষ হুমকি দিলেন এই বলে যে, এসকল সদস্যগণকে তো পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসতেই হবে।

১৯ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে ফরমান আলী এবং জেনারেল পীরজাদার সাথে আলোচনাকালে বঙ্গবন্ধু মুজিব সম্পর্কে চরম অশোভন উক্তি করে ইয়াহিয়া বলেছিলেন, ওকে শীগগিরই ছেঁটে ফেলা হবে। "West Pakistan is my base. I have to look after it'....On 22 February Yahya called a conference of Goverenors and MLAs. Generals Peerzada and Hamid were also present.....Both Governor Ahsan and MLA Yakub were against the idea of postponement (of the Assembly) and wrote a memorandum bringing out the disastrous implications rolling back .... in 1969. Yahya seemed somewhat shaken and told them : 'I am willing to accept your views. But go and convince Mr. Bhutto. He is the one who is insisting on posteponment" (৭/১৮০-১৮১)। করাচিতে এক সাক্ষাৎকারে আহসান এবং ইয়াকুবকে ভুট্টো বলেছিলেন, আওয়ামী লীগ হচ্ছে গণভিত্তিহীন বুর্জোয়াদের পার্টি, গেরিলা যুদ্ধ করতেও জানে না, সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানে বড় কোনো গোলমাল হবে না। ভুট্টোর বক্তব্য ইয়াহিয়াকে জানানোর পর, ইয়াহিয়া তাঁদেরকে বলেছিলেন, ২৮ফেব্রুয়ারি তারিখে মুজিবের সাথে সাক্ষাত করে যেন সংসদ স্থগিদ করার কথা জানিয়ে দেয়া হয়। জেনারেল ইয়াকুবের কাছে খবরটি শুনে শেখ মুজিব বলেছিলেন, যদি একান্তই সংসদ স্থগিদ করতে হয়, তাহলে একই ঘোষণায় অধিবেশনের সম্ভাব্য পরবর্তী তারিখটাও জানিয়ে দিতে হবে। মুজিবের বক্তব্য আহসান যথাসময়েই ইয়াহিয়াকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়া নিজের সিদ্ধান্তেই

অনির্দিষ্ট কালের জন্য সংসদ অধিবেশ স্থগিদ করেছিলেন, এক্ষেত্রে ভুট্টোর পরামর্শ এবং প্রভাব কার্যকর ছিল, এবিষয়ে সংশয়ের কোনো কারণ নেই।

স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৭০এর নির্বাচনে আ.লীগের ঘোষণা ছিল পরিপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন সহ ছ'দফা বাস্তবায়নের। অপরদিকে ভুট্টোর পিপিপি লড়েছিল 'ইসলামিক সমাজতন্ত্র' কায়েমের দাবি নিয়ে। এখানে প্রসঙ্গতই ১৯৫৪ইং নির্বাচনের কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। তখন যুক্তফ্রন্টের মেনিফেস্টো ছিল ২১ দফা ভিত্তিক আসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আর মুসলিম লীগ লড়েছিল ধর্মীয় রাজনীতির দোহাই দিয়ে। তখন মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটেছিল। কিন্তু সেনা-আমলাতন্ত্রের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে অভ্যস্থ মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভোটের মাধ্যমে নয়, ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। ইতিহাস সাক্ষী, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বাঙালি যতবার বিজয়ী হয়েছে, ততবারই পরাজিত হয়েছে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের কাছে। চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময়ের আওয়ামী লীগ সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমান, এখন অনেক পথ পেরিয়ে, অবর্ণনীয় জুলুম-নির্যাতন সয়ে বর্তমানে দলীয় সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, সদ্য পেরোনো জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তান গণ-পরিষদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনেতা।

১ মার্চ, ১৯৭১ইং দুপুর ১টার পরে রেডিও-সংবাদে 'সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিদ' সংক্রান্ত ঘোষণাটি, ইয়াহিয়ার কণ্ঠে নয়, ঘোষকের কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল। অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের ঢাকার পরিস্থিতির একটা বিবরণ উপস্থাপন করতে চাই আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার স্মৃতি থেকে।

একাত্তরের পয়লা মার্চ, শুরুতে ছিল আর দশটা দিনের মতই সাধারণ। দর্শকপূর্ণ ঢাকা স্টেডিয়ামে বিশ্ব-একাদশ বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেট টেস্ট, অফিস-আদালতে-রাজপথে-বাজারে স্বাভাবিক কর্মপ্রবাহ। মতিঝিলের পূর্বাণী হোটেলে পাকিস্তানের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে নির্বাচিত আ.লীগ সংসদীয় দলের সভা, দু'দিন পরের জাতীয় পরিষদ অধিবেশনের প্রস্তুতিমূলক সভা। দুপুরে রেডিওর খবর, প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক শাসক ইয়াহিয়া সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিদ ঘোষণা করেছেন। মুহূর্তে সব স্বাভাবিকতা অস্থির অস্বাভাবিকতায় রূপান্তরিত হলো। স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা বন্ধ হয়ে গেলো, ঢাকা শহর পরিণত হলো প্রতিবাদী মিছিলের শহরে। সব মিছিলের গন্তব্য পূর্বাণী হোটল, যেখানে ছিলেন 'তোমার নেতা আমার নেতা' শেখ মুজিব। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, সেদিনের স্বতঃস্ফূর্ত জনতার মিছিলে মিছিলে স্লোগান ছিল : জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, পিন্ডি না ঢাকা -ঢাকা ঢাকা; তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা; বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর; এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ইত্যাদি। স্লোগানে-স্লোগানেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা এবং নেতৃত্বের প্রশ্নে বাংলার জনমানস সংশয়হীন। কারণ নিরন্তর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বঙ্গবন্ধুই জনমনে রাজনৈতিক সচেতনতার বীজ বুনেছিলেন, এবং গণমানুষের আস্থা-আকাঙ্খার ব্যক্তি-প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। গতকাল পর্যন্ত যা' ছিল ছ'-দফার দাবি, ইয়াহিয়া-ভুট্টোর হঠকারী চক্রান্তের একটি ঘোষণাতেই

সেটা আজ জনতার স্লোগানেই বদলে গেছে এক-দফায়, স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা।

সেদিন শেখ মুজিব শুধু বলেছিলেন, বাঙালি আর কোনো অন্যায়, গণতন্ত্র-বিরোধী কোনো ষড়যন্ত্র মাথা পেতে নেবে না। যারা আমাদেরকে এখনো দাবিয়ে রাখতে চায়, তারা রয়েছে বোকার স্বর্গে। বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতি ধৈর্য এবং শৃঙ্খলার আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, পরের দিন ঢাকায় হরতাল আর সংসদ অধিবেশনের পূর্ব-নির্ধারিত ৩ মার্চ তারিখে সারাদেশে হরতাল এবং জাতীয় শোকদিবস পালিত হবে। ৭ মার্চ রেসকোর্সে জনসভায় বিস্তারিত কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

স্বদেশ রায়, একাত্তরের ছাত্রলীগ-নেতা, বর্তমানে 'জনকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক, তাঁর 'বিক্ষুব্ধ মার্চ ৭১' নামের বইটিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছিলেন, "হোটেল পূর্বাণীর পার্লামেন্টারি বৈঠক সে সময় একটি জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে পরিণত হয়েছিল। "ধীরস্থির শেখ মুজিব সাংবাদিকদের জানান, আপনারা সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নামে প্রচারিত বিবৃতি শুনেছেন। ... আমি পূর্ব থেকেই বলছি যে, ষড়যন্ত্র চলছে। ...

(সাংবাদিকের) প্রশ্ন : জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিদের আগে কি প্রেসিডেন্ট আপনার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন?

(বঙ্গবন্ধুর) উত্তর : না। আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, আমার সঙ্গে আলোচনা না করে তিনি আলোচনা করলেন ভুট্টো সাহেবের সাথে।

প্রশ্ন : আপনি কি আগে থেকেই জানতেন যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করা হবে?

উত্তর : আমি খবর পেয়েছিলাম। আমি তো আপনাদের বার বার বলেছি, ষড়যন্ত্র চলছে। আমি কিছু খবর পাই।

প্রশ্ন : আপনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানি জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন কি?

উত্তর : আমি পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের জনগণকে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর অনুরোধ করবো।

প্রশ্ন: আপনার দলীয় কর্মী ও নেতাদের গ্রেফতার করা হবে বলে কি আপনি আশংকা করেন?

উত্তর : আমরা যেকোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি। আমাদের ভালোর জন্য আশা করলেও খারাপের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতেই হবে।

প্রশ্ন : এ প্রদেশে বসবাসকারী অবাঙালিদের ভবিষ্যৎ ... ?

উত্তর : তারা এদেশেরই সন্তান। এদেশের জনগণের সংগ্রামে তাদের অবশ্যই যোগ দিতে হবে" (১৭/১১-১২)।

ইকবাল বাহার চৌধুরী, বিখ্যাত টিভি-সংবাদ পাঠক, সেদিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছেন, "১ মার্চ ... দুপুরে ... হঠাৎ দেখি মিছিল আসছে পূর্বাণী হোটেলের দিকে। ... জনতা স্লোগান দিচেছ- ' ... বাংলাদেশ স্বাধীন করো', 'শেখ মুজিব জাতির পিতা'।

মনে আছে মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তৎকালীন জনপ্রিয় যুবনেতা তোফায়েল আহমেদ। ... জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত মিছিল ... পাকিস্তান ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারলাইন্স অফিসে ইটপাটকেল মেরে পাকিস্তান শব্দটি ভেঙ্গে চুরমার করে দিলো। ১ মার্চ এই ধরণের কিছু হবে, সম্ভবত কেউ তা ভাবেনি। আসলে সংসদ অধিবেশন বাতিলের সরকারী ঘোষণাই পাকিস্তানের কবর রচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলো। ... পরের দিন দোসরা মার্চ, ... সাধারণ ধর্মঘট পালিত হলো। তেসরা মার্চ ছাত্রদের আহ্বানে বিরাট জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিলেন। ... ঐ ঐতিহাসিক ভাষণের বিস্তারিত সংবাদ উপস্থাপনের সময় আমি শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' বলেছিলাম। ... তখন থেকে প্রতিদিন 'বঙ্গবন্ধু' বলা চালু হলো" (১(১)/৪৯০)।

পশ্চিম পাকিস্তানি জাতীয় পরিষদ সদস্যদের অনেকের সম্পর্কেই ভুট্টোর দুশ্চিন্তা ছিল একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিক তথ্য হিসেবেই উল্লেখ্য যে, জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিদ সংক্রান্ত ইয়াহিয়ার ঘোষণাটি প্রচারের আগেই, "ভুট্টোর হুমকি সত্বেও ৩৫জন পরিষদ সদস্য ১লা মার্চের আগেই ঢাকা এসে গিয়েছিলেন আরো অনেকে ঢাকার পথে ছিলেন। ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান বললেন, 'আমি ঢাকা যাচ্ছি। ভুট্টোর সাধ্য থাকলে আমাকে ঠেকাক দেখি" (১৮/ ১১)।

"The hartal (2nd. March) was a complete success in Dhaka as well as in the district towns. In Dhaka, however, it was not entirely peaceful...unrully elements also indulged in the looting of shops of non-local Muslims. Curfew was in the city from 9 p.m. to 7 a.m ... it was widely violated. The Army....fired on curfew violators in several places, resulting in nine deaths and fifty-one wonded. On 3 March Mujib ... urged the people to continue the struggle in a peaceful and disciplined manner and reminded them that any breach of discipline `will serve the interest of agent provocateurs and the anti-people forces'....By the morning of 3 March the entire province of East Pakistan had been paralysed by the non-cooperation movement launched by Mujib". (৭/১৮৩)।

অতঃপর ২৫ মার্চ পর্যন্ত এদেশে সরকারী-বেসরকারী সকল কার্যক্রমই চলেছে একমাত্র তাঁরই নির্দেশে। এ সময় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থা-অনুগত্য প্রকাশ করেননি এমন কোনো সংগঠন বা নেতা ছিলেন না বাংলাদেশে। ১৯৭১ইং মার্চ মাসে 'অসহযোগ আন্দোলন'এর সময় সামরিক শাসকচক্র ১৬-২০ মার্চ পর্যন্ত একটানা এবং পরে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত আলোচনা চালিয়েছে শেখ মুজিবের সাথেই। পাক-জান্তার জানা ছিল, তখন মুজিব মানেই বাঙলা, তাঁকে ভয় দেখাতে কিংবা বশীভূত করতে পারলেই আন্দোলন থেমে যাবে। স্মরণ করা যেতে পারে, '৬৬ সালে ভুট্টো ছ'দফার প্রশ্নে প্রকাশ্য জনসভায় বিতর্ক করার জন্য শেখ মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। মুজিব চ্যালেঞ্জ গ্রহন করেছিলেন, কিন্তু বিতর্কে অবতীর্ণ না হয়ে, অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেয়া হবে বলে, ভুট্টো ঢাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর একাত্তরের মার্চে দশ-

বারোদিন ব্যাপী আলোচনায় শেখ মুজিবকে আপোষে রাজী করাতে অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হয়েছিলেন ইয়াহিয়া। কারণ বাংলার মানুষের স্বার্থ এবং কল্যাণের প্রশ্নে শেখ মুজিব ছিলেন সতত আপোষহীন। তাই এবার যথার্থই অস্ত্রের ভাষায় জবাব দেবার ব্যবস্থা করে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা থেকে পাকিস্তানে পালিয়ে গিয়েছিলেন ইয়াহিয়া। সে রাতেই পাকসেনাদের হাতে বন্দী হবার আগে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

অসহযোগ আন্দোলন ঃ
অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ইতিহাস

"১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত, ... গণহত্যাযজ্ঞ শুরু হবার পূর্ব নাগাদ, বঙ্গবন্ধু ছিলেন এদেশের মানুষের মুকুটহীন সম্রাট"। অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ : "সমগ্র জাতির ম্যান্ডেট পাওয়া, সর্বক্ষমতাপ্রাপ্ত, ... শেখ মুজিবের প্রতিটি নির্দেশ তখন সকল বাঙালি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। প্রতিবাদী কোটি মানুষ রাজপথে নেমে এসেছিল, হাতে ছিল লাঠি, কোদাল, লাঙ্গল, বেলচা, মুখে ছিল 'জয় বাংলা' স্লোগান। কিন্তু একটি মানুষও উচ্ছৃঙ্খল হয়নি। বিশ্ব-ইতিহাসে এরকম ঘটনার নজির খুব বেশি নেই" (১(১)/৪৬)। বিশ্লেষণমূলক বক্তব্য অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের, বঙ্গবন্ধুর সমালোচকেরা বলেছিলেন, "এবারে মুজিব আপস করবেন। আপস তিনি করেননি, বরঞ্চ ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের চব্বিশ দিনে পৃথিবী দেখেছিল এক অবিস্মরণীয় অসহযোগ আন্দোলন - এক নেতার ডাকে মাথা তুলে দাঁড়ালো পূর্ব বাংলা। এই সময়টা ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় সময়, আবার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষারও। ... পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে ছয়-দফার ভিত্তিতে সংবিধান রচনার পথ তিনি খুঁজছিলেন, কিন্তু ... উপলব্ধি করছিলেন, সংকট সমাধানের সাংবিধানিক উপায় ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে তিনি এও জানতেন যে, দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। ... তাই আলোচনার পথ খোলা রাখছিলেন" (১(১)/২৪৪-২৪৫)। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদের কথা:"২-২৫ মার্চ, ১৯৭১ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন চলে। পাকিস্তান সরকার বাংলায় সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। ... বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেন *de facto* বা কার্যত সরকার-প্রধান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ... অসহযোগ আন্দোলনই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপলাভ করে (১(১)/২৫৫)। ১০ মার্চের মধ্যে জনজীবন স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল।

উল্লেখ্য যে, অসহযোগ আন্দোলনে পূর্ব বাংলার শাসন-কর্তৃত্ব যখন কার্যতই বঙ্গবন্ধুর নিয়ন্ত্রণে, তখনো পাকিস্তানি সেনা-শাসক চক্রের বাঙালি-দমনের 'পরিকল্পিত উদ্যোগ' সম্পন্ন হয়নি। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিক পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় সেনা বাহিনীর পশ্চিম পাকিস্তানি সদস্য সংখ্যা ছিল মোটামুটি ১০ হাজার, অপরদিকে প্রধানত বাঙালিদের দ্বারা গঠিত 'ইপিআর' ছিল ১৪ হাজার এবং বাঙালি পুলিশের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার। যদিও পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা ছিল আধুনিক ভারী অস্ত্রের অধিকারী এবং যুদ্ধ-দক্ষতায় অগ্রগামী, তথাপি সংখ্যাগত বিরাট ব্যবধান যথাসম্ভব কমানোর

জন্যই বিমানে কলম্বো হয়ে ঢাকায় বেসামরিক পোষাকধারী সেনা পরিবহন শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু ১মার্চ অসহযোগ আন্দোলন শুরুর পরই ঢাকা বিমান বন্দরের বাঙালি কর্মীরা সহযোগিতা করতে অস্বীকার করায় বিমান বাহিনী ঢাকা বিমান বন্দরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তখনই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, যে বিমানে করে জাতীয় পরিষদ সদস্যদেরকে ঢাকায় অনার কথা ছিল এখন বাঙালি-দমনের জন্য পাকিস্তানি সেনাদেরকে আনা হচ্ছে। "Yahya therefore, felt compelled to temporize until the Eastern Command was reinforced to be ready for military action to suppress the Bengali nationalism.So on 3 March Yahya invited all parties to a conference in Dhaka on 10 March to resolve the constitutional problems. (৭/১৮৪)।

৩ মার্চ ভুট্টোর সাথে আলোচনা সেরেই ইয়াহিয়া ঢাকায় ১০মার্চ তারিখে সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দের বৈঠক আহ্বান করেছিলেন। ইয়াহিয়ার আমন্ত্রিত নেতৃবর্গের মধ্যে ছিলেন : "শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, আব্দুল কাইয়ুম খান (মুসলিম লীগ - কাইয়ুম) , মিয়া মমতাজ দৌলতানা (কাউন্সিল মুসলিম লীগ) , মওলানা মুফতি মাহমুদ (জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম) , খান আব্দুল ওয়ালী খান (ওয়ালী ন্যাপ) , মওলানা শাহ আহমদ নুরানী (জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান) , আব্দুল গফুর আহমেদ (জামাতে ইসলামী) , মোহাম্মদ জামাল কোরেফা (মুসলিম লীগ, কনভেনশন) , নুরুল আমিন (পূর্ব পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ), মেজর জেনারেল জামাল দার ও মালিক জাহাঙ্গীর খান (উপজাতি এলাকা থেকে নির্বাচিত)। ... নুরুল আমিনের মত নেতাও ... ঐ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ... বঙ্গবন্ধু ... ঘোষণা করেন, ঢাকা ... ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে যখন নিরস্ত্র জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হচ্ছে, শহীদের তাজা খুণ যখন রাজপথে শুকিয়ে যায়নি, ঠিক সেই সময় এ আমন্ত্রণর প্রস্তাব নির্দয় তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে, কঠোর অস্ত্রের ভাষার ধ্বনি আমাদের কানের কাছে ধ্বনিত হচ্ছে, সেই অবস্থায় এই সম্মেলনের আমন্ত্রণ জানানো বন্দুকের নল উঁচিয়ে আমন্ত্রণ জানানোর সামিল। এ ধরণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না (১৭/১৬-১৭)।

একদিকে প্রেসিডেন্টের আলোচনার প্রস্তাব বঙ্গবন্ধুর সরাসরি প্রত্যাখ্যান এবং অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলনের দৃশ্যমান সাফল্য, ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের জন্য যথার্থই দুশ্চিন্তা এবং আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাও ফরমান আলীকে পিন্ডিতে ডেকে পাঠানো হলো। যাবার আগে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতে ফরমান সরাসরি প্রশ্ন করলেন, পাকিস্তান রক্ষার সত্যি কি কোনো উপায় আছে? বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "হাঁ, রক্ষা করা যেতে পারে, তবে আমাদের কথা শুনতে হবে। সেনাবাহিনী ভুট্টোর কথা শুনছে, তারা আমাদের অনেক লোককে হত্যা করেছে"। এ আলোচনায় তাজউদ্দিন বলেছিলেন, একটা নতুন ফর্মুলা মানলে পাকিস্তান রক্ষার চেষ্টা করা যেতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গণপরিষদ সদস্যদেরকে পৃথকভাবে পাকিস্তানের দু'টি অংশের জন্য দু'টি সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেয়া হোক।

এর পরে, তাঁরা মিলিত হয়ে পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করবেন। বিস্ময়-বিমূঢ় ফরমান আলী ভাবলেন, এ প্রস্তাবটি তো 'ফেডারেশন' নয় 'কনফেডারেশন'এর দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে (৭/১৮৪) (অনুদিত)।

"২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন" করা হয়। ৩মার্চ পল্টনে বিরাট ছাত্র-জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে ছাত্রলীগ নেতা শাহজাহান সিরাজ ১০-দফা বিশিষ্ট 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করলে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, "অবিলম্বে বাংলার গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে। পুণরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সব অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে। টিভি ও বেতারে আন্দোলনের খবর প্রচার না করলে বাঙালিরা তা বর্জন করে রাস্তায় নেমে আসবেন। আন্দোলনরতদের ওপর গুলি করে কাপুরুষের মত যা করা হচ্ছে, তা আর বরদাশত করা হবে না। আন্দোলনের ফাঁকে দুস্কৃতিকারী কর্তৃক লুটতরাজ, ... ইত্যাদির মাধ্যমে আন্দোলনকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াতে হবে। নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি করার পরিণাম শুভ হবে না। এই হত্যাকান্ডের নিন্দা করার ভাষা আমার জানা নেই" (১(৩)/১২৪৭, ১২৪৯)। উল্লেখ্য যে, ১-৩ মার্চ পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে ২৫জন সেনাবাহিনীর গুলিত নিহত হয়েছিল। সভা শেষে বঙ্গবন্ধু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে শহীদদর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। এদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৮জন শিক্ষক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিদ এবং নির্বিচার গুলিবর্ষণ ও হত্যার নিন্দা জানিয়ে যৌথ বিবৃতি দিয়েছিলেন। শিক্ষক সমিতির সভায় "উপাচার্য ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী বলেন, জাতীয় জীবনের এই সংকটময় মুহুর্তে আমরা জনগণের সাথে একাত্ম হওয়ার ঘোষণা করছি। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে গভীর আস্থা জ্ঞাপন করে বলেন, বাংলার ভাগ্য আজ নির্ধারিত, নতুন দিনের সূর্য উঠবেই" (১৭/১৬)।

ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রের অমানবিক 'বাঙালি-দমন' পরিকল্পনার সাথে একমত হতে না পেরে, ৪ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াকুব পদত্যাগ করেছিলেন। মুজিব-তাজউদ্দিনের সাথে সাক্ষাতের পর ঢাকা থেকে পিন্ডি যাবার পথে লাহোর বিমান বন্দরে রাও ফরমানের সাথে দেখা হয়েছিল 'বেলুচিস্তানের কসাই' টিক্কা খানের। জেনারেল ইয়াকুবের স্থলাভিষিক্তি হয়ে টিক্কা ঢাকায় আসছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একান্ত নির্দয়-নির্মম সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বেলুচিস্তানের জনগণের স্বায়ত্বশাসনের দাবি নস্যাৎ করে দিয়েই টিক্কা খান 'বেলুচিস্তানের কসাই' উপ-নামে কুখ্যাত হয়েছিলেন। আর সেই 'অমানবিক অভিজ্ঞতা'র জন্যই সময়মত পূর্ব বাংলায় নতুন গভর্ণর এবং সামরিক আইন প্রশাসক পদে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। ফরমান আলী তাকে ঢাকার পরিস্থিতি জানানোর পরও টিক্কা ভেবেছিলেন, সহজেই সকল সংকট সামলে নেয়া যাবে। টিক্কা খান ঢাকায় এসেই সারা শহরে ট্যাংক নামালেন এবং বড় বড় ভবনের ছাদে বসালেন মেশিন গান।

৫ মার্চ লেখক সংঘ বিক্ষোভ মিছিল সহকারে শহীদ মিনারে সমবেত হয়েছিলেন।

"ড. আহমদ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় বক্তব্য রাখেন ড. মযহারুল ইসলাম, শামসুর রাহমান, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ ... তাঁরা আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, দেশের যে সার্বিক স্বাধিকারের জন্য দেশবাসী রক্ত দিচ্ছে তার প্রশ্নে নেতৃবৃন্দ যেন আপোষ না করেন। বাংলাদেশের লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকেরা আজ পূর্ব বাংলার সার্বিক স্বাধিকার চায়। ... সার্বিক স্বাধিকারের জন্য পূর্ব বাংলাকে এদেশের জনগণের প্রার্থিত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা। ... শেখ মুজিবের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ঐ দিন পর্যন্ত কেবল ঢাকা ও তার আশেপাশে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে ৩০০জন এবং আহত হয়েছে ২০০০" (১৭/২০)। ৩মার্চ তারিখে কেবল চট্টগ্রামই নিহত হয়েছিল ৭৯জন।

৫ মার্চ বেলা ১১টায় সাক্ষাতের জন্য পিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বাসভবনে গিয়ে রাও ফরমান আলী "found him (Yahya) seated barefooted in the verandah, having drinks with General Hamid and Bhutto. After saluting the President, Farman Ali requested to speak to him alone.....Bhutto then withdrew .....Ali gave his report on the grave situation in East Pakistan and an account of his meeting with Mujib. 'Listen to my speech tomorrow. It has answers to your problems in East Pakistan' responded Yahya ... In his speech (6 March) , widely believed to be written by Bhutto, Yahya announced a new date for .....inaugaral session of the National Assembly : 25 March" (৭/১৮৫)।

৬ মার্চের বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া একথাও বলেছিলেন, "মুষ্টিমেয় লোককে আমি লক্ষ লক্ষ নিরীহ পাকিস্তানির মাতৃভূমি ধবংস করতে দেবো না। ... আমি দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আওয়ামী লীগ সভাপতি আমার আমন্ত্রণে (ঢাকায় ১০মার্চের সর্বদলীয় সম্মেলন) সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। ... আমি স্বেচ্ছায় পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে আইনভঙ্গকারীদের লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও খুনোখুনি বন্ধ করার জন্য ন্যূনতম শক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। পূর্ব পাকিস্তানে যা চলছে, তাতে কোন সরকারই নীরব থাকতে পারে না। ... আমি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিতে চাই যে, আমি যতক্ষণ পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর ও রাষ্ট্রের প্রধান থাকব, ... আমি পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ অখন্ডতার নিশ্চয়তা বিধান করব" (১৭/২১)। বাংলার মানুষ যখন পাকিস্তানের নিপীড়ন, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে, তখন ইয়াহিয়ার ভাষণে তাঁরা উল্লেখিত হলো 'মুষ্টিমেয়, আইনভঙ্গকারী' হিসেবে। ইয়াহিয়ার ভাষণে কোনো দিকেই পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন (Civil disobedience) সমগ্র পরিস্থিতিকে এক অপরিবর্তনীয় গতিমুখে ঠেলে দিচ্ছিল। বিভিন্ন স্থানে জেল ভেঙ্গে কয়েদিরা মিছিল করে বেরিয়ে এলো, পাকিস্তানের পতাকা আর কায়েদে আজমের ছবি পুড়িয়ে দেয়া হলো, একমাত্র সেনানিবাস ছাড়া কোথাও পাকিস্তানের পতাকা রইলো না। সিনেমা হলে প্রদর্শনীর শেষে পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত বাজানো বন্ধ করে অধিকাংশ হলেই বাজানো হতে লাগলো: 'জয় বাংলা,

বাংলার জয়'। বাঙালি ঠিকাদারেরা সেনানিবাসে খাদ্যসামগ্রী এবং দৈনন্দিন সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল। এমন অবস্থায় নতুন আইন এবং শাস্তির ঘোষণা দিয়েও কাজ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর অনুমতি নিয়েই ঠিকাদারেরা সেনানিবাসে সরবরাহ শুরু করেছিলেন।

সুধীজন শামসুজ্জামান খানের পর্যবেক্ষণ : "ইংরেজ আমলে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন করেছিলেন। সে আন্দোলন জনসমর্থন পেলেও প্রকৃতিতে ছিল নিষ্ক্রিয় ... সাফল্য ছিল পরোক্ষ ও আংশিক, এর তুলনায় বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ পাকিস্তানি শাসকচক্রের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার শোষণ-বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে ছিল এক চূড়ান্ত ও সফল পদক্ষেপ। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগের পেছনে জনগণের ম্যান্ডেট ছিল। মহাত্মা গান্ধীর তা ছিল না। তাঁর (গান্ধীজীর) অসহযোগ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল দুর্বল" (১(২)/৬৬৯)। বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য সম্পর্কে পাখতুন নেতা আব্দুল ওয়ালি খানের অর্থবহ মন্তব্য: "Even Gandhi would have marveled" (৭/১৮৮)। ঢাকায় কর্মরত মার্কিন কুটনীতিক আর্চার ব্লাড তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিন সরকারের কাছে নিয়মিত বার্তা প্রেরণ করতেন। একটি বার্তায় অর্চার ব্লাড জানিয়েছিলেন, "It would be difficult, perhaps impossible, for the movement toward independence to be checked now" (১(২)/৬৪৩)।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিভিন্ন দিনে জারিকৃত নির্দেশনামাসমুহের (সর্বমোট ৩৫টি) প্রণয়নে জড়িত ছিলেন, বঙ্গবন্ধুর অনুরাগী, রাজনীতি-অর্থনীতির মেধাবী ব্যক্তিবর্গ। প্রসঙ্গত মহীউদ্দীন খান আলমগীর লিখেছেন, "রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পালনীয় কর্তব্যাবলীর সাথে আর্থিক ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী প্রায় প্রতিদিনই আসছে, প্রকাশিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর নামে। খসড়া তৈরিতে সহযোগী আমরা ক'জন। ... অর্থনীতির অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান ... অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা ... অধ্যাপক খান সারওয়ার মুর্শিদ ... আমাদের সকলের স্যার, অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। ... আর্থিক ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলীর খসড়া তৈরি হত, আলোচনা হত প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিচ্ছন্ন অনুলিপি তৈরির পর ড. খান সারওয়ার মুর্শিদ তা পৌঁছে দিতেন ... তাজউদ্দিন আহমদের কাছে, তিনি পৌঁছে দিতেন বঙ্গবন্ধুর হাতে। পরদিন দেখতে পেতাম তাঁর অনুমোদিত ও সংশোধিত অবয়ব খবরের কাগজে। ... তৎকালীন স্টেট ব্যাংকের ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক সম্পাদনীয় কাজ, ঢাকার স্টক ও স্থানান্তর যথা প্রযোজন নির্দিষ্টকরণের জন্য ডাকা হয়েছিল তখনকার অর্থ বিভাগের উপসচিব মনোয়ারুল ইসলামকে। ... কি কাজটি কি প্রক্রিয়ায় করা ফলপ্রসূ হবে বলেছিলেন তিনি" (১(১)/১৫২)। আরো অনেক প্রাজ্ঞজনেরাও নানাবিধ ঘোষণা তৈরির সাথে নানাভাবে যুক্ত ছিলেন, সবকিছুই তাজউদ্দিন আহমদের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর অনুমোদনক্রমে জারি করা হতো।

'বাঙালি যেখান হইতে আজ নির্দেশ গ্রহণ করে' শীর্ষক সম্পাদকীয় কলামে 'দৈনিক আজাদ' লিখেছিল : "বিশ্ববাসীর কাছে আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, বাংলার শাসনক্ষমতা এখন আর সামরিক কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারে নাই, বরং সাত কোটি মানুষের ভালোবাসার শক্তিতে ধানমন্ডির ৩২নং সড়ক এখন বাংলার শাসনক্ষমতার

একমাত্র উৎস হইয়া পড়িয়াছে। আর যাহার নির্দেশ জনগণ পরম শ্রদ্ধায় ও চূড়ান্ত ত্যাগের বিনিময়ে কার্যকরী করে, তিনি হইতেছেন বাংলার মহানায়ক শেখ মুজিবুর রহমান। শেখ মুজিবুর রহমান এখন বাংলার মুক্তি সংগ্রামের জীবন্ত প্রতীক। ... শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবন একটি অঘোষিত সরকারী দপ্তরে পরিণত হইয়াছে। হোয়াইট হাউস বা ১০ নং ডাউনিং স্ট্রীটের মত এই বাড়িটির কোনও সরকারী মর্যাদা নাই বটে কিন্তু বাংলার সাত কোটি মানুষের ভালোবাসার রাজ্যে এই বাড়ি এক অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত" (১(১)/৪৭৬)। লন্ডনের 'দ্য ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড' লিখেছিল: "Sheikh Mujibur Rahman now appears to be the real boss of East Pakistan, with complete support of the population. Rahman's home in Dhanmondi, already known as Number 10, Downing Street in imitation of the British Prime Minister's residence, has been besieged by bureaucrats, politicians, bankers, industrialists and the people from all walks of life" (১(২)/৬৫৫)।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সুপরিচিত সূত্রে বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী অসহযোগ আন্দোলনের পরিস্থিতির মোটামুটি একটি বিবরণ উল্লেখ করা হলো। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র জানিয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন বয়ান :

১. আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপের দরুন আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলো।
২. ব্যাপক অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট ছাড়াও, আওয়ামী লীগের হিংসাত্মক কার্যকলাপ আরো বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ালো। ভিন্নমতাবলম্বনকারীদের তারা আক্রমণ করলো। ৩রা মার্চ চট্টগ্রামে এবং ৫ই মার্চ খুলনায় আক্রমনের ফলে শত শত লোক হতাহত হলো।
৩. শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারকে প্রকাশ্যভাবে চ্যালেঞ্জ করে একের পর এক এমন কতকগুলো নির্দেশ জারি করলেন, যার ফলে প্রশাসন, যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হলো।
৪. পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে হিন্দুস্তানি সৈন্য-সমাবেশ বৃদ্ধি পেলো। (তথ্য সূত্র : ১৬/২৬)।

প্রসঙ্গতই মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের কবিতার কথা: পেঁচা রাষ্ট্র করি দেয় পেলে কোন ছুঁতা// সূর্যের সাথে আছে মোর শত্রুতা"।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ঃ
স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের হলো

প্রবীণ প্রাজ্ঞজন অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের পর্যবেক্ষণ: ১৯৭১এর ৭ মার্চ কল্পনারও অধিক জনসমুদ্র ছিল রেসকোর্সে, মাথার ওপর আকাশে ছিল পাকিস্তানিদের জঙ্গী বিমানের গর্জন। "সেই গর্জনকে ভাষণের অত্যুঙ্গতায় অতিক্রম করে এক দীর্ঘদেহী যুবক মঞ্চ থেকে বিমানের চাইতেও অধিকতর বজ্রের নিনাদে উচ্চারণ

করেছিলেন ... এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। ইতিহাসের অধ্যাপক ড. সালাহ্উদ্দিন আহমদের প্রশ্ন : "১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর বিখ্যাত ভাষণে বাংলার জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। দেশবাসীকে ডাক দিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, এবারের সংগ্রাম ... মুক্তির সংগ্রাম ... স্বাধীনতার সংগ্রাম। পাকিস্তানের জাঁদরেল শাসকদের নাকের ডগায় বাস করে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার সপক্ষে এর চেয়ে বলিষ্ঠ ও পরিষ্কার আহ্বান আর কি হতে পারতো সে সময়"? (১(১)/৫৪)।

"বঙ্গবন্ধু কেন ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না? এই প্রশ্ন এখন শেখ মুজিব-বিরোধীদের প্রধানতম অস্ত্র। কিন্তু শেখ মুজিব ৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার কিছু বাকি রেখেছিলেন কিনা, তা সেই সব জ্ঞানপাপীদের বোঝাবে কে"? সাংবাদিক-সাহিত্যিক মাসুদা ভাট্টি উত্তর সন্ধান করেছেন বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণেই। বঙ্গবন্ধু সেদিন বলেছিলেন, "এরপর যদি একটা গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয - তোমাদের কাছে অনুরোধ রইলো, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে ... সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আর আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না। ... বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবে। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। ... প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ" (১(১)/৪৭৫-৪৭৬)।

শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক এ. বি. এম. মূসা 'সাতই মার্চের যুদ্ধ ঘোষণা' শিরোনামে লিখেছেন, "ইতিহাসের তিনজন মহানায়কের তিনটি ভাষণের মধ্যে আমি অপূর্ব মিল দেখতে পাই - মার্কিন গণতন্ত্রের পথ নির্দেশক আব্রাহাম লিংকনের গেটিসবার্গ ভাষণ, বৃটিশ জাতির সংকটকালে উইনস্টন চার্চিলের যুদ্ধকালীন একটি বেতার ভাষণ এবং বাঙালি জাতির মুক্তির নির্দেশনা দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের একাত্তরের সাতই মার্চের উদাত্ত আহ্বান। ... আব্রাহাম লিংকন মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানীয় ও গণতান্ত্রিক আদর্শের পথ নির্দেশক বলে পরিচিত। ... তাঁর ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর গেটিসবার্গে প্রদত্ত ভাষণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করা। তিনি বলেছিলেন, 'এ নিউ নেশন', একটি নতুন জাতির কথা, যে জাতি সব মানুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে মুক্তির মূল মন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। ... তাঁর এই আহ্বান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি রচনার সহায়ক। ... স্যার উইনস্টন চার্চিল ... হিটলারের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে তিনি দেশবাসীকে এই বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন, 'শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করব'। বিবিসি থেকে ১৯৪০ সালের ৪ জুন তিনি ... বলেছিলেন, 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচ্, অন দ্য ল্যান্ড, ইন দ্য স্কাই, অ্যান্ড ওশেনস্ ... হোয়াটএভার মে বি দ্য কষ্ট, যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করব, আমরা আত্মসমর্পণ করব না'। কী অদ্ভুত মিল রয়েছে এই দু'টি ভাষণের উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্যের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণের। তবে

রেসকোর্সের ভাষণটি ছিল আমার মতে আরো অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী, অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ" (১৪/৬৫-৬৬)।

"সাতই মার্চের ভাষণ শুধু একটি ঘোষণা নয়, ছিল স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা। ... ডিক্লারেশন অব ওয়ার। ... তিনি বলেছিলেন, 'ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'। আর বলেছিলেন, 'তোমাদের যার যা আছে তা-ই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে'। ... এর মানে হচ্ছে যুদ্ধ শুরু হলে, এ যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শত্রু বলতে নিশ্চয়ই একটি প্রতিপক্ষের কথা বলা হয়েছিল, সেই প্রতিপক্ষ কোত্থেকে এল যদি যুদ্ধই না বাঁধে। ... আমার বিশ্লেষণ হচ্ছে, ... বঙ্গবন্ধু যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন, যে যুদ্ধ ছিল মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য। ... অতি ধীরেসুস্থে বক্তব্য শুরু করে তিনি একসময় চরমে গিয়ে পৌঁছেছেন, ... বলেছেন, 'এই দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ'। ... তাঁর বক্তব্য অতীত থেকে বর্তমানে এল, তারপর ভবিষ্যতের দৃঢ় প্রত্যয়ের ঘোষণা, 'জয় বাংলা'। ... ৭ মার্চের আগেই আমরা স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলাম, ... সাতই মার্চের ভাষণে রক্তের বিনিময়ে সেই স্বাধীনতা রক্ষার ডাক দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু" (১৪/৬৭-৬৯)। অধ্যাপক কবীর চৌধূরী লিখেছেন, "তিনি ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার যে অতুলণীয় আহ্বান জানিয়েছিলেন তার ... মধ্যে ছিল সাহস, প্রজ্ঞা, দূরদৃষ্টি ও দেশবাসীর প্রতি গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতিতে মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হবার দিক নির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ভাষণ হিসেবে সার্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছে। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অবিচল আস্থার কারণে মানুষ তাঁর প্রতিটি নির্দেশ আক্ষরিক ভাবে পালন করেছে" (১(১)/৪৬-৪৭)।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার বিষয়-বিশেষজ্ঞ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক বঙ্গবন্ধুর ৭মার্চের ভাষণটির 'প্রায়োগিক' বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, "ভাষণের সূচনা পর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ... শ্রোতার মানসিক অবস্থান ও সাম্প্রতিক ঘটনা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক ... তার আশ্চর্য প্রতিফলণ ঘটে বঙ্গবন্ধুর এই যুগান্তকারী ভাষণে। তিনি শুরু করেছিলেন, 'ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায় ... বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়'। অত্যন্ত কার্যকর অবতরণিকা-যা পুরো বক্তৃতার ভিত্তি তৈরি করেছে ও শ্রোতৃকুলকে অভ্যুদিত বক্তব্যের আভাস দিচ্ছে। ... বক্তৃতাটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয়-বার্তা ও ... পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্র-কাঠামোর পরিসমাপ্তির প্রজ্ঞপ্তি ও বিবরণী"।

"তিনি সংলাপের বাচনভঙ্গী অনুসরণ করেছিলেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। বক্তৃতার বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি ... সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন পাঁচটি। 'কি অন্যায় করেছিলাম? কি পেলাম আমরা? কিসের আরটিসি? কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের রক্ত নিয়েছে তাদের সঙ্গে বসব?' বক্তার সাথে শ্রোতার মেলবন্ধন তৈরিতে 'ask question and then answer' পরামর্শের সুপ্রয়োগ ঘটেছে এ ভাষণে। ... আবার

কথোপকথনের ধারার ... অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সুন্দর সংমিশ্রণও ঘটিয়েছেন এই বক্তৃতায়। বক্তৃতার যেসব অংশে বঙ্গবন্ধু আদেশ, নির্দেশ বা সতর্ক সংকেত দিচ্ছেন, সেসব স্থানে বাক্যগুলো স্বাভাবিকভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। ... যেমন, '২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। ... আমি যা বলি তা মানতে হবে। ... খাজনা-ট্যাকস্ বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ দেবে না" (১(৩)/১৬৯৮-১৭০০)।

রেডিও পাকিস্তান ঢাকার কর্মকর্তা কাদের মাহমুদ লিখেছেন,ভাষণটি সরাসরি সম্প্রচারের ব্যাপারে "সামরিক সরকারের কাছ থেকে অনুমতিও নেয়া হয়েছিলো ... মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে ... ফাঁকে ফাঁকে উত্তেজিত হয়ে স্লোগান দিচ্ছে। ... সহসা দেখতে পেলাম, ঢাকা রেডিও স্টেশনের পরিচালক প্রবীণ আশরাফুজ্জামান আতঙ্কিতের মত ছুটে গেছেন উঁচু সভামঞ্চের দিকে। ... তিনি (বঙ্গবন্ধু) এক ফাঁকে এক নজর তাকালেন জনাব জামানের দিকে। ... 'স্যার, ওরা (সেনা কর্মকর্তারা) রীলে বন্ধ করে দিয়েছে। আপনার বক্তৃতা রেডিও'তে প্রচার করছে না'। কথাটা একবার শুনেই বঙ্গবন্ধু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ... মঞ্চে উপস্থিত অনেকেই শুনেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে ... পেছন থেকে সমস্বরে বারবার আহ্বান জানাতে লাগলো, 'বঙ্গবন্ধু, আপনি এখন (স্বাধীনতা) ঘোষণা করুন ! এখন ঘোষণা করুন !' বঙ্গবন্ধু যেন এদের কথা শুনতেই পাননি, ... তাকালেনও না। তবে এরি মধ্যে তাঁর বক্তৃতার স্বর ... ভাষা ... ভাবভঙ্গী বদলে যাচ্ছে। ... নিজের মতো করে জনতার সাথে কথা বলতে লাগলেন। ... তিনি জানতেন, জাতির এই সংকটকালে তাঁর ভাষণ জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে গণমাধ্যমের অপরিসীম গুরুত্ব আছে। তাই নিজের এই ঐতিহাসিক ভাষণের মাঝেই, ... মানুষের কথা প্রচার করতে না পারলে, রেডিও বন্ধ করে দেবার জন্যে বেতার কর্মচারীদের প্রতি ডাক দেন। প্রকৃতই তাঁর এই ডাকের পরে, ... ঢাকায় রেডিওর কর্মচারীরা প্রচার কাজ বন্ধ করে দেন। সরকারী বেতারে এমন বিপ্লব ঘটানোর আর কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। ... পরে সামরিক সরকার রেডিও কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেন। ... বেতারের প্রচারের কাজ রাতে আবার শুরু হয় এবং বঙ্গবন্ধুর টেপ করা ভাষণটি প্রচার করা হয়। ... পরের দিন সকালেও পূণঃপ্রচার করা হয়" (১(৩)/১৩৩২-১৩৩৪)। পাকিস্তান টেলিভিশনের ঢাকা কেন্দ্র সরকারী 'রক্তচক্ষু' উপক্ষো করেই বঙ্গবন্ধুর ভাষণ পূর্ণাঙ্গভাবে প্রচার করেছিল। "সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে, কর্তৃপক্ষ ২৫ মার্চ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কারো বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সাহস পায়নি" (১(১)/৪৯২)।

সাত মার্চের অমন বিস্ময়কর ভাষণটি কিন্তু পূর্ব-প্রস্তুতকৃত নয়, তাৎক্ষণিকভাবে উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু কোনো দ্বিধা-জড়তা ছিল না, একান্ত প্রয়োজনের কথাগুলি সময় মত উচ্চরিত হয়েছে সুস্পষ্ট কণ্ঠে, প্রাণের গভীর থেকে। এখানে প্রসঙ্গতই উল্লেখ করতে হয় বঙ্গবন্ধু-পত্নী বেগম ফজিলতুন্নেসার কথা। দুপুরে খাবার পর, সভায় রওনা হবার আগে, স্ত্রীর পরামর্শে বঙ্গবন্ধু স্বল্পক্ষণের বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, পাশে উপস্থিত স্ত্রী, কাছে কন্যা শেখ হাসিনা। বেগম মুজিব বললেন, আজ "তোমার সামনে লাখ লাখ

মানুষ, তাঁদের হাতে বাঁশের লাঠি। তোমার পেছনে বন্দুক। এই লাখ লাখ মানুষ যেন হতাশ না হন। কারও পরামর্শ শোনার দরকার নাই। তোমার বিবেকের দিকে তাকাও। মন যা চায় তা-ই বলবে" (২২/৮৩)। ভাষণের শুরুতেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন' অথচ কী সাবলীল দক্ষতায় দ্রুতই 'তুমি' সম্বোধনে বলেছিলেন, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল, তোমাদের যা কিছু আছে, প্রস্তুত থাকবে ইত্যাদি। নেতায়-জনতায় কোনো দূরত্বই নেই। যেন 'হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা'- তবে ফারাকটাও সুস্পষ্ট বটে। 'হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা' মোহমুগ্ধ শ্রোতাদেরকে নদীর জলে ডুবিয়ে মেরেছিল আর বঙ্গবন্ধু সেদিন শ্রোতৃ-জনতাকে মোহমুগ্ধ অবশ্যই করেছিলেন, কিন্তু অনস্বীকার্য যে, সচেতন করেই জাগিয়ে দিয়েছিলেন, মানসিকভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন আসন্ন মুক্তিযুদ্ধের জন্য।

শামসুজ্জামান খান লিখেছেন: "বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে, বাঙালি শত শত বছর ধরে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, সংগ্রাম করেছে, রক্ত দিয়েছে ... এবং তার ফলে স্বাধীনতার যে প্রত্যাশাটি উন্মুখ হয়ে উঠেছে, তাকে ভাষা দিয়েছেন - এবং এই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত একটি ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। ... বিশ্ব-প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও এ ভাষণ অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ। ... উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-ভয়-ত্রাস এবং আশা ও সম্ভাবনায় উদ্বেল সাড়ে সাত কোটি মানুষকে মাত্র ১৯ মিনিটের এক জাদুকরী ভাষণে রাজনৈতিক চেতনার একই স্তরে এনে স্বাধীনতার জন্য মরণপণ অঙ্গীকারে দীপ্ত মুক্তি-সেনানীতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ইতিহাসে এমন ঘটনার নজির মেলা ভার। ... লিংকন, চার্চিল ও নেতাজীর প্রাসঙ্গিক ভাষণকে অবশ্যই তিনি স্মরণ করে থাকতে পারেন। তবে ৭ মার্চের অনন্যসাধারণ ভাষণ, তাঁর এবং শুধু তাঁরই এক চিরকালীন মাস্টারপিস"।

"বাংলার মানুষকে একাত্ম করার জন্য এবং নিজ ক্যারিশমানুযায়ী তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অভিভাবক হিসাবে নিজ কাঁধে নেবার জন্য বঙ্গবন্ধু 'আমার' শব্দটিকে বারংবার ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ : 'ভাইয়েরা আমার', 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে', 'আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরীব, দুঃখী, নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে', ... 'আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে', ... ইত্যাদি। ... তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে (ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্যে) বলেন, 'এ্যাসেম্বলি কল করেছেন, আমাদের দাবি মানতে হবে। প্রথমে সামরিক আইন মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদেরকে ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এ্যাসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না'। বঙ্গবন্ধুর এই চারটি শর্তকে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বিচক্ষণ রণ-কৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়"।

"এই চারটি শর্তে তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে : এক. স্বাধীনতা ঘোষণা শোনার জন্য পাগলপারা উত্তাল জনসমুদ্র একটু থমকে গেছে, তবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেনি, ...

বুঝতে শুরু করেছে বঙ্গবন্ধু অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যই এই চারটি কঠিন শর্তকে সামনে নিয়ে এসেছেন। দুই. দৃশ্যত নেতা গণতন্ত্রসম্মত ও নিয়মতান্ত্রিক পথেই আছেন ... বহির্বিশ্বকে এমন ধারণা দেয়া। ... না হলে, তাঁর 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, ... স্বাধীনতার সংগ্রাম' -এই বাক্যকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা বলে গণ্য করা হত। তাতে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত হতেন। ... তাই রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞা ও মেধাবী কৌশলবিদ হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েও তার কার্যকারিতাকে তিনি শর্তসাপেক্ষ রাখলেন। তিন. ... বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চে সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পাকিস্তানি শাসকচক্র ট্যাঙ্ক, মেশিনগান ও বিমান আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল। ... স্বাধীনতা ঘোষণার শর্তযুক্ত বাতাবরণ পাক-শাসকদের সেই পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। বঙ্গবন্ধুর ক্ষুরধার রাজনৈতিক কৌশলের কাছে পরাজিত হয়ে ইয়াহিয়া-ভুট্টোরা ... একতরফা গণহত্যা শুরু করায় বঙ্গবন্ধুর চার শর্ত বাতিল হয়ে গিয়ে ২৬ মার্চ থেকে তাঁর ঘোষণা কার্যকর হয়। ২৬মার্চ মধ্যরাতে তাঁর স্বাধীনতার নতুন ঘোষণাটি ছিল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র" (১(২)/৬৬৯-৬৭৫)।

"পাকিস্তানি শাসকচক্র ট্যাঙ্ক, মেশিনগান ও বিমান আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল।" প্রশাসনিক চাকুরির দায়িত্ব সূত্রেই রেসকোর্সে উপস্থিত শাহরিয়ার ইকবাল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণে লিখেছেন : "রেসকোর্সের ম্যানেজারের বাসা ছিল একটি টিলার উপর। নীচে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। এখানে এখন পুলিশ কন্ট্রোল রুম। আমরা টিলার ওপর অবস্থান নিয়েছিলাম। ... নীচে বিশাল জনতার ঢল। বঙ্গবন্ধু মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য উপস্থিত হবেন। কিছুক্ষণ পর দেখলাম একটি খোলা জীপে একজন আর্মি অফিসার আসলেন। ... পাকিস্তান আর্মির সর্বাধিনায়ক, জেনারেল হামিদ। এসে বসলেন একটি কাঠের চেয়ারে। ... বঙ্গবন্ধু সেদিন ঘোষণা দিলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, ... স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধু সেদিন অন্য কোনো ভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে উপর থেকে এয়ার ফোর্সের বিমান গুলি বর্ষণ করে লক্ষ জনতাকে নিহত করতো। তিনি বাঙালি জাতিকে এমনভাবে স্বাধীনতার কথা শোনালেন যে জনতা ঠিকই বুঝল, কিন্তু পাকিস্তানি জেনারেল সাহেব কিছুই করতে পারলেন না" (১(১)/২১৫)।

তৎকালের বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য এখানে কয়েকটি তথ্য প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হবে বলেই আশা করা যায়। বাঙালি লেঃ জেঃ খাজা ওয়াসিউদ্দিন (মূলতান 'কোর কমান্ড'এ কর্মরত) ১৯৭১ইং ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি "তার বাঙালি ব্যক্তিগত সহকারীকে নিজের উদ্যোগে পাঠিয়েছিলেন (ঢাকায়) বঙ্গবন্ধুর কাছে খবর দিয়ে যে, ১০ ফেব্রুয়ারির কনফারেন্সে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, দেশের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা শেখ মুজিবের কাছে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না। বরং পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র হামলা দ্বারা উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করা হবে। ... শেখ সাহেব ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা জানতেন এ খবর; কিন্তু তাঁদের কিছুই করার ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত সামরিক জান্তা আলোচনা করতে চায় ততক্ষণ আলোচনা করতে হবে" (১০/২৫)। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাবেক মন্ত্রী জি ডব্লিউ চৌধুরী তাঁর 'লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান' নামক বইতে উল্লেখ করেছেন, "১৯৭১ সালের ৬মার্চ

গভীর রাতে ইয়াহিয়া খান মুজিবকে ফোন করে ... দীর্ঘ সময় কথা বলেছিলেন। এ সময়ে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল যে, মুজিব ৭মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। ... বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণার দলিলপত্র, পঞ্চদশ খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠায় ড. কামাল হোসেন বলেছেন, '১৯৭১ সালের ৬মার্চ গভীর রাতে একজন পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার বঙ্গবন্ধুর বাসস্থানে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন ইয়াহিয়া খানের বার্তা নিয়ে। ইয়াহিযা খান অনুরোধ করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু যেন পরদিন ৭ মার্চ কোন কঠিন সিদ্ধান্ত না নেন" (১(১)/২১৫)।

"Mujib was under immense pressure not to take a precipitous course by declaring independence. ....The US Ambassador Farland called on Mujib to urge moderation. There is no overt evidence that India counselled any particular course of action, but it stands to reason that an orderly transfer of power to elected representatives was more in India's interest than a state of unrest, perhaps civil war, which could distabilise the bordering indian state of West Bengal.....There was universal agreement among Awami League leaders that it would be unwise to declare independence unilaterally at this time" (৭/১৮৭)। সুতরাং আপন লক্ষ্যে অবিচল বঙ্গবন্ধুর দিক থেকে আলোচনার পথ রুদ্ধ করে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' অপবাদের ঝুঁকি নেবার কোনই যুক্তি ছিল না। মুজিব নিশ্চিত জানতেন, 'হঠকারী' আঘাতটা পাকিস্তানি শাসকচক্রই করবে, তার বেশি বাকিও নেই, তখন বিশ্ব-সমাজকে জানিয়েই বাঙালি নিজের পথে চলতে পারবে। বঙ্গবন্ধু সেই নির্ভুল পথের দিশা দিয়েছেন বাঙালিকে, প্রাণে প্রাণে জাগিয়েছেন সেই অনিবার্য সংগ্রামের অজেয় সাহস।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে পাকিস্তানের 'শ্বেতপত্র' জানিয়েছিল : "শেখ মুজিবুর রহমান একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার চালাবার ঘোষণা করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কয়েকটি নির্দেশ জারি করেন। ... ১. কর না দেওয়ার আন্দোলন, ২. 'সারা বাংলা দেশের' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহ, সরকারী ও আধাসরকারী অফিসগুলো, হাইকোর্ট এবং অন্যান্য কোর্ট বন্ধ করে দেওয়া। রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসমুহকে আওয়ামী লীগের কর্মপন্থা অনুযায়ী নির্দেশ দেওয়া হলো ... পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে টেলিযোগাযোগ বন্ধ করা হলো। এক নির্দেশে বলা হলো ... পশ্চিম পাকিস্তানে টাকাপয়সা পাঠাতে পারবে না। ... আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হবে"। সেইসাথে লন্ডনের 'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় (৯মার্চ) প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন পাকিস্তানি শ্বেতপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সাংবাদিক কেলিথ ক্লার্কের প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, "রোববার ৭ইমার্চ রাতে যখন শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশকে বিচ্ছিন্নতাবাদের শেষ প্রান্তে এনে ফেলেছিলেন তখন ঢাকা সম্পূর্ণভাবে অরাজকতার কবলে গিয়ে পড়েছিলো। ... আওয়ামী লীগ নেতা শেখ, তাঁর আন্দোলনকে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' বলে নাম দিয়েছিলেন। তিনি জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে সহযোগিতা করার জন্য এমন এক শর্ত আরোপ করেন যা প্রেসিডেন্ট

খানের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিলো না" (১৬/৪৩-৪৪)। ইতিহাস প্রমান করেছে, বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণের অনেক আগে ইয়াহিয়া-ভুট্টো লারকানায় পাখি মারতে গিয়েই এমন পরিকল্পনা করেছিলেন যে পূর্ব বাংলায় মানুষ মেরেই বাঙালির সকল দাবির অবসান ঘটানো হবে। ঈশপের গল্পের মেষশাবকটিকে হত্যার জন্য নেকড়ে ইচ্ছেমত অজুহাত তৈরি করেছিল। পাকিস্তানি চক্রান্তকারীরাও অজুহাত তৈরি করেছিল বাঙালি হত্যার, 'শ্বেতপত্র'টি তারই দলিল।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭মার্চের ভাষণটির প্রসঙ্গ-কথা শুরু করেছি প্রবুদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের কথা দিয়ে, শেষ করছি কবি নির্মলেন্দু গুণের কথায় : "আমার সৌভাগ্য হয়েছিল একজন তরুণ সাংবাদিক হিসেবে মঞ্চের খুব কাছে বসে সেই ভাষণ শোনার। ... ঐ অবিস্মরণীয় ভাষণটির মধ্যে যে মহাকাব্যের বীজ লুকিয়ে রয়েছে, তা আমি অনুভব করেছিলাম। ... ৭ই মার্চের ভাষণটি কাব্যগুণে গুণান্বিত বলেই ... বঙ্গবন্ধুকে ... স্বাধীনতার কবি হিসেবে বর্ণনা করেছি : 'শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে // অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।// তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল// হৃদয়ে লাগিল দোলা// জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা// কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?// ... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম // এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।// সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের" (১(২)/৭৮৭-৭৮৮)।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু-ইয়াহিয়া আলোচনা ঃ
প্রতিজ্ঞা আর প্রতারণা যখন মুখোমুখী

চলমান পরিস্থিতির সব খবরাদি জানার পরেও বঙ্গবন্ধু মুজিব নিজে থেকে কখনো আলাপ-আলোচনার পথ বন্ধ করে দিতে চাননি। ৩মার্চ তারিখে ইয়াহিয়া ঘোষণা দিয়েছিলেন, ১০মার্চ তারিখে ঢাকায় সর্বদলীয় একটি 'গোল টেবিল বৈঠক' অনুষ্ঠান করা হবে। মুজিব জানতেন, সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রয়েছে প্রেসিডেন্টের হাতে, তাছাড়া, ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানি অনেকেই ছ'-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি সমর্থন করবেন না। ইয়াহিয়ার আলোচনার প্রস্তাবটি অকার্যকর এবং অর্থহীন ভেবেই বঙ্গবন্ধু প্রত্যাখান করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের নির্ধারিত ২৫মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের ব্যাপারেও ৭মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু সরাসরি চারটি শর্ত দিয়েছিলেন, সে কথা ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে।

৮মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর পদে টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে রাজি হননি ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি এ সিদ্দিকী। "বার বার মিলিটারি পাঠিয়েছিলেন প্রধান বিচারপতিকে লাট ভবনে নিয়ে আসার জন্য। কিন্তু সেদিন শেখ মুজিবের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন বি এ সিদ্দিকী, অস্বীকার করেছিলেন লাট ভবনে যেতে। শপথ বাক্য পড়াননি তিনি টিক্কা খানকে" (১৭/২৫)। এটা একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের ইতিহাসে এক প্রত্যয়দীপ্ত ঘটনা হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ৯মার্চ মওলানা ভাসানী পল্টনের জনসভায় বললেন, ২৫ মার্চের আগেই শেখ মুজিবের

শর্তগুলি পূরণ করা না হলে তিনি শেখ মুজিবের সাথে মিলিতভাবে এক নজিরবিহীন গণ-আন্দোলন গড়ে তুলবেন। ১২ মার্চ ঢাকায় ইপিসিএস সমিতি এবং সিএসপি সমিতি বঙ্গবন্ধুর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছিল। এদিন ভারতের সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ন এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, শেখ মুজিবের তূলনা চলে মহাত্মা গান্ধীর সাথে। বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা শেষে করাচি ফিরে গিয়ে তাহরিক-ই-ইশতেকলাল দলের নেতা, অবসরপ্রাপ্ত এয়ার ভাইস-মার্শাল আসগর খান বলেছিলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্রুত ক্ষীয়মান সম্পর্কের শেষ সংযোগ হচ্ছেন শেখ মুজিব। জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে। ... দেশ চলছে পশ্চিম পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে নয়, শেখ মুজিবের নির্দেশে" (১৭/২৯)।

সামগ্রিকভাবেই ইয়াহিয়ার জন্যও পরিস্থিতি ছিল যথার্থই নাজুক। পূর্ব পাকিস্তানে যা করার পরিকল্পনা, তার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়নি। সুতরাং তিনি দৃশ্যত নমনীয় হয়েই শেখ মুজিবের কাছে একটি 'টেলেক্স' বার্তা পাঠালেন, "Please do not take any hasty decision. I will soon come to Dhaka and discuss the details with you. I assure you, your aspirations and commitments to the people can be fully honoured." (৭/১৮৯)। ইয়াহিয়ার বার্তার নমনীয়তা, বিশেষত ছ'-দফার তীব্র বিরোধিতার বদলে মেনে নেবার আশ্বাসকে মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কিছুটা হলেও অনুকুল পরিবর্তন বলে ভেবে থাকতে পারেন। তবে যতক্ষণ শাসক-চক্র আলোচনা করতে চায়, ততক্ষণ আলোচনা চালাতেই হবে এবং এর কোনো বিকল্পও ছিল না। তাই ইয়াহিয়ার আলোচনার প্রস্তাব সংশয়-যুক্ত চিত্তে গ্রহণ করলেও, বঙ্গবন্ধুর নিজস্ব পরিকল্পনা এবং অবস্থানের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। প্রাক্তন আওয়ামী লীগ মন্ত্রী আবু সাইয়িদ লিখেছেন, "১৫ মার্চ ১৯৭১। বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ দিন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনা করতে এলে বঙ্গবন্ধু তাঁকে 'মেহমান' হিসেবে উল্লেখ করেন। ... অর্থাৎ পাকিস্তান তখন ভিন্ন রাষ্ট্র এবং পূর্ব পাকিস্তান তখন স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট প্রকৃত অর্থেই তখন মেহমান" (১(২)/৭৯৮)। পাকিস্তানের 'শ্বেতপত্র' ভারতের দৈনিক 'স্টেটস্‌ম্যান' (১৬মার্চ, ১৯৭১ইং) থেকে উদ্ধৃত করে বলেছিল, "মিস্টার মুজিবুর রহমান ... 'বাংলা দেশ' এর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করেছেন। ... শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, প্রেসিডেন্ট আমাদের অতিথি হবেন। ঢাকায় পর্যবেক্ষকরা এর এই অর্থ নিয়েছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান নিজেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বতন্ত্র একটি এলাকা বলে মনে করে" (১৬/৪৭)। ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল-ইসলাম লিখেছেন, "স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকাবাহী গাড়িতে করে বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার জন্য সুগন্ধাতে যেতেন" (১(১)/২০৪)।

পিন্ডি থেকে ১৪মার্চ করাচিতে গিয়ে ভুট্টোর সাথে আলোচনা করে, নিজেদের পরিকল্পনা পাকা করেই ইয়াহিয়া ঢাকায় এসেছিলেন ১৫ মার্চ তারিখে। "এই প্রথম তাঁর আগমনকে রাজকীয়ভাবে স্বাগত জানানো হলো না এবং চরম গোপনীয়তা ও সূক্ষ্ম

নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতর দিয়ে ইয়াহিয়া খান বিমান বন্দর থেকে প্রেসিডেন্ট হাউসে পৌঁছলেন" (১(১)/৪৭৭)। আলোচনার জন্য ঢাকায় আগত ইয়াহিয়ার সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি এ. আর. কর্ণেলিয়াস, জেনারেল পীরজাদা, আই.এস.আই প্রধান জেনারেল আকবর, গোয়েন্দা ব্যুরোর পরিচালক জেনারেল রিজভী এবং এম. এম. আহমেদ। বঙ্গবন্ধুর সহযোগী আলোচকবৃন্দ ছিলন তাজউদ্দিন আহমেদ, মোশতাক আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান এবং ড. কামাল হোসেন। ১৬মার্চ বঙ্গবন্ধু এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রাথমিক আলোচনার পর ১৭মার্চ থেকে দু'পক্ষের দু'টি টিম আলোচনা শুরু করেছিলেন।

মুজিব-ইয়াহিয়া এবং তাঁদের সহযোগীদের পারস্পরিক আলোচনার প্রকৃতি এবং অগ্রগতি সম্পর্কে পরবর্তী সময়ের পর্যবেক্ষকরা দু'টি ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ধারাক্রম থেকে উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী এবং অবস্থানগত ভিন্নতা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করা চলে। ইয়াহিয়ার কালক্ষেপনের প্রয়োজন এবং পরিকল্পনার কথা আগেই বলা হয়েছে, সুতরাং তাঁর দিক থেকে, 'গোপন প্রস্তুতি' শেষ করার পূর্ব পর্যন্ত নমনীয়তা প্রদর্শনের কৌশল অবলম্বন ছাড়া কোনো পথ ছিল না। নানা সূত্রেই বঙ্গবন্ধু সে-সব খবর পাচ্ছিলেন। তদুপরি, বঙ্গবন্ধুর দিক থেকে আলোচনার পথ রুদ্ধ না করা এবং স্ব-উদ্যোগে বিচ্ছিন্নতার দায় না নেবার পরিকল্পিত অভিপ্রায়ের কথা মনে রাখলে এবিষয়ে বিভ্রান্তির কোনো কারণই থাকে না।

কারো কারো অভিমত, ইয়াহিয়া এবং তাঁর সহযোগী আলোচকরা শেখ মুজিবসহ সহযোগী আলোচকদেরকে 'ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিশ্বাস করাতে (Lulled into belief) পারছিলেন' যে, অলোচনায় ধীরে হলেও অগ্রগতি হচ্ছে। এবিষয়ে তাঁরা বলেন, আলোচনার অগ্রগতি জানতে আগ্রহী ফরমান আলীর ফোন পেয়ে "Mujib told him that an agreement was at hand and a proclamation would be issued by the President containing the outline of arrangement for the transfer of power. Mujib was to be the Prime Minister with equal number of ministers from each wing. Mujib expressed satisfaction with the arrangement" (৭/১৯০)। এজন্যই কি এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, বঙ্গবন্ধু সকল বাস্তবতার বিপরীতে ইয়াহিয়ার চালাকিতে ভুলেই আশাবাদী ছিলেন?

ভিন্নতর সূত্রের পর্যবেক্ষণ : "সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মুজিব অপেক্ষা করতে থাকেন। কারণ ... সামরিক জান্তার আগে তিনি কোনও প্রকার হঠকারি সিদ্ধান্ত নেবেন না। তিনি বল ঠেলে দেন ইয়াহিয়ার কোর্টে। ইয়াহিয়া সে অনুযায়ী ১৫মার্চ ঢাকা আসেন। ... মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের মূল আলোচ্য ছিল সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি। মুজিব বললেন, নতুন একটি সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বাষট্টির সংবিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হবে এবং ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে। পশ্চিম পাকিস্তান তাদের ইচ্ছানুসারে শাসিত হবে। ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রপতি হিসেবে বর্তমান অবস্থানে থেকেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ... ইয়াহিয়া খান ... ভুট্টোর সঙ্গে পরামর্শ করার কথা

বললেন, সে অনুযায়ী ভুট্টো ঢাকায় আসেন ২১ মার্চ" (১(১)/৪৭৮)। ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনায় মুজিব কি পূর্ব বাংলার ব্যাপারে ন্যায্য দাবিতে কোনো ছাড় দিয়েছিলেন বলে ধারণা করা চলে?

২১ মার্চ ঢাকায় এসে আওয়ামী লীগের উপস্থাপিত প্রস্তাবটি শুনেই ভুট্টো বলেছিলেন, এতে 'দুই পাকিস্তানের বীজ' রয়েছে। অথচ, ভুট্টো নিজে আরো আগেই 'পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ আর পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পিপিপি' বলে 'দুই পাকিস্তানের বীজ' বপন করেছিলেন। "It was precisely Bhutto who had spoken about `*Idhar ham, Udhar tum*' (We here, you there) at a large PPP rally in Karachi only a week before, as a way out of the political impasse in Pakistan" (৭/১৯০)। ১৪ মার্চ করাচিতে এক জনসভায় ভুট্টো প্রকাশ্যেই বলেছিলেন, "ইয়াহিয়া চাইলে দেশের দুই অংশে আলাদা করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ক্ষমতা দিতে পারেন। ... পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতারা এর প্রতিবাদ করেন। তাঁরা বলেন যে, এক দেশে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থাকতে পারে না" (২০/৭৩)। এবার ঢাকায় আলোচনায় বসে "ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো দু'জনেই টের পেলেন যে, এই মুজিব যেন একেবারেই অন্য রকম, আগের মুজিবের সঙ্গে এর পার্থক্য যোজন যোজন। মুজিব একটি স্বাধীন দেশের নেতার মতই আলোচনার টেবিলে" যোগ দিয়েছিলেন (১(১)/৪৭৭)। এ তথ্যটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ভুট্টো নিজেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রকাশিত তাঁর 'দ্য গ্রেট চ্যালেঞ্জ' নামের বইতে লিখেছেন, "Mujib had cautioned him (Bhutto) against the military and told him not to trust them : If they destroyed him (Mujib) first, they would also destroy Bhutto later" (৭/১৯০)। বঙ্গবন্ধুর এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাই তো প্রমান করে যে, তিনি সামরিক চক্রান্তের পূর্বাপর পরিস্থিতি ভুট্টোর চেয়েও গভীরতর দক্ষতায় উপলব্ধি করতে পারছিলেন।

বঙ্গবন্ধু নির্ভূলভাবেই জানতেন যে, জনগণের সচেতন ঐক্যের শক্তি দিয়েই সকল প্রতিকুলতা এবং শত্রুতা মোকাবেলা করতে হবে। তিনি জানতেন, সামরিক শক্তি দিয়ে বাঙালির পক্ষে পাকিস্তানের সক্ষমতার মোকাবেলা করা যথার্থই দুঃসাধ্য। "Osmani was the only senior Awami Leaguer with military background. He had joined the Awami League...after having been retired against his will ... It should have been his job to keep a sharp eye on the military scene in East Pakistan and maintain contacts with the Bengali officers in the cantonments, but he was not equal to the task" (৭/১৯১)। বঙ্গবন্ধু "বিদ্রোহী বা বিপ্লবী ছিলেন না, ... তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র চর্চার এক নিবেদিত-প্রাণ অনুসারী। ... গণতান্ত্রিক ... নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে তিনি শুধু সংগ্রামের এবং স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেছেন। এটিই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কৌশল ও প্রজ্ঞা, যার দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল" (১(২)/৮১৮-৮১৯)।

পাকিস্তানি সেনা-চক্রের 'গোপন প্রস্তুতি' কার্যতই আর গোপন ছিল না।

অপরদিকে, সেনা-চক্রের নাকের ডগায় বসেই শেখ মুজিব, বাংলার ঐক্যবদ্ধ জনগণকে নিয়ে নির্ভয়ে আপন লক্ষ্যের অভিযাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন প্রকাশ্যেই। ২মার্চ থেকেই উড়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা এবং বলা হয়েছে তাঁর সাত মার্চের ভাষণের কথাও। কিন্তু সব ছাপিয়ে গিয়েছিল ২৩ মার্চের পূর্ব বাংলা। ২৩ মার্চ, ঐতিহাসিক পাকিস্তান দিবস, ১৯৪০ সালের এই দিনে লাহোরে মুসলিম লীগ সম্মেলনে শেরে বাংলা ফজলুল হকের 'পাকিস্তান প্রস্তাব' সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতও হয়েছিল। কিন্তু মাত্র একত্রিশ বছর পর শেরে বাংলার জন্মভূমিতে দিনটি পালিত হলো 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে। "পোড়ানো হলো পাকিস্তানের পতাকা এবং দাহ করা হলো জিন্নাহর কুশপুত্তলিকা। ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর উপস্থিতিতে এবং সামরিক শাসন বলবত থাকা অবস্থাতেও গোটা বাংলার কোথাও পাকিস্তানি পতাকা উড়ল না, তার বদলে প্রতিটি ভবনের মাথায় উড়ল স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ রঙা পতাকা। শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি ভবন ও সামরিক শাসকের কার্যালয়ে পাকিস্তানের পতাকা উড়েছিল; ... রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত হলো 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি। এই গানের সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবের বাসভবনে ওড়ানো হলো বাংলাদেশের পতাকা এবং শেখ মুজিব একটি ছাত্র র‍্যালির ... 'স্যালুট' নিলেন" (১(১)/৪৭৮-৪৭৯)।

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে ঢাকায় টেলিভিশন ভবনে পাকিস্তানি সেনা-কর্মকর্তাদের উপস্থিতি সত্বেও পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত 'পাক সার জমিন সাদ্ বাদ্' না বাজানোর জন্য এক কুশলী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাঙালি টি.ভি. কর্মীরা। তখন রাত বারোটায় পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে প্রতিদিনের টিভি-অনুষ্ঠান সমাপ্ত হতো। ১৯৭১ইং সেদিনটিতে টিভি কর্মীরা নানা অনুষ্ঠানে এমন প্রোগ্রাম সাজিয়েছিলেন যে, তাতেই রাত বারোটা পেরিয়ে যায়, অর্থাৎ পাকিস্তান দিবসে ঢাকা টিভি'তে পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর প্রয়োজনই হলো না। ঢাকা বেতারে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচারের ঘটনাটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বেতার-কর্মকর্তা কাদের মাহমুদের বিবরণ থেকে। তাঁরই আরো কিছু কথা : "৭ মার্চের কয়েকদিন আগে থেকেই করাচির কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে আমাদের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয়। কারণ, আমরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের যেসব খবর দিচ্ছিলাম, তা তাদের মনঃপূত ছিল না। ... তারা চলছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নির্দেশে, আর আমরা চলছিলাম জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে। ... শুরু হলো চূড়ান্ত অসহযোগ। ... পূর্ব পাকিস্তান থেকে করাচির প্রচারিত 'জাতীয় সংবাদ' প্রচারও বন্ধ হলো। এর বদলে, ঢাকা থেকেই রচিত ও প্রচারিত হতে লাগলো নতুন 'জাতীয় সংবাদ'। ২৫ মার্চের আগ পর্যন্ত চলে এই অসামান্য অসহযোগ" (১(৩)/১৩৩৪)।

ছাত্রনেতা, মুক্তিযোদ্ধা এবং পরবর্তী সময়ের সাংবাদিক খোন্দকার মোজাম্মেল হক লিখেছেন, "২০মার্চ ইয়াহিয়া ... সোয়া দুই ঘন্টার আলোচনায় বঙ্গবন্ধুর ছয়-দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ... ২১ মার্চ ... ভুট্টো দু'ঘন্টাব্যাপী ইয়াহিয়ার সাথে বৈঠক করে এসে বলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। ... ২২মার্চ বঙ্গবন্ধুর সাথে ৭৫ মিনিটের একটি বিশেষ বৈঠক হয় ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর। শাসনতন্ত্রের

প্রশ্নে মুজিব-ভুট্টোর একমত হবার লক্ষ্যে আবারও ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিদ করেন। এদিন ভুট্টো, ওয়ালী খান, এয়ার-মার্শাল আসগর খানসহ পাকিস্তানি নেতারা দফায় দফায় বৈঠকে মিলিত হন। দেশের প্রতিটি সংবাদপত্রে ... ছয়-দফার আলোকে ... শাসনতন্ত্রের রূপরেখা ছাপা হয়। দৈনিক 'ইত্তেফাক'এ পুরো খসড়া সংবিধানই প্রকাশিত হয়। ২৩ মার্চ ... ইয়াহিয়ার নির্ধারিত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়ার কর্মসূচী বাতিল হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের বৈঠক হয়। ভুট্টোর মন্তব্য, শেখ মুজিবের দাবির প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের মধ্যে একটা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অচলাবস্থা কেটে যাবে" (১(৩)/১২৫৩-১২৫৪)।

২৩ মার্চ সকালে "বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে ছাত্রলীগের হাজার হাজার নেতাকর্মীর ভিড়। ... ধানমন্ডির বাসভবনের সামনে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ালেন এবং পতাকার প্রতি সম্মান জানালেন বঙ্গবন্ধু। ... বললেন,'বাংলাদেশের জনগণকে আর পরাধীন রাখা যাবে না'। ... সন্ধ্যায় ... জনস্রোতের সামনে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'যত দিন সাড়ে সাতকোটি বাঙালির মুক্তি অর্জিত না হবে, ততদিন আমাদের এই সংগ্রাম চলবেই। ... জনগণের প্রতি আমার নির্দেশ, সংগ্রাম চালিয়ে যান। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, আর সংগ্রামের কর্মপন্থা নির্ধারণের ভার আমার উপরই ছেড়ে দিন'। সারা দেশ থেকে হত্যার খবর আসছে। উদ্বিগ্ন বঙ্গবন্ধু। ... সাড়ে ছয়টায় টেলিফোনের রিসিভার তুলে ইয়াহিয়াকে শোনালেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ইউ টোলড্ মি দ্যাট দেয়ার উইল বি নো মোর কিলিং। ... বাট দ্য আর্মি ইজ কিলিং মাই পিপল এভরিহয়ার। ... দিস ইজ ভেরি স্যাড ! আই কনডেম দিস কিলিং'। ... ইয়াহিয়া কী বললেন, তা শুনতে পেলেন না বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নেতাকর্মীরা। আবার (বঙ্গবন্ধুর) উচ্চকণ্ঠ, 'দিস ইজ এ গ্রস ব্রিচ অব আওয়ার ডিসকাসন, গ্রস ব্রিচ অব ইওর কমিটমেন্ট। দ্য আর্মি ইজ কিলিং মাই পিপল অ্যাট ইওর প্রেজেন্স ইন ঢাকা। পিপল উইল নট বি সাইলেন্ট স্পেক্টেটরস। প্লিজ স্টপ দিস কিলিং'। বলেই টেলিফোন রিসিভার রেখে কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ বঙ্গবন্ধু। ঘর-জুড়ে পিনপতন নীরবতা" (২২/ ৯৩)।

"২৩ মার্চের গণজোয়ার ও জনগণের স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের ভিত্তিতেই ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ আলোচনার টেবিলে নতুন প্রস্তাব পেশ করলো। ... 'কনস্টিটিউশন কমিটি' নয় 'কনস্টিটিউশন কনভেনশন' গঠিত হোক; এই কনভেনশন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দু'টি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে এবং জাতীয় পরিষদে এই শাসনতন্ত্র দু'টি এক করে 'কনফেডারেশন অব পাকিস্তান' গঠন করা হবে। এরপর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক (তাজউদ্দিন আহমদ) বললেন, 'আমার আর কিছু বলার নেই'। সত্যসত্যই এরপর আর কিছুই কিছুই তো বলার থাকে না ... " (১(১)/৪৭৯)। "But the Yahya team persisted in their delatory tactics and no conclusions were reached. General Peerzada suggested that a time for a further meeting need not be fixed and this could be done over the telephone... (৭/১৯৩)।

২৫ মার্চ ইয়াহিয়ার আক্রমণ এবং পলায়ন ঃ
বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

২৪মার্চ অনুষ্ঠিত আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ইয়াহিয়া-টিমের পক্ষে ড. কামাল হোসেনকে টেলিফোনে অবহিত করার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু নির্ধারিত এবং প্রত্যাশিত সেই 'টেলিফোন কল' আর আসেনি। কারণ, পাক-সেনাচক্রের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে। ২৫মার্চ দিনেও পাক-সেনারা গুলি চালিয়েছে চট্টগ্রামে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে। "সন্ধ্যার আগে মারা গেছে ১১০জন। যে কারণে বঙ্গবন্ধু ২৭ মার্চে হরতাল ডেকেছেন। সে হরতাল আর হয়নি ... তার আগেই এসেছিল ২৫শে মার্চ মধ্যরাত। যে রাতে জন্ম নিয়েছিল অজস্র মৃত্যুর ভিতর দিয়ে একটি সশস্ত্র জাতি" (১৭/৪২)।

পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিকের 'উইটনেস্ টু সারেন্ডার' গ্রন্থ-সূত্রের উল্লেখ করে মাসুদা ভাট্টি লিখেছেন, "প্রথম দিনের বৈঠকের পরই ইয়াহিয়া টের পেলেন মুজিব কি চাইছেন। সেদিনের বৈঠক শেষে নৈশভোজই ইয়াহিয়া টিক্কা খানকে জানিয়ে দিলেন, 'দিস বাস্টার্ড ইজ নট বিহেভিং। ইউ গেট রেডি'। ... টিক্কা খান সঙ্গে সঙ্গেই জিওসি খাদিমকে বললেন, 'খাদিম ইউ ক্যান গো এ্যাহেড'। এরপরেই ... 'অপারেশন সার্চ লাইট'এর নীল নক্সা ... মাত্র ষোলটি প্যারাগ্রাফের এই 'অপারেশন সার্চলাইট' ... হিটলারের নাৎসি-বাহিনীর ইহুদি নিধনের পরিকল্পনার সাথে তুলনীয়। এই পরিকল্পনাটি পূর্ব পাকিস্তানে বসেই ইয়াহিয়া, ভুট্টো, টিক্কা খান ও তার অন্যান্য উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং 'গো এ্যাহেড'-এর নির্দেশ দিয়ে (২৫ মার্চ রাতে) ইয়াহিয়া ... পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন" (১(১)/৪৭৭-৪৭৮)। উল্লেখ্য যে, 'অপারেশন সার্চলাইট'এর সাফল্য দেখার জন্য ভুট্টো অপেক্ষায় ছিলেন এবং পরের দিন (২৬মার্চ) সকালে ঢাকা ছেড়ে যাবার আগে 'আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, পাকিস্তানকে রক্ষা করা গছে' বলে ভুট্টো সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী,ততক্ষণে আনুষ্ঠানিক জন্মঘোষণা হয়ে গেছে রক্তাপ্লুত বাংলাদেশের।

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল পাক-বাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট' নামের নীল নকশাটি প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মানুষ কত ঠান্ডা মাথায় গণহত্যার পরিকল্পনা করতে পারে, এই দলিলটা হচ্ছে তার প্রমাণ। ২৫মার্চে কীভাবে বাংলাদেশের মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া হবে তার খুঁটিনাটি বর্ণনা এই দলিলে দেওয়া আছে। একেবারে পরিষ্কারভাবে 'চমক এবং ছলনা' (Surprise and Deception) হেডিং দিয়ে লেখা হয়েছে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট (ইয়াহিয়া) বঙ্গবন্ধুকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর সঙ্গে আলোচনার ভান করে যাবেন এবং ২৫মার্চে আওয়ামী লীগের দাবি মেনে নেওয়া হবে সেই আশ্বাস দেবেন। কীভাবে 'ধূর্তামি' (Cunningness) করতে হবে, ছলনা (Deception) করতে হবে এবং ভয়াবহতায় বিমূঢ় করে দিতে হবে, এই দলিলে তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কখন নির্বিচারে গুলি (Free use of fire) করতে হবে, কখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো আক্রমণ করতে হবে, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নেতাদের ধরতে হবে, পরিষ্কার

দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নির্দেশ হচ্ছে বাঙালি সেনাবাহিনী, আধা-সামরিক আর পুলিশের সম্পর্কে। কীভাতে তাদের নিরস্ত্র করে নিঃশেষ (Neutralized) করতে হবে সেই কথাগুলোও বলে দেওয়া হয়েছে" (১(১)/৪১২-৪১৩)।

রহস্যজনক গোপনীয়তায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা ছেড়ে যাবার খবরটি "সঙ্গে সঙ্গে উইং কমান্ডার এ. কে. খন্দকার জানিয়ে দেন বঙ্গবন্ধুকে। ... শেখ মুজিব তাঁর নেতাদের বলেন 'তোমরা আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাও। এর আগেই অবশ্য শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে 'পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' নাম দিয়ে তার স্বাধীনতা ঘোষণা করে একটি বক্তব্য রেকর্ড করেন" (১(১)/৪৭৯)। ভিন্ন সূত্রে জানা যায়, "রাত আটটায় ক্যান্টনমেন্ট থেকে একটি রিক্সা একটি চিরকুট নিয়ে এসেছিল তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) বাসভবনে। তাতে লেখা ছিল : 'আজ রাতে আপনার বাড়িতে হামলা হবে" (২০/৭৫)। সুতরাং স্পষ্ট যে, সম্ভাব্য ঘটনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু অবহিত ছিলেন এবং নিজের পরিকল্পনামতই সবাইকে পালিয়ে যুদ্ধ শুরুর পরামর্শ দিয়েছিলেন। সন্ধ্যার পরই স্বাধীনতার ঘোষণা রেকর্ড এবং লিখিতভাবেও নানাজনের কাছে প্রেরণ করছিলেন।

২৫ মার্চ রাতে করাচি থেকে লন্ডনের 'দ্য টাইমস' পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি পিটার হেজেলহার্স্ট প্রেরিত প্রতিবেদনটি ২৬মার্চ প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল : "মুজিব ২৫ মার্চ সন্ধ্যারাতে ঢাকায় এক জনসমাবেশে ... 'চরম ত্যাগ স্বীকারে' (suprueme sacrifice) সবাইকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। তিনি পূর্ব বাংলার সঙ্গে সরাসরি পাট-ব্যবসা শুরু করার জন্য বিদেশী কোম্পানীসমুহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এবং বিদেশের সঙ্গে ডাক ও তার যোগাযোগ এখন থেকে করাচি না হয়ে ম্যানিলা ও লন্ডন রুটে হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ... ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্, আর্মড রিজার্ভ পুলিশের সকল বাঙালি সদস্য ও পুলিশ বাহিনী মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছে" (১(১)/২৫২)। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী লিখেছেন, "২৫শে মার্চ বিকালের দিকেই তিনি (বঙ্গবন্ধু) জানতে পারেন যে, ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে এবং পাকবাহিনী আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন তিনি তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের নিরাপদ স্থানে সরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবার নির্দেশ দেন, কিন্তু নিজে তাঁর বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবন থেকে পালিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানান" (১(১)/৪৭)। যদি প্রশ্ন জাগে, ঘটনার 'আকস্মিকতা'য় বঙ্গবন্ধু কি ভীত বা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন? এ প্রশ্নের নির্ভরযোগ্য জবাব সন্ধানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বয়ানে-বিবরণ অতঃপর, দু'টি জীবন্ত 'চিত্রনাট্য' যেন।

'বঙ্গবন্ধুর নিকট বন্ধুদের একজন' বিশিষ্ট লেখক খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন বামপন্থী রাজনীতিবিদ এবং লেখক অজয় রায় : "২৫ মার্চের কালো রাত্রি। রাত সাড়ে আটটা-নয়টা নাগাদ। বৈঠক ঘরে তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কর্ণেল ওসমানী, ড. কামাল হোসেন, আব্দুল মান্নান, আমিরুল ইসলাম (ব্যারিস্টার) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ... বঙ্গবন্ধু ... একজন করে নেতাকে ডেকে নিচ্ছেন। কানে কানে ফিস ফিস করে কথা বলে বিদায় দিচ্ছেন। আমার যখন ডাক পড়লো, তিনি বললেন -আজ

রাতেই ইন্দোনেশিয়ার মত সেই হত্যাকান্ড হতে চলেছে বাংলাদেশে। দেশবাসীকে জানাও সেকথা। আর তুমি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাও। ... প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা কর। ... যদি পাকবাহিনী আক্রমণ করে বসে তবে নির্দেশ পাঠিয়েছি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য। যে জাতি রক্ত দিতে জানে তার মৃত্যু নেই। জয় আমাদের নিশ্চিত" (১(১)/৩৪১)। এখানে দু'টি বিষয় মনোযোগ দাবি করে, প্রথমত, 'আজ রাতেই ইন্দোনেশিয়ার মত সেই হত্যাকান্ড হতে চলেছে বাংলাদেশে' - বলার মধ্যেই স্পষ্ট যে, বঙ্গবন্ধু এবং সহযোগীবৃন্দ শুধু ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে আলোচনার ওপর ভরসা করেই নিশ্চেষ্ট অপেক্ষায় ছিলেন না, তাঁরা সম্ভাব্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষয়গুলিও নিজেদের পারস্পরিক আলোচনা এবং সন্ধানে রাখছিলেন। আর দ্বিতীয়ত, 'যদি পাকবাহিনী আক্রমণ করে বসে তবে নির্দেশ পাঠিয়েছি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য' - কথাটি থেকেই বোঝা যায়, সম্ভাব্য পরিস্থিতির বিবেচনায় স্বাধীনতা ঘোষণার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তুতিও বঙ্গবন্ধু আগে থেকেই নিয়েছিলেন।

২৫ মার্চ রাত ন'টার মধ্যে স্ত্রী-পুত্রকন্যাসহ রাতের খাবার সেরে নিলেন বঙ্গবন্ধু, নীচে বসার ঘরে তখন উদ্বিগ্ন মানুষের ভীড়। বঙ্গবন্ধু নীচতলায় নেমে এলেন। সিরাজুল আলম খান, রব-সিরাজ প্রমুখ ছাত্রনেতারা তাঁকে বারাবার অনুরোধ করেন, পরিবারের সকলকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে তিনি যেন তাদের সাথেই বাসা ছেড়ে চলে যান। বঙ্গবন্ধু পালাতে রাজি নন, ছাত্রনেতারা কে কোন পথে ঢাকার বাইরে যাবে, সে পরামর্শ দিলেন। রাত এগরোটার দিকে শেখ হাসিনা এসে বললেন, চারদিকে অবস্থা খুব খারাপ, 'আপনিও আসুন বাবা, আমাদের যেতে হবে'। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে বাইরে থেকে কয়েকজন এসে "বললেন, 'মুজিব ভাই, পাকিস্তানি আর্মির কয়েকটি বহর এগিয়ে আসছে। আপনি সবাইকে নিয়ে সরে যান। ওরা ... আপনাকে মেরে ফেলবে'। বঙ্গবন্ধু এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন; বললেন, পাকসেনারা যদি তাঁকে মেরেও ফেলে তবু তিনি বাসা ছেড়ে যাবেন না। জামাতা ড. ওয়াজেদ মিয়াকে বললেন, 'তুমি যে বাসা ভাড়া করেছ, সেখানে হাসিনা ও রেহানাকে নিয়ে এখুনি চলে যাও'। কামাল ও ল্যাফটেনেন্ট শেখ জামালকে বললেন, 'তোমাদের কাজ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা'। ... রাত ১২টার দিকে ওয়াজেদ মিয়া হাসিনা ও রেহানাকে নিয়ে চলে যান। কয়েক মিনিটের মধ্যে পাকিস্তানি সৈন্য বাসা ঘিরে ফেলে। ... ফিরোজুর রহমান ওলিও দৌড়ে দোতলায় উঠে ... জানান, যেকোনো সময় আর্মি বাসায় ঢুকতে পারে। ... রাত সোয়া ১২টায় বঙ্গবন্ধু গোলাপী ও আকাশী রংয়ের দুই শিট কাগজ নিয়ে তাতে দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা লিখে স্বাক্ষর করেন। আর তখনই ইপিআর-এর ওয়ারলেসে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণা রেকর্ড করা হয়" (১(৩)/১২৫৬)।

ঢা.বি. উপাচার্য (প্রাক্তন) অধ্যাপক এ. কে. আজাদ চৌধুরী লিখেছেন, "২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের ঢাকা ত্যাগের খবর পেয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতিবেশি এ. কে. এম. মোশাররফ হোসেন (পরবর্তী সময়ের শিল্প সচিব ও বিএনপি প্রতিমন্ত্রী) মারফত জরুরী ভিত্তিতে একটি মেসেজ পাঠান চট্টগ্রামের এম. আর. এ. সিদ্দিকীর কাছে। ... Liberate Chittagong, take over administration, proceed for Comilla ... ২৫-

এর রাতে সন্ধ্যা থেকে বঙ্গবন্ধু চট্টগ্রামে নির্দেশ পাঠাচ্ছিলেন বিভিন্নভাবে লোকের মাধ্যমে" (১(২)/৬৫৬)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মোযহারুল ইসলাম 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' গ্রন্থে লিখেছেন, "২৫মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর সাথে যারা দেখা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সাংবাদিক আতাউস সামাদও ছিলেন। তিনি পাকিস্তানি আক্রমণের খবর দিলে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমরাও প্রস্তুত। ... I have given you independence, now preserve it ... বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে ... স্বাধীনতা ঘোষণার টেপটি জনৈক ছাত্র (শামসুল আলম মিলন) ... ১১টার কিছু সময় পূর্বে ... পিলখানায় ... সুবেদার মেজর শওকত আলীর নিকট হস্তান্তর করেন। ... বেতারের মাধ্যমে মেসেজটি ট্রান্সমিটরত অবস্থায় শওকত সাহেব পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন" (১(২)/৬৬১-৬৬৩) এবং চরম নির্যাতন সহ্য করে শহীদ হন।

নয়ীম গহর 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় (১৯ জুলাই, ২০০৪ইং) 'প্রসঙ্গ : ২৫মার্চে বঙ্গবন্ধুর চট্টগ্রামে পাঠানো নির্দেশ' শিরোনামের নিবন্ধে লিখেছেন, "রাত ৮ থেকে ১১ পর্যন্ত এই তিন ঘন্টার মধ্যে আমাকে চারবার বঙ্গবন্ধুর বাড়ি আসা-যাওয়া করতে হয়েছে। তার কারণ ছিল, বঙ্গবন্ধুর তরফ থেকে এম. আর. সিদ্দিকীর কাছে বার্তা ও নির্দেশ পাঠানো। এম. আর. সিদ্দিকীর ওপর দায়িত্ব ছিল বঙ্গবন্ধুর নতুন নির্দেশগুলো কার্যকর করা। নির্দেশগুলো এরকম :

(1) Talk has failed, (2) Don't surrender arms (E.P.R, E.B.R, Police, Ansar, general public), (3) Let the people and other start ... , (4) Liberate Chittagong, (5) Proceed towards Comilla, (6) Carry out my earlier orders, even if I am not available (dead or captive), (7) Confirm me back that Chittagong understood me clearly". (১(২)/৬৫৬-৬৫৭)।

দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু মানসিক বা প্রয়োজনীয় বাস্তব কর্ম-সম্পাদনের দিক থেকে আদৌ অপ্রস্তুত ছিলেন না, চরম শংকাকুল সময়েও পরিকল্পিত প্রস্তুতির ধারাবাহিকতায় সব কাজ সম্পন্ন করছিলেন। তিনি যে ধানমন্ডির বাসা ছেড়ে যাননি, এটাও বিহ্বল কোনো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়, ভেবেচিন্তে আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। আর তাই, ইতিহাস সাক্ষী, বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতেও তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীরা সঠিক লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে পেরেছিলেন।

প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োজনেই অতঃপর কিছুটা সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি মুক্তিযুদ্ধের বিখ্যাত সংবাদদাতা মুসা সাদিকের লেখা থেকে। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রবীণ নেতা এম. এ. মান্নান সাক্ষাৎ আলোচনায় মূসা সাদিককে জানয়েছিলেন, ২৫মার্চ সন্ধ্যা সাড়ে সতটায় এম. আর. সিদ্দিকীর বাসায় চট্টগ্রাম জেলা সংগ্রাম পরিষদের পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কো-অর্ডিনেটিং কমিটির মিটিং থেকে ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সাথে যোগাযোগ করা হলে বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে বলা হয়, তিনি পরে ফোন করবেন। রাত সাড়ে আটটায় বঙ্গবন্ধু ফোন করে জহুর আহমদ চৌধুরীকে বলেন, "আমার বাড়ির টেলিফোন গোয়েন্দারা গোপনে রেকর্ড করছে। সেজন্য পাশের বাড়ির মোশাররফ হোসেনের টেলিফোন থেকে কথা বলছি। জরুরি মেসেজ লিখে নিন : 'আপনারা ২৫মার্চ রাত

দশটার মধ্যে সমগ্র চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে সকল ফোর্স নিয়ে কুমিল্লায় অগ্রসর হোন। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও আশেপাশের সকল ফোর্সকে আজ রাতের মধ্যে সংগঠিত করুন। ... অবস্থা অনুকুলে আসলে সকল ফোর্স নিয়ে ঢাকায় অগ্রসর হোন। আমার কাছ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না পেলে, আমার এই নির্দেশসমুহ পুরোপুরি পালন করবেন"।

"বঙ্গবন্ধুর এই নির্দেশ পাওয়া মাত্র কো-অর্ডিনেশন কমিটি হালি শহরের তদানিন্তন ইপিআরকে যোগাযোগ করলো ... ইপিআর-এর মেজর রফিক তার বাহিনী নিয়ে তৎক্ষনাৎ সাড়া দিলেন। চট্টগ্রামের এসপি শামসুল হক এবং ডিসি রমিজ উদ্দিনকে বলা মাত্র তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন এবং রাত নয়টার মধ্যে তার অস্ত্রাগারের যত আর্মস ছিল সব আমাদের ছাত্রলীগ ও অন্যান্য কর্মীদের দিয়ে পুলিশের সঙ্গে সমন্বিত বাহিনী গড়ে তুললো। ... বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক রাত ১০টার মধ্যে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি, বান্দরবন এলাকার সকল এম.এন.এ-এম.পি'র নেতৃত্বে প্রশাসনের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে নেয়া হলো এবং সমস্ত চট্টগ্রামকে মুক্ত করে ফেলা হলো। সূর্যসেনের বীর চট্টলা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১০টার মধ্যে স্বাধীন ভূখন্ড হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ালো। চট্টগ্রামের ইপিআর কমান্ডার মেজর রফিক বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ আমাদের থেকে পাওয়া মাত্র টাইগার পাসের মুখে দেওয়ান হাটের ওখানে পাক সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। ... মিটিং চলাকালীন এম আর সিদ্দিকী বলছিলেন, আগরতলায় চিঠি দিয়ে আর্মস সংগ্রহ করার জন্য এক্ষুনি লোক পাঠাতে হবে। এবিষয়ে আলোচনা চলছিল, এমন সময় সলিমপুর ওয়ারলেস স্টেশন থেকে একজন মেসেঞ্জার আসলেন। তার হাতে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার ওয়ারলেস মেসেজ। তখন রাত সাড়ে বারোটা হবে" (১(২)/৮৫৪-৮৫৬)। ২৫ মার্চ রাতের চট্টগ্রামের যুদ্ধের কথা ছেড়ে আবার ফেরা যাক ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর বাসায়।

খন্দকার ইলিয়াসকে রাত ন'টার দিকেই বঙ্গবন্ধু যেমন বলেছিলেন, 'যদি পাকবাহিনী আক্রমণ করে বসে তবে নির্দেশ পাঠিয়েছি স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য' - সেটা যথাসময়েই কার্যকর হয়। ২৫ মার্চ গভীর রাতে (ঘড়ির কাঁটার হিসেবে তখন ২৬ মার্চ) বাঙালির ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর অমানবিক আক্রমণ, 'অপারেশন সার্চলাইট' শুরু হওয়ার পরই "পাকিস্তান রেডিওর কাছাকাছি কোনও ওয়েভলেংথ থেকে 'বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি' ভেসে আসে। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণাটি সম্পর্কে মাসুদা ভাট্টি সংরক্ষিত'বৃটিশ দলিলপত্র'এর সূত্রোল্লেখ করেছেন। সম্ভবত পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরুর আগেই এটা রেকর্ডকৃত হয়েছিল।

> "এটা হয়তো আমার শেষ বার্তা। আমি সকল বাঙালির কাছে আবেদন করছি শরীরের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত দেশকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যান" (১(১)/৪৭৯-৪৮০)।

আবার মধ্যরাতে যখন আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে, তখনও বঙ্গবন্ধু একই বার্তা, স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা অন্যতর বয়ানে রেকর্ড করিয়েছিলেন। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী লিখেছেন (১(১)/৪৭) , মার্কিন লেখক রবার্ট পেইন তাঁর বিখ্যাত 'ম্যাসাকার' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "মাঝরাত নাগাদ তিনি (বঙ্গবন্ধু) বুঝতে পারলেন যে ঘটনা

প্রবাহ দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। তাঁর টেলিফোন অনবরত বেজে চলেছে, কামানের গোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে, আর দূর থেকে চিৎকারের আওয়াজ ভেসে আসছে। তখনও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। কিন্তু তিনি জানতেন যে, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ -এর ব্যারাকগুলি ও রাজারবাগ পুলিশ দপ্তর আক্রান্ত হয়েছে। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর ঘাঁটিগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিতে বদ্ধপরিকর। তাই সে-রাতেই, ২৬শে মার্চে, ... সর্বত্র বেতারযোগে পাঠাবার জন্য তিনি নিম্নোক্ত বাণীটি সেন্ট্রাল টেলিফোন অফিসে জনৈক বন্ধুকে ডিক্টেশন দেন"।

> "পাকিস্তান সামরিক বাহিনী মাঝরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইন ও পিলখানার পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করেছে। প্রতিরোধ করবার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন"

উল্লেখিত দু'টি পৃথক বার্তায় বর্ণিত পরিস্থিতি এবং সময়ের ব্যবধান নজর এড়াবার নয়। প্রসঙ্গতই বলা অপরিহার্য যে, বঙ্গবন্ধু একাধিক সময়ে একাধিক মাধ্যমে সময়োপযোগী বার্তাগুলি প্রেরণ করেছিলেন, কোনোটি স্বকণ্ঠে, কোনোটি স্বলিখিত আবার কোনোটি তাঁর 'ডিক্টেশন' শোনে অন্য কেউ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাই মূল বক্তব্যে মিল থাকলেও ভাষা ও শব্দের তারতম্য ঘটেছে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার বার্তা কোনটি কখন, কার মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে, সেটা অবশ্যই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংক্রান্ত ইতিহাসের অনুসন্ধানী গবেষণার বিষয় হতে পারে, তবে আদৌ কোনো সংশয়ের বিষয় নয়। রাজনীতিবিদ এবং লেখক অজয় রায় উল্লেখ করেছেন, "বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণার দু'টি ভাষ্য পাওয়া যায়। প্রথমটি ... পুরাতন সংস্করণের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলের ৩য় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত। ... এখানে ২৫ মার্চের রাতের পাকিস্তানি বাহিনীর ঢাকার ওপর আক্রমণ বা গণহত্যার কোন প্রসঙ্গ নেই। বলা হয়েছে :

> 'এটি হয়তো আমার শেষ বাণী, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন'।
>
> 'This may be my last maessage, from today Bangladesh is independent'

... অনুমান করা যেতে পারে যে বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণাটি ২৫ মার্চ কালরাত্রির (আক্রমণ শুরু হওয়ার) পূর্বেই বাণীবদ্ধ করা হয়েছিল এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কোন না কোন ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশস যন্ত্র ব্যবহার করে সম্প্রচারিত হয়েছিল ২৫মার্চ রাতের গণহত্যা শুরুর পরপরই। ... ২৬মার্চের পরবর্তী সময়ে চট্টগ্রামসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে টেলিগ্রাফ অফিসে এবং বিভিন্ন ওয়্যারলেস রিসিভিং স্টেশনে বঙ্গবন্ধুর নামে আর একটি স্বাধীনতার ঘোষণা ধরা পড়েছে। এটির ভাষ্য এবং তাৎপর্য ভিন্নতর। ...

> 'Pak army suddenly attacked EPR base at Pilkhana and Rajarbagh Police line killing citizens. Street battles are going on in every street of Dhaka and Chittagong. I appeal to the nations of the world for help. Our freedom fighters are gallantly fighting with the enemies to free the motherland. I appeal and order you all in the name of Almighty Allah

to fight to the last drop of blood to liberate the country. Ask Police, EPR, Bengal Regiment and Ansar to stand by you and to fight, no compromise, victory is ours. Drive out enemies from the holy soil of the motherland. Convey this message to all Awami League leaders, workers and other patriots and lovers of freedom. May Allah bless you. Joy Bangla. Sheikh Mujibur Rahman'

এই মেসেজটি গণভবনে রক্ষিত ছিল ... বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত এই ঘোষণার বাক্য গঠন এবং শব্দ নিয়ে তারতম্য লক্ষিত হলেও মূল স্পিরিট এক ও অভিন্ন" (১(১)/৩৩৮-৩৩৯)। অজয় রায় 'বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণার দু'টি ভাষ্য পাওয়া যায়' বলার পরে সুনির্দিষ্টভাবেই পৃথক দু'টি ভাষ্যের উল্লেখ করেছেন। তবে একথাও যুক্তিসঙ্গত কারণেই মেনে নিতে হবে যে, নানা সূত্রে নানা মধ্যমে প্রেরিত বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতা ঘোষণা'র আরো নানা ভাষ্য বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখিত হয়ে থাকে। তারই একটি ছিল :

"এটাই হয়ত আমার শেষ বাণী। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের জনগণ যে যেখানে আছে এবং তাদের কাছে যা' কিছু আছে তা' দিয়ে দখলদারী সেনাবাহিনীকে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশের মাটি থেকে পাকিস্তানের দখলদারী সেনাবাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে চুড়ান্ত বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। জয় বাংলা" (১(১)/২৮৮)।

বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত স্বাধীনতার অন্যতর একটি ভাষ্য পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষিত 'ক্লাসিফাইড ডকুমেন্টস্' থেকে। অধ্যাপক এ.কে. আজাদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রের 'ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী : অপারেশন্যাল ইন্টেলিজেন্স ডিভিশন : ২৬ মার্চ ১৯৭১ : ইএসটি ১৪৩০ (অর্থাৎ দিন ২-৩০মি) সূত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন,

"Civil War in Pakistan :

Pakistan was thurst into civil war to-day when Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the east Wing of two-part country, the soverign independent People's Republic of Bangladesh. Fighting is reported heavy in Dhaka and other eastern cities where 10,000 men paramilitary Pakistan Rifles has joined police and private citizen in conflict with an estimated 23,000 West Pakistani regular army troops"১(২)/৬৫৯-৬৬০)।

আকস্মিক আক্রমণে ভীত-বিভ্রান্ত না হয়ে রাইফেলসের জোয়ানরা যে সমবেতভাবে পুলিশ এবং জনগণের সহযোগিতায় রুখে দাঁড়িয়েছিলেন,তাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, পরিকল্পিতভাবে সকলের সাথেই কার্যকর যোগাযোগ এবং মনস্তাত্বিক প্রস্তুতির কাজগুলি আগেই সম্পন্ন করা হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আদৌ অপ্রস্তুত তাৎক্ষণিকতায় শুরু হয়নি।

খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসকে ২৫ মার্চ সন্ধ্যার পরেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, যদি পাকিস্তান বাহিনী আক্রমণ করে, তাহলে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারের ব্যবস্থা তিনি

ইতোমধ্যেই করে রেখেছেন। এবার তারই কিছু তথ্য-সত্য উল্লেখ করা যেতে পারে। ধানমন্ডির বাসায় বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী হাজী মোর্শেদ এক সাক্ষাৎকারে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস : একটি অনুসন্ধান' গ্রন্থের লেখক মোহাম্মদ হান্নানকে জানিয়েছিলেন, "রাত ১১টার পরে বলধা গার্ডেন বা তার কাছাকাছি কোন এক জায়গা থেকে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি টেলিফোন করে বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চায়, 'ম্যাসেজটা পাঠানো হয়ে গেছে, বেতার যন্ত্রটি কোথায় লুকাবো"। এবিষয়ে ড. এম. ওয়াজেদ মিয়া জানাচ্ছেন, "বঙ্গবন্ধুর বার্তাটি ছিল টেপকৃত। ঢাকার বলধা গার্ডেন থেকে ঐ টেপকৃত বার্তাটি সম্প্রচারের পর ই.পি.আর.-এর বীর সদস্যটি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোনে যোগাযোগ করে পরবর্তী নির্দেশ জানতে চান। তখন বঙ্গবন্ধু গোলাম মোর্শেদের (হাজী মোর্শেদ) মাধ্যমে ই.পি.আর.-এর সদস্যটিকে সম্প্রচার যন্ত্রটি বলধা গার্ডেনের পুকুরে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান পরিত্যাগের নির্দেশ দেন" (১(২) ৯৭১-৯৭২)।

অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বাপর বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্টতম ছাত্রনেতাদের একজন, পরবর্তী সময়ে জাসদ নেতা. কাজী আরেফ আহমেদ সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'কে জানিয়েছিলেন "মূলতঃ পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয় রাত দশটারও পরে। ইকবাল হল (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) থেকে কিছু দূরে গুলির আওয়াজ শুরু হলো। কারেন্ট চলে গেল। ঠিক এই সময় সিরাজুল আলম খান এলেন ধানমন্ডির ৩২নং বাড়ি থেকে। তিনি বললেন, কিছু সময়ের মধ্যে শেখ মুজিবের স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে। ই.পি.আর.-এর পিলখানাস্থ ওয়্যারলেস সেট থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হবে"। কাজী আরেফ আরেকটি সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমকে বলেছিলেন, "স্বাধীনতার ঘোষণাটি বঙ্গবন্ধুর কন্ঠে টেপ করা হয়েছিল। রাত বারোটার পর ঘোষণাটি ই.পি.আর. ও টি.এন.টি. ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে সারারাত ধরে সম্প্রচারিত হয় এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছামাত্রই কর্তব্যরত কর্মচারীরা তা টেলিগ্রাম আকারে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছে দেন" (১(২)/৯৭০)।

চট্টগ্রামে 'ইত্তেফাক' করেসপন্ডেন্ট মইনুল আলম ওয়্যারলেস অপারেটরের মাধ্যমে পাওয়া বঙ্গবন্ধুর একটি বার্তা ২৬মার্চ ভোরে ... আওয়ামী লীগ নেতা এম. আর. সিদ্দিকীর স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিযেছিলেন–

"Message to the people of Bangladesh and to the people of the world. Rajarbagh police camp and Peelkhana EPR suddenly attacked by Pak Army at 2400 hours ... Apeal to the world for freedom struggle ... Joi Bangla" (৭/২০৪)।

বার্তাটি চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বেলা ২:৩০মিনিটে বেতারে পাঠ করেছিলেন। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' বইটির লেখক বেলাল মহম্মদ উল্লেখ করেছেন, বেতারে ঘোষণাটি পাঠের আগে, আব্দুল হান্নান সকাল থেকেই মাইকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি চট্টগ্রাম শহরে প্রচার করেছিলেন।

তবু সংশয়, তবু প্রশ্ন ঃ

বঙ্গবন্ধু কি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন?

বিএনপি'র চেয়ার পারসন বেগম খালেদা জিয়া মাঠের বক্তৃতায় মাঝে মাঝেই বলেন, জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল এবং জনগণ সেই ডাকে সাড়া দিয়ে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল। এমনকি একবার প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া জাতীয় সংসদেও বলেছিলেন যে, "জিয়াউর রহমানই ২৫ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যার যা আছে, তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছিলেন" (১(১)/৩৩৪)। ঐতিহাসিক তথ্য কিংবা সাংবিধানিক নির্দেশ, কোনটা জেনে কিংবা মেনে এমন উদ্ভট কথা বলেছিলেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন। তবে, এমনটাও হতেই পারে, বিএনপি-জামাত শাসকদের ইতিহাস-বিকৃতির যে পরিকল্পিত অপপ্রয়াস, তার প্রযোজনেই তাঁকে এমন ভিত্তিহীন কথা বলতে হয়েছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, 'আমি বিজয় দেখেছি' গ্রন্থের লেখক এম আর আখতার মুকুল উল্লেখ করেছেন, "সর্বত্র বেতারযোগে পাঠাবার জন্য তিনি (বঙ্গবন্ধু) টেলিফোনে নিম্নোক্ত বাণীটি সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসে জনৈক বন্ধুকে ডিক্টেশন দিলেন। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম এম এ হান্নানের কাছে এই বাণী যথাসময়ে পৌঁছেছিল।

'The Pakistan Army has attacked Police Lines at Rajarbagh and EPR Head quarters at Pilkhana at midnight. Gather strength to resist and prepare for war of independence' ...

এ ব্যাপারে একাত্তরের মার্চ মাসে চট্টগ্রামে অবস্থানরত দু'জন সামরিক অফিসার মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম ও মীর শওকত আলীর ভাষ্য হচ্ছে, চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম এম এ হান্নানের কাছে (প্রেরিত) বঙ্গবন্ধুর উল্লিখিত (বার্তাটি) বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা সম্বলিত বাণীর বরাত দিয়ে এম এ হান্নান এক ভাষণ প্রচারিত করেন" (২৯/১৫)। স্মরণীয় যে, মীর শওকত আলী মেজর জেনারেল পদ মর্যাদায় অবসর গ্রহণের পরে, 'জিয়ার প্রিয়জন' হিসেবে বিএনপি-রাজনীতির উচ্চ পর্যায়ে যুক্ত হয়েছিলেন। জিয়া হত্যার পরে, বেগম জিয়া যখন দেশের কান্ডারি তখন জিয়ার 'রাজনৈতিক ভাবমূর্তি' উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে মীর শওকত এক বক্তৃতায় জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার 'ড্রাম-তত্ব' দিয়ে জাতিকে বিস্মিত করে বলেছিলেন, ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি কর্মকর্তার আদেশে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে পাকিস্তানি অস্ত্র খালাস করতে যাবার রাস্তায় একটা তেলের ড্রামের ওপর দাঁড়িয়ে জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু আরো কিছুকাল পরে, জামাত-বিএনপি জোটের 'ইতিহাস নির্মান কারখানা'র সীমাহীন বিকৃতির মাত্রা এবং রাজনৈতিক আচরণ তাঁকেও ব্যথিত-বিস্মিত করেছিল। তখন তিনি বড় ক্ষোভে জামাতের গাড়িতে স্বাধীনতার পতাকা ওড়ানোর লাঞ্ছনা দেখার জন্য আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করিনি বলে কার্যত বিএনপি-জামাতকে নাখোশ করেই রাজনীতি থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। মীর শওকত আমৃত্যু তাঁর এ বক্তব্য কিংবা অবস্থান প্রত্যাহার করেননি।

হুকুমদারী ইতিহাসের একটি মাত্র নজির উদ্ধৃত করছি অধ্যাপক মমতাজউদ্দিন পাটোয়ারী'র 'পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-বিকৃতি' বইটি থেকে। "১৯৭১ সালের ২৫মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে জিয়া তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিশেষত আওয়ামী লীগের কোনো কর্মসূচী না থাকায় সবাই বিভ্রান্ত অবস্থায় ছিলেন। সে পরিস্থিতিতে জিয়াউর রহমান এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ২৬মার্চ চট্টগ্রামস্থ কালুরঘাট অস্থায়ি বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তখন থেকেই হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়" (১৯/৫৩)। বিচারপতি হাবিবুর রহমান লিখেছেন : "জিয়ার অনুরাগীরা বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার কথা অস্বীকার করতে চান। বঙ্গবন্ধু নিজে ঘোষণা লিখে গিয়েছিলেন, না তাঁর নাম ঐ ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল - এ সম্পর্কে আলোচনা গবেষণা চলতে পারে। কিন্তু ঘোষণা যে প্রচারিত হয়েছিল এবং জিয়াউর রহমানের ঘোষণার আগেই, তা অস্বীকার করার উপায় নেই" (১(১)/৯৪-৯৫)। জিয়া নিজে লিখেছেন, তিনি ২৭মার্চ সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর 'স্বাধীনতার ঘোষণা'টি পাঠ করেছিলেন। ইতিহাসের কারখানা খুলে জিয়া-ভক্তরা তারিখটি বানিয়েছেন ২৬ মার্চ, আরো এগিয়ে বেগম জিয়া জাতীয় সংসদেই বলেছেন, জিয়া ২৫ মার্চ রাতেই বেতারে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল, আর জনগণ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল। কথায় বলে, সত্য জানে সেই জন, যে-জন জানহ সন্ধান।

স্বাধীনতা-বিরোধী জামায়াতে ইসলামির মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম' ১৯৭১-এর ৮মে 'সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা' শিরোনামের সম্পাদকীতে লিখেছিল : "অবৈধ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গত ২৬ মার্চ সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এঁটে সব আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন। সামরিক সরকার তা জানতে পেরেই পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাতে এই পরিকল্পনা নস্যাত করে দেন এবং পাকিস্তানকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। ... এ পরিকল্পনার পেছনে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা ছিল ... শুধু মুখে ঘোষণাটি বাকি রাখা হয়েছিল ২৫মার্চের জন্য (১(২) ৯৭৪)।

সুপরিচিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এবং গবেষক বদরুদ্দিন উমর 'সাপ্তাহিক ২০০০'এর ১৫জানুয়ারি, ১৯৯৯ইং সংখ্যায় লিখেছিলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতে স্বাধীনতার ঘোষণা দিযেছিলেন, এটা এখন অতি উচ্চঃস্বরে প্রচারিত হলেও এর চাইতে বড় মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। এ রকম কে কবে শুনেছে যে, স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে এবং জনগণকে সেই যুদ্ধে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে কোনো সেনানায়ক কিংবা মহান রাজনৈতিক নেতা নিজে বাড়িতে বসে থেকে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং এটা করেন যখন তাঁর নিজের দেশের হাজার হাজার মানুষ সামরিক বাহিনীর হাতে মারা পড়ছেন"। জনাব উমরকেই বরং পাল্টা প্রশ্ন করা দরকার, 'এ রকম কে কবে শুনেছে যে', একজন গবেষক দেশ-দুনিয়া স্বীকৃত তথ্যাদির দিকে নজর না দিয়ে, শুধু 'আপন মনের মাধুরি মিশায়ে' সিদ্ধান্তমূলক সংশয় প্রচারে সামিল হন?

বদরুদ্দিন উমরের মত বিজ্ঞজনের অজানা থাকা অস্বাভাবিক যে, "আরও অনেক দেশের জনগণের পরাধীনতা, ঔপরিবেশিকতা ও স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি ঘটেছে তাদের মহানায়কের দূরে অবস্থান সত্বেও। লেনিন বসে ছিলেন সূদূর জার্মানিতে, রাশিয়া জার শাসনমুক্ত হলো। নেলসন ম্যান্ডেলা একটি নির্জন দ্বীপে বন্দী, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেত-শাসনের অবসান ঘটাল তাঁর অনুসারীরা। জেমো কেনিয়াত্তা দূর থেকে কেনিয়ার ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়েছিলেন। ... ইরানের শাহের পতন ঘটিয়েছিলেন খোমেনির অনুসারীরা। যিনি স্বয়ং তখন প্যারিসে বসবাস করছিলেন। তাঁর ক্যাসেট-বদ্ধ বাণী শুধু ইরানের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। একইভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের নামটি সম্বল করে বাঙালি যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করল। একটি মুজিবের কণ্ঠ লক্ষ মুজিবের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে বিস্তৃত রণক্ষেত্র আর অবরুদ্ধ বাংলাদেশ জুড়ে" (১৪/৭০)।

গোলাম মুরশিদ 'মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস' নামক বইতে 'মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা' উপ-শিরোনামে লিখেছেন, "২৫মার্চ রাতেও ... হামলার আশংকা করলেও, অথবা একাধিক সূত্র থেকে খবর পেলেও, সেই রাতেই সেনা-হামলা হবে - এবিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। তাই তিনি স্বাধীনতার কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি। অথবা কোনো ঘোষণা রেকর্ড করে রাখেননি। সেদিন সন্ধ্যের পরেও বেতার-টেলিভিশনের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিলো। ইচ্ছে করলে তিনি তা ব্যবহার করতে পারতেন। ... শেখ মুজিব নিজেও দাবি করেছেন যে, ঝটিকা আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার পরে তিনি প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছিলেন (মুজিব, 'শোষিতের গণতন্ত্র চাই' ২৬ মার্চ ১৯৭৫ তারিখের বক্তৃতা)। ... মনে হয়, সত্যি সত্যি তিনি বার্তা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বার্তা পাঠানোর পরই টেলিগ্রাফ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেজন্য বার্তাটি কোথাও পাঠানো যায়নি। এ ছাড়া, সিদ্দিক সালিকের (পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা, 'উইটনেস্ টু সারেন্ডার' গ্রন্থের লেখক) মতে, রাত বারোটার দিকে একটা অজ্ঞাত-পরিচয় বেতার কেন্দ্র থেকে ক্ষীণকণ্ঠে তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) ঘোষণা শোনা গিয়েছিলো। কিন্তু এই ঘোষণা তিনি নিজে শোনেননি, অথবা অন্য কেউ শুনেছেন বলেও উল্লেখ করেননি" (২০/৮৬)। সুদীর্ঘ মন্তব্য এবং অনেক সংশয়, শুধু একটি মাত্র অনুকুল অনুমান, 'মনে হয়, সত্যি সত্যি তিনি এই বার্তা পাঠিয়েছিলেন'।

বঙ্গবন্ধুর স্বকণ্ঠে 'স্বাধীনতা ঘোষণা'র গুরুত্বপূর্ণ দু'জন শ্রোতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, একজন বৃটিশ নাগরিক, 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সংবাদদাতা ডেভিড লোশাক, দ্বিতীয়জন টিক্কা খান। ডেভিড লোশাক তাঁর 'পাকিস্তান ক্রাইসিস' শিরানামের বইতে উল্লেখ করেছেন: "Soon after darkness fell on March 25 (1971) , the voice of Sheikh Mujibur Rahman came faintly through a wavelength close to the official Pakistan radio. In what must have been, and sounded like, a pre-recorded message, the Sheikh proclaimed East Pakistan to be the People's Republic of Bangladesh. He called on the Bengalees to go underground, to reorganize and to attack the `invaders'."

(১(২) ৮৫৯)। তবে এ বিষয়ে এস.এ. করিমের সংশয়-মন্তব্য, অন্য কোনো সূত্রে বক্তব্যটি সমর্থিত কিংবা বিদেশী সংবাদ মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়নি। প্রশ্ন জাগতেই পারে, এমন সব 'অনৈতিহাসিক মন্তব্য' তথ্যের অভাবে করা হয়েছে, নাকি অমনোযোগের কারণে?

ঢাকায় নিযুক্ত প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং 'অপারেশন সার্চ লাইট'এর অন্যতম প্রধান পরিকল্পনাকারী, জেনারেল টিক্কা খানের কথায় লোশাকের বক্তব্যেরই লক্ষণীয় সমর্থন মেলে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সংবাদদাতা মুসা সাদিক ১৯৮৮ইং পাকিস্তানে অবসরপ্রাপ্ত জেনালের টিক্কার একটি বিস্তারিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন, " ... মাইনে খোদ শেখ সাব কো রেডিও পর ... Independence কা এলান করতে হুয়া সুনা ... ম্যঁয়ে শেখ সাব কি আওয়াজ আচ্ছি তেরা পেহছান তা থা ... And I had no option but to arrest him ... অন্য নেতাদের আমার গ্রেফতার করার ইচ্ছা ছিল না। এজন্য তারা সবাই খুব সহজেই ঢাকার বাইরে চলে যেতে পেরেছিল" (জনকণ্ঠ,৪-০৩-০২)। টিক্কার কথায় স্পষ্ট যে, বঙ্গবন্ধু মুজিব স্বকণ্ঠেই স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচার করেছিলেন। অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ-পুস্তকে এ তথ্যটি বিভিন্ন সময়ে উদ্ধৃত হয়েছে। মুসা সাদিকও বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত 'মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম' এবং 'Bangladesh Wins Freedom' নামক দু'টি গ্রন্থেই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন।

বিচারপতি কে.এম সোবহান লিখেছেন, ২৬ মার্চ '৭১ ইয়াহিয়ার প্রচারিত বেতার ভাষণে বলা হয়েছিল, "শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী। সে পাকিস্তানের পতাকার অবমাননা করেছে। ... এবার তাকে শাস্তি পেতেই হবে"। একথা তো কারো ভুলে যাবার নয়, 'ডি ফ্যাক্টো স্বাধীনতা ঘোষণা' প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনা-কারাগারে আটক করে "স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার হয় এবং প্রাণদন্ডের আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু ... মুক্তিযুদ্ধ তাঁর নামে পরিচালিত হওয়ায় বিশ্বের স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলো পাকিস্তানের কাছে প্রতিবাদ পাঠায় এবং তাঁর মুক্তি দাবি করে" (১(১)/১০৬)। ইয়াহিয়ার ২৬ মার্চের বেতার-ভাষণে বহুবার অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছে আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবে প্রতি। প্রশ্ন জাগতেই পারে, বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগের প্রতি পাকিস্তানের সামরিক জান্তার প্রধান মুখপাত্র ইয়াহিয়ার এত ক্ষোভ, এত অভিযোগের কারণ কি ছিল? পূর্বোল্লেখিত টিক্কা খানের কথা এবং বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সূত্রেই সেই কারণের সন্ধান মেলে।

লন্ডনের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'দ্য টাইমস' ২৭ মার্চ,'৭১ ইং প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হেডলাইনে ছেপেছিল, "Heavy fighting as Sheikh Mujibur declares E Pakistan independent" আর 'দ্য গার্ডিয়ান' লিখেছিল, "Shortly before his arrest,Mujib had issued a proclamation to his people, which informed them : you are citizens of a free country". ইউএনআই বার্তা সংস্থার বরাত দিয়ে ভারতের বিখ্যাত 'স্ট্যাটস্ম্যান' পত্রিকায় ২৭ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদ প্রকাশ করেছিল : "Pakistan's Eastern wing rechristenned the idependent state of

Bangladesh by Sheikh Mujibur Rahman in a clandestine radio broadcast ... said, 'Pakistan armed forces suddenly attacked the East Pakistan Rifles base ... and Rajarbagh Police Station in Dacca at zero hours on March 26 killing a number of unarmed people. Fierce fighting is going on with East Pakistan Rifles ... people are fighting galantly ... resist the enemy forces at any cost in every corner of Bangladesh. May Allah bless you and help you in your struggle ... Jai Bangla" (১(১)/৩৩৯-৩৪০)।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থকার মুসা সাদিক জানিয়েছেন, "বিশ্ববিখ্যাত 'টাইম' পত্রিকায় ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় ... শেখ মুজিব প্রেরিত স্বাধীনতা ঘোষণা যে চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে, তার সুস্পষ্ট উল্লেখ করে জানিয়েছিল, "The army ordered a strict 24hour curfew in Dacca (Dhaka) , with violators shot on sight. But soon the free Bengal revolutionary radio center, probably somewhere in Chittagong cracked in life. Over the clandestine station, Mujib proclaimrd the creation of the 'soverign independent Bengali nation, and called on its people to' resist the enemy forces at all costs in every corner of Bangladesh ... at 1:30 am ... soldiers seized the Sheikh in his home" (১(২)/৮৫২)। এমন বহু খবর আরো অনেক বিদেশী পত্র-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। সব মিলিয়ে এটাই লক্ষণীয় যে, সে সময়টাতে আক্রান্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা এবং ঘোষণা প্রদানকারীর কথাও বিদেশীরাই প্রচার করেছিল বিশ্বময়।

যে শুভানুধ্যায়ীরা বঙ্গবন্ধুকে পালিয়ে যেতে এবং গ্রেফতার বরণ না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "If I leave my house, raiders (Pakistani) are going to massacre the people of Dhaka. I don't want my people to be killed on my account'. Death held no terror to him personally. But he thought that many innocent lives would be lost if he went underground ... " (৭/১৯৪)। 'বেলুচিস্তানের কসাই' পরিচয়ের টিক্কা খান স্পষ্টভাবেই মুসা সাদিককে বলেছিলেন, "ম্যায় আচ্ছি তেরা জানতা থে মুজিব য্যায়সা লিডার আপনি আওয়াম কো ছোড়কে নেহি যায়েঙ্গি। আমি শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার জন্য ঢাকার প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি বাড়িঘরে ... তল্লাশি চালাতাম"। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে পূর্বোল্লেখিত 'গার্ডিয়ান'এর 'হিজ পিপ্‌ল্' আর টিক্কা খানের 'য্যায়সা লিডার'এবং 'আপনি আওয়াম' ইত্যাদি অর্থবহ শব্দগুলি লক্ষ্য করলে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত চেতনা এবং রাজনৈতিক চিন্তার তাৎপর্য বুঝতে কারোই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

কবি শামসুর রাহমান লিখেছেন,"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন পঁচিশে মার্চ রাতে এবং এটি ঘোষণার জন্যে জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরীর নামে পাঠিয়ে দেন। সেই ঘোষণা ২৬শে মার্চ ভোর বেলা জনাব আব্দুল হান্নান মাইকে প্রচার করেন চট্টগ্রামে। ... একজন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা

হলো শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি রেডিওতে প্রচার করার উদ্দেশ্যে। ইতিহাসের বাঁক কখন যে কোন দিকে মোড় নেয় বলা ভারি মুশকিল। অনুপস্থিত, শত্রুর হাতে বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানের হয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। আমি অস্পষ্ট ঘোষণাটি শুনি সাতাশে মার্চ। বিকালবেলা। এরপর অবশ্য কয়েকবার। ... তিনি স্পষ্টতই ঘোষণা করেন,'অন বি হাফ অব আওয়ার গ্রেট ন্যাশন্যাল লীডার বঙ্গবন্ধু ... আই হেয়ারবাই ডিক্লেয়ার দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়ার ... " (জনকণ্ঠ, ৮-৮-০৩)। জিয়া নিজেই লিখেছেন, "২৭শে মার্চ শহরের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত লড়াই চলছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় রেডিও স্টেশনে এসেছিলাম।" ('মেজর জিয়ার বেতার ভাষণ',সরদার সিরাজুল ইসলাম, জনকণ্ঠ,২৬-৩-০৪)। "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" গ্রন্থের তথ্যসুত্রে জানা যায়, ২৭ মার্চ সকালে বেতারকর্মী বেলাল মহম্মদ পটিয়ায় গিয়ে জিয়ার সাথে আলোচনা করে তাঁকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলেন। সাক্ষাৎ আলোচনায়, বেলাল মহম্মদের সরাসরি মন্তব্য শুনেছি, ঘোষণা প্রদান আর পাঠ করা এক কথা নয়। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের জন্য অধিকার-কর্তৃত্ব থাকতেই হয়, যা ছিল একমাত্র বঙ্গবন্ধুর, অন্য কারোই নয়। ঘোষণা পাঠ বা প্রচার করতে পারে যে কেউ, 'আমিও করেছিলাম, কিন্তু ঘোষণা প্রদানের দাবিদার আমি নই, হতেও পারি না'। তিনি আরো বলেছিলেন, আ.লীগ নেতা আব্দুল হান্নান ২৬ মার্চ সকালেই চট্টগ্রাম শহরে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি মাইকে প্রচার করেছিলেন এবং পরে বেতারেও পাঠ করেছিলেন। ইংরেজি তর্জমা পাঠ করেছিলেন আবুল কাশেম সন্দীপ।

প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে 'দৈনিক বাংলা'য় "একটি জাতির জন্ম" শিরোনামে জিয়া লিখেছেন, "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বানে সারা দেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দেলন। ... ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হলো। ... ২৫শে ও ২৬শেমার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিলো নৌবাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে যেয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। ... পথে আমি কর্ণেল শওকতকে ... জানালাম আমরা বিদ্রোহ করেছি। ... ব্যাটেলিয়নে ফিরে দেখলাম সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। ... তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে ... ডেপুটি কমিশনার ... ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা। ... আমি ব্যাটেলিয়নের অফিসার, জেসিও আর জওয়ানদের ... সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। ... একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট" (জনকণ্ঠ,২৬-০৩-০২)।

২৬ মার্চ রাত ২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত সময়ের বর্ণনায় জিয়া কোথাও 'স্বাধীনতা ঘোষণা' করার দাবি করেননি। উল্লেখ্য যে, উক্ত নিবন্ধে জিয়া লিখেছেন, ২৪মার্চের পরদিন অর্থাৎ ২৫মার্চ মেজর জিয়া চট্টগ্রাম শহরের রাস্তায় ব্যারিকেড (জনসাধারণের তৈরি) অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ২৫ মার্চ রাত ১১টার পরেও পাকিস্তানী

কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে রওনা হয়েছিলেন, কর্ণেল শওকতের সাথে আলোচনা করে সেনানিবাসে ফিরে আসার আগেই সেখানে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে এবং "সমস্ত পাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে রাখা হয়েছে"। অর্থাৎ জিয়া কেন্টনমেন্টে ফেরার আগেই বাঙালি সৈনিক-কর্মকর্তারা পাকিস্তানি সৈনিক-কর্মকর্তাদেরকে নিরস্ত্র এবং বন্দী করেছিলেন। অন্যান্য সূত্রের তথ্যে জানা যায়, ২৫মার্চ দিবাগত রাত ১-১০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার টেলেক্স বার্তা পৌঁছে গেছে। এবং তারও অনেক আগেই ঢাকার বিডিআর এবং পুলিশ বাহিনী প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। সুতরাং এ সত্য মানতেই হবে, জিয়া 'স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক', প্রথম বিদ্রোহী কিংবা প্রথম প্রতিরোধ যোদ্ধাও ছিলেন না। কিন্তু তবু সত্য যে, মেজর জিয়ার অবস্থান ইতিহাসের অনুকুলেই ছিল, বিপরীতে নয়। তাহলে 'স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া' বলে জিয়ার অনুসারীরাই তাঁর উপর মিথ্যার বোঝা চাপাচ্ছেন কেন? উত্তর একটাই, ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা নয়, জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধাও নয়, জিয়াকে রাজনীতির পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করাটাই মূল লক্ষ্য।

মুক্তিযোদ্ধা এবং নেতৃস্থানীয় সংস্কৃতিকর্মী গোলাম কুদ্দুছ উল্লেখ করেছেন: "অনেকে বলেন, শেখ মুজিব যদি বাংলাদেশের স্বাধীনতাই চাইতেন তবে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে আলোচনায় বসলেন কেন"? গোলাম কুদ্দুছের পর্যবেক্ষণ, "এখানেই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। ... তিনি যদি ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে আলাপ-আলোচনায় না বসেন তবে পাকিস্তানিদের এ নাটক বিশ্ববাসীর কাছে ধরা পড়বে না। উপরন্তু পাকিস্তান ভাঙ্গার একক দায়িত্ব শেখ মুজিবের ঘাড়ে চাপানো হবে এবং বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারতীয় চক্রান্ত হিসেবে দেশ-বিদেশে প্রচার করা হবে। বঙ্গবন্ধুর এ দূরদর্শী চিন্তা ও অবস্থানের কারণে শত অপপ্রচার সত্বেও বিশ্ববাসী আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ায় এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের নিন্দা জানায়" (১(২)/১০৯৭-১০৯৮)।

প্রসঙ্গতই উল্লেখ করা যেতে পারে, একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা (Unilateral Declaration of Independence – UDI) বা বিচ্ছিন্নতাবাদ (Scession) আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী বলেই বলে গণ্য হয়। সাধারণভাবে সকল রাষ্ট্রই নিজস্ব অখন্ডতার স্বার্থে অন্য রাষ্ট্রের কোনো অংশে একতরফা স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতাকে সমর্থন করে না বরং ক্ষতিগ্রস্থ রাষ্ট্রটির পক্ষেই সমর্থন জোগায়। স্মরণ করা যেতে পারে, আফ্রিকা মহাদেশের ফেডারেল রাষ্ট্র নাইজেরিয়ার 'ইবো' (Ibo) জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলীয় অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯৬৬ইং 'রিপাবলিক অব বায়াফ্রা' নামে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উল্লেখযোগ্য সমর্থন-সহযোগিতা না পেয়ে, চরম নির্যাতন, বিপুল প্রাণহানি এবং সম্পদনাশের পরিণামে আবার ১৯৭১ইং মূল রাষ্ট্র নাইজেরিয়ার সাথে একীভূত হতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলাদেশের ছ'-দফা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের সমকালীন বিশ্বে আলোড়ণ সৃষ্টিকারী 'বায়াফ্রা-সংকট' বঙ্গবন্ধুর অজানা থাকার কথা নয়। বঙ্গবন্ধু মুজিব বাংলার মানুষের সামগ্রিক মুক্তির লক্ষ্যে আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকায় সতত অবিচল থাকলেও, তিনি

কখনো হঠকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী কিংবা বিপ্লবী ছিলেন না।

বঙ্গবন্ধু "বাংলাদেশ স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন একটি মর্যাদাব্যঞ্জক যুদ্ধ বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে। ... বনেজঙ্গলে ঘুরে বিচ্ছিন্নতাবাদীর অপবাদ নিয়ে তিনি স্বাধীনতার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে চাননি"। শাহরিয়ার কবির লিখেছেন, "আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড এবং তাঁর বিশ্বস্ত ছাত্র-যুব নেতাদের তিনি ভারত যাওয়ার নির্দেশ দিয়েও নিজে ... থেকে গিয়েছিলেন - তিনি ভেবেছিলেন, যদি ভারত প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে তাহলে তাঁকে বিশ্ববাসীর কাছে চিহ্নিত হতে হবে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তিনি একসময় বন্ধু-ভাবাপন্ন ছিলেন, তাদের রাষ্ট্রদূত (ফারল্যান্ড ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতে) যখন তাঁকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন মার্কিন সরকার কোনও অবস্থাতেই পাকিস্তান ভাঙ্গার কোনও পদক্ষেপ অনুমোদন করবে না, তখন তাঁকে আন্তর্জাতিক জনমত সম্পর্কে অধিকতর সতর্কতার সাথে ভাবতে হয়েছে" (১(১)/৩৭৪)। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর পক্ষে, সবকিছু জেনেবুঝেই পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবার কোনো বিকল্প ছিল না। তবে পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক প্রস্তুতি অব্যাহত রেখেছিলেন - এসত্য একান্তই অস্বীকার্য।

স্মরণ করা যেতে পারে, অসহযোগ আন্দোলন শুরুর প্রথম দিকেই "আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের পক্ষ থেকে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য মুজিবকে 'সর্বময় ক্ষমতা' দেওয়া হয়। নীতি-নির্ধারণী বিষয়াদি ঠিক করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, তাজউদ্দিন আহমদ ও এ.এইচ.এম কামারুজ্জামানকে নিয়ে 'দলীয় হাই কমান্ড' গঠন করা হয়। তাজউদ্দিন আহমদকে 'কর্মসূচী বাস্তবায়নের' দায়িত্ব দেয়া হয় এবং ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে করা হয় তার সাহায্যকারী" (২৪/১৩)। এ হাই-কমান্ডের পরিকল্পিত উদ্যোগে-নির্দেশেই 'অনুপস্থিত বঙ্গবন্ধু'র নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। সুতরাং বঙ্গবন্ধু মানসিকভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় কিংবা কিংবা দলীয় দায়িত্বের 'লাইন আপ' ঠিক না করেই গ্রেফতার বরণ করেছিলেন, এমন সংশয়-কথা ইতিহাস সমর্থন করে না।

২৫ মার্চ পাক-বাহিনীর আক্রমণ এবং বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বাপর সময়টাতে তাঁর চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে আরো নানা জনেই নানা সংশয়-প্রশ্ন প্রকাশ করেন। বিশেষত পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু-হত্যার পর থেকে অনেকেই বলতে ভালোবাসেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শেখ মুজিব 'অনুপস্থিত' ছিলেন। কর্ণেল অলির কথা, "ওই রাতে শেখ মুজিব নিজ বাসায়ই ছিলেন এবং কারাগারে যাবার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিলেন"। এমন কথা বেগম জিয়াও দলীয় সভা-সমাবেশে বহুবার বলেছেন। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চেতনার দিকটি উপলব্ধির জন্যই বিবেচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, কারাবরণের পেছনে তাঁর কি কোনো সপ্রমান যৌক্তিক অভিপ্রায় ছিল? নাকি নিতান্তই আপোষে-আরামে থাকার বাসনায় ইচ্ছে করেই মুক্তিযুদ্ধে 'অনুপস্থিত' ছিলেন?

মুজিবের গ্রেপ্তার বরণের সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্পর্কে, একটা নির্মোহ-নিরপেক্ষ অবস্থান থেকেই এস এ করিম যেন নিজের মনেই প্রশ্ন করেন, "তাঁর (বঙ্গবন্ধুর) মনে কি এমন কোনো ভয় ছিল যে, তাঁকে সন্ধানরত পাকসেনাদের প্রচন্ড নির্যাতনের কারণে সক্রিয় প্রতিরোধের কর্তৃত্বটা তূলনামূলকভাবে অধিকতর সংগঠিত কিন্তু দায়িত্বহীন অতি-বাম শক্তির হাতে চলে যাবে, পূর্ব বাংলা কি বিশৃঙ্খল অপশাসনের কবলে পড়বে? নাকি তিনি ধারণা করেছিলেন যে, তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৯৬৯এর চেয়েও বিপুলতর গণঅভ্যুত্থান ঘটবে, যার ফলে তাঁর দাবিগুলি ইয়াহিয়া মেনে নিতে বাধ্য হবেন?" অতঃপর এসএ করিমের মন্তব্য, "We can not be certain about the interplay of complex motives that guided his action ... it seems plausible that humanitarian motives primarily influenced his action to surrender." (৭/১৯৪)। বঙ্গবন্ধুর মানবিক চেতনা এবং জনগণের জন্য দরদের কথা বলেছেন আরো অনেকেই। কিন্তু গ্রেপ্তার বরণের আগে বঙ্গবন্ধুর মনের যে দু'টি চিন্তার জটিলতার কথা বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরবর্তী সময়ে, সেগুলি বহুলাংশেই অভ্রান্ত প্রমানিত হয়েছিল।

অতিবাম রাজনীতিকরা মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুরের লড়াই' বলে উল্লেখ করতেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অতিবাম-ডান রাজনৈতিক শিবির এবং রাজাকাররা যে চরম 'এনার্কি' কায়েম করেছিল, এ তথ্যও কারো অজানা নয়। আর একথা মানতেও দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ গণ-সম্পৃক্ত মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করেই এদেশের মানুষ স্বাধীনতা এবং জাতির জনকের মুক্তি অর্জন করেছিল। সুতরাং রাজনীতিবিদ হিসাবে মুজিব কেবলই মানসিক আবেগে পরিচালিত হয়েছেন এমন ভাবার তো কারণ নেই। বরং নিশ্চিত করেই বলা চলে, তাঁর রাজনৈতিক চেতনায় আবেগ থাকলেও কোনো রকম বিভ্রান্তি কিংবা সংশয় দুদোল্যমানতা ছিল না, ছিল বাস্ত বতাবোধ। সপ্রমান তথ্যের আলোকেই বলা যেতে পারে, ২৫মার্চ দিবাগত রাতে সবকিছু অবহিত থেকেও বঙ্গবন্ধু মুজিব হতাশ কিংবা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েননি এবং রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির হিসাবেও তাঁর কোনো ভুল ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারের পূর্বাপর প্রেক্ষাপট ঃ
অতঃপর পশ্চিম পাকিস্তানের সেনা-কারাগারে

একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে শেষ পর্যন্ত যাঁরা বঙ্গবন্ধুর বাসায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরই একজন ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম। সে রাতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, ২৪ মার্চ বিকাল থেকে ২৫ মার্চ রাত ১০টা সাড়ে ১০টা পর্যন্ত সকলকে মুজিব ঢাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেন। অনেকেই তাঁকে আত্মগোপনের অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর একটিই জবাব ছিল, "আমাকে নিয়ে তোরা কোথায় রাখবি? বাংলাদেশে আত্মগোপন করা সম্ভব নয়। আমার হয়তো মৃত্যু হবে, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই"।

গোলাম মুরশিদ লিখেছেন, "মুজিব আগে থেকে অন্য নেতাদের গা ঢাকা দেওয়ার

নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাজউদ্দিনকে সে রাতেই তিনি শহরতলীতে পালিয়ে থাকার কথা বলেছিলেন। শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রাজ্জাক এবং সিরাজুল আলম খানকেও পালিয়ে গিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ... কিন্তু তাঁর নিজের পালানোর কোনো উপায় ছিলো না। তাঁর মত একজন নেতাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা যায় না। ... বড়ো কথা, পালানোর মত মনোবৃত্তিই তাঁর ছিলো না। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লেখা এবং পালানোর ব্যাপারে তাজউদ্দিন তাঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি রাজি না-হওয়ায়, শেষপর্যন্ত তাজউদ্দিন রাগ করে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যান" (২০/৭৮)। এখানে শেষ বাক্যটি সংশয় জাগাতেই পারে। তাজউদ্দিনের কোন পরামর্শে বঙ্গবন্ধু একমত হতে পারেননি, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র লেখা, পালানো, নাকি দু'টিই? ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম লিখেছেন, ২৪মার্চ বিকাল থেকেই বঙ্গবন্ধু দলীয় নেতাকর্মীদেরকে ঢাকা ছেড়ে যাবার নির্দেশ দিতে শুরু করেছিলেন। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে, ২৫মার্চ সন্ধ্যা থেকেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা সম্বলিত স্বকণ্ঠ-রেকর্ড এবং লিখিত আহ্বান প্রস্তুত করা হচ্ছে। ইয়াহিয়ার সাথে চলমান আলোচনা ভেস্তে যাবার খবরটি জানার পরেই শুরু হয়েছিল তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণার প্রকাশ-প্রচার। সুতরাং এমন ধারণাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র নয়, পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কেই তাজউদ্দিনের পরামর্শের সাথে বঙ্গবন্ধু একমত হতে পারেননি।

২৫ মার্চ রাতের প্রথম দিকেই "এই মুহূর্তে তোমরা আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। আর তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করবে'। মুজিবের এই শেষ আজ্ঞা শিরোধার্য করে ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম ও ড. কামাল হোসেন তাদের 'দলনেতা' তাজউদ্দিনের বাসায় আসেন। ... পরনে লুঙ্গি, গায়ে পাঞ্জাবি, পায়ে কাপড়ের জুতো, এক কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ ও অন্য কাঁধে একটি রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে এলেন তাজউদ্দিন। ... শুরু হল অনিশ্চিত যাত্রা। ... তাজউদ্দিন ও আমীর-উল ইসলাম লালমাটিয়ায় ... ইঞ্জিনিয়ার গফুর সাহেবের বাড়িতে আশ্রয় নেন। পথিমধ্যে ড. কামাল হোসেন তাঁদের সঙ্গ ছেড়ে গিয়েছিলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় অপারেশন 'সার্চলাইট' এবং পরদিন কার্ফু। ২৭মার্চ 'পথই ঠিকানা, পথই গন্তব্যে পৌঁছে দেবে' ভেবে, উভয়ে রায়ের বাজার দিয়ে নদী পার হয়ে, হেঁটে ... মোটরসাইকেল যোগে ... পরদিন (২৮ মার্চ) নৌকায় পদ্মা পার হয়ে ঘোড়ায় চড়ে ফরিদপুর ... রিক্সা-বাস ও হেঁটে মাগুরা এবং এর পরদিন (২৯ মার্চ) জিপযোগে তাঁরা সোহরাব হোসেনসহ ঝিনাইদহ পৌঁছেন; এরপর চুয়াডাঙ্গা হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে (৩০ মার্চ) ভারতে যান। ... পদ্মার পাড়ের আগারগাঁওয়ে রাত্রিযাপন কালে (২৭ মার্চ) স্বাধীন বাংলা বেতারের স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে পান। মাগুরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, যশোর (ঝিনাইদহ) প্রভৃতি স্থানে প্রতিরোধ আন্দোলন দেখতে পান। স্থানে স্থানে তাঁরা বৈঠক করে (জনগণের) মনোবল ও সংগ্রাম জোরদার করার প্রয়াস পান। 'অবস্থাদৃষ্টে' তাঁদের মনে হল, 'সারা বাংলায় গণযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে" (২৪/১৫)।

তৎকালে ধানমন্ডির অধিবাসী জাপানী রেডক্রস কর্মকর্তা তাদামাসা হুকিউরা

উল্লেখ করেছেন, 'আওয়ামী লীগের ঢাকা অঞ্চলের একজন নেতা আব্দুল আহমেদ সেদিনের কথা স্মরণ করে' বলেছিলেন "২৫তারিখ রাতে আমি শেখ মুজিবের সঙ্গে ছিলাম। সেদিন তাঁর বাসায় আসা অতিথিদের নয়টার মধ্যে বিদায় দিলেন এই বলে যে, সাধারণ নাগরিকেরা স্বাধীন বাংলা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সাহসের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য প্রাণ দিতে হতে পারে। কিন্তু এটাই হবে আমাদের শেষ আত্মত্যাগ"। হুকিউরা বলছেন, "শেখ মুজিবের এই উক্তি সম্ভবত এমন ইঙ্গিত বহন করছিল যে, সে রাতে কী ঘটতে যাচ্ছিল, তিনি সেটা জানতেন"। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর পাশের বাসায় থাকতেন জাপানী কনসাল জেনারেল মাসাতাদা হিগাকি। বঙ্গবন্ধুর শুভার্থীরা তাঁকে জাপানী কনসাল জেনারেলের বাসায় আশ্রয় নেবারও পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু বঙ্গবন্ধু কিছুতেই নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে রাজি হননি। ২৫মার্চ গভীর রাতে হিগাকি "গুলি ও রাস্তা দিয়ে ছুটে যাওয়া মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পান। সেই সঙ্গে তাঁর কানে এল 'জয় বাংলা ! জয় বাংলা !' বলে চিৎকার, যা এসেছিল তাঁর পাশের বাড়ি থেকে। তিনি সেই কণ্ঠস্বরের মালিককে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন - স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান" (২১/৩২)।

সেদিন রাতে "ধীরে ধীরে সকল নেতা চলে গেলেন। কেবল রয়ে গেলেন শেখ সাহেবের বিশ্বস্ত সহচর ও শুভানুধ্যায়ী হাজী গোলাম মোরশেদ সেই কালো রাত্রিতে ৩২নং রোডে (বাড়িতে) বঙ্গবন্ধুর কি ঘটল তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে। তিনি পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন যে, বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার বরণ করেন রাত ১:৩০এর পরে" (১(১)/৩৪১)। "The hammer-blows of the tank-led forces fell on four main targets : the police lines at Rajarbagh, the East Pakistan Rifles barracks at Peelkhana, the Dhaka University campus and the slums of old Dhaka. ..The most important single target of the Army was the person of Sheikh Mujib. After all he was the embodiment of Bengali nationalism ... The Army did not want to kill him, ... give him aura of martyrdom. A specially selected commando unit was given the task of capturing him alive. They reached Mujib's house shotly after 1 a.m.' 26 March" (৭/১৯৯-২০০)। "সিদ্দিক সালিকের মতে সৈন্যরা ছাউনি ছাড়ে সাড়ে এগারোটায়। ... গ্রেফতারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল লে.ক. জহির আলম খানকে। ... মুজিব তৈরি ছিলেন আত্মসমর্পনের জন্য। ... গ্রেফতারের আগে মুজিবের বাসভবনের ওপর নানা দিক থেকে অসংখ্য গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। তাকে মেগাফোনে নিজে নেমে আসার কথা বলা হয়েছিল। তিনি তখন কাপড়-চোপড়ের ছোট্ট একটা ব্যাগ সঙ্গে নিয়ে আর মুখে পাইপ দিয়ে নেমে এসেছিলেন" (২০/৭৬-৭৮)।

কোনো কোনো তথ্যে বলা হয়েছে, পাক-সৈনিকেরা "মুজিবের শোবার ঘরের দরজায় গুলি করে দরজা খুলে সেই কক্ষে ঢুকেছিল ... । মুজিব তৈরি ছিলেন আত্মসমর্পনের জন্য"। কিন্তু "the commandos ... shoot several *darwans* of the

neighbouring houses. Dhaka was already aglow with houses on fire ... Mujib looked at the skyline and asked the commanding officer, 'Was it necessary to do all this'? He replied, 'Sir, I am only carrying out orders." (৭/২০০)। অপরদিকে এমন তথ্যও মেলে যে, গ্রেফতারের আগে-পরে পাক-সেনারা বঙ্গবন্ধুর ওপর চরম অপমান-নির্যাতন চালিয়েছিল। গ্রেফতারকারী ইউনিটের পক্ষ থেকে অনতিবিলম্বে সেনা সদর দফতরকে বেতার-বার্তায় জানানো হয়েছিল, "BIG BIRD IN THE CAGE" (৭/২২৪)। সেনা-জিপে করে যথাশীঘ্র তাঁকে ঢাকা সেনা নিবাস এলাকার কাছে অবস্থিত আদমজী ক্যান্টনমেন্ট হাই স্কুলে নিয়ে রাখা হয়। পরের দিনই নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টের ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে। তিনদিন পরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, প্রথমে করাচিতে, তারপর লায়ালপুর জেলে।

"বদরুদ্দিন উমরের মত কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন যে, এভাবে ধরা দেওয়া তাঁর ঠিক হযনি। ... তিনি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন। কিন্তু এ সমালোচনা আদৌ যথার্থ নয়। কারণ, মুজিব বিপ্লবী রাজনীতি করেননি, বরং চিরদিন সাংবিধানিক রাজনীতি করেছেন। ... ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সত্যিকার নির্ভীক এবং আপোষহীন। ... তিনি কোনোদিন কম্যুনিস্টদের মত গোপন আন্দোলনও করেননি" (২০/৭৮)। "মুজিবের বন্দীত্ব মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণার থেকেও অনেক বড় ঘটনা", প্রয়াত অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই লিখেছিলেন, "মুজিব যদি ধরা না দিয়ে পালিয়ে গিয়ে ... কোনো ভাঙ্গা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন ... তাহলে কি তিনি মুজিব হতেন? ... মুজিব পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিলে মুক্তিযুদ্ধ হতো না, তিনি ... হতেন সামান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী; এবং আমরা একটি বিশাল রাজনৈতিক ভাবপ্রতিমাকে হারাতাম, মুক্তিযুদ্ধে আমরা এত অনুপ্রাণিত বোধ করতাম না। যোদ্ধা মুজিবের চেয়ে বন্দী মুজিব ছিলেন অনেক শক্তিশালী ও প্রেরণাদায়ক; তিনি তখন হয়ে উঠেছিলেন মহানায়ক; ... মুক্তিযুদ্ধের সময়টি ভরে তিনিই ছিলেন নিয়ন্ত্রক ও প্রেরণা ... সমগ্র বাঙালির রূপ ধরে তিনিই করে চলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ। ... প্রতিটি বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাই ছিল মুজিবের দ্বিতীয় সত্তা"।

গোলাম মুরশিদ উল্লেখ করেছেন, "তিনি (বঙ্গবন্ধু) সম্ভবত কল্পনাও করতে পারেননি যে, পাকিস্তানিরা অমন বর্বোরোচিত হামলা করে লাখ লাখ লোককে হত্যা করতে পারে" (২০/৭৮)। আসলে কোনো সুস্থ মানুষের পক্ষেই পাকিস্তানিদের দানবিক প্রচন্ডতার কথা আন্দাজ করাও সম্ভব ছিল না। পরবর্তী সময়ে জানা গেছে, ঘটনার অনেক আগেই, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ইং জেনারেলদের এক সভায় ইয়াহিয়া বলেছিলেন, "দরকার হলে তিরিশ লাখ লোককে খতম করে দেওয়া হবে। বাকিরা তখন অনুগত ভৃত্যের মত আচরণ করবে। এজন্যই তিনি পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে আসেন টিক্কা খানকে। ... টিক্কা খান পরিকল্পনা করেছিলেন যে, মাত্র ৭২ঘন্টার মধ্যে দেশকে তিনি 'বিদ্রোহী'-মুক্ত করবেন"। সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, "বিশে মার্চ এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়। ব্যাপক গণহত্যার মধ্য দিয়ে জনতাকে হতভম্ব এবং চুপ করিয়ে দেওয়াই ছিলো এই ঝটিকা আক্রমণের উদ্দেশ্য" (২০/৭৮-৭৯)। এখানে প্রাসঙ্গিকতার

প্রয়োজনেই দু'টি ভিন্ন সূত্রের কিছু তথ্য-পরিসংখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত প্রধান সেনাপতি আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী লিখেছেন, "টিক্কার নিষ্ঠুরতা দেখার জন্য ভুট্টো ঢাকায় থেকে গেলেন। অচিরেই ভুট্টো দেখতে পেলেন ঢাকা জ্বলছে। তিনি জনগণের আর্ত চিৎকার, ট্যাংকের ঘড় ঘড় শব্দ, রকেট ও গোলাগুলির বিস্ফোরণ এবং মেশিনগানের ঠা-ঠা-ঠা আওয়াজ নিজের কানেই শুনতে পেলেন। সকালবেলায় (২৬মার্চ) টিক্কা, ফরমান ও আবরারকে পিঠ চাপড়িয়ে ভুট্টো তাঁদের অভিনন্দন জানান। তিনি তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশ্বাস দেন। ভুট্টো তাঁর কথা রেখেছিলেন" (২০/৭৫)। "ঢাকায় কী ভয়ানক হামলা হয়েছিল ... সরকারী হিসেবে বলা হয়েছিলো ৪০জন নিহত হয়েছেন। সেনাবাহিনীর অফিসারদের মতে এক শ'। সায়মন ড্রিং ব্যাংকক থেকে পাঠানো প্রতিবেদনে বলেন, ঢাকায় সাত হাজার, দেশের অন্যান্য জায়গায় পনেরো হাজার (ডেইলি টেলিগ্রাফ,৩০ মার্চ)। ... ২৯মার্চের 'সিডনি হেরাল্ড'এ লেখা হয়,দশ হাজার থেকে এক লাখ। 'নিউইয়র্ক টাইমস্'এর পয়লা এপ্রিলের সংখ্যায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয় 'অপারেশন সার্চ লাইট'এর সময় নিহতদের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার। ... সবচেয়ে ভালো বর্ণনা দিয়েছেন লে. জে. নিয়াজী : ২৫ মার্চের সেই সামরিক অভিযানের নৃশংসতা বুখারায় চেঙ্গিস খান, বাগদাদে হালাকু খান এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ জেনারেল ডায়ারের নিষ্ঠুরতাকেও ছড়িয়ে যায়। ... মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী তার টেবিল ডায়রিতে লিখেছেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের শ্যামল মাটি লাল করে দেওয়া হবে'। বাঙালির রক্ত দিয়ে মাটি লাল করে দেওয়া হয়েছিল" (২০/৮৪)।

মাসুদা ভাট্টি লিখেছেন, "পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাঙালির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে এক রাতেই হত্যা করে প্রায় এক লাখ বাঙালিকে (মার্কিন ও বৃটিশ গোপন দলিলপত্রানুযায়ী)। ... পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন চৌধুরী বলেছিলেন, 'দি বেঙ্গলিস হ্যাভ বিন সর্টেড আউট ওয়েল এ্যান্ড প্রপার- এ্যাট লিস্ট ফর এ্যা জেনারেশন'। একদিকে গণহত্যা ও অন্যদিকে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে ইয়াহিয়া খান ভাবলেন তিনি পাকিস্তানকে 'সেভ' করেছেন। এবং সেই অনুযায়ী ২৬মার্চের (রাতের) বেতার ভাষণে বললেন, শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন ছিল দেশদ্রোহিতা। সে আর তার দল আইনানুগ কর্তৃপক্ষকে অস্বীকার করেছে। ... সমান্তরাল সরকার পরিচালনা করেছে। ... তারা পূর্ব পাকিস্তানকে সার্বিকভাবে পাকিস্তান থেকে পৃথক করতে চায়। তার এই অপরাধ 'উইল নট গো আনপানিশড্'। ... ইয়াহিয়ার এই ঔদ্ধত্যের ফলাফল যে কী হয়েছিল, তাতো বিশ্ববাসীই দেখেছে" (১(১)/৪৮০)।

বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের পর দু'সপ্তাহেরও অধিক কাল সংবাদটি প্রকাশ করেনি ইয়াহিয়া-সরকার। খবরটি প্রথম প্রকাশ করা হয় ১০এপ্রিল। ততদিনে ঢাকা থেকে করাচি হয়ে লায়ালপুর সেনা-কারগারে নিঃসঙ্গ-বন্দী করা হয়েছে মুজিবকে। তার আগে বিশ্ববাসীর কাছে, এমনকি দলীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাকর্মীদের কাছেও বঙ্গবন্ধু কেমন আছেন, কোথায় আছেন, ইত্যাদি খবরগুলি সম্পূর্ণ অজানাই ছিল। তাই দিল্লিতে ৩ এপ্রিল তারিখে তাজউদ্দিন সাক্ষাৎ করতে এলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন "How is Sheikh Mujib? Is he all rifght? Tajuddin repplied that he had not met Bangabandhu since the twenty-fifth of March but he was sure that he was continuing to provide leadership for the nation. Indeed it was his (Bangabandhu's) instructions that he (Tajuddin) was acting." (৭/২০৭)।

পর্যবেক্ষকদের ধারণা, প্রধানত দু'টি ভয়ের কারণে পাক-সরকার খবরটি প্রকাশে এত বিলম্ব করেছিল। প্রথমত, ঢাকায় তাদের ভয় ছিল, বাঙালিরা কমান্ডো কায়দায় মুজিবকে ছিনিয়ে নিতে পারে। দ্বিতীয় ভয়টা ছিল, বন্দী মুজিবকে ঢাকা থেকে করাচি স্থানান্তরের বিষয়টি আগাম জানাজানি হলে ভারতীয় বিমানবাহিনী জোর করে মুজিবকে বহনকারী বিমানটি আকাশেই আটক করে ভারতে নামিয়ে নিতে পারে। সুতরাং মুজিবকে লায়ালপুর জেলে যথার্থ নিরাপদ হেফাজতে আটক করার পরই খবরটি প্রকাশ করা হয়েছিল। মুজিব জীবিত রয়েছেন, বিশ্ববাসীকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে জানানোর জন্য আলোচ্য খবরটির সাথে করাচি বিমান বন্দরে প্রহরাধীন বন্দী মুজিবের ছবিও প্রকাশ করা হয়েছিল।

হয়তো নিতান্তই একটা 'ঐতিহাসিক কাকতালীয়' - যেদিন পাকিস্তানীরা বঙ্গবন্ধু মুজিবের বন্দিত্বের কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছিল, সেই ১০এপ্রিল, ১৯৭১ইং তারিখেই স্বাধীনতা সংগ্রামরত বাংলাদেশের (প্রবাসী) সরকার কর্তৃক স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। সাবেক প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেনের 'সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' নিবন্ধ থেকে আংশিক উদ্ধৃতি :

"THE PROCLAMATION OF INDEPENDENCE
Mujibnagar, Bangladesh,
Dated : 10th day of April, 1971.

... Whereas in the facts and circumstances ... Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of the 75 millon people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971 and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh.

... We, the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour-bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme, duly constituted ourselves into a Constituent assembly, and having held mutual consultations, ... declare and constitute Bangladesh to be a soverign People's Republic and thereby confirm the declaration of inependence already made by Bangabandhu Sheikh Mujibur

Rahman ... and ... that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971 ... বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বহু রায়ে এই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের একটি আকর দলিল বলে গণ্য করেছেন" (১(১)/১১২-১১৪)।

সামরিক কারাগারে সাজানো বিচার ঃ
মৃত্যুভয়হীন সাহসী মুজিব

"লায়ালপুর পাঞ্জাবের একটি জেলা শহর। ... উষর ও অত্যন্ত গরম আবহাওয়ার জন্য কুখ্যাত একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল। কয়েদির নিরাপত্তা ও তার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টির বিবেচনায় উপযুক্ত স্থান" (১০/৮৫)। জেলে মুজিবকে রেডিও-সংবাদপত্রহীন অবস্থায় বহির্বিশ্বের সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ বন্দী করে রাখা হয়েছিল। দর্শনার্থী দূরের কথা, যে কারারক্ষীটি খাবার নিয়ে আসতো, তাকেও মুজিবের সাথে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছিল। "It was the worst imprisonment that he had ever experienced ... Most likely his worst torture was not knowing how the liberation struggle was progressing in his absence ... Just before his arrest he had observed how pakistani soldiers were busy pillaging Dhaka and killing thousands of innocent civilians" (৭/২২৪-২২৫)।

ইয়াহিয়ার অভিপ্রায় ছিল, মুজিবকে হত্যা করা হবেই। কিন্তু সেটা বীরের মৃত্যু বা শহীদের মৃত্যুর মত মর্যাদাময় হতে দেয়া চলবে না। "১৯৭১ সালের মাঝামাঝি সময়ে সামরিক প্রশাসন স্থির করলো, শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদোহিতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে চিরতরে ঠান্ডা করে দেযা যাবে এবং এভাবেই বাঙালিদেরকে কব্জায় রাখতে হবে। সংখ্যাধিক্যের ভোট মারফত প্রদত্ত রায় তলিয়ে যাবে মুজিবের কবরে। কিন্তু একটি আন্তর্জাতিক সমস্যাও ছিল। সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে শেখ মুজিব ... সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করেন। আন্ত র্জাতিক ও গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী নিঃসন্দেহে শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। ... পৃথিবীর সমস্ত অগ্রসর দেশের পক্ষ থেকে দাবি উঠতে লাগলো, শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হোক ... সামরিক শাসক ভাবলো, যতো অবিশ্বাস্যই হোক, ... প্রহসনমূলক বিচারে মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী আখ্যায়িত করে যদি মৃত্যুদণ্ড দ্রুত কার্যকর করা যায, তারপর আন্তর্জাতিক বিরোধিতাও ক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়বে। কারণ যার জন্য এই দাবি, সেই ব্যক্তিই তো মৃত। আরও বড় কথা, আমেরিকা ও চীন নিজেদের জাতীয় স্বার্থে পাকিস্তানকে সমর্থন যুগিয়ে যাবে" (১০/৮৫-৮৬)।

১৯জুলাই, ১৯৭১ইং লন্ডনের 'ফিনান্সিয়াল টাইমস'কে ইয়াহিয়া জানালেন, মুজিবকে সামরিক আদালতে গোপন বিচারের মুখোমুখি করা হবে। মুজিব আইনজীবী নিয়োগ দিতে পারবেন, তবে আইনজীবীকে অবশ্যই পাকিস্তানি হতে হবে। ইয়াহিয়া সম্ভবত এমন ধারণাই করতেন যে, মুজিবকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দণ্ড দেযা হলে, পাকিস্তানিরা সহজেই তা মেনে নেবে। "It was judicial murder that he

(Yahya) had in mind for Mujib. He (Mujib) should therefore, be in perfect health when he appeared before the military court. So Mujib was not physically maltreated in any way" (৭/২২৫)। নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হলো, পরিচিত এবং পছন্দের খাবার রেঁধে দেবার জন্য বাঙালি বাবুর্চি নিয়োগ করা হলো। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর পছন্দসই ব্রান্ডের তামাক সরবরাহেরও ব্যবস্থা করা হলো। অতঃপর জেলখানার ভেতরেই ১১আগস্ট, ১৯৭১ইং তারিখে সামরিক আদালতে মুজিবের বিচার শুরু হলো। পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট বিচারক প্যানেলের প্রধান ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার (রহিমউদ্দিন) , দু'জন সেনা কর্মকর্তা, একজন নৌবাহিনীর কর্মকর্তা এবং অন্যজন পাঞ্জাবের জেলা আদালতের বিচারক। ১২-দফা অভিযোগ আনা হয়েছিল মুজিবের বিরুদ্ধে, এর মধ্যে ছ'টিই ছিল মৃত্যুদণ্ড-যোগ্য। সবচেয়ে বড় অভিযোগটি ছিল : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা।

মামলাটি সাজানো হলো "বাঙালি সেনা অফিসারদের দ্বারা পরিচালিত একটি ষড়যন্ত্র ঘিরে। ষড়যন্ত্রটি হয়েছিল জয়দেবপুর রাজপ্রাসাদে, ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে। সেখানে তখন মোতায়েন ছিল দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট। তার অধিনায়ক ছিলেন কর্ণেল মাসুদ। ষড়যন্ত্রটিতে জেনারেল ওসমানী, (ব্রিগেডিয়ার) মজুমদারসহ সব বাঙালি সিনিয়র অফিসার জড়িত ছিলেন। ষড়যন্ত্রের কথিত সিদ্ধান্ত ছিল যে, সমস্ত বাঙালি সৈনিক অতর্কিতে পাকিস্তান সেনাছাউনিতে পাঞ্জাবি সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আক্রমণ করবে ও তাদের অস্ত্রাগার দখল করে নেবে। এরপরে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পন করা ছাড়া উপায় থাকবে না, অতএব পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে যাবে। ... ষড়যন্ত্রের আদেশদানকারী ... বিদ্রোহের মূল নেতা শেখ মুজিব। দেশদ্রোহিতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কথা-কাহিনীটি পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগের মস্তিষ্ক নির্গত এবং খুব সম্ভব ১৯৭১ সালের মে-জুন মাসের দিকে গড়া। গোটা পরিকল্পনাটি অবশ্য ইয়াহিয়া খান দ্বারা অনুমোদিত" (১০/৮৬-৮৭)। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র সাথে এ মামলার মিলটা লক্ষণীয় নয় কি?

"বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করার পর রেডিও অস্ট্রেলিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, 'শেখকে মরতেই হবে'। ... ২২মে করাচিতে ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া বলেন, 'আমি মনে করি, শেখ মুজিব মহা অপরাধ করেছেন। ... তবে বিচার হবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ'। ... ফারল্যান্ড বলেন, 'শেখ মুজিবের প্রতি ব্যাপক মাত্রায় আন্ত র্জাতিক সহানুভূতি রয়েছে। কাজেই তাঁকে দণ্ড দেওয়ার মত বিষয়ে পাকিস্তানের উচিত হবে বিশ্ব-জনমতকে গুরুত্ব দেওয়া'। ... ২৪মে করাচিতে এক সংবাদ সম্মেলনে ইয়াহিয়া ... বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে বললেন, 'পাকিস্তান সরকার যেরূপ যথাযথ মনে করবে, তাঁর সম্পর্কে সে রকমই ব্যবস্থা নেওয়া হবে'। এরপর ১১জুলাই ... ইয়াহিয়া বললেন, 'বাঙালি নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে সুস্থ ও জীবিত রয়েছেন। তবে আজকের পরে কাল শেখ মুজিবের কপালে কী ঘটবে, তা বলতে পারব না। বিচার করা হবে এবং এই নয় যে, আগামীকালই তাঁকে গুলি করব। স্বাভাবিক মৃত্যুও তো হতে পারে। সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার করার জন্য জেনারেলরা চাপ দিচ্ছেন। খুব

দ্রুত বিচার অনুষ্ঠিত হবে'। ... লন্ডনের 'দি ফিন্যান্সিয়াল টাইমস' ১৯জুলাই ১৯৭১-এর সংবাদ থেকে বিশ্ববাসী জানল, জেনারেল ইয়াহিয়া খান অত্যন্ত গোপনে বঙ্গবন্ধুর বিচারের ব্যবস্থা করেছেন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে। এখানে ১১ আগস্ট শুরু হয় প্রহসনের বিচার" (২২/৯৮-১০০)।

"এই মামলার জন্য সাক্ষী দরকার। ... জামায়াতে ইসলামীর মতো বহু পাঞ্জাবী-ভক্ত সাক্ষী পাওয়া সম্ভব; কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের দাম কম। কারণ, মামলাটি একটি সামরিক ষড়যন্ত্র ঘিরে" (১০/১০৬)। তাই যুক্তিসঙ্গত কারণেই রাষ্ট্রপক্ষের জন্য উচ্চপদস্থ বাঙালি সেনা-কর্মকর্তাদের সাক্ষী প্রদানের বিষয়টি ছিল একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য 'আসল সাক্ষী' হিসেবে পূর্বপাকিস্তান থেকে পরিকল্পিত ভাবে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আসা হযেছিল ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদার, লে. কর্ণেল মুহাম্মদ ইয়াসিন এবং লে. কর্ণেল মাসুদুল হোসেন খানকে। পাক-সেনাবাহিনীর পরিকল্পিত "মামলাটি যতো হাস্যকর হোক না কেন, এটি সাক্ষীদের জন্য ছিল বিধাতার দেয়া চরমতম দুর্ভাগ্যের ব্যাপার" (১০/৮৭)। মামলার সাক্ষ্য তৈরি করার জন্য যে অমানবিক অত্যাচার করা হয়েছিল তার বর্ণনা প্রসঙ্গে কৌতুহলী পাঠকের জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে, মে.জে. খলিলুর রহমান, 'পূর্বাপর ১৯৭১ পাকিস্তানি সেনা-গহ্বর থেকে দেখা' বইটিতে তার মর্মান্তিক বিবরণ বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

"Since Mujib was allowed to select his own Pakistani defense counsel, Mujib indicated that he would like to have Dr. Kamal Hossain to defend him. He was told that this was not possible. He then chose A. K. Brohi, a Sindhi. A brilliant lawyer, Brohi was also the leading constitutional expert in Pakistan" (৭/২২৫)। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ উত্থাপনের পর্যায়েই মুজিব জানলেন ইয়াহিয়ার ২৬ মার্চের বেতার ভাষণের কথা, যেখানে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য মুজিবকে 'Act of treason' অর্থাৎ দেশদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তাই একান্ত নিরর্থক ভেবেই ব্রোহির পরামর্শ-সহায়তা নিতে বঙ্গবন্ধু সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন। তারপরেও "শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি যে উকিলই চান ডিফেন্স কাউন্সিল হিসেবে তাঁকেই নিযুক্ত করা হবে। ব্যয়ভার সরকারের। ... মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে মুজিব উত্তর দিলেন যে, তিনি পাকিস্তানিদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রমূলক আদালতকে কোনো আদালত বলে মানেন না। ইয়াহিয়া খানকে যেন বলা হয়, সে যা খুশি তাই করতে পারে, মুজিবকে যদি হত্যা করতে চায় - তা সে স্বচ্ছন্দে করতে পারে। বিচারের নামে কোনো প্রহসন করতে হবে না। মুজিব এই প্রহসনের আদালতকে কোনোভাবে স্বীকৃতি দেয় না" (১০/৮৬)। সেনা ট্রাইব্যুনালে চক্রান্তমূলক মৃত্যুদন্ডের আশংকার মুখে দাঁড়িয়ে এমন সুস্পষ্ট সাহসী অবস্থান গ্রহণ, বঙ্গবন্ধুর ক্ষেত্রে এটাই প্রথম নয়। ১৯৬৮-'৬৯ইং 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' ট্রাইব্যুনালেও একাধিকবার বঙ্গবন্ধুর এমন অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে।

পাকিস্তান সরকার তবু ব্রোহিকেই মুজিবের 'ডিফেন্স কাউন্সেলর' নিযুক্ত করেছিল। পরামর্শ গ্রহণ দূরের কথা, মুজিব ফিরেও তাকাতেন না ব্রোহির দিকে। 'পাকিস্তানের

বিখ্যাত আইনজীবী ব্রোহি'র সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখযোগ্য। বিভৎস নির্যাতনের শিকার কর্ণেল "মাসুদের সবচাইতে বড় ভয় ছিল ব্যারিস্টার ব্রোহির জেরা। ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেয়া লিখিত জবানবন্দী তাঁর মুখস্থই ছিল; কিন্তু তিনি তো অনেক কিছুই জানতেন না। ... এসব ব্যাপারে বিবাদি পক্ষের আইনজীবীর জেরা শুরু হলে মাসুদ বেসামাল হয়ে ... মিথ্যাবাদী সাক্ষী প্রমানিত হতেন। অতএব, ব্রোহির ভয়ে তিনি ছিলেন উদ্বিগ্ন। কিন্তু ... ব্রোহি শেখ সাহেবের ডিফেন্স ল-ইয়ার হয়েও বাদিপক্ষের সাক্ষী কর্ণেল মাসুদকে কোনো প্রশ্নই করলেন না - জেরা তো দূরে থাক (১০/১০৩-১০৪)। সেনা-কর্তৃপক্ষের আদেশে কর্ণেল মাসুদ বিচারকক্ষে এসেছিলেন "সামরিক উর্দি পরে। তিনি সেখানে দেখলেন শেখ মুজিবকে পাইপ মুখে, নির্বিকার, বরঞ্চ কিঞ্চিৎ হাসি হাসি মুখ। মাসুদকে তিনি চিনতে পারলেন। সেই ১৯৪৪ সালের কলকাতা বেকার হোস্টেলের মাসুদ। শেখ সাহেবকে দেখে মাসুদের মাথা নত হয়ে এলো। শেখ সাহেবও তাঁর দিকে তাকিয়ে, মুখে মৃদু হাসি। বিচার শুরু হলো" (১০/১০৩)।

চরম নির্যাতন করে সাজানো সাক্ষী কর্ণেল ইয়াসিনকে একটা 'লিখিত বিবরণ' দিয়ে বলা হয়েছিল, লায়ালপুরে বিচারকের সামনে "এই কাগজে যা লেখা আছে, তাই জবানবন্দী হিসেবে বলবে, ঠিক আছে? ... ইয়াসিন জবানবন্দীটি মুখস্ত করছিলেন। এক জায়গায় ... লেখা আছে - অমুক দিন শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাড়িতে একটি ঘরে মিটিং হচ্ছিল। সেখানে কর্ণেল ইয়াসিন উপস্থিত ছিলেন। ইয়াসিন পড়লেন বিপদে। শেখ মুজিবের ধানমন্ডির ৩২নং সড়কের ... বাড়িটি তিনি দেখেনওনি। এদিকে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ব্রোহি ... নিশ্চয় জিজ্ঞেস করবেন মুজিবের বাড়ির কোন কামরায় সভাটি হয়েছিল। উত্তরটি অন্য সাক্ষীদের সাথে মিলিয়ে দেখবেন। অতএব, ইয়াসিন তাঁর এই সমস্যার কথা কর্তৃপক্ষকে বললেন ... দু'একদিন পরে একজন এসে ইয়াসিনকে বললো ... ব্রোহি বলেছেন যে, তিনি এ প্রশ্ন ইয়াসিনকে জিজ্ঞেস করবেন না। ... ইয়াসিন বাকরুদ্ধ। এমন বিখ্যাত এবং বিদ্বান আইনজীবী ব্রোহিও সামরিক বাহিনীর দলে ! অথচ তিনি রাষ্ট্র কর্তৃক শেখ মুজিবের আইনজীবী নিযুক্ত হয়েছেন। ... অথচ কাজ করছেন মুজিবের প্রতিপক্ষ সামরিক বাহিনীর হয়ে মুজিবকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর বন্দোবস্ত করতে। ... ব্রোহি বিদ্বান হতে পারেন, কিন্তু লোভ-লালসার ব্যাপারে পদলেহী পশুর ওপরে নয়" (১০/১০৮)।

"With the knowledge that the proceedings of the trial was only farcical preliminaries to his grim execution, he (Sheikh Mujib) sat impassively as witness after witness were brought in to give evidence that would implicate him as being involved in a conspiracy to destroy the integrity of Pakistan. The prosecution had originally submitted a list of 105 witnesses but no more than half of them were produced. Almost all of them who did testify had confessed while under police or military custody" (৭/২২৬)। বিচারালয়ে একেবারেই "নিশ্চুপ বসে থাকতেন বঙ্গবন্ধু। খুব প্রযোজন না হলে কথা বলতেন না। কযেকদিন পর আদালতের বিবরণী দেখার জন্য দেওয়া হলে বিবরণী বইয়ের ওপর

(বঙ্গবন্ধু) লেখেন 'সব মিথ্যা'। কয়েকদিন পর আবার বিবরণী বই দেখতে দেওয়া হলে এবার লিখলেন, 'কাকে বলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা?' (২২/১০০)।

বঙ্গবন্ধুর 'গোপন বিচার' চলার সময় "ইয়াহিয়া খানকে বিশ্বনেতৃবৃন্দ চাপ দিতে থাকেন, 'কোনোভাবেই যেন শেখ মুজিবের কোনো ক্ষতি করা না হয়। ফাঁসি দেওয়া না হয়'। বিশ্বজনমত গড়ে তোলার পেছনে অগ্রণী ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক মানুষও তাঁদের প্রিয় 'শেখ সাহাব'-এর কোনো রকম ক্ষতি হোক, তা চাননি। ৫ নভেম্বর ... পাকিস্তানের বিভিন্ন স্তরের ৪২জন ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে একটি আবেদনপত্রে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে শেখ মুজিবের দ্রুত এবং নিঃশর্ত মুক্তির আবেদন জানিয়েছেন। ... বিচার শুরুর আগে জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট নিজের উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল (শেখ মুজিবকে) 'বিবেকের বন্দী' বলে ঘোষণা করল। পাশ্চাত্যের 'জুরি কমিশন'ও বিচারের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। ... সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ ... ফারল্যান্ড স্টেট ডিপার্টমেন্টকে গোপন বার্তায় লিখলেন, 'আমরা ব্যক্তিগত আশ্বাস পেয়েছি যে, মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে না'। দেশবিদেশে চাপ বাড়তে থাকলে ইয়াহিয়া সুর পাল্টান। ৮ নভেম্বর ১৯৭১, 'নিউজউইক' ম্যাগাজিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে (ইয়াহিয়া) বলেন, 'আমাকে অনেকে বিশ্বাস নাও করতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, শেখ মুজিব যদি পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যান, তাহলে তাঁর নিজের জনগণই তাঁকে হত্যা করবে। কেন না তারা তাঁকেই তাদের দুঃখকষ্টের জন্য দায়ী করছে। ... কিন্তু জাতি যদি চায়, তাঁকে মুক্তি দিতে পারি। আমিও উদ্বিগ্ন" (২২/১০২-১০৩)।

সামরিক আদালতে মুজিবের মৃত্যুদন্ডের আশংকায় সৃষ্ট প্রবল বিশ্ব-জনমত ইয়াহিয়া হয়তো এড়িয়ে যেতেও পারতেন। কিন্তু মার্কিন সামরিক সহায়তার ওপর অতি-নির্ভরতার কারণে পাক-প্রেসিডেন্ট মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গীর গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারছিলেন না। Americans had reasons to be apprehensive that Mujib's execution after a secret trial would inflame the situation and make it impossible to reach a compromise settlement short of independence ... Along with trying to extract Yahya's promise not to execute Mujib, the Americans sought to negotiate a settlement between Pakistan and the rightist pro-American elements in the Bangladesh government-in-exile" (৭/২২৬)। জুন মাসেই নিক্সন প্রশাসন মুজিবের বিচারের ব্যাপারে ইয়াহিয়াকে অধিকতর নমনীয় এবং কুশলী পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিল। তবে মনে রাখা দরকার, ইয়াহিয়া রাজনীতিবিদ বা কুটনীতিবিদ ছিলেন না এবং সেনা-নায়ক হিসেবে তিনি সেনাবাহিনীর দিক থেকেও চাপে ছিলেন। তাই, মুজিবের বিচারের ব্যাপারে তাঁর পক্ষে যুক্তি-বুদ্ধি মেনে চলার কোনো উপায় ছিল না। ভুট্টোর চক্রান্তে এবং অপরাপর পাক-সেনাপতিদের উগ্রতা আর লোভের কারণে ইয়াহিয়া তখন নিজের অপকর্মের জালেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। বলা চলে, চলমান ঘটনার ওপর ইয়াহিয়ার নিয়ন্ত্রন ছিল না, বরং ঘটনাই তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করছিল।

সেনা-ট্রাইব্যুনালে বিচারের প্রেক্ষাপটে মুজিবের ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক অবস্থান প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদের পর্যবেক্ষণ : "মুজিব ছিলেন সত্যিকার অর্থেই নির্ভীক এবং আপোষহীন। তিনি বিচারে ভয় পাননি, অথবা আপোষ করতেও রাজি হননি। ... যখন মুজিবের বিচার হচ্ছিলো, ততো দিনে মুক্তিযুদ্ধের বয়স প্রায় ছ'মাস হয়ে গিয়েছিলো। বেশির ভাগ বাঙালি বাংলাদেশকে একটা বাস্তবতা বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তা সত্বেও মুজিব যদি ... পাকিস্তানের চাপে আপোষ করতে রাজি হয়ে যেতেন, তা হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো কিনা, সন্দেহ আছে। কিন্তু তিনি তাঁর সাহস বজায় রেখেছিলেন বলেই বাংলাদেশ বাস্তবতায় পরিণত হতে পেরেছিলো" (২০/১৩০-১৩১)। বঙ্গবন্ধু মুজিবের গভীর আস্থা ছিল, একটানা প্রায় ২৪বছরের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে তিনি বাঙালিকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে যে প্রত্যয়ী অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে তারা বিচ্যুত হবে না। মুজিব সম্পর্কে অনেকেই একটি কথা বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, মুজিব জনগণের 'পালস্' নির্ভুল পড়তে পারতেন।

মুজিবের বিচার সম্পর্কে মে. জে. খলিলুর রহমানের মন্তব্য : "মানবেতিহাসের হাস্যকর এই বিচারকার্য দীর্ঘস্থায়ী হযনি। প্রযোজনও ছিল না" (১০/১০৯)।"১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর, প্রহসনের আদালতে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত যখন মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন, তখনো বঙ্গবন্ধু শান্ত। শুধু সামরিক কর্তাদের বললেন, 'আমার কবরটা যেন বাংলাদেশে হয়'। বিচারের রায় ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুর কারাগার থেকে মিয়ানওয়ালি কারাগারে স্থানান্তর করা হলো। সেখানে সাধারণ কয়েদিরা হাতের কাছে যা পেল, তা-ই দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হয়। উপায়ান্তর না দেখে, কয়েকজন কারারক্ষী ফাঁকা গুলি করে তাদের থামালেন। ... পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিচারণা, 'ইয়াহিয়া খানের আসল উদ্দেশ্য ছিল, ভোরবেলায় সাধারণ কয়েদিদের দিয়ে আক্রমণ করে হত্যা করানো'। মিয়ানওয়ালি কারাগারের যে সেলে প্রথমে রাখা হয়েছিল, ওই ঘরটার সামনে কবর আকৃতির একটি গর্ত খোঁড়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু দেখলেন, 'এই আমার কবর" (২২/১০৩-১০৪)।

পাকিস্তানের সেনা-কারাগারে কর্মরত হাবিব আলী বঙ্গবন্ধু প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণে বলেছেন, "বন্দী থাকা অবস্থায় বিচারকাজ চলাকালীন অবস্থায় তোমাদের নেতার মুখ থেকে আমরা একটা কথাও বের করতে পারিনি। তোমরা মহা সৌভাগ্যবান এই জন্য যে, এমন একজন নেতা পেয়েছ। যিনি সত্যিই মহান। কারাগারের পাশে কবর খোঁড়া হয়েছিল, আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আত্মপক্ষ সমর্থন বা অন্তিম কোনো ইচ্ছা তোমার আছে কি না? উত্তরে বলেছিলেন, 'আমার একমাত্র ইচ্ছা, আমার লাশটা যেন প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে পাঠানো হয়" (২২/১০৮-১০৯)। "একবার নয়, তিনবার তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনবারই তাঁর ফাঁসি কার্যকর করার প্রয়াস স্থগিত হয়। শেষবার কবর খোঁড়া হয়েছিলো ১৫ই ডিসেম্বর, যেদিন তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার জন্যে ইয়াহিয়া আদেশ দিয়েছিলেন। (কিন্তু পূর্ব বাংলায় পাক-বাহিনীর) আত্মসমর্পনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে যে-সংশয় দেখা দেয়, তার ফলে ফাঁসি যাদের দেবার কথা, তাদের কিছুটা দেরি হয়ে যায়। সেই সুযোগে দয়ালু জেলার মুজিবকে লুকিয়ে

নিয়ে যান নিজের বাড়িতে। তিনি শুনেছিলেন যে, ইয়াহিয়া পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। এই জেলার তাঁকে নিজ বাড়িতে রাখেন দু'দিন। তারপর এক কলোনিতে পাঁচ-ছ' দিন। ১৯৭৪ সালে ভুট্টো যখন ঢাকায় আসেন, তখন মুজিব এই জেলারকেও আসার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন" (২০/১৩১)।

একাত্তরে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ঃ
বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতি সত্বেও বঙ্গবন্ধুময়

১৯৪৭এ পাকিস্তান নামক অ-স্বাভাবাবিক রাষ্ট্রটির সৃষ্টি-পর্বে "আমাদের পিতৃ-প্রজন্ম একটি মারাত্মক ভুল করেছিলেন বা প্রতারিত হয়েছিলেন অথবা শিকার হয়েছিলেন দুটোরই। তারা 'পূর্ববঙ্গ'কে পাকিস্তানের অংশ করে 'পূর্ব পাকিস্তান' বানিয়ে ফেলেছিলেন"। 'বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৭২-১৯৭৫' গ্রন্থের লেখক হালিম দাদ খানের মন্তব্য, সেই ভুল বা প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে এদেশের মানুষের আদৌ বেশি সময় লাগেনি। "ফলে মাত্র দুই যুগ কাল পার হতে না-হতেই আমাদের প্রজন্ম ১৯৭১ সালে পূর্বপুরুষের ভুলের মাশুল কড়ায়-গন্ডায় শোধ করে প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন সার্বভৌম 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্র" (২৪/৭)। এ দু'টি প্রজন্মের মাঝে যোগসূত্র বা অনস্বীকার্য পথ-প্রদর্শক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, -যিনি প্রকৃতপক্ষেই ছিলেন অনেকের মাঝে অনন্য একজন।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সূচিন্তিত মন্তব্য, "হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী,এ কে ফজলুল হকের মত অভিজ্ঞ নেতারাও অনেক অবদান রেখেছেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ হয়েও একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। একথা অস্বীকার করা যাবে না"। অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ, লিখেছেন, "ওই রাজনীতিক আকাশে একটিই নক্ষত্র ছিল, তাঁর নাম ... শেখ মুজিব। ... তাঁর সঙ্গে তূলনীয় আর কোন বাঙালি রাজনীতিবিদ নেই। ... তাঁর পাশে অগ্রজরা মাঝারি,অনুজরা তুচ্ছ ... । তিনি শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতি করেননি, তিনি যুগান্তর ঘটানোর রাজনীতি করেছেন"। সেই যুগান্তর সাধিত হয়েছে একাত্তরের স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে "যোদ্ধা মুজিবের চেয়ে বন্দী মুজিব ছিলেন অনেক শক্তিশালী ও প্রেরণাদায়ক; ... সমগ্র বাঙালির রূপ ধরে তিনিই করে চলেছিলেন মুক্তিযুদ্ধ। ... প্রতিটি বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাই ছিল মুজিবের দ্বিতীয় সত্তা"। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি সম্পর্কে যার ধারণা-অভিজ্ঞতা আছে, তাঁকেই মানতে হবে যে, হুমায়ুন আজাদের উদ্ধৃত বক্তব্যে ইতিহাসই কথা বলেছে, হয়তো কিছুটা আবেগের ভাষায়।

২৫ মার্চ রাতেই নিজ নিজ বাসস্থান ছেড়ে তাজউদ্দিন ও আমীর-উল ইসলাম ঢাকা ছেড়েছিলেন ২৭ মার্চ এবং তাঁরা চুয়াডাঙ্গায় ভারত-সীমান্তে পৌঁছেছিলেন ৩০মার্চ - একথা আগেই বলা হয়েছে। "পলায়নী মনোবৃত্তি নিয়ে নয়, স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকারের প্রতিনিধির মর্যাদা নিয়ে প্রতিবেশী দেশে প্রবেশের ইচ্ছায়, সাথে আসা মেহেরপুরের মহকুমা প্রশাসক তওফিক ইলাহী ও ঝিনাইদহের এসডিপিও মাহবুব

উদ্দিনকে সীমান্তের ওপারে পাঠানো হয়। কয়েক ঘন্টা পর ওপার থেকে কয়েকজন এসে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে যথোপযুক্ত সম্মান দিয়ে তাঁদের ছাউনিতে নিয়ে যায় এবং সাথে সাথে দিল্লির সাথে যোগাযোগ করে। রাত আটটার দিকে বিএসএফ'র ('বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স') আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদার ছাউনিতে এসে তাঁদের দু'জনকে নিয়ে জিপ চালিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছেন। ... দিল্লি থেকে আসা একটি বিমান থেকে নেমে বিএসএফ-প্রধান রুস্তমজী সোজা তাঁদের নিয়ে গাড়িতে উঠেন। ... 'আসাম হাউসে' (কলকাতা) ... তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ... গভীর রাতে শুরু হয় বৈঠক। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যসহ নেতাদের একটি তালিকা তৈরি ও সম্ভাব্য অবস্থানের উল্লেখ করে তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়িতে প্রেরণ করা হয়" (২৪/১৬)।

আওয়ামী লীগ হাই-কমান্ডের (বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুল, কামারুজ্জামান এবং মোশতাক সমন্বয়ে গঠিত) অন্যতম সদস্য হিসেবে ভারতে পৌঁছার পরই তাজউদ্দিন উপলব্ধি করলেন যে, পরবর্তী সকল কার্যক্রমের পরিকল্পনা করার আগেই, যত শীঘ্র সম্ভব প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ এবং আলোচনা করা দরকার। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় একটা কার্গো-বিমানে করে তাজউদ্দিন এবং আমীর-উল ইসলাম ১এপ্রিল তারিখে নয়া দিল্লি পৌঁছালেন। দিল্লিতেই তাঁরা দেখা পেলেন চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. আর. সিদ্দিকীর, যিনি আগরতলা থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করেই দিল্লি এসেছিলেন। সিদ্দিকীও ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাজউদ্দিন আহমদকে পরামর্শ দিলেন।

সমকালীন পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিক বর্ণণায় আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ লিখেছেন, "আজকে স্বাধীনতার ইতিহাস অনেকেই বিকৃত করে। অথচ কী সুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন। একাত্তরের ১৮ ফেব্রুয়ারি আমাদের চারজন - শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক ও আমাকে বঙ্গবন্ধু ডাকেন ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে। বঙ্গবন্ধু আমাদেরে বলেন 'পড়ো, মুখস্থ করো'। আমরা মুখস্থ করলাম একটি ঠিকানা - '২১ রাজেন্দ্র রোড, নর্দার্ন পার্ক, ভবানীপুর, কলকাতা'। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এইখানে হবে তোমাদের জায়গা। ভুট্টো-ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। পাকিস্তানিরা বাঙালিদের ক্ষমতা দেবে না। আমি নিশ্চিত ওরা আক্রমণ করবে। আক্রান্ত হলে এখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধ করতে হবে" ('জেল হত্যার স্মৃতি// জাতীয় চার নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি', 'প্রথম আলো, ৩-১১-'১২ইং)। এ তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতেই পারে, বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া-ভুট্টোর প্রতারণার দিকটা বুঝতে পারেননি, সরল-বিশ্বাসে আশাবাদী হয়ে নিষ্ক্রিয় ছিলেন এবং 'আসন্ন এবং অবশ্যম্ভাবী' যুদ্ধের জন্য কোনো প্রস্তুতিই গ্রহণ করেন নি, যারা এসব কথা বলেন, তাঁরা হয় অজ্ঞ নয়তো 'জ্ঞানপাপী'।

তাজউদ্দিনের স্বাভাবিক দুশ্চিন্তা ছিল, তিনি কোন পরিচয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন? বঙ্গবন্ধু মুজিব গ্রেফতার হয়ে গেছেন কিনা, আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের অপরাপর নেতারা কোথায় আছেন, কিছুই তাঁর জানা নেই। তবে "He

was clear in his mind that he must project the image of Sheikh Mujib in a positive light" (৭/২০৭)। এপ্রিল ৩, ১৯৭১ইং প্রথম সাক্ষাতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী প্রথমেই তাজউদ্দিনের কাছে শেখ মুজিবের কথা জানতে চেয়েছিলেন, তিনি কি ভালো আছেন? তাজউদ্দিন নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মতই বলেছিলেন, ২৫ মার্চের পর থেকে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হয়নি। তবে ধারণা করি তিনিই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমি তাঁর নির্দেশিত কাজই করে চলেছি। তাজউদ্দিন আহমদ আলোচনায় ইন্দিরা গান্ধীকে একথাও জানিয়েছিলেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এবং স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্তই অব্যাহত থাকবে। তিনি অস্ত্র-সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা পাবার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছিলেন। একান্ত মানবিক চিন্তাতেই তিনি, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত পেরিয়ে আসা বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুদেরকে আশ্রয় এবং খাদ্যসহ সহায়ক সামগ্রী প্রদানের জন্যও ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক আবেগ বশতই "বাংলাদেশের নেতারা আশা করেছিলেন যে, ভারত প্রথমেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সরকার গঠিত হযনি। সে জন্যে প্রথমে স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করা হয় ১০ই এপ্রিল। এতে বাংলাদেশের নাম দেওয়া হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। সরকারও গঠিত হয় একই দিনে। এই ঘোষণায় শেখ মুজিবকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি। কিন্তু অস্থায়ি রাষ্ট্রপতি হিসেবে থাকেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দিন আহমদ। আর তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী ছিলেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং খন্দকার মোশতাক। এই ঘোষণার খবর প্রথমে আকাশবাণী শিলিগুড়ি ... তারপর প্রচারিত হয় আকাশবাণীর অন্যান্য কেন্দ্র থেকে। সাতদিন পরে, ১৭এপ্রিল ১৯৭১ইং বাংলাদেশের মেহেরপুরের মুক্তাঞ্চলে - বৈদ্যনাথতলায়- নির্বাসিত সরকার শপথ গ্রহণ করে। এই জায়গার নাম দেওয়া হয় মুজিবনগর" (২০/১০৪)। সে দিনই কর্ণেল এম.এ.জি ওসমানীকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সেনা-প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের 'প্রবাসী সরকার'গঠন সম্পর্কে প্রায় অনালোচিত কিন্তু একান্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই উল্লেখ করা অপরিহার্য বিবেচনা করা চলে। ৪এপ্রিল ১৯৭১ইং দিল্লিতে ইন্দিরা-তাজউদ্দিন প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠানের আগেই ৩১মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল "সরকার গঠিত হয়েছে জানতে পারলে পূর্ব বাংলার জনগণের সংগ্রামকে সাহায্য করার কথা বিবেচনা করা হবে"। ইন্দিরা-তাজউদ্দিন বৈঠকের পরই প্রবাসী সরকার গঠনের প্রশ্নটি জরুরী হয়ে পড়ে। "সরকার ছাড়া কাজে এগোনো যাচ্ছে না। আ.লীগের নেতারা কে কোথায় আছেন জানা নেই। অথচ সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে"। এমন পরিস্থিতিতে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম পরামর্শ দিলেন "২৫শে মার্চের পর থেকে যিনি দায়িত্ব পালন করে আসছেন" সেই তাজউদ্দিনকেই প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে হবে। ৫ এপ্রিল তাজউদ্দিন-ইন্দিরা দ্বিতীয় বৈঠকে "বংলাদেশের গঠিতব্য সরকারকে ভারতের মাটিতে গোপন অবস্থানে ইন্দিরা সম্মতি দেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, শরণার্থী আশ্রয় ও

খাদ্যের ব্যবস্থা এবং একটি বেতার স্টেশন স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়। নেতাদের খোঁজখবর নেবার জন্য একটি ছোট বিমানের ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধে সহায়তা করার জন্য জেনারেল (অব) নগেন্দ্র সিংকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়" (২৪/১৬-১৭)। এখানে প্রসঙ্গতই স্মরণীয় যে, অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিকেই বঙ্গবন্ধু পাঁচ-সদস্য বিশিষ্ট 'হাই কমান্ড' গঠন করেছিলেন এবং "তাজউদ্দিন আহমদকে 'কর্মসূচী বাস্তবায়নের' দায়িত্ব দেয়া হয় এবং ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামকে করা হয় তার সাহায্যকারী" (২৪/১৩)। সুতরাং বাস্তব পরিস্থিতির প্রয়োজন স্বীকার করলে, মানতেই হয়, এ-বিষয়ে যারা যতই বিরূপতা-বিতর্ক তুলুন না কেন, তাজউদ্দিন-আমীর কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তটি ছিল কর্তৃত্বশীল, সঠিক এবং একান্তই সময়োচিত।

দিল্লিতেই 'প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন'এর একটি ভাষণ রেকর্ড করে বাংলাদেশের কোনো সীমান্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করার দায়িত্ব দেয়া হয় বিএসএফ'র আঞ্চলিক প্রধান গোলক মজুমদারকে। ৮ এপ্রিল কোলকাতায় ফিরেই তাঁরা দেখলেন অনেক নেতাই কোলকাতায় পৌঁছে গেছেন এবং 'ক্ষমতার দ্বন্দ্বের' আভাসও পেলেন। ইতোমধ্যে "একথা রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল যে, তাজউদ্দিন নিজেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পরিচয় দিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। ... 'অসন্তুষ্ট' দলীয় নেতাকর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের ... কামরুজ্জামানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ... বৈঠকের সাধারণ অভিমত, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্যই দিল্লি যাওয়া হয়েছে। এত তাড়াহুড়া করে দিল্লি না গিয়ে ... হাই কমান্ডের সদস্যদের আসার জন্য অপেক্ষা করা উচিত ছিল। ... তাজউদ্দিনের জন্য খুবই বিব্রতকর। তাজউদ্দিন-আমীর-উল কামরুজ্জামানের সাথে সাক্ষাৎ করে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা বলেন"। এজন্য রাতে লর্ড সিনহা রোডে অনুষ্ঠিত বৈঠকে শেখ ফজলুল হক মণি বলেন : "স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শত্রু শিবিরে বন্দী, বাংলার যুবকেরা বুকের তাজা রক্ত দিচ্ছে, এখন কোনো মন্ত্রীসভা গঠন করা চলবে না। মন্ত্রী মন্ত্রী খেলা এখন সাজে না। এখন যুদ্ধের সময়। সকলকে রণক্ষেত্রে যেতে হবে। রণক্ষেত্রে উঠে আসবে আসল নেতৃত্ব। এই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করতে হবে'। বৈঠকে "উপস্থিত প্রায় সকলেই শেখ মণির বক্তব্য সমর্থন করেন"।

বক্তব্যটি যেহেতু তাজউদ্দিনকে উদ্দেশ্য করে, তাই তাঁর পক্ষে পাল্টা জবাব দেয়া শোভন নয় ভেবে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম বলেছিলেন : "দিল্লি যাত্রার পূর্বে আমাদের জানা ছিলনা কারা বেঁচে অছেন এবং কাকে কোথায় পাওয়া যাবে। ... ইন্দিরা গান্ধীর সাথে তাজউদ্দিন ... দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কথা বলেছেন। দলের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ... কথা বলার এখতিয়ার তাজউদ্দিন ভাইয়ের রয়েছে। ... আমরা বঙ্গবন্ধুর নিয়োজিত হাইকমান্ড নিয়ে অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীসভা গঠনের পরিকল্পনা করেছি মাত্র। ... বাংলাদেশ বারো ভুঁইয়ার দেশ। বারোটি বিপ্লবী কাউন্সিল গড়ে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। আমাদের অবশ্যই আইনসঙ্গত সরকার দরকার। ... আইনসঙ্গত সরকার ছাড়া কোনো বিদেশী রাষ্ট্র আমাদের সাহায্য করবে না। ...

স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অধিকার একটি আন্তর্জাতিক নীতি। ... পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলার মানুষের সে গণতান্ত্রিক অধিকারের অবমাননা করেছে। ... শেখ মণির প্রস্তাবিত বিপ্লবী কাউন্সিল যদি বিভিন্ন মতাবলম্বীরা দুইটি, পাঁচটি বা সাতটি গঠন করে তাহলে জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধারা কোনটির আদেশ মেনে চলবে না। কোন কাউন্সিলের সাথে বিদেশী সরকার সহযোগিতা করবে? ... সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকারই হচ্ছে জনগণর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আজকে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে অন্য কান বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করা হলে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করা হবে"।

"আমীর-উল-ইসলামের বক্তব্যের পর মিজান চৌধুরী ও শেখ মণি ছাড়া উপস্থিত সকলে তাঁদের পূর্বের মনোভাব পরিবর্তন করেন। ... সর্বশেষ তাজউদ্দিন বক্তৃতা দেন। উপস্থিত সকলে সরকার গঠন সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্য মেনে নেন। একটা বড় বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তিযুদ্ধ রক্ষা পায়। ... বিকালে (কোলকাতা থেকে রওনা হয়ে) বাগডোগরা বন্দরে বিমান থেকে নেমে সকলে (তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, শেখ মণি, তোফায়েল আহমেদ, আমঅর-উল ও নগেন্দ্র সিং) জিপে শিলিগুড়ি শহর যান। ... সীমান্তের খুব কাছে ... গোলক মজুমদার তাদের অভ্যর্থনা জানন। এখানে কোনো একটি জঙ্গল থেকে গোপন বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে তাজউদ্দিনের ঐ টেপকৃত ভাষণ প্রচারিত হবে। ... আনুপূর্বিক ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করে (আমীর-উল-ইসলারে সাথে একান্ত আলোচনায়) মনসুর আলী অভিমত দেন যে, 'তাজউদ্দিন আহমদের রাজনৈতিক আচরণ ও নৈতিকতা ঠিক হয়নি। তবু বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীরূপে তাজউদ্দিনকে মেনে নয়া ব্যতিত গত্যন্তর নেই'। ... 'হাই কমান্ডের' পাঁচজনের মধ্যে তিনজন সম্মত হওয়ায় ধারণা করা হয়, তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীরূপে মেনে নিতে প্রস্তাবিত উপরাষ্ট্রপতি তথা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাস আপত্তি করবেন না। আর চারজন একমত হলে খন্দকার মোশতাককেও রজি করানো সম্ভব হবে"।

"এবার প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রচারের পালা। ... কিন্তু বাদ সাধলেন শেখ মণি। ... অন্যথায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। ... আবার এগিয়ে এলেন ব্যারিস্ট্যার আমীর-উল-ইসলাম। তাঁর ভাষায় : "আমি সরকার গঠনের পক্ষে যুক্তি দিলাম। ... সরকার গঠন করতে বিলম্ব হলে সংকট আরো বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। ... মনসুর ভাই ও কামরুজ্জামান ভাই তাজউদ্দিন ভাইকে প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়েছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও খন্দকার মোশতাক আহমদের তখনো দেখা নেই। তাঁরা কোথায়, কী অবস্থায় আছেন, সে খবর এখনো আসেনি। ইতিমধ্যে বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে আমাদের কিছুটা রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সরকার গঠনে বিলম্ব হলে তাও নস্যাৎ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ... আমাদের মধ্যে যে কোন্দল রয়েছে কোনো অবস্থাতেই তা বাইরে প্রকাশ হতে দেয়া উচিত নয়। ... আমার এসব কথা শেখ মণি মানতে রাজি নন। ... শেখ মণি জানান, 'তারা বঙ্গবন্ধু থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। অতএব তাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। ... তাজউদ্দিন ভাই আমাকে বললেন, আমি যেন গোলক মজুমদারকে জানিয়ে দেই যে, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা আজ প্রচার করা হবে না। এ-ব্যাপারে পরবতী সিদ্ধান্ত তাঁকে যথাসময়ে জানানো হবে। ...

একথা শুনে তিনি (গোলক মজুমদার) যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ... পাল্টা প্রশ্ন করেন, বিলম্ব করা কি ঠিক হবে? ... যে মুহূর্তে সবকিছু ঠিক-ঠাক ... স্থগিদ রাখলে সব মহলে যে প্রশ্ন দেখা দেবে, তা আমরা ভেবে দেখেছি কিনা। ইতিমধ্যে ক্যাসেট নির্ধারিত স্থানে (জঙ্গলে) পৌঁছে গেছে"।

"আমি (আমীর-উল) ... বললাম, ক্যাসেট যদি পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে প্রচার করে দিন। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই একটিমাত্র সিদ্ধান্ত এককভাবে নিয়েছিলাম। এই দিন ছিল দশই এপ্রিল। ... খাওয়ার টেবিলে তাজউদ্দিন ভাই ও শেখ মণি আছেন। রাত তখন সাড়ে ন'টা। ... প্রথমে (রেডিওতে) আমার কণ্ঠ ভেসে আসল। ... বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদ বক্তৃতা দেবেন। ... সারা বিশ্ববাসী শুনল স্বাধীন বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা। আমাদের সংগ্রামের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল"।

পরদিন ১১ এপ্রিল ... বিমান উড়িয়ে দু'দেশের সীমান্ত সংলগ্ন বন্দরে নেমে নেমে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের খোঁজ নিতে গিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আব্দুল মান্নানকে (টাঙ্গাইল) পাওয়া যায় এবং সকলে আগরতলা পৌঁছেন। সীমান্তবর্তী বিমনবন্দরেই তাজউদ্দিন সৈয়দ নজরুলকে একান্তে গতদিনগুলোর ঘটনাবলী অবহিত করেন। তিনি সব জেনে খুশি হন এবং তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোবারকবাদ জানান। ... কর্ণেল ওসমানী, খন্দকার মোশতাক, এম আর সিদ্দিকী, জহুর আহমদ চৌধুরী, আদুস সামাদ আজাদ, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর, মাহবুব আলম চাষীসহ অনেক নেতাকর্মী আগরতলা এসে পৌঁছেছেন। ... মোশতাক খুবই মনক্ষুন্ন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার হিসেবে তার নাম প্রস্তাবিত ছিল। নিজেকে তিনি সবসময় সিনিয়র আওয়ামী লীগার ভাবতেন। তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী। ... তিনি খেদের সাথে বলেন, তাকে যেন মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং মৃত্যুর পর লাশ যেন বাংলদেশে ফিরিয়ে আনা হয়। ... অবশেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পাওয়ার শর্তে তিনি থাকতে রাজি হন। বৈঠকে ইতোমধ্যে নেয়া সকল পদক্ষেপ অনুমোদন নেয়া হয়। ... এই বৈঠকের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভবিষ্যৎ। নেতৃবৃন্দ এ বৈঠকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের উর্ধে উঠে জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় বিচক্ষণতার পরিচয় দেন" (২৪/১৬-২১)।

প্রায়শ নানাসূত্রেই প্রবাসী সরকারের অভ্যন্তরীণ নানা টানাপড়েন-মতভেদের কথা উল্লেখ করা হয়। আজ এতকাল পরে পেছন ফিরে তাকিয়েও বলতে চাই, এটা কোনো অবান্তর-অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল না। বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করেই বিপুল-বিশাল গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগে বহুমুখী মত-পথের রাজনীতিবিদেরা সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের কেউ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ অনুগামী ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতিয়তাবাদে আস্থাশীল, কারো বিশ্বাস ছিল ধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদে। সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসীরা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন পুঁজিবাদের সমর্থকরাও। কেউ ছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রত্যক্ষ স্বজন, আবার কেউ ছিলেন সুযোগসন্ধানী প্রতিপক্ষও। যেকোনো বড় দলের ভেতরে যেমন অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার টানাপড়েন থাকে, তেমনি ছিল

আওয়ামী লীগেও। এসব কথা মনে রাখলে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সংকট এবং সংবেদনশীল মতভিন্নতার কারণগুলো যেমন উপলব্ধি করা যাবে, তেমনি সহজ হবে স্বাধীনতা-উত্তর মত-পথের সংকট-সংঘাত-বিভ্রান্তির কারণগুলি উপলব্ধি করাও। তবু এতকাল পরেও বলতে চাই, তাজউদ্দিন-আমীর-উল-ইসলাম সেদিন সময়োচিত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিলম্বিত, এমনকি বিঘ্নিতও হতে পারতো। একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দিয়েই প্রসঙ্গটির ইতি টানতে চাই। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন কি মুক্তিযুদ্ধের সংকটময় সময়ে কখনো বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন?

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একদিকে যখন সেনা-কারাগারে ইয়াহিয়ার নির্দেশিত বিচার চলছে মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের লক্ষ্যে, আরেকদিকে তখন পাকিস্তান সরকারের সাথে বাংলাদেশের প্রবাসী-সরকারের সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পিত মার্কিন কুটনৈতিক তৎপরতা শুরু করা হয়েছিল। "George Griffith, a junior official in the American Consulate in Calcutta was put in charge of making contacts with Mushtaque Ahmed, the Bangladesh Foregn Minister, for this purpose. আমেরিকানদের স্বাভাবিক ধারণা ছিল, রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে তাজউদ্দিনের বিরোধী হওয়ার কারণে মোশতাক পাকিস্তানের সাথে আপোষ করার ব্যাপারে মার্কিন প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে স্বভাবতই রাজি হবেন" (৭/২২৬-২২৭)।

মার্কিন পরিকল্পনা মোতাবেক মোশতাক যুক্তি দাঁড় করালেন, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মুজিবের জীবন রক্ষার বিষয়টিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। মোশতাক সরাসরি একথাও বললেন যে, মুজিবের জীবন আর বাংলাদেশের স্বাধীনতার মধ্যে এখন যেকোনো একটিকেই বেছে নিতে হবে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম কিংবা তাজউদ্দিনের সাথে আলোচনা ছাড়াই মোশতাক এবং কুমিল্লার এম.এন.এ জহিরুল কাইয়ুম মার্কিন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন। মার্কিন কুটনীতিকেরা সকলেই ভারতীয় গেয়েন্দা নজরদারিতে থাকায় এসব যোগাযোগের কথা ভারতীয় কর্তৃপক্ষও জেনে গিয়েছিলেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করলেন, আওয়ামী লীগে ভাঙ্গন ধরানোই মোশতাক-মার্কিন চক্রের লক্ষ্য। মাহবুবুল আলম চৌধুরী বলছেন, "বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে যে ... সরকার গঠন করা হয়ছিল কোলকাতায়, তারমধ্যে আওয়ামী লীগের নানা লবির লোক ছিল। ... মুক্তিযুদ্ধের নানা ধারাকে সমন্বিত করতে খুব বেগ পেতে হয়েছিল তাজউদ্দিনকে। বঙ্গবন্ধু তখন যদি সশরীরে রাষ্ট্রপতি এবং সর্বাধিনায়ক হিসেবে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন, তাহলে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের অভিঘাতে ... প্রতিহত করতে পারতেন স্বাধীনতাবিরোধীদের ষড়যন্ত্র। তাজউদ্দিনের মন্ত্রীসভায় এবং প্রশাসনে এমন কিছু লোক ছিল, তাদের আমেরিকার এজেন্ট বলাই সঙ্গত। এই লবির নেতৃত্বে ছিলেন খন্দকার মোশতাক-মাহবুবুল আলম চাষী প্রমুখ। তারা ... আমেরিকান লবির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং ... পাকিস্তানের উভয় অংশের কনফেডারেশন করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। ভেতরে ভেতরে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হন" (১(৩)/১৪২০-১৪২১)।

"এরকম একটি আশ্রয়দাতা, সাহায্যদাতা, বন্ধুপ্রতিম দেশের বিরুদ্ধে এরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। ভারতীয় গোয়েন্দারা এ ব্যাপারে তাজউদ্দিনকে জানালে ... মোশতাককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না দিয়ে কার্যত নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন এবং ... চাষীর বিভিন্ন দলিলে সই করার ক্ষমতা তুলে নিয়ে পররাষ্টমন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার আবুল ফতেহকে প্রদান করেছিলেন। এ নিয়ে তাজউদ্দিন ও খন্দকার মোশতাকের মধ্যে শুরু হয় প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব। একদিন মন্ত্রীসভার বৈঠকে ... মোশতাক বলেন, আমরা যদি কনফেডারেশনে রাজি না হই, তাহলে বঙ্গবন্ধুকে দু'চার দিনের মধ্যে হত্যা করা হবে। ... রাগত স্বরে তাজউদ্দিন বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন যেমন আমাদের কাছে মূল্যবান, তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাও ... কম মূল্যবান নয় (১(৩)/১৪২১)। প্রসঙ্গতই স্মরণীয়, ২৫ মার্চ পাক-বাহিনী গণহত্যা শুরুর ঠিক আগেও বঙ্গবন্ধু স্বজন-সহকর্মী এমনকি কন্যা শেখ হাসিনার অনুরোধেও পালিয়ে যেতে রাজি হননি। সবাইকে বলেছেন, পাক-সেনারা যদি তাঁকে মেরেও ফেলে, তাহলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই। সেই শেখ মুজিব, মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যায়ে, নিজের জীবন বাঁচাতে পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন গঠনে সম্মত হতেন ভাবতে হলে, বঙ্গবন্ধুর সাহস-ব্যক্তিত্ব এবং রাজনৈতিক আপোষহীনতা সম্পর্কেই বিশ্বাস হারাতে হয়। সুতরাং এখানে স্মরণীয় একমাত্র কথাটি হচ্ছে, সপরিবারে বঙ্গবন্ধু-হত্যার যে দুষ্কর্মটি পাকিস্তানিরা করতে পারেনি, পেরেছিল কতিপয় বিপথগামী, বিশ্বাসঘাতক বাঙালি, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন খন্দকার মোশতাক।

আওয়ামী লীগের ভেতরে প্রবাসী সরকার বিরোধী আরেকটি লাইনের খবরও ভারত সরকারের জানা ছিল। "এই বিরোধিতা করেন শেখ মুজিবের একান্ত অনুগত তরুণ নেতারা। তাঁদের মধ্যে শেখ ফজলুল হক মণিই ছিলেন প্রধান। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, তাঁরাই মুজিবের সত্যিকার প্রতিনিধি। সুতরাং নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন প্রমুখের মন্ত্রীসভা গঠন করার কেনো বৈধতা নেই। সরকার গঠনের সময় থেকে দলাদলি শুরু হয় বাংলাদেশের অন্য রাজনীতিকদের মধ্যেও। অনেকে তাজউদ্দিনকে অপছন্দ করতেন। তাঁরা মনে করতেন, তিনি ভারতপন্থী। অনেকে আবার নিজেদের গণ্য করতেন তাজউদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিশেষ করে খন্দকার মোশতাক এবং মুজিবের কয়েকজন স্বজন। ... এই যুদ্ধ যে কেবল আওয়ামী লীগের - তাঁরা এটা দেখাতেও আগ্রহী ছিলেন। তাই বামপন্থী দলগুলোকে তাঁরা দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। ... এই দলীয়করণে ভারত সরকারও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। ... ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ২০শে এপ্রিলই আওয়ামী লীগের (মুজিবপন্থী) কট্টর সমর্থকদের নিয়ে 'মুজিব বাহিনী' গঠন করে। এই বাহিনীর নেতা ছিলেন শেখ মণি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আব্দুর রব এবং শাহজাহান সিরাজ। ভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে এই বাহিনীকে ... প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ... রাখা হয় বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ... বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যেসব গ্রন্থ লেখা হয়েছে, তা থেকে এদের সক্রিয় ভূমিকার কথা জানা যায় না। এদের প্রধান কাজ ছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে। এই বাহিনীর যেটুকু তৎপরতার

কথা জানা যায়, তা নভেম্বর-ডিসেম্বর যুদ্ধের সময়। তখন স্বাধীনতা একেবারে দোরগোড়ায় এসে গিয়েছিলো" (২০/১০৫-১০৬)।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের নিউইয়র্ক যাবার কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সহায়ক ভারতের গোয়েন্দা এবং কুটনীতিক সূত্রে আপত্তি তোলা হয়। তাঁরা ভাবতেন, নিউইয়র্কে যাবার সুযোগ পেলেই মোশতাক পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করে এমন কোনো 'স্টেটমেন্ট' দিতে পারেন, যাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বাধাগ্রস্থ হয় এবং মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য ভারতও বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। সুতরাং ভারত প্রস্তাব দিয়েছিল, মোশতাকের পরিবর্তে আব্দুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী করা হোক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ভাবলেন, এতে করে, আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ মতভেদের বিষয়টি প্রকটভাবেই প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি এক্ষেত্রে কুশলী উদ্যোগ নিয়ে, মোশতাকের নিউইয়র্ক যাওয়া বন্ধ করে, জাতিসংঘে সাধারণ অধিবেশনের সময় প্রচারণার দায়িত্ব দিলেন, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে লন্ডনে কর্মরত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে।

স্বাধীনতার পরে, ঢাকায় ফিরেই তাজউদ্দিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে খন্দকার মোশতাককে সরিয়ে দিয়েছিলেন। "Mushtaque nursed his grievence against Tajuddin and was probably able to convince Mujib later that he (Mushtaque) , more than any other Awami Leaguer in the `Mujibnagar Government', was concerned about Mujib's fate and had done his best to save his (Mujib's) life" (৭/২২৭)।

প্রবাসী সরকারের সারাটা সময়জুড়েই "মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি রাজনীতির অঙ্গনেও ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে। ... এমনকি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশকে নিয়ে কম লড়াই হযনি। বাংলাদেশ সরকারের ভেতরে অক্টোবর মাস নাগাদ তাজউদ্দিন-বিরোধিতা খানিকটা কমে যায়। তবে খন্দকার মোশতাক তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে চক্রান্ত করতে থাকেন পাকিস্তানকে আবার জোড়া লাগানোর। এর সূচনা হয় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে। ... একটা ফেডারেশন গঠনের মধ্য দিয়ে, এই সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা, তারই চেষ্টা করছিলো যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন সরকার। তাজউদ্দিন-বিরোধী গোষ্ঠী এবং মুজিব বাহিনীর সমর্থকেরা এই প্রয়াসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকেন। তাঁরা মোশতাকের ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন কিনা, তা অবশ্য জানা যায় না" (২০/১২৯)। তোফায়েল আহমেদ উল্লেখ করেছেন, "মুক্তিযুদ্ধের এক পর্যায়ে মুজিব বাহিনীর সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের ভুল বোঝুবুঝির চেষ্টা হয়েছিল। জাতীয় নেতৃবৃন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সব ভুল-বোঝাবুঝি দূর করে প্রিয় মাতৃভূমিকে আমরা স্বাধীন করেছি" ('প্রথম আলো' ৩-১১-'১২)।

প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নামে, তাঁকেই 'অনুপস্থিত রাষ্ট্রপতি' ঘোষণা করে। খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেয়ে বড় করে সামনে

এনেছিলেন বঙ্গবন্ধুর প্রাণরক্ষার বিষয়টি। আর ভারত সরকার আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বঙ্গবন্ধুকেই উপস্থাপন করছিলেন রাষ্ট্র-ক্ষমতার বৈধ অধিকারী হিসেবে। লড়াইয়ের ময়দানে মুক্তিযোদ্ধারা স্লোগান দিতেন, 'জয় বঙ্গবন্ধু', 'জয় বাংলা' বলে। বিশ্ব-শক্তিধর দেশগুলির যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি নির্মোহ থাকেননি, আদর্শের প্রশ্নে কিংবা আপন রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-চিন্তায় তাঁরাও পরিকল্পনা সাজাতেন মুজিবকেই কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে। অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল পক্ষের কাছে বঙ্গবন্ধুই ছিলেন মৌলিক প্রেরণার উৎস বা প্রধান বিবেচ্য। আর এরকম বিভিন্ন দিক থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর শারিরীক অনুপস্থিতি সত্বেও ছিল বঙ্গবন্ধুময়।

লায়ালপুর কারাগারের ট্রাইব্যুনালে 'দেশদ্রোহিতার অভিযোগে' বঙ্গবন্ধুর বিচার শুরুর প্রায় একমাস পরে, ১ সেপ্টেম্বর প্যারিসের বিখ্যাত 'লা মঁদ' পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের শত্রু'। নিক্সন সরকারের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন 'দুর্যোগ সহায়তা কার্যক্রম'এর সমন্বয়কারী মরিস জে উইলিয়ামস্ বলেছিলেন, "ইয়াহিয়ার বিশ্বাস, মুজিব দোষী। ... বাঙালি বন্ধুরা আমাদের বলেছেন, যদি মুজিবকে হত্যা করা হয়, তাহলে পুর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তুদের ঢল নামেবে। এই মন্তব্য আমরা ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দিয়েছি। ... ১১ সেপ্টেম্বর ... নিক্সন সরকার ইয়াহিযাকে পাঠানো গোপন বার্তায় লিখেছিল, 'জীবিত মুজিবের চেযে মৃত মুজিব বেশি ভয়ঙ্কর'। ... ১২ ডিসেম্বর, স্টেট ডিপার্টমেন্টের সচিব এল এলিয়ট ... কিসিঞ্জারের জন্য বড় আকারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করলেন, 'আমরা পাকিস্তান সরকারের কাছে এটা বলতে পারি যে, বিহারী-বিরোধী সহিংস মনোভাব ছড়িয়ে পড়ায় ... নেতাদের মধ্যে একজনই আছেন, যিনি তা থামাতে পারেন। তিনি শেখ মুজিব। পাকিস্তানিদের এটা বিবেচনায় নিতে হবে" (২২/১০০-১০১)।

মুজিবের প্রাণরক্ষা এবং মুক্তির বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে পাকিস্তানের ওপর কুটনৈতিক চাপ ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, জার্মেনি, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি অনেক দেশই মুজিবের মুক্তির জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। "ইয়াহিযা রাজনীতিক ছিলেন না। কিন্তু ভুট্টো ছিলেন। ... তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুজিবকে বিচার করে ফাঁসি দিলে 'মৃত মুজিব জীবিত মুজিবের থেকেও বেশি প্রভাবশালী হবেন'। বাঙালিরা তাহলে পাকিস্তানি সৈন্য ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের একজনকেও জীবিত অবস্থায় ফেরত দেবে না" (২২/১৩১-১৩২)। মার্কিন আইন-প্রণেতা এবং প্রশাসকদের প্রবল চাপের কারণে ইয়াহিয়া বাধ্য হয়েই মুজিবের প্রতি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের আভাস দিতে শুরু করেছিলেন। 'লা মঁদ' পত্রিকা (১৯ অক্টোবর) জানায়, ইয়াহিয়াকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষায় মুজিবের সাথে আলোচনা করবেন কিনা? ইয়াহিয়া বলেছিলেন, একজন বিদ্রোহীর বিচার শেষে তাকে নির্দোষ ঘোষণা করা না হলে, তিনি তার সাথে কোনো আলোচনাই করতে পারেন না। বিচারে মুজিবের মৃত্যুদণ্ড হলে তিনি কি তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন, জবাবে ইয়াহিয়া বলেছিলেন, জনগণ চাইলেই মার্জনা করা যেতে পারে।

'নিউজ উইক' ম্যাগাজিনে ৮ নভেম্বর প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া বলেছিলেন, "What we do after the sentence is passed, is the prerogative of the head of state. It's one hell of a responsibility. But if the nation demands his release, I will do it" (৭/২২৮-২২৯)। সরকারী পত্রিকা 'পাকিস্তান টাইমস'এর ভাষ্যকার বলেছিলেন, মুজিবের মুক্তির কোনো কথাই বলেননি ইয়াহিয়া, বরং সবাইকে জানিয়ে দিয়েছেন, মুজিবের ভবিষ্যৎ কেবল পাকিস্তানেরই ভাবনা-বিবেচনার বিষয়, আর কারো নয়। অপরদিকে ইয়াহিয়ার বক্তব্যে উৎসাহিত হয়েই, তাহরিক-ই-ইশতেকলাল পার্টির আসগর খান এবং কবি ফয়েজ আহমেদ ফয়েজসহ পাকিস্তানের ৪০ জন বিশিষ্ট নাগরিক এক যৌথ বিবৃতিতে মুজিবের দ্রুত মুক্তির আবেদন জানিয়েছিলেন। বিশিষ্ট নাগরিকদের আহ্বানকে পাকিস্তান পরিস্থিতির অনুকুল পরিবর্তনের সূচনা বলেই যুক্তরাষ্ট্র বিবেচনা করেছিল। "What was unthinkable six months ago in West Pakistan, may have become acceptable today – regime could probebly survive opening of negotiations with Sheikh Mujibur Rahman provided latter agreed to support united Pakistan" (৭/২২৯)।

অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এবাবদে পাক-ভারত যুদ্ধের আশংকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যথার্থই দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের আশংকা ছিল, সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেই এমন পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, যা' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকুলে থাকবে না। এসময় জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক রাষ্ট্রদূত প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহকারী সচিব সিসকোকে বলেছিলেন, 'মুজিবের সাথে আলোচনার মাধ্যমে এখনো পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষা করা যেতে পারে'। কিন্তু আগা খান মুজিবের সাথে আলোচনার ব্যাপারে ইয়াহিয়াকে সম্মত করতে পারেননি। ইয়াহিয়ার আশংকা ছিল, মুজিবের সাথে আলোচনার কোনো উদ্যোগই সামরিক বাহিনী সমর্থন করবে না। ভারতের কুটনীতিবিদ ডি.পি. ধর মার্কিন সহ-সচিব সিসকোকে বলেছিলেন, মুজিবের সাথে আলোচনায় যদি কিছুমাত্র অগ্রগতিও হয়, "India might accept the UN Secretary General's good offices" (৭/২২৯)।

"২ নভেম্বর এএফপি'র একটি সংবাদে জানা যায়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেছেন, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন এবং চীন তার সশস্ত্র বাহিনীকে সবরকম গোলাবারুদ সরবরাহ করবে" (২২/১০১)। "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া, পাকিস্তানের অন্য মুরুব্বি ছিল চীন। ... সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ সদস্যদের প্রতিনিধিদল নিয়ে ভুট্টো চীনে যান ৩রা নভেম্বর। পাকিস্তানকে ভারত আক্রমণ করলে চীন ভারতেকে আক্রমণ করবে - এই ছিল তাঁর দাবি। দেশে ফিরে তিনি জানান যে, চীনে তাঁর সফর সফল হয়েছে। এছাড়া, ইয়াহিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দেন যে, ১৯৫৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পাশে যুক্তরাষ্ট্রের দাঁড়ানোর কথা। মোট কথা, বাংলাদেশের যুদ্ধ ... একটা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছিলো। ... ওদিকে, বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বের জনমত তৈরির জন্যে ভারতও যদ্দূর সম্ভব কাজ করতে

থাকে। এজন্যে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংহ একাধিকবার বিদেশ সফরে যান। ইন্দিরা গান্ধীও যান একাধিকবার। অক্টোবর মাসের ২৪শে ... একে-একে তিনি প্যারিস, বন, লন্ডন, ওয়াশিংটন সফর করেন। তা ছাড়া যান, বেলজিয়াম এবং অষ্ট্রিয়ায়। এই দেশগুলোর নেতাদের তিনি বুঝিয়ে বলেন ভারত ও বাংলাদেশের সমস্যার কথা। আগস্ট মাসেই তিনি একটি বড়ো চাল দিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সহযোগিতার চুক্তি করে। ... পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশ সমস্যা এবং তার গুরুত্ব আরও ভালো করে বুঝতে শুরু করে। বিরোধিতা করতে থাকে কেবল আমেরিকা এবং ইন্দিরা গান্ধী প্রতিপন্ন করতে চান যে, তিনি আন্তর্জাতিক সমাজের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন" (২০/১৩৩-১৩৪)।

১৬নভেম্বর ১৯৭১ চাঁদপুর থেকে ঢাকায় ফেরার পথে লঞ্চের কেবিনে জাপানী রেডক্রস কর্মী তাদামাসা হুকিউরা'র আলাপ হয়েছিল জনৈক পাকিস্তানি লেফটেন্যান্ট কর্ণেলের। বিয়ার পানরত অবস্থায় অনুষ্ঠিত তাঁদের সুদীর্ঘ আলোচনা সূত্রে হুকিউরা প্রশ্ন করেছিলেন, "আচ্ছা, গেরিলারা তৎপর হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে পাকিস্তানি নৌবাহিনী কি ভাবছে? তাঁর উত্তর ছিল, 'সত্যি বলতে নৌবাহিনী পূবের অভিযানের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। নৌবাহিনীর গানবোট দেখতে শক্তিশালী মনে হলেও আসলে ... তীব্র স্রোত ও জটিল নৌপথ আমাদের নৌবাহিনীর অনুকুল নয়। ... এ ছাড়া গেরিলা যুদ্ধে নৌবাহিনীর সাধ্য কম। ... পূবে সামরিক অভিযানে স্থলবাহিনীর প্রধান ভূমিকা পালন করা উচিত। কিন্তু তাদের সরঞ্জামকে আধুনিক বলা যায় না। আমাদের প্রতি বাঙালিদের এত ঘৃণা ও বিদ্বেষের মধ্যে অভিযান চালানো দুষ্কর। ... পাকিস্তানকে রক্ষা করতে গেলে পশ্চিমকে রক্ষা করাটাই গুরুত্বপূর্ণ" (২১/৭৮-৭৯)।

"ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হবে বলে কি মনে করেন আপনি"? লে.কর্ণেল বলেছিলেন, "পাকিস্তান সরকার যখন রাজনৈতিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম হবে এবং যখন ভারত সিদ্ধান্ত নেবে যে শরণার্থী সমস্যা সমাধানে কূটনৈতিক আলোচনার চেয়ে সামরিক পদক্ষেপ কার্যকর হবে এবং তারা সেটা সফলভাবে চালাতে পারবে ... তখন দুই দেশই যুদ্ধ করতে চাইবে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তান থেকে এত বেশি শরণার্থী তৈরি করে পাকিস্তান সরকার ভুল করেছে"। হুকিউরার মন্তব্য, "তাঁর বক্তব্য শুনে মনে হলো, তিনি যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিয়েছেন"। সেনা কর্মকর্তাটি আরো বলেছিলেন, "সামরিক শক্তি দিয়ে পূবের সমস্যা সমাধান করা উচিত নয়। কূটনীতিসহ রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত। ইয়াহিয়া খান যদি সেটা করতে অক্ষম হন, তাহলে পাকিস্তান রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে যাবে। সমস্যা মিটিয়ে ফেলার পথে সব থেকে বড় অন্তরায় হচ্ছেন পিপিপি'র প্রধান ... ভুট্টো। ... তিনি প্রেসিডেন্টকে বুদ্ধি দেওয়ার ভান করে নিজের অবস্থান শক্তিশালী করা চেষ্টা করছেন"। হুকিউরার প্রাসঙ্গিক মন্তব্য,"সত্যি অবাক হলাম, ... পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা আমার মতো একজন বিদেশীর কাছে পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে এত খোলাখুলি কথা বলছেন বলে। বোঝা গেল, দেশের পরিস্থিতি তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে অথবা ... পাকিস্তান নিজেই এখন প্রচন্ড কষ্টের মধ্যে আছে" (২১/৭৯-৮০)।

"নভেম্বর মাসের শেষ দিক থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শুরু হয়েছিল অঘোষিত যুদ্ধ। ... এক দিকে পাকিস্তান যেমন একটা যুদ্ধ শুরু করতে চাইছিলো, অন্যদিকে ভারতও বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তে গোলাগুলি করে এবং মুক্তিবাহিনীর সাহায্যে হামলা করে পাকিস্তানকে যুদ্ধ শুরু করার জন্যে উস্কানি দিচ্ছিলো। ভারত-পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তেও উত্তেজনা দেখা দিয়েছিলো। ... তবে ভারত কিছুতেই আগে আক্রমণ করতে চাইছিলো না। ... পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করে তেসরা ডিসেম্বর। আগে থেকেই আক্রমণ করে ভারতীয় বিমান বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্থ করে বেকায়দায় ফেলার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা না-করেই পাকিস্তান পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি বিমান ঘাঁটির ওপর হামলা চালায়। কিন্তু ভারতীয় বাহিনী পুরোপুরি তৈরি ছিলো এই হামলার জন্যে। ফলে ভারতীয় বিমানবাহিনীর কোনো ক্ষতি হযনি। বরং কয়েকটি পাকিস্তানি জঙ্গীবিমান ভারতীয় বাহিনীর হাতে বিধ্বস্ত হয়। এদিন ইন্দিরা গান্ধী ভাষণ দিতে এসেছিলেন কলকাতায়। আক্রমণের সংবাদ শুনে তিনি দ্রুত ফিরে যান দিল্লিতে। ... রাত ১২টা ৪০মিনিটের সময় তিনি বেতার ভাষণ দেন। ... পাকিস্তানের আক্রমণের কথা উল্লেখ করেন। তারপর সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা না করেই বলেন যে, দেশকে তিনি যুদ্ধাবস্থায় রাখতে বাধ্য হচ্ছেন। পরের দিন (৪ ডিসেম্বর) থেকে আরম্ভ হলো ভারত-পকিস্তান সম্মুখ যুদ্ধ, বাঙালিরা যার প্রতীক্ষা করছিল ন মাস ধরে" (২০/১৪২-১৪৪)।

৪ ডিসেম্বর ইয়াহিয়া খান রেডিও-ভাষণে পাকিস্তানের বেসামরিক জনগণ ও সামরিক বাহিনীর প্রতি জিহাদের আহ্বান জানিয়ে বলেন, "এই যুদ্ধ সব মুসলমানকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ভারতের পরিচালিত যুদ্ধ। আমি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী আপনাদের সবার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। চিরগৌরবময় দেশ পাকিস্তানের পক্ষে এটাই হবে শেষ যুদ্ধ" (২১/১০০)। "পাকিস্তানি বাহিনী ছিলো আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সৈন্যসংখ্যাও কম ছিলো না। ... তা সত্বেও পাকিস্তানিরা যে হেরে যায়, তার অনেকগুলো কারণ ছিলো। যেমন, তারা ভেবেছিলো যে, শুধুমাত্র গায়ের জোরে তারা বাঙালিদের শাসন করবে। ভেবেছিলো ... কিছু বাঙালি দালাল থাকলেই চলবে। হাজার হাজার দালাল তারা জোটাতেও পেরেছিলো। ... রাজাকার, আল বদর এবং আল শামস। ... এদের সংখ্যা প্রায় এক লাখ ছিলো ... অপর পক্ষে, মুক্তিযোদ্ধাদের আন্তরিক সমর্থন ও সাহায্য দিয়েছিলেন কোটি কোটি বাঙালি। ... মিত্রবাহিনী যাতে ঢাকার দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে না পারে, তার জন্যে অনেক জায়গায় সেতু উড়িয়ে দিয়েছিলো পাকিস্তানিরা। ... কিন্তু সব জায়গাতেই সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসেন 'যার যা কিছু আছে' তা-ই নিয়ে মিত্রবাহিনীকে সাহায্য করার জন্যে। ... গোরুর গাড়িতে ... পার করা হয় তাঁদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র। এর উল্টো দৃষ্টান্ত ... সিদ্দিক সালিক লিখেছেন যে, ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইল হয়ে যখন পাকিস্তানিরা ঢাকার দিকে যাত্রা করে, তখন গ্রামবাসীরা তাদের পানিও খেতে দেযনি" (২০/১৪৫-১৪৬)।

৭ ডিসেম্বর মাইজদী কোর্ট (নোয়াখালী) এলাকায় অবস্থানরত রেডক্রস কর্মী হুকিউরার বর্ণনা : "আমাদের অফিসের অদূরে রেলওয়ে স্টেশন। পাকিস্তানি সেনারা তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছিল স্টেশনটি। মিত্রবাহিনীর আক্রমণের মুখে সেদিন

দুপুরের আগে তার পতন ঘটল। ... ১২০জনের মত সেনা ও রাজাকার মাথায় হাত তুলে সারিবদ্ধ হয়ে ঘাঁটির বাইরে আসছে। মুক্তিযোদ্ধারা দুইপাশে দাঁড়িয়ে আত্মসমর্পণকারীদের দেহ তল্লাশী করছেন। ... একজন মুক্তিযোদ্ধা বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন। ... সবাই একসঙ্গে গাইতে শুরু করলেন 'আমার সোনার বাংলা' ... কমান্ডার আকাশের দিকে মুঠো তুলে গলা উঁচিয়ে বলে উঠলেন 'জয় বাংলা'। তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সবাই বলে উঠলেন 'জয় বাংলা'। তাঁরা যত চিৎকার করছেন সবাই তত উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন। ... 'আমার দেশ, তোমার দেশ ... বাংলাদেশ, বাংলদেশ'। কমান্ডারের পরবর্তী উচ্চারণ 'আমার নেতা, তোমার নেতা'-সমবেত কণ্ঠে উত্তর 'শেখ মুজিব, শেখ মুজিব" (২১/১০২)।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাংলাদেশ ঃ

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

পাকিস্তানের সেনা-কারাগারে নিঃসঙ্গ বন্দী বঙ্গবন্ধুর কিছুই জানা ছিল না, মুক্তিযুদ্ধ অথবা দেশ-দুনিয়ার কোনো খবর। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে পাকভারত আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ শুরুর দিন, অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর, মুজিবের বিচারে প্রহসনের আদালত যখন মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল, তখনো বঙ্গবন্ধু শান্ত, সুস্থির। শুধু বললেন, 'আমার কবরটা যেন বাংলাদেশে হয়'। বিচারের রায় ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুর কারাগার থেকে মিয়ানওয়ালি কারাগারে স্থানান্তর করা হলো। ইয়াহিয়া মুজিবের ফাঁসির দিন ধার্য করলেন ১৫ ডিসেম্বর, কিন্তু ইয়াহিয়ারও জানা ছিল না যে, ততদিনে যুদ্ধাবস্থা পাকিস্তানের চরম প্রতিকুলে পৌঁছে যাবে, পরের দিনই ঢাকায় প্রায় এক লক্ষ পরাজিত পাক-সেনা আত্মসমর্পণ করবে ভারত-বাংলাদেশের মিত্রবাহিনীর কাছে। পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সংশয়ের ফলে যথাসময়ে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। তখন দয়ালু জেলার মুজিবকে নিজের বাড়িতে নিয়ে দু'দিন লুকিয়ে রাখেন, একথা আগেই বলা হয়েছে।

যুদ্ধে পাকবাহিনীর পরাজয় এবং ঢাকায় আত্মসমর্পনের সময়টাতে ভুট্টো 'নিজের পরিকল্পনা মতই' ছিলেন নিউইয়র্কে। "Before leaving for Pakistan Bhutto had meetings with Secretary of State Rogers and President Nixon. Since the Americans expected Mujib to play a stabilising role in emerging Bangladesh, ... Bhutto told Rogers; `Mujib was an important element but public opinion must first be prepared for his re-involvement in picture and he (Bhutto) did not in any event believe Mujib would remain influential political figure beyond three months' time. Mujib ... a good speaker but `very blank in the head" (৭/২৫০)। লক্ষণীয় যে মুজিব সম্পর্কে মূল্যায়নে ইয়াহিয়া-ভুট্টোর চিন্তার কোনোই ফারাক ছিল না।

"বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ২০শে ডিসেম্বর ভুট্টো হন প্রেসিডেন্ট। ২১শে ডিসেম্বর তিনি ঘোষণা করেন

যে, শেখ মুজিবকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে গৃহবন্দী করা হবে। ... বাংলাদেশের লোকেরা তখনও জানতেন না,জাতির জনককে ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা, অথবা ছেড়ে দিলে কবে তিনি ফিরে আসবেন। ইতিমধ্যে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাজউদ্দিনের নেতৃত্বে দেশ চলতে থাকে। কিন্তু ... যুদ্ধের শেষে দেশে যে-বিশৃঙ্খলা এবং আইনের প্রতি অবজ্ঞা দেখা দেয়, তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নেবার মত ক্ষমতা তাজউদ্দিনের মন্ত্রীসভার ছিলো না। সত্যি সত্যি দরকার ছিলো হয় একটি জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনের অথবা শেখ মুজিবের মতো একজন প্রভাবশালী নেতা এবং 'ফাদার ফিগার'এর। অর্থাৎ এমন একজন নেতার, যাঁকে সবাই পিতার মত মেনে নেবে" (২০/১৭৮-১৮০)।

২২ ডিসেম্বর ভুট্টো মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জানালেন, 'মুজিবকে দ্রুতই মুক্তি দেওয়া হবে'। ২৬ ডিসেম্বর সেনা হেলিকপ্টারে বঙ্গবন্ধুকে নেযা হলো রাওয়ালপিন্ডির কাছে সিহালা অতিথি ভবনে। ২৭ ডিসেম্বর ভুট্টো গোপনে সাক্ষাৎ করলেন বঙ্গবন্ধুর সাথে। ভুট্টোকে দেখে আকস্মিক বিস্ময়ে বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন, 'আরেকটা দুর্যোগ বোধ হয় নেমে এসেছে'। বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, 'কীভাবে এলেন? ভুট্টো বললেন, আমি (ভুট্টো) এখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট'। 'আমার বাংলার অবস্থা কী? ... খুবই বিচলিত হয়ে আছি'। ভুট্টো বললেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনী সোভিয়েত নৌ এবং বিমানবাহিনীব সাহায্য নিয়ে ঢাকা দখল করে নিয়েছে'। উদ্বিগ্ন বঙ্গবন্ধু বললেন, 'তার মানে ওরা আমার লোকদের হত্যা করছে। আপনি আমাকে দ্রুত ঢাকায় যাবার বন্দোবস্ত করুন'। বঙ্গবন্ধুর কাছে জানতে চাইলেন ভুট্টো, 'পাকিস্তান ও বাংলদেশের মধ্যে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনে আপনার সাহায্য দরকার, আমরা একসঙ্গে থাকব, তার কি কোনো সম্ভাবনা নাই'? বঙ্গবন্ধু বললেন,'আমার জনগণের সঙ্গে কথা না বলে আমি কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না। আমি আগে ফিরে যাই, তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলব" (২২/১০৪)। সুচতুর ভুট্টো তখন বঙ্গবন্ধুর সাথে সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টায় বলেছিলেন যে, "When Yahya wanted to surrender power to him (Bhutto) after the `tragic defeat' suffered by the Pakistan Army, ইয়াহিয়া বলেছিলেন মি.ভুট্টো, মুজিবকে জীবিত রেখে আমি জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল করেছি। অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে একটু সময় দিন, পূর্বতন কোনো তারিখ উল্লেখ করে আমি মুজিবকে ফাঁসিতে হত্যা করে আপনার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাই। কিন্তু ভুট্টো অসম্মত হয়ে বলেছিলেন, এমন কিছু করলে, পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটকে পড়া এক লাখ কুড়ি হাজার সামরিক এবং সোমরিক লোকদের কেউই আর জীবিত পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরতে পারবে না." (৭/২৫১) (অনুদিত)।

৭ জানুযারি, ১৯৭২ইং ভুট্টোর ৪৪তম জন্মদিন। ভুট্টো আবার সাক্ষাৎ করলেন বঙ্গবন্ধুর সাথে। ভুট্টোর মূল লক্ষ্য ছিল, "ইয়াহিয়ার জন্য টুকরো হওয়া পাকিস্তানকে একসঙ্গে করে দেশের ত্রাণকর্তা হওয়া। ভুট্টো বললেন, দুই দেশের মধ্যে কনফেডারেশনের ব্যবস্থা কি করা যায় না? বঙ্গবন্ধু বললেন, না, তা আর কোনো দিনই সম্ভব নয়। ... লারকানার বাড়িতে (জন্মদিনের) উৎসব সেরে রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায়

নৈশভোজে যোগ দিলেন ভুট্টো। প্রধান উদ্দেশ্য বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন। 'আমি যেকোনো মুহূর্তে ঢাকায় যেতে প্রস্তুত' - ভুট্টো একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু বললেন, না, না। ভুট্টো বুঝলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করে লাভ হবে না। নৈশভোজ শেষে হাত খরচ হিসেবে ৫০হাজার ডলার দেওয়ার চেষ্টা করলে বঙ্গবন্ধু বললেন, টাকাটা আমার বিশেষ বিমান খরচ বাবদ রেখে দিন" (২২/১০৪-১০৫)।

"Mujib's arrival in London without prior notice was planned by Bhutto so that the event would not be well-publicised beforehand and Mujib would have a quiet, not a warm, public reception" (৭/২৫৯)। বঙ্গবন্ধু "পাকিস্তান থেকে ছাড়া পান ৭ই জানুয়ারি ভোর রাতে অর্থাৎ ... ৮ই জানুয়ারি খুব ভোরে। রাত তিনটের সময় কামাল হোসেন এবং তাঁকে ভুট্টো বিমানে তুলে দেন। সকাল সাড়ে ছ'টায় তাঁরা এসে নামেন লন্ডনের হীথরো বিমান বন্দরে" (২০/১৮০)। "৮জানুয়ারি, ১৯৭১। ... বিবিসি'র শব্দতরঙ্গে ভেসে আসছে, 'বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনে পৌঁছে গেছেন'। ... ব্রিটিশ পুলিশ বঙ্গবন্ধুকে স্যালুট দিয়ে বললেন, 'স্যার, উই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইউ'। ... গায়ে সাদা গলা খোলা শার্ট। ধুসর স্যুট। ধুসর ওভারকোট। হাতে পাইপ। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'দেখতেই পাচ্ছেন, আমি বেঁচে আছি" (২২/১০৫)। একান্ত দ্রুততার সাথেই হীথরো বিমানবন্দরের ডিউটি অফিসার লন্ডনের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া ডেস্কের প্রধান, সাদারল্যান্ডকে খবর দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পৌঁছার আগেই বঙ্গবন্ধুর বিমানটি অবতরণ করেছিল। ততক্ষণে ডিউটি অফিসার বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুর জন্য একটি ভিআইপি-রুম বন্দোবস্ত করে কয়েকজন কর্মীকে বঙ্গবন্ধুর দেখাশোনায় নিয়োজিত করে ফেলেছেন।

বিদেশ মন্ত্রক থেকে ভিআইপি কক্ষে লন্ডনস্থ বেসরকারী বাংলাদেশ মিশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা রেজাউল করিমের টেলিফোন নাম্বার জানানো হলো। যদিও বিবিসি থেকে খুব ভোরেই বঙ্গবন্ধুর আগমনের খবর প্রচার করা হচ্ছিল, তথাপি শীতকালের সেই 'উইক-এন্ড' ভোরে রেজাউল করিম ঘুমিয়ে থাকায় সংবাদটি শোনেননি। বঙ্গবন্ধু নিজেই তাঁকে টেলিফোন করে জাগিয়ে বললেন, "Rezaul Karim, this is Sheikh Mujib'। অনতিবিলম্বেই সেখানে পৌঁছে গেলেন যুক্তরাজ্য বিদেশ মন্ত্রকের আয়ান সাদারল্যান্ড এবং বেসরকারী বাংলাদেশ মিশনের 'তদানিন্তন প্রধান' রেজাউল করিম। লন্ডনে বঙ্গবন্ধুর থাকার ব্যবস্থা করা হলো বিখ্যাত ক্ল্যারিজেস হোটেলে। বিগত নয় মাসের কোনো খবরই জানা না থাকায় বঙ্গবন্ধু স্বভাবতই চরম উদ্বিগ্ন ছিলেন। দেশের কথা জানার জন্য, রেজাউল করিমের গাড়িতেই বঙ্গবন্ধু হোটেলে রওনা হলেন। আর বৃটিশ সরকারের দেয়া লিমুজিনটি ব্যবহার করতে দিলেন ড. কামাল ও তাঁর পরিবারকে। পথে যেতে যেতে, মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলী সম্পর্কে রেজাউল করিমের বর্ণনা শুনতে শুনতে বিস্মিত-বিমূঢ় বঙ্গবন্ধু বার বারই বলছিলেন, 'আমরা তাহলে সত্যি স্বাধীন হয়েছি' !

এখানে প্রসঙ্গতই আরেকটি তথ্য উপস্থাপন করা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুর লন্ডনে আগমনের কথা জেনেই রেজাউল করিম খবরটা দিলেন 'দ্বিতীয় সচিব' মহিউদ্দিন

আহমদকে। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরই লন্ডনের পাকিস্তান মিশনে দ্বিতীয় সচিব পদে কর্মরত মহিউদ্দিন আহমদ চাকুরি ছেড়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কাজে নিয়োজিত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। রেজাউল করিমের কাছে খবর পেয়েই মহিউদ্দিন আহমদ তাঁর সহকর্মী মহিউদ্দিন জায়গীরদারকে নিয়ে হিথরো বিমান বন্দরে এসেছিলেন। "বিমান বন্দরের আলকক অ্যান্ড ব্রাউন ভিভিআইপি সুইটে মহিউদ্দিন আহমদ যখন প্রথম বঙ্গবন্ধুকে দেখলেন, দেখেই তাঁর চোখ দিয়ে অঝোরে পানি পড়তে থাকে। বঙ্গবন্ধু সেটা লক্ষ্য করে মধুকে (মহিউদ্দিন আহমদের ডাক নাম) বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'ভয় নেই, আমি এসে গেছি'। রশীদ হায়দারের 'মহানায়ক ফিরলেন' ('প্রথম আলো', ১৮জানুয়ারি ২০০৫) থেকে তথ্যটি উল্লেখ করেছেন ঢকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গোলাম রহমান। অধ্যাপক রহমানের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, "কত বড় মাপের মানুষ হলে 'সামান্য' একজন দ্বিতীয় সচিবকে অমন আদর করতে পারেন, অভয় দিতে পারেন" (১(১)/৪৬২)। আমি নিজেও একাধিকবার মহিউদ্দিন আহমদের কাছেই ঘটনাটি শুনেছি। আমার মনে হয়েছে, 'ছোট্ট' এ ঘটনায় বঙ্গবন্ধুর আত্মবিশ্বাস এবং দেশের মানুষের প্রতি তাঁর পিতৃসুলভ স্নেহের আন্তরিক বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয় ছিল।

"Among the early visitors was Anthony Mascarenhas, the Pakistani journalist of Goanese origin, whose expose' of attrocities committed by Pakistani troops in East Bengal in the `Sunday Times' created a world-wide sensation. He was personally known to Mujib ... Mujib wanted to reward Mascarenhas for his valuable service to the cause of the liberation struggle, for he confided to him : 'I have a big scoop for you. We are going to keep some link with Pakistan but I can't say anything more till I have talked it over with others. And ... don't write anything till I tell you'. Mascarenhas tried to tell Mujib that this was a preposterous thought after what had happened in East Bengal ... Mujib's re-education had begun, in the words of Mascarenhas" (৭/২৬০-২৬১)।

ঢাকা থেকে লন্ডনের ক্ল্যারিজেস হোটেলে ফোনে কথা বললেন "সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, বেগম মুজিব। ভারতের লক্ষ্ণৌ থেকে ফোন করলেন ইন্দিরা গান্ধী। দীর্ঘক্ষণ দুজনের কথা হলো। কলকাতা ... থেকে অমিতাভ চৌধুরী বললেন, 'আনন্দবাজার এবং পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে আপনাকে প্রণাম' (২২/১০৫-১০৬)। বেলা দশটার দিকে বঙ্গবন্ধু টেলিফোনে কথা বলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডোয়ার্ড হীথের সাথে। মি. হীথ তখন লন্ডনের বাইরে চেকার্স পল্লী-নিবাসে সপ্তাহান্তিক ছুটি কাটাচ্ছিলেন। হোটেলে তাঁর সাথে "সাক্ষাৎ করতে আসেন লেবার পার্টির তৎকালীণ নেতা ... হ্যারল্ড উইলসন, ভারতীয় হাই কমিশনার আপা পন্থ, বিবিসি'র সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট এবং লেবার পার্টির এমপি পিটার শোর। ... বাইরে হাজার হাজার মানুষ তাঁকে একনজর দেখার জন্য সারাক্ষণ ভীড় জমিয়ে ... মুহুর্মুহু হাততালি আর 'জয়

বাংলা' ধ্বনিতে পুরো এলাকাকে মুখরিত করে তোলেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অফিসাররা বঙ্গবন্ধুকে বাইরে যেতে দেননি। তিনি বার বার হোটেলের জানালা দিয়ে হাত নেড়ে জনগণকে তাঁর প্রাণের শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জ্ঞাপন করে যাচ্ছিলেন" (১(৩)/১৬৮৭-১৬৮৮)।

"দেশবিদেশের বহু সাংবাদিক সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের এই বিপ্লবী নেতার বক্তব্য শোনার জন্য ক্ল্যারিজেস হোটেলে ভীড় জমান। বঙ্গবন্ধু একটি লিখিত বক্তব্য পেশ করলেন। ... তিনি বলেন, 'এক মুহূর্তের জন্যও আমি বাংলাদেশের কথা ভুলিনি। ... আমি জানতাম তারা আমাকে হত্যা করবে। ... কিন্তু আমার জনগণ মুক্তি অর্জন করবে। ... এ সম্বন্ধে আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। ... সাংবাদিক সম্মেলনের পর বহু লোকের ভীড়ের মধ্য থেকে একজন বললেন, 'যুদ্ধ-বিগ্রহের শেষে আমাদের উপমহাদেশেই বসবাস করতে হবে। কাজেই পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সহযোগিতার ভাব রেখে আমাদের ... চলা উচিত'। বঙ্গবন্ধু বললেন : 'পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো আপস হতে পারে না। আমাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে দর কষাকষির কথাই ওঠে না। আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছি। পাকিস্তান আমার কাছে অন্য যে-কোন একটা দেশের মতো। ২৫ মার্চ (১৯৭১) পাকিস্তান একটি জাতি হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে এবং আমার জনগণ বীরের মত যুদ্ধ করেছে। ... সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে। আমি কখনো তাদের অসম্মান করবো না; এমনকি আমার জীবন দিয়ে হলেও আমি এই প্রতিশ্রুতি পালন করবো" (প্রাগুক্ত)।

"The Prime Minister Edward Heath cut short his weekend at the Chequers and returned to his official residence at No. 10 Downing Street to receive Mujib. The Commonwealth Secretary-General Arnold Smith called on him as the leader of a potential member of the Commonwealth. Prime Minister Heath left no doubt in Mujib's mind that Britain entertained friendly feelings towards Bangladesh and would accord recognition ... as soon as it was perceived to be firmly in control. Meanwhile the British government put a Royal Air Force jet at his disposal to fly him to Dhaka" (৭/২৬১)।

লন্ডনে সকলেই ধারণা করেছিলেন, বঙ্গবন্ধু লন্ডন থেকে সোজা ফিরে যাবেন ঢাকায়, যেখানে তাঁর স্বজন-পরিজন-জনগণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। "কিন্তু সবাইকে অবাক করে বঙ্গবন্ধু জানালেন, ... তিনি প্রথমে যাবেন দিল্লি, তারপর ঢাকায়"। বিশিষ্ট সংস্কৃতি-কর্মী গোলাম কুদ্দুছ যথার্থই লিখেছেন, "স্বভাবতই একটি প্রশ্ন এসে যায়, ... প্রথমে তিনি ঢাকা না এসে দিল্লি গেলেন কেন? এখানেই বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, প্রজ্ঞা এবং অসীম দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে তিনি দেখেছেন যে, বন্ধুত্ব আর মিত্রতার সুযোগ নিয়ে বহু দেশের সেনাবাহিনী আর নিজ দেশেই ফিরে যায়নি। বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে নিয়ে কোনো শঙ্কার মধ্যে থাকতে চাননি। ... নতুন করে কেউ

যাতে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে চক্রান্তের জাল বুনতে না পারে তার জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল ভারতীয় মিত্রবাহিনীর প্রত্যাবর্তন। হয়তো বঙ্গবন্ধু নিজেও কোনো দ্বিধায় থাকতে চাননি। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে প্রথম সাক্ষাতেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্য ভারত সরকার এবং সে দেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের সুনির্দিষ্ট তারিখ জানতে চাইলেন। ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেম এবং রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞায় অভিভূত হয়ে গেলেন। ... ইন্দিরা গান্ধী জানালেন ১৭মার্চ থেকেই ভারতীয় মিত্র বাহিনী প্রত্যাহারের কাজ শুরু হবে এবং ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে এটিই হবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি জন্মদিনের শুভেচ্ছা। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কথা রেখেছিলেন" (১(২)/১০৯৮)। ভারতীয় মিত্রবাহিনী যথাসময়েই বাংলাদেশ ছেড়ে গিয়েছিল। এখানে অবশ্যই স্মরণ করা যেতে পারে রাওয়ালপিন্ডি রেস্ট হাউসে সাক্ষাৎ করতে এসে বন্দী মুজিবের প্রশ্নের উত্তরে ভুট্টো বলেছিলেন, 'ভারতীয় সেনাবাহিনী সোভিয়েত নৌ এবং বিমানবাহিনীব সাহায্য নিয়ে ঢাকা দখল করে নিয়েছে'। উদ্বিগ্ন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তার মানে ওরা আমার লোকদের হত্যা করছে। আপনি আমাকে দ্রুত ঢাকায় যাবার বন্দোবস্ত করুন'। সেই চিন্তাও মুজিবকে বাংলাদেশ থেকে দ্রুত ভারতীয় সেনা-প্রত্যাহারের ব্যাপারে প্রভাবিত করা একান্তই স্বাভাবিক ছিল।

লন্ডন-দিল্লি পথে প্রথম যাত্রাবিরতি সাইপ্রাসে। সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি ম্যাকারিয়াস সংবর্ধনা জানালেন বঙ্গবন্ধুকে। পরবর্তী গন্তব্য দিল্লি। ১০ তারিখ সকালে ৮টা ১০মিনিটে বঙ্গবন্ধু নামলেন দিল্লি বিমানবন্দরে। "দিল্লির রাস্তায় রাস্তায় তখন ভারত-বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। ... অভিবাদন জানাতে দাঁড়িয়ে আছেন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মন্ত্রীসভার সদস্য, কূটনীতিক, সাংবাদিকসহ অনেকে। বিমান থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা দিয়েই বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করলেন অগ্নিমন্ত্রের ধ্বনি, 'জয় বাংলা'। বিমানবন্দরের পাশে বিশাল মাঠে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করলেন। লাখ লাখ মানুষ একনজর দেখতে এসেছেন। ... বঙ্গবন্ধু বললেন, 'শেষ পর্যন্ত আমি আমার স্বপ্নের সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে আমি দেখতে পাব লক্ষ লক্ষ মানুষের বিজয়ের হাসি। আমি মুক্ত। স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি'। বঙ্গবন্ধু 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দিয়ে বক্তৃত শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী বললেন, 'জয় বাংলা'। ... অনুষ্ঠানের আচরণ স্পষ্ট করল, এ কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান নয়, পারিবারিক বন্ধুত্ব" (২২/১০৭)। "ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকও হয়। ভারতের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের কাছে তাঁদের অকৃপণ সাহায্যের জন্য তিনি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। ... বলেন যে, তিনি অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এসেছেন" (২০/১৮১)।

বঙ্গবন্ধুর জামাতা পরমাণু-বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদ প্রাসঙ্গিক এক বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, লন্ডন-ঢাকা-দিল্লি আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হয়েছিল, "বঙ্গবন্ধু একটি বিশেষ বৃটিশ বিমানে ৯ জানুয়ারি রাতে লন্ডন ত্যাগ করবেন এবং পরের দিন দুপুরের দিকে দিল্লি পৌঁছাবেন। দিল্লিতে ঘন্টাখানেকের জন্যে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলাপ-আলোচনার পর বঙ্গবন্ধু ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে কোলকাতা

পৌঁছে সেখানে এক ঘন্টা যাত্রাবিরতি করে বিকেল চারটার দিকে ঢাকা পৌঁছাবেন। ঢাকায় পৌঁছানোর পর বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স-এ জনসভায় ভাষণ দেবেন। ঐ দিন কোলকাতাতেও যাত্রাবিরতি করলে ঢাকায় রেসকোর্সে সভাস্থলে পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে, এই ভেবে শাশুড়ী (বেগম মুজিব) তাজউদ্দিন সাহেবকে কোলকাতার কর্মসূচী বাতিল করার পরামর্শ দেন। দ্বিতীয়ত, দিল্লিতে বিমান পরিবর্তন করলে বৃটেনের জনগণ মনঃক্ষুন্ন হতে পারেন, সে-কারণে এই বৃটিশ বিমানেই বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা পর্যন্ত নিয়ে আসা সমীচীন হবে বলে শাশুড়ী মন্তব্য করেন। একথা শোনার পর তাজউদ্দিন সাহেব দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডি.পি.ধরকে ফোন করে শাশুড়ীর মতামত অবহিত করেন। অতঃপর সাব্যস্ত হয় যে, লন্ডন থেকে ঢাকা ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু শুধু দিল্লিতে এক ঘন্টার জন্য যাত্রাবিরতি করে একই বিমানে দিল্লি থেকে সোজা ঢাকা আসবেন"। ড. ওয়াজেদের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে 'বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেসা' নিবন্ধে ডেনিস দিলীপ দত্ত লিখেছেন,"কেন বেগম মুজিব কর্মসূচী পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন? কারণ, জানুয়ারি মাসে বিকেল পাঁচটায় সন্ধ্যা হয়ে যায়। যেকোনো ঘাতক এ সময়টিতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার জন্য সুযোগ গ্রহণ করতে পারে" (১(২) ৯১৯)।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ইং বেলা প্রায় আড়াইটায় বঙ্গবন্ধুর বিমান নামলো ঢাকায়, পাকিস্তানি সেনা-কারাগারে মৃত্যুর অপেক্ষাধীন বন্দীজীবন কাটিয়ে স্বাধীন স্বদেশে ফিরে এলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। চারদিকে উল্লাস, তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে "কিছুক্ষণ বাকরুদ্ধ। কাঁদলেন। কাঁদালেন। অনেকদিন পর সেই ভরাট বঠস্বর, 'আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশ্যে জানাই সালাম। ইয়াহিয়া খানের কারাগারে ... মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুতও ছিলাম, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ যে মুক্ত হবে, এবিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। ... পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো দেশের মুক্তি সংগ্রামে এত লোকের প্রাণহানির নজির নাই। ... আমার মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে তারা জঘন্য বর্বরতার পরিচয় দিয়েছে। সোনার বাংলার অসংখ্য গ্রাম তারা পুড়িয়ে দিয়েছে" (২২/১০৮)।

সেদিন রেসকোর্স ময়দানে আবেগে-আনন্দে অপেক্ষমান "প্রায় দশ লাখ লোকের সামনে ... কাঁদতে কাঁদতে তিনি সবার ত্যাগের কথা স্মরণ করেন। দেশ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন সবাইকে। দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে দেশ শাসনের জন্যে যে-নেতার প্রয়োজন ছিলো, সেই শূণ্য স্থান তিনি পূরণ করলেন দেশে ফিরে। তাঁর জন্যেই সমগ্র জাতি প্রতীক্ষায় ছিলো। পরের দিন তাঁর আগমন উপলক্ষে ছিলো ছুটির দিন। এদিন তাজউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলাপ হয় সরকার গঠন সম্পর্কে। কিন্তু তিনি তাজউদ্দিনের কাছে একবারও জানতে চাননি, ন' মাস মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে চলেছিলো। জানতে চাননি নির্বাসিত সরকারের কথা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকার কথা ('জোহরা তাজুদ্দিনের সাক্ষাৎকার'; মতিউর রহমান, ২০০৪)। তিনি দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ এবং সব

সংবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর হঠাৎ জেগে উঠেছিলেন বাস্তবতার আলোতে। কিন্তু ন' মাস কী ঘটেছিলো, নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তিনি তা শুনতে চাননি। ... তিনি সম্ভবত ... ভাবেন যে, বোধ হয় যাঁরা যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন,তাঁরা সমস্তটা কৃতিত্ব নিজেরাই দাবি করছেন। এ ছিলো তাঁর ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, যোদ্ধারা একত্রিত হয়েছিলেন তাঁরই নামে, তাঁরই আহ্বানে" (২০/১৮১-১৮২)।

"Nothing significant in history is achieved without paying a price. It had been a long struggle and Mujib personally had paid a heavy price for leading his people to emancipation, to freedom ... His greater challenge was now ahead of him : How to transform a liberated Bangladesh in ruins into a *Sonar Bangla* of his dreams" (৭/২৬৩)। "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাংলাদেশের মাটিতে পদার্পন করেন ১০জানুয়ারি ১৯৭২ সালে। ১১ই জানুয়ারি অস্থায়ী সাংবিধানিক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে তিনি আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১২ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ২৩ সদস্য বিশিষ্ট আওয়ামী লীগের মন্ত্রীসভা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (৫/৪২)। এখানে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুর একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি যথার্থই প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে। "সোনার বাংলা গড়তে হবে। এটা বাংলার জনগণের কাছে আওয়ামী লীগের প্রতিজ্ঞা। আমার আওয়ামী লীগের কর্মীরা, যখন বাংলার মানুষকে বলি, সোনার মানুষ হও তখন তোমাদেরই প্রথম সোনার মানুষ হতে হবে। তাহলেই সোনার বাংলা গড়তে পারবা। আর যারা বাংলার দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছো, তারা বাংলার দুঃখী মানুষের কাছ থেকে সরে যেয়ো না" (৫/১০)। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, বঙ্গবন্ধুর এ আহ্বান সত্যিকার অর্থে কাজে লাগেনি।

বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫ ঃ
পূণর্গঠন, সংবিধান রচনা এবং ষড়যন্ত্র মোকাবেলা

বাংলাদেশ-সুহৃদ অন্নদাশঙ্কর রায়, ১৯৭২-'৭৫ইং সময়কালের মধ্যে তিনবার এসেছিলেন বাংলাদেশে। দেখেছিলেন বাংলাদেশের পূণর্গঠন প্রক্রিয়া, দু'বার সাক্ষাতে আলোচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু মুজিবের সাথে। বাংলাদেশ এবং বঙ্গবন্ধুর তখনকার অবস্থা উপলব্ধির জন্য তাঁর লেখা 'কাঁদো, প্রিয় দেশ' থেকে কিছুটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে। "বাংলাদেশের মুক্তির পর তার দুরূহতম সমস্যা হলো অস্ত্র সমর্পনে অনিচ্ছুক বিভিন্ন গোষ্ঠীর দ্বারা অনুষ্ঠিত গুপ্তহত্যা। এদের কেউ বা পাকিস্তানপন্থী রাজাকার, কেউ বা চীনপন্থী নকশাল। কেউবা স্বদেশপ্রেমিক, অথচ সমাজবিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধা। কেউবা মুক্তিযোদ্ধা থেকে ডাকাত। ... পুলিশ দুর্বল, সৈন্যদল দুর্বল, সিভিল সার্ভিস দুর্বল। শত্রুরাষ্ট্র পাকিস্তানের চক্রান্ত সমানে চলছে। ... সরকার

ধরপাকড় করতে গেলেই রব ওঠে ভারতের স্বার্থেই দেশবাসীকে নিরস্ত্র করা হচ্ছে। ... আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে একজন সাংবাদিক এসেছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলি, শেখ সাহেব অত্যন্ত দয়ালু মানুষ। কড়া হাতে শাসন করা তাঁর স্বভাবে নেই। মনে হলো, সাংবাদিকেরও সেইরূপ ধারণা। সকলেই বুঝতে পারছিল যে, শেখ সাহেব হালে পানি পাচ্ছেন না। কিন্তু তিনি ভিন্ন আর কে হাল ধরতে পারেন? দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলে তো?" (১(১)/৩৫-৩৬)।

শ্রী রায় আরো লিখেছেন :বঙ্গবন্ধু "কথায় কথায় বলেন 'আমার কাজ সারা হয়েছে। আমি আর থাকতে চাইনে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াব। দু'লাখ লোক আমার সঙ্গে ঘুরবে। কিন্তু আমাকে যেতে দিচ্ছে কে? আমাকে আটকে রেখেছে ওই যাদের দেখছেন ওরাই'-আঙ্গুল দিয়ে দেখান তাঁর দলের চাঁইদের কয়েকজনকে। ... কোনো নেতাই স্বয়ংসিদ্ধ নন। প্রত্যেকেরই একটা দল থাকে, দলের চাঁই থাকে। তাদের তিনি নাচান। তাঁকেও তারা নাচায়। সেদিন আমার সত্যি বিশ্বাস হলো যে-কাজের জন্যে মুজিব এসেছিলেন, সে-কাজ সারা হয়েছে। দেশকে তিনি মুক্ত করে দিয়েছেন। তাকে শাসন করবে অন্য কেউ। গ্যারিবালডির পর যেমন কাভুর। কিন্তু বাংলাদেশের কাভুরটি কোথায়? তাঁর ধারে কাছে দাঁড়াতে পারেন, এমন একজনও কি আছেন?" (১(১)/৩৬)।

বঙ্গবন্ধুকে উপলব্ধির জন্য এখানে তাঁরই আরেকটি কথা স্মরণ করবো। পাকিস্তানের বন্দীশালা থেকে ঢাকা ফেরার পথে লন্ডন বিমান বন্দরে তাঁকে সর্বদলীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন জাতীয় নির্বাচনে "আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন পেয়ে সারা দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জীবিত আছে, তারা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে, তারা সরকার গঠন করবে। কিন্তু তোমরা যদি চাও অন্যরাও সরকারে যোগ দেবে, তা' হলে সেই সুযোগ আমি দেবো। ইলেকশন করা হোক, তোমরা দেশে আসো, দেশের জন্য কাজ কর। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, সরকার ওরাই গঠন করবে। আমি যেয়ে বাগিয়ার নদীতে ছাতা মাথায় দিয়ে মাছ ধরবো। তোমরা একটা স্বাধীন দেশে এখন বসবাস করছো। এরপর তোমাদের আর কিছু আমার দেওয়ার নেই। ... তোমরা অনেক সুযোগ পাবে এবং আমি তোমাদেরকে সেই সুযোগ দেবো, অঙ্গীকার করছি" (১(৩)/১৬৮৮-১৬৮৯)। দেখা যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা-লীপ্সায় নয়, বরং পরিস্থিতির কারণেই রাষ্ট্র-ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন।

আবার ফেরা যাক শ্রী অন্নদা শঙ্কর রায়ের পর্যবেক্ষণমূলক বর্ণনায়। ১৯৭৫ইং জুন মাসে "ভুট্টো সাহেব আসেন ঢাকা সন্দর্শনে। তাঁর ভক্তসংখ্যা অগণ্য। তাঁরা তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা জানান। যেন তিনিই বাংলাদেশের বিদেশী রাজা, শেখ সাহেব তুষ্ট হলেন কি রুষ্ট হলেন বোঝা শক্ত। তবে ওঁর ওই এক কথা। আগে বাংলাদেশের পাওনা অ্যাসেটস্ মিটিয়ে দিতে হবে আর ... পাকিস্তানি নাগরিকদের সরিয়ে নিতে হবে। ভুট্টো পাশ কাটাতে চেষ্টা করেন। শেখ সাহেব নাছোড়বান্দা। ভুট্টো হাসিমুখে এসেছিলেন, বিষণ্নমুখে ফিরে গেলেন। ... অ্যাসেটসের শতকরা পঞ্চান্নভাগ চাই, যেহেতু অবিভক্ত পাকিস্তানে শতকরা পঞ্চান্নভাগ ছিল বাঙালি। ... যতই দিন যায় ততই শেখ সাহেবের

বার্গেনিং পাওয়ার কমে আর ভুট্টো সাহেবের বাড়ে। ... যুদ্ধ জেতা আর সন্ধি জেতা এক জিনিস নয়। ... পাকিস্তানিরা যুদ্ধে হেরে যাওয়ার গ্লানি ভোলেনি। সন্ধিতে জিতে এখন তারা প্রতিশোধ নিতে চায়। শেখ সাহেবের বিরোধীপক্ষ তাঁর ওপর প্রচণ্ড চাপ দেয় যে, আর্থিক দুর্গতি থেকে বাঁচতে হলে বাংলাদেশকেই শর্তগুলো নরম করতে হবে। ... কিন্তু শেখ সাহেবের ওই এক কথা। ... জীবনে কখনো তিনি কারো কাছে নত হননি। ... বাংলাদেশ সবদিক থেকে বড়ো" (১(১)/৩৭-৩৮)। এখানে প্রসঙ্গতই সেই সকরুণ বৈপরিত্বের দৃশ্যপট স্মরণ করা দরকার। "একাত্তরের মার্চে ঢাকায় জনপ্রিয় স্লোগান ছিল 'ভুট্টোর বুকে লাথি মারো - বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। সেই ভুট্টো স্বাধীন বাংলায় বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন পঁচাত্তরের জুনে। দু'এক স্থানে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান ওঠে বলেও শোনা যায়" (২৪/৫৩)।

"আমরা অবাক হয়ে দেখি, বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধিত (বাকশাল, ১৯৭৫ইং) হয়েছে। পার্লামেন্ট আছে, কিন্তু তাতে বিরোধী পক্ষ নেই। সরকার পক্ষই একমাত্র পক্ষ। গণতন্ত্রী দুনিয়ার কোথাও কেউ এমন দৃশ্য দেখেছে? ... তারপর প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হলো সর্বময় কর্তার। ... শেখ সাহেব স্বয়ং হলেন প্রেসিডেন্ট। নিজের হাতে রাখলেন দেশরক্ষা বিভাগ। ... বাংলাদেশের সৈন্যদলটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও তাতে তিনটি পরস্পরবিরোধী উপাদান। তার সবে চেয়ে অভিজ্ঞ অফিসার যাঁরা, তাঁরা পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন কেউ কেউ পাকিস্তানের সহযোগীও ছিলেন। তাঁদের চেয়ে কম অভিজ্ঞতা যাঁদের, তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে আরেক রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, সেটা বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা। অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ তরুণরা দেশের স্বাধীনতার পর কমিশন পেয়েছেন, ইতিপূর্বে হয়তো মুক্তিবাহিনীতে লড়েছেন। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে ... এমন প্রশ্নও তো উঠতে পারে, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ... মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা কার কত বেশি? ... কে কতটা ধর্মপ্রাণ, ... কে কতটা দেশভক্ত? ... গণতন্ত্রের গণেশ ওল্টালে কার মনে হর্ষ, কার মনে বিষাদ?" (১(১)/৩৮-৩৯)।

"শেখ সাহেব দেশরক্ষার দফতর আপনার হাতে রেখে সংবিধানের মূলসূত্রগুলি সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বাইরে থেকে আক্রমণের আশংকা ছিল না। ভিতর থেকেই বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ছিল। পাকিস্তানী পঞ্চম বাহিনী সর্বক্ষণ সক্রিয়। চীনপন্থীরাও কতক অঞ্চলে তৎপর। যাদের সেভাবে চিহ্নিত করা যায় না, তাদের হাতেও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও তাদের মেজাজটাও ধ্বংসপ্রবণ। ... মাঝখানে তিনি পার্টির সভাপতিত্ব পাত্রান্তরিত করে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পেয়েছিলেন। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের পর তিনিই হন একাধারে রাষ্ট্রপতি তথা দলপতি। দলটিও হয় দেশের এক ও অদ্বিতীয় দল। অন্যান্য দলগুলোকে ভেঙ্গে তাদের সদস্যদের ডাক দেওয়া হয় বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগে (বাকশাল) যোগদান করতে। মহানুভবতার পরিচায়ক সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্বুদ্ধিতারও। বাইরে থেকে যারা যোগ দিতে আসবে,তারা যে তাদের আপন আপন মতবাদ ভুলে যাবে তা নয়। দলের ভিতরে ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোবে" (১(১)/৩৯-৪০)।

"পনেরোই আগস্ট (১৯৭৫ইং) প্রত্যুষে মুজিব পরিবারের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। তাঁর বহু আত্মীয়স্বজনকেও। এর নাম ক্রাইম এগেনস্ট হিউমানিটি। ... তারপর দোসরা নভেম্বর মধ্যরাত্রির পরে কারাগারে প্রবেশ করে বন্দী অবস্থায় ... হত্যা করা হয়েছে যাঁদের, তাঁরা মুজিবের বিশ্বস্ত সহকর্মী তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামারুজ্জামান। এর নাম ক্রাইম অব দ্য সেঞ্চুরি। ... গোটা বঙ্গোপসাগরের জল দিয়ে এই রক্ত মুছে সাফ করা যাবে না" (১(১)/৪৪)। অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা থেকে বাংলাদেশের ১৯৭২-'৭৫ইং সময়কালের একটা দৃশ্যমান ভাষ্য এবং এরই প্রান্ত-পরিণামে মুজিব-হত্যা এবং জেল-হত্যাকান্ডের অমানবিক বিবরণ পাওয়া গেল। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সমকালীন ঘটনাবলী ছিল উদ্ধৃত বিবরণের চেয়েও বহুমাত্রিক জটিলতা এবং ষড়যন্ত্রে আচ্ছন্ন। ঐতিহাসিক বাস্তবতার সন্ধানে,আবেগ-ভক্তি-বিরূপতা যথাসাধ্য এড়িয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের সাড়ে তিন বছর সময়টাকে বহুমুখী ভাষ্যে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন একান্ত অনস্বীকার্য।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবুর রহমান স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর সরকারের সামনে পুঞ্জিভূত বহুমুখী চ্যালেঞ্জগুলির একটি তালিকা উপস্থাপন করেছেন (১(৩)/১৩৮১) :

১. দেশের জনগণের আকাশচুম্বী আশা-আকাঙ্খার বাস্তবায়ন করা, ১১-দফায় উল্লেখিত দাবিগুলো, যেমন ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ, ব্যাঙ্ক-বীমা, পাট-ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করা, কৃষকদের খাজনা কমানো, বকেয়া খাজনা মওকুফ করা ইত্যাদি বাস্তবায়ন করা।
২. মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে পূণর্বাসন করা। শহীদ ও আহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা।
৩. দালালদের আটক ও বিচারের সম্মুখীন করা।
৪. পাকিস্তানে আটক বাঙালিদেরকে ফিরিয়ে আনা।
৫. ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভারতে ফেরৎ পাঠানো।
৬. সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা।
৭. আন্তর্জাতিক তেলের বাজারে মূল্যবৃদ্ধিজনিত প্রভাব, বাংলাদেশকে ঘিরে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনাশের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি মোকাবেলা করা বঙ্গবন্ধু সরকারের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়।
৮. সর্বোপরি বিরোধী রাজনীতি - যেমন জাসদ ও সর্বহারা পার্টির সরকার-বিরোধী কার্যকলাপ নতুন সরকারের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল"।

আজ এতকাল পরে পেছন ফিরে তাকিয়ে, নিশ্চিতভাবেই ধারণা করা চলে, উল্লেখিত তালিকার ভিত্তিতে নিশ্চয়ই অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তৎকালীন পরিবেশে, প্রতিটি প্রসঙ্গই সংশ্লিষ্ট শ্রেণী-গোষ্ঠির কাছে ছিল 'সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারযোগ্য'। তখন একসাথে সকলকে সন্তুষ্ট করা একান্তই অসম্ভব ছিল।

"শেখ মুজিবকে নিয়ে আলোচনায় কখনো ব্যক্তি মুজিবকে পরিচিত করানো হয়

না। জাতির পিতা ... স্বাধীনতার স্থপতি ... রাজনীতিবিদ ও একটি জাতিসত্ত্বার প্রবক্তা ... ব্যর্থ বা সফল প্রশাসক শেখ মুজিব আলোচিত হন, সমালোচিত হন ... অথচ ব্যক্তি মুজিব ... জনগণের 'শ্যাখ সাব', ... ভিন্ন পরিমাপে আলোচিত হতে পারেন। ... ব্যক্তিগত গুণের কারণেই ... নেতারা মহত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সাধারণ মানুষের বুকে স্থান পেয়েছেন।" এবিএম মূসার প্রাসঙ্গিক মন্তব্য : "শেখ মুজিবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর বিরাট হৃদয়। ... তাঁর সমসাময়িক কোনো কোনো রাজনীতিবিদ বলতেন, শেখের মাথায় কিছু নেই, মুখের জোরে রাজনীতি করে গেল। জনগণের আবেগকে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন - এসব ঢালাও মন্তব্যের জবাবে বলতে হয়, এদেশে নেতা হওয়ার জন্য একটিমাত্র বস্তু অতীব প্রয়োজনীয়। তা হচ্ছে হৃদয়, বিরাট একটি হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে। সর্বোপরি প্রয়োজন ক্যারিশমা, জনগণকে কাছে টানার, উদ্বেলিত করার ... জন্য একটি বড়সড় ওজনদার কলিজা থাকতে হবে। শেখ মুজিবের তা' ছিল" (১৪/৭৭-৭৮)। "শেখ মুজিব মানুষ ছিলেন, দেবতা ছিলেন না। তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ করা যেমন কাম্য নয়, তেমনি ইতিহাসে তাঁর অবদানও অস্বীকার করা অন্যায়। ... আমরা যখন শেখ মুজিবের সমালোচনা করি, তখন তাঁর পাশে অন্যান্য জাতীয় নেতাকে বসালেই বোঝা যায়, তিনি কোথায় বড় ছিলেন" (১(৩)/১৩১২)।

প্রাজ্ঞজন, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শাহ এ.এম.এস. কিবরিয়ার পর্যবেক্ষণ : "দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হচ্ছে যে, বঙ্গবন্ধুর তিন বছরের শাসনকাল সম্পর্কে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস আজো লেখা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর সমর্থকেরা যেভাবে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধাচারীরা মূল্যায়ন করেছেন বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে" (১(১)/৮৫)। বিচারপতি হাবিবুর রহমান লিখেছেন, "ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক নেতাদের জনপ্রিয়তা কিছুটা নষ্ট হওয়ার কথা, কিন্তু তা যে এত তাড়াতাড়ি হয়েছিল তার পেছনে রয়েছে দেশের জনগণের প্রত্যাশা ও হতাশার টানাপড়েন, শেখ মুজিবের শত্রুদের নিরলস প্রয়াস এবং বন্ধুবর্গের নিষ্ক্রিয়তা। ... সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি শনাক্ত করতে পারেননি। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যাদের আনুগত্য ছিল না, তাদের প্রশাসনে রেখে সাফল্যের সঙ্গে বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, এমন সাবধান বাণী ক্যাস্ট্রো, টিটো বা বুমেদিন উচ্চারণ করে থাকলেও ... শেখ মুজিব সে সম্পর্কে তখন তেমন দুশ্চিন্তা করেননি। ... শেখ মুজিব গঠনমূলক চিন্তা করার ... অবকাশ পাননি। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতাহীনতা ও কোন্দল, সুযোগসন্ধানী বেসামরিক ও সামরিক আমলাদের ... আত্মপ্রতিষ্ঠার চক্রান্ত ও দুর্নীতি, অর্থনীতিবিদদের অবাস্তব পরিকল্পনা এবং তাঁর চারপাশের ব্যক্তিদের সীমাহীন অর্থলিপ্সা মধ্যাহ্নে অন্ধকার সৃষ্টি করেছিল" (১(১)/৯৬-৯৭)।

দৈনিক 'সংবাদ'-সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, বহুল পঠিত-আলোচিত 'দরবার-ই-জহুর' শিরোনামের কলামে লিখেছিলেন, "দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জনসাধারণ আশা করেছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নতুন করে গড়ার জন্য এবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা শুরু হবে। তাদের মানসিক প্রস্তুতিও ছিল সে-কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কিন্তু

সব দল না হলেও অধিকাংশ দলের কার্যকরী ঐক্যর বদলে দেখা গেল আওয়ামী লীগের একাংশই ('জাসদ' নামে) বেরিয়ে গেল। ... রাজনৈতিক দলগুলোর একে অপরকে দেশদ্রোহী, অমুকের দালাল, তমুকের দালাল বলা শুরু হয় স্বাধীনতার পর থেকেই, অর্থাৎ সে-পুরণো ট্রাডিশনের পূণরাবৃত্তি। তফাত এটুকু যে, এবার আর গলাবাজি হাতাহাতি নয়, রীতমত স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের মারাত্মক খেলা। কারণ, সরকার সমর্থক এবং বিরোধী দলগুলো, সকলের হাতেই অস্ত্র ছিল। ... শাসনযন্ত্রেও বিশৃঙ্খলা ক্রমে চুড়ান্ত হয়ে উঠল" (৯/৫৯)।

অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে একজন ব্যর্থ প্রশাসক, অসফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু ইতিহাসে তার বিপরীত ভাষ্য মেলে। মুক্তিযুদ্ধ অবসানের এক বছরের মাথায় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ইং ঢাকার আমেরিকান দূতাবাস থেকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং হেনরি কিসিঞ্জার প্রমুখের কাছে পাঠানো একটি 'বিশেষ প্রতিবেদন'এ জানানো হয়েছিল : "বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী প্রায় সবকিছুই আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছেন। পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। ... তিনি যেভাবে প্রশাসনকে সাজিয়ে তুলেছেন, তাতে বুঝবার উপায় নেই যে, মাত্র এক বছর আগে এই দেশের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ইতিমধ্যে বড় বড় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বরখাস্ত করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমতি থাকলেও একথা বলাই যায়, এই নতুন সরকারের প্রশাসনযন্ত্র সচল হয়ে উঠছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবনার বিষয়, ... আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনো নাজুক অবস্থায়। ... মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা বাহিনীর প্রায় ৩০হাজার সদস্য, যারা দেশের ভেতরে থেকে যুদ্ধ করেছে, তাদের প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র রয়েছে, যা এখনো উদ্ধার হয়নি" (২২/১১৫-১১৬)।

ড. দেওয়ান ওয়াহিদ নবী, স্বাধীনতা-পরবর্তী সমস্যা-সংকটের পর্যবেক্ষণমূলক ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "স্বাধীনতার সংগ্রামে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের সবার আদর্শ বা উদ্দেশ্য এক ছিল না। ... তাই স্বাধীনতার পর তাঁদের মধ্যে অনৈক্যের সুর বেজে উঠলো। মুক্তিবাহিনীর মধ্যে মুজিববাহিনী জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। জাসদের অতি উৎসাহী সমাজতন্ত্রের আহ্বানে অনেক তরুণ সাড়া দিলে এবং আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হলেও স্বাধীনতা-পরবর্তী গঠনমূলক কাজে সাহায্য করেনি। স্বাধীনতা-বিরোধী পরাজিত শক্তি স্বাধীনতা লাভের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। ... তাদের সংগঠন একেবারে দুর্বল হয়ে যায়নি। বিশেষ করে অতি-বাম কিছু দল দেশের কোনো কোনো অংশে অরাজকতার সৃষ্টি করে। এইসব কারণে পরবর্তীকালে একজন সেনা-নেতার নেতৃত্বে সমস্ত স্বাধীনতাবিরোধী দলগুলি একত্রিত হলে বেশ শক্তিশালী একটা জোট গড়ে উঠে। ... স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তিগুলি বিশেষ করে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে। ... সবচেয়ে ক্ষতি যেটা করলো, সেটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের একদল মানুষের মনোবৃত্তি। ... এঁদের সহযোগিতায় একদল ব্যবসায়ী ও অমলা দুর্নীতির পাহাড় গড়ে তোলে। 'আমি ভিক্ষা করে নিয়ে আসি আর চাটার দল সব খেয়ে ফেলে' - শেখ মুজিবের এই উক্তির মধে যে কতটা দুঃখ, হতাশা, অভিমান আর ক্রোধ লুকানো রয়েছে, তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়" (১(৩) ১৫০৪-১৫০৬)।

"যারা পাচারকারী এবং চোরা-কারবারী তারা বিবেকহীন ব্যবসায়ী। কিন্তু যা জনগণের কাছে অসহ্য ছিলো, তা হলো এরা অনেকেই ব্যবসা করতো আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য অথবা অন্যকোনো স্থানীয় নেতার ছত্রছায়ায়। '৭২-এর ৬ই এপ্রিল শেখ মুজিব এ রকমের ১৬জন নির্বাচিত সদস্যকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করেন। তিন দিন পর বহিষ্কার করেন আরও ৭জনকে। ... সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বহিষ্কার করেন আরও ১৯জনকে। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন বড়ো কর্তকেও পদচ্যুত করেন"। ১৯৭২ইং ১৯ আগস্ট ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "আমি ৪৬জন গণপরিষদ সদস্যকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করেছি। অন্য কোন পার্টি জীবনে তা করে নাই। কিন্তু যারা বড় বড় কথা বলে, তাদের আয়নার দিকে চেয়ে কথা বলতে হবে। ... আজ আত্মসমালোচনা করে নিও। .... স্বাধীনতা ভোগ করতে হলে আগে জানতে হবে, স্বাধীনতার মর্ম কি। তাই ছাত্র ভায়েরা ও বোনেরা, ... মানুষের মত মানুষ হও। স্বাধীন দেশের নাগরিক হও। ... মিথ্যা, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও" (১(২)/৬৩১)। কিন্তু চরম নেতিবাচক অভিজ্ঞতায় সবারই জানা, বঙ্গবন্ধুর ভালো কথায় বা কঠোরতায়, আওয়ামী লীগের নীতিহীন অংশটিতে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। গোলাম মুরশিদের প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ : "তিনি যা করেছিলেন, তা ছিলো বড্ডো কম এবং বড্ডো দেরি করে" (২০/১৮৮-১৮৯)। আর একথাও অনস্বীকার্য যে, তখন বিভিন্ন মহলেই সকল প্রকার সমালোচনা এবং বিরূপতার 'টার্গেট' করা হতো বঙ্গবন্ধুকেই।

প্রসঙ্গতই দার্শনিক আঁন্দ্রে মালরোর কিছু মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯৭৩ইং বাংলাদেশ সফরে এসে শিক্ষাবিদ খান সারওয়ার মুরশিদের সাথে আলোচনায় মালরো বলেছিলেন, "আপনারা বাঙালিরা বড়ো ধৈর্যহীন। আপনারা সব কিছু একসঙ্গে পেতে চান - একটুও অপেক্ষা করতে নারাজ। জানেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের ফ্রান্সের ... প্রথম ক'বছর আমাদের কি কষ্টে কেটেছে? খাবার, পানি, কয়লা, বাসস্থান, যাতায়াত ব্যবস্থা সবকিছুর সংকট ছিল। পৌরসেবা তো ছিল না বললেই চলে"। (১(১)/১৮৯)।

দার্শনিক মালরোরর মন্তব্যর সাথেই আমরা স্মরণ করতে পারি, বাংলাদেশের সাংবাদিক এবং মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী আন্দোলনের প্রথম সারির 'এ্যাক্টিভিস্ট' শাহরিয়ার করিরের একটি সখেদ মন্তব্য : "পৃথিবীতে বাঙালি জাতির মত গর্বিত জাতি খুবই কম পাওয়া যাবে। যে জাতি নিজের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য, নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে,স্বাধীনতার জন্য যে জাতির আত্মদানের তূলণা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, ... । আবার এই বাঙালিরই আত্মবিস্মৃতি, ইতিহাসের প্রতি অবজ্ঞা এবং বিশ্বাসঘাতকতার দায় অনেক সময় গোটা জাতিকেই বহন করতে হয়েছে। দু'শ বছর আগে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতার যে নজির স্থাপন করেছিলেন, তার ধারাবাহিকতা আজও উদ্ভাসিত রয়েছে। ... মুজিব ছাড়া একাত্তরে বাংলাদেশ হতো না, বাঙালি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পেতো না। ... মুজিব বাঙালিকে মুক্ত করেছেন দাসত্বের সেই শৃঙ্খল থেকে" (১(১)/৩৬৯, ৩৭৯)। আবার একথাও অবনত মস্তকেই চিরকাল স্বীকার করতে হবে

যে, পাকিস্তানি সেনা-আমলা এবং গোয়েন্দারা একধিকবার তাঁকে 'দেশদ্রোহী ষড়যন্ত্র মামলা'য় জড়িয়েও, এমনকি স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের পরেও তাঁকে হত্যা করতে সাহস করেনি, কিন্তু বিকৃত মানসিকতার কতিপয় বাঙালি সৈনিক তাঁকে হত্যা করতে পেরেছে। কে জানে কত দিনে কত দেশপ্রেমিক সৎকর্মে বাঙালির হাত থেকে পিতৃহত্যার রক্ত-দাগ মুছবে? একটা অনিবার্য প্রশ্ন, বঙ্গবন্ধুর খুনীরা কি নিতান্তই নিঃসঙ্গ ছিল, নাকি অগণিত সমর্থক-সহযোগী ছিল দেশে এবং দেশে বাইরেও। সকলেই কি সম-স্বার্থে জড়িয়েছিল?

সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বমুখী সংকটের অন্ত ছিল না, অন্যদিকে 'সবকিছুই এখুনি পেতে হবে প্রত্যাশায়' সকল নৈতিকতাই হারিয়েছিল কিছু মানুষ। "স্বাধীনতার আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস কেটে যেতে সময় লাগেনি। তারপর কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখী হয় বাংলাদেশ সরকার। যুদ্ধের সময় দেশের পুরো অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত হয়েছিল ... প্রশাসনিক অবকাঠামোও লোপ পেয়েছিলো। কলাকারখানা, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানি, রাস্তাঘাট, সড়ক-সেতু ও রেলসেতু-সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা, শিক্ষা, উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা কমবেশি অচল হয়ে পড়েছিল। ... বাংলাদেশ তখন যে-অনটনের মধ্যে ছিলো, সমগ্র বিশ্ব চেষ্টা করলেও, তা থেকে রক্ষা করা সহজ ছিলো না। যেমন, ত্রাণ সামগ্রী দেশে এলেও, তা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া প্রায় অসম্ভব ছিলো। কারণ, তার জন্যে যে-অবকাঠামো দরকার, ... তা ভেঙ্গে পড়েছিলো। বন্ধ কলকারখানাগুলো চালু করাও সহজ ছিলো না। ... একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে যে-কারিগরী জ্ঞান এবং দক্ষতাসম্পন্ন পরিচালক প্রয়োজন, বাঙালিদের মধ্যে তা খুব কমই ছিলেন। ... উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা - উভয়ই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিলো। ... সরকার ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে ক্ষমতার যে দ্বন্দ্ব চলছিলো" (২০/১৮৩-১৮৪) সেটাও প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রবল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর তাই, অর্থনৈতিক বিবেচনায় বলি কিংবা ধর্ম-সাম্প্রদায়িক, মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষেই অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

প্রাজ্ঞজন জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর মন্তব্য : "বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচয়ে দেখা দিলেও রাষ্ট্র হিসেবে তার বুনিয়াদ দৃঢ় হওয়ার অবকাশ মেলেনি। ... সক্রিয় ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শক্তি, দেশের ভিতরে ও বাইরে। ... এই দুই শক্তি, একযোগে কাজ করেছে। ... কিসিঞ্জারের কুটবুদ্ধি কাজ করেছে এই যৌথ উদ্যোগের পিছনে। কিসিঞ্জারের সঙ্গে নাম করতে হবে আরও একজন মনুষ্যরূপী সর্পের, ... ভুট্টো ছিলেন এক আহত সর্প। বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের সঙ্গে তাঁর ছিল গোপন ও অব্যাহত যোগাযোগ। ... সরকারের শীর্ষে বঙ্গবন্ধু ... তবে এ সন্দেহও মন থেকে তাড়ানো যায় না যে, বঙ্গবন্ধু তাঁর সকল সুকৃতি তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তা, তাঁর আদর্শের ধ্রুবতা, তাঁর প্রশ্নাতীত সততা সত্বেও সেদিনের টালমাটাল সময়ের জন্য উপযুক্ত সরকার প্রধান ছিলেন কিনা। তাঁর ... মহৎ গুণ, - ক্ষমা, উদারতা - ওই সময়ে তাঁর দুর্বলতা হিসেবে দেখেছেন অনেকে। তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়েছিল যারা, সৎ পরামর্শ দেবার ইচ্ছা বা সাহস তাদের ছিল না। তাঁর এতদিনের সংগ্রামের সাথী, একাত্তরের প্রবাসী

বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, তাজউদ্দিন আহমদকে তিনি কেন তাঁর সঙ্কটের দিনে দূরে সরালেন, এ এক চরম বিস্ময়। তাজউদ্দিন আহমদের মতো তীক্ষ্ণধী, দূরদর্শী ও পরীক্ষিত নেতাকে সর্বাধিক দায়িত্ব দিয়ে নিজেকে কিছুটা নেপথ্যে রেখে সরকারের অভিভাবকত্ব করা ছিল ওই অস্থির সময়ের দাবি। এ-সত্য উপলব্ধি করেননি বঙ্গবন্ধু" (১(১)/৬৪-৬৫)।

"যে-তাজউদ্দিন যোগ্যতার সঙ্গে ন' মাস নির্বাসিত সরকারকে পরিচালনা করেন এবং মুজিবের প্রতি যাঁর ছিলো ষোলো আনা আনুগত্য ও ভালোবাসা, সেই তাজউদ্দিনের কাছ থেকে তিনি একদিনও শোনেননি, ন'মাস ধরে তিনি কিভাবে দেশকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। মুজিব এই বিবরণ শুনেছিলেন তাজউদ্দিন-বিরোধী তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে। তাই তাঁর 'ভালো খাতা' থেকে তাজউদ্দিন বাদ পড়েন। এমনকি, একসময় বাদ পড়েন মন্ত্রীসভা থেকেও। তাঁর বদলে তাঁর 'ভালো খাতা'র অন্ত র্ভূক্ত হন খন্দকার মোশতাক, যে-মোশতাক যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দালালি করেছেন; এবং যে-মোশতাক পরে ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দিয়ে মুজিবকে নিষ্করুণভাবে হত্যা করেছিলেন সপরিবারে। ... তারপর ক্ষমতা দখল করেছিলেন"। প্রসঙ্গতই গোলাম মুরশিদ উল্লেখ করেছেন, "কামাল হোসেন নিজের কানে একদিন শুনেছেন, কিভাবে বেগম মুজিবের কাছে মোশতাক নিন্দা করছিলেন তাজউদ্দিনের। এ হলো বিশ্বাসঘাতক এবং দালালদের ক্ষমতায়নের একটি কালো দৃষ্টান্ত। এবার দৃষ্টান্ত দেয়া যাক ভুল লোক নির্বাচনের। ... মুজিব-হত্যার বিচার প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বাংলাদেশের তখনকার প্রধান সেনাপতি জেনারেল সফিউল্লাহকে 'মিথ্যাবাদী এবং কাপুরুষ' বলে উল্লেখ করেছেন। মিথ্যাবাদী এবং কাপুরুষ কিনা, আমার জানা নেই। কিন্তু তিনি যে তাঁর পদের যোগ্য ছিলেন না, এবিষয়ে তেমন সন্দেহ নেই" (২০/১৮৫)। এমন আরো ক'জন 'অযোগ্য এবং নীতিভ্রষ্ট' মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন গোলাম মুরশিদ, ব্যক্তিগতভাবেও নানা সূত্রেই অনেকে আরো অনেকের কথা জানেন। তবে নিতান্তই বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের 'জঞ্জাল' হিসেবে সে প্রসঙ্গ এখানে বাদ দেয়া যেতে পারে।

মুজিব-তাজউদ্দিন সম্পর্কের প্রসঙ্গটি স্বাধীনতা পরবর্তী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে শুধু যে একান্ত গুরুত্বপূর্ণই ছিল, তাই নয়, দু'জন মহান নেতার সম্পর্কের সংবেদনশীলতাও এড়িয়ে যাবার মত নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দিনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাঝে কে বা কারা যেন একটা বিভেদের দেয়াল নির্মানে সচেষ্ট ছিল। মুজিবের মূল শক্তিই ছিল তাঁর গণ-সম্পৃক্ততা। কিন্তু পাকিস্তানের বন্দীশালা থেকে ঢাকায় ফিরেই যেন তিনি দলীয় ছাত্র-নেতৃবৃন্দের অতি-সচেতন সাবধানতার দেয়ালে আটকা পড়ে গেলেন। অনুগত ছাত্রনেতারা দৃশ্যতই মুজিবকে সম্ভাব্য আততায়ীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য যে প্রতিরক্ষা-ব্যুহ রচনা করেছিল, তাতেই গণমানুষের 'শ্যাখ সাব' বঙ্গবন্ধু মুজিব ক্রমশই জন-বিচ্ছিন্ন 'দূরের মানুষ' হয়ে পড়ছিলেন।

প্রাসঙ্গিক একটি অন্যতর গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেছেন এস. এ. করিম :

"This was their moment and they took advantage of it. ... Sheikh Moni,

Sirajul Alom Khan, Tofael Ahmed and Abdur Razzak. Then they sat down with Mujib ... to brief him about developments of the preceding year in the 'Mujbnagar' government ... It is not difficult to imagine the tenor of their deatribe: Tajuddin was hungry for power and that is why he had unilaterally declared himself to be the Prime Minister of the government-in-exile. He had disobeyed the wishes of Bangabandhu and tried to keep the student leaders from performing their rightful role during the liberation struggle. He was responsible for the disgraceful infighting within Awami League. Instead of uniting the ranks of the Awami League he had devided them. He had excessive ambition and would ... relegate Mujib to a figurehead position as President. Hence he might be removed from his position as Prime Minister ... some members of Mujib's immediate family, especially his brother-in-law, Serniabat, who had sided with Sheikh Moni in Calcutta, helped to create an unfavourable opipnion of Tajuddin in Mujib's mind" (৭/২৬৪-২৬৫)।

পূর্বোল্লেখিত অন্নদা শঙ্কর রায়ের দীর্ঘ বর্ণনায় যেমন স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের দৃশ্যমান বিবরণ মেলে, তেমনি যেন অনিবার্য ভবিতব্যের বিবরণ রয়েছে উপরোদ্ধৃত এস. এ. করিমের পর্যবেক্ষণে। ইতিহাস অপ্রিয় সত্যকেও এড়িয়ে যায় না। তবে একথাও ততোধিক সত্য যে, সমকালীণ ইতিহাসে ভুল বা আবেগ-বিভ্রান্তির যে জঞ্জাল ভাসে, সময়ের ঢেউই ইতিহাসকে সেই জঞ্জালমুক্ত করে। কিন্তু মেনে নেয়া দরকার, তাতে অনিবার্য ভবিতব্য এড়ানো যায় না। প্রসঙ্গতই অনেক পরবর্তী সময়ের দু'টি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে, যদিও তার আগেই বাংলাদেশের ইতিহাসের দুর্ভাগ্যজনক পরিবর্তন ঘটে গেছে। একটি তথ্যের উল্লেখ করেছেন স্বাধীনতার পরবর্তী ১৫আগস্ট ১৯৭৫ইং পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সহকারী একান্ত সচিব শাহরিয়ার ইকবাল, আর দ্বিতীয়টি তোফায়েল আহমেদ। দু'জনেই প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। শাহরিয়ার ইকবালের বক্তব্যে আমরা মুজিবের চোখে দেখি তাজউদ্দিনকে আর তোফায়েল আহমদের লেখায় মুজিবকে পাই তাজউদ্দেনের চেতনায়। প্রশ্ন জাগতেই পারে, বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা স্থপতি বঙ্গবন্ধু মুজিব এবং সংকটকালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নকারী তাজউদ্দিন - উভয়েই কালক্রমে নিহত হয়েছেন একই শত্রু-গোষ্ঠির হাতে, সেকি নিতান্তই কাকতালীয়?

শহরিয়ার ইকবাল লিখেছেন, "১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন বঙ্গবন্ধু। তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে (পূর্ব পরিচয় সূত্রে) খুবই স্নেহ করতেন। ... আমি তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলাম বঙ্গবন্ধুর কাছে। ... তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি ... তখনকার অর্থমন্ত্রীর বাসভবনে তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। ... তাজউদ্দিন সাহেব .... বললেন, 'আপনি সরকারী চাকুরি করেন। কেন অসুবিধায়

পড়তে চান'। আমি তাঁকে জানালাম যে, আমি বঙ্গবন্ধুর অনুমতি নিয়েই তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছি। ... ২৫জানুয়ারি ১৯৭৫ বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব (সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর পর) গ্রহণ করেন। ২৬ তারিখ সকালে তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে গণভবনের দোতালায় তাঁর কক্ষের পাশের একটি কক্ষ রাষ্ট্রপতির Special Assistant-এর জন্য যেন খালি করা হয়। তিনি আরও বললেন যে, জনাব তাজউদ্দিন রাষ্ট্রপতির Special Assistant-এর পদে আসবেন। আমি আনন্দিত হয়ে তাজউদ্দিন সাহেবকে ফোন করেছিলাম। তিনি বললেন, তাঁকে অনুরূপ প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। পরে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি" (১(১) ২২০)।

তোফায়েল আহমদের জানানো তথ্যটি হচ্ছে : "তাজউদ্দিন ভাইকে মন্ত্রীসভা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রতিদিন তাউজউদ্দিন ভাইয়ের বাসায় যেতাম। তাজউদ্দিন ভাই আমায় বলতেন, 'দেখো তোফায়েল, সারা জীবন যা করেছি, তার সবই মুজিব ভাইয়ের খাতায় জমা রেখেছি। আমার নিজের খাতায় কিছুই রাখিনি। যেকোনো মূল্যে মুজিব ভাইকে বাঁচাতে হবে। মুজিব ভাইকে বাঁচাতে না পারলে আমরা কেউ-ই বাঁচতে পারবো না। এই স্বাধীনতা সবকিছু অর্থহীন হয়ে যাবে'। ভাবতে অবাক লাগে, তাজউদ্দিন ভাই মন্ত্রীসভায় ছিলেন না, সরকারে ছিলেন না, অথচ বঙ্গবন্ধু হত্যার পর রক্ত দিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি ভালোবাসার ঋণ পরিশোধ করে গেছেন" (প্র.আ, ৩-১১-'১২)। এক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই উপলব্ধি করবো যে, মুজিব-তাজউদ্দিনের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিভেদ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল, সেটা আদৌ তাঁদের পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি কিংবা মান-অভিমানে ঘটেনি। এর পেছনে ছিল এমন কোনো চক্রান্ত, যে সম্পর্কে শুধু মোশতাকের নামোল্লেখ ছাড়া, কোনো বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা এখনো করা হয়নি।

ফেরা যাক বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রসঙ্গ-কথায়। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান লিখেছেন, স্বদেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধু "সম্মুখীন হয়েছিলেন পর্বতপ্রমান সমস্যার। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের পূণর্গঠন, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন, প্রাদেশিক সরকারকে জাতীয় প্রশাসনযন্ত্রে রূপান্তরিত করা, ঘাতক-দালালদের বিচার, যুদ্ধবন্দীদের বিচারের প্রশ্ন একদিকে, অন্যদিকে যুদ্ধবন্দীরা মুক্তি না পেলে পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের ছাড়া হবে না বলে ভুট্টোর হুমকি, ঘাতক-দালাল সংক্রান্ত আইন বাতিল করার দাবি, আটক বাঙালিদের পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের পরিবারের দাবী– এসব পরস্পরবিরোধী স্রোতের মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হচ্ছিল। ... মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে অস্ত্র সমর্পন করালেন, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব স্পষ্টগোচর করবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করালেন। নয় মাসে আমাদের সংবিধান প্রণীত হলো, আঠারো মাসের মাথায় সাধারণ নির্বাচন হলো। দেশের অবকাঠামো যতোটা সম্ভব পূণর্গঠন করা গেল। বহু দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেল। তবে ... দেশের সর্বত্র অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর দলের মধ্যে কোন্দল সৃষ্টি হয়েছিল। ... বাংলাদেশবিরোধীরা মুক্তিযোদ্ধা-হত্যা থেকে পোস্ট অফিস লুণ্ঠন প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়ে গেল। ... এই সময় সবচেয়ে ক্ষতিকর হলো তাঁর সাথে তাজউদ্দিনের দূরত্ব সৃষ্টিতে একদল মানুষের সাফল্য। ... যুক্তরাষ্ট্রের অবিচ্ছিন্ন বিরূপতার কথাও ... মনে

রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সাফল্যের তালিকা দীর্ঘতর করা যেতে পারে, ওই বৈরী পরিস্থিতিতে তাঁর ব্যর্থতা বা ভুল সিদ্ধান্তের তালিকাও তৈরি করা যেতে পারে। তিনি মানুষ ছিলেন -ভুলত্রুটির উর্ধে ছিলেন না" (১(১)/২৪৫-২৪৬)।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আব্দুল খালেক তদানিন্তন বাংলাদেশের রাজনৈতিক আদর্শের টানাপড়েনের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৭২ইং বছরের শুরুতে "দেশে ফিরে আসবার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমুহ থেকে বঙ্গবন্ধুর ওপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, স্বাধীন বাংলাদেশে যাতে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হয়। কিন্তু ... শেখ মুজিব গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়াবেন, তেমনটি আশা করা যায় না। ... তবে সমাজতন্ত্রের প্রভাব থেকে বের হয়ে আসাটাও সে-সময় অত সহজ ছিল না। কারণ, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তরিক সহযোগিতা এবং অন্যদিকে গণতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার বিষয়টিকে হালকা করে দেখবার সুযোগ ছিল না। এরই ফলশ্রুতি আমরা ১৯৭২ সালের সংবিধানে লক্ষ্য করেছি ... গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে। পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ... পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবার জন্য বঙ্গবন্ধু দেশবাসীর কাছ থেকে তিন বছর সময় চেয়ে নিয়েছিলেন। তিন বছরের মাথায় দেশে যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং অনাহারে বেশ কিছু লোকের মৃত্যু ঘটে, তখন বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন। ... যে শাসন-পদ্ধতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছে করলেই দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে দিতে পারে, সে শাসন-পদ্ধতির প্রতি আস্থা রাখা যায় কিভাবে?" (১(১)/৪২৬-৪২৭)।

১৯৭২-'৭৪ইং সময়কালে "বাংলাদেশের সকল বামপন্থী বুদ্ধিজীবি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা কায়েমের জন্য অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। তাঁদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য, যাঁদের দাবির প্রতি সম্মতি প্রদর্শন করতে বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্রের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেই সমস্ত বামপন্থী বুদ্ধিজীবি এবং রাজনৈতিক নেতাগণও বঙ্গবন্ধুর প্রতি সুবিচার করেননি। ... ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল বটে, কিন্তু ... বঙ্গবন্ধু যতদিন পুঁজিবাদী শাসন-ব্যবস্থা লালন করেছেন, দেশের অর্থনীতি যত সংকটময়, যত বিপন্নই হোক না কেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন বিপন্ন হয়নি। কিন্তু যখনই ... সমাজতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতির মাধ্যমে দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে গেছেন, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন,তখনই তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন" (১(১)/৪৩০)।

বাংলাদেশের সেই সংবিধান যখন রচিত হচ্ছে, তখন ১৯৭২ইং ১৬ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রসহ বাংলাদেশের সংবিধানের লক্ষ্য-আদর্শ প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "আমি জানি, আমার মত আপনারাও চারটি আদর্শ সমর্থন করেন। এই চারটি আদর্শের ভিত্তিতে

দেশকে বাঁচাতে চাই। ... আমরা নতুন প্রচেষ্টা নিয়েছি গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য। ... দুনিয়ায় দেখা গেছে, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে অনেক সময় মানুষের মঙ্গলের খাতিরে, বাধা দূর করার জন্য রূঢ় হতে হয়েছে। সেটা আমি করতে চাই না। ... আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, আমি চেষ্টা করে দেখছি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমার আন্দোলন। সেই জাতীয়তাবাদ না থাকলে স্বাধীনতার অস্তিত্ব নষ্ট হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাও আমার আদর্শ। এখানে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই" (১(১)/৪৬৫)।

রাজনীতি-গবেষক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অজিত কুমার দাস লিখেছেন, "ডানপন্থী ইসলামী দলগুলো, যাদেরকে স্বাধীনতার পরপরই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং যারা সংসদীয় গণতন্ত্রে মোটামুটি বিশ্বাস করলেও সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার কট্টর বিরোধী ছিল, তারাও নতুন সংবিধানের কট্টর বিরোধিতা শুরু করে এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে বানচালের জন্য উগ্র বামপন্থীদের সাথে হাত মেলায়। ... সিরাজ সিকদারের ... সর্বহারা পার্টি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঘোষণা করে, 'বাংলাদেশ ভারতের অধীন'। তাই দলটি 'স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা' কায়েমের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান জানায়। আব্দুল হকের ... পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল (মা-লে) , মোহাম্মদ তোয়াহার ... পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল, দেবেন সিকদারের ... কমিউনিস্ট পার্টি, অমল সেনের ... বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেলিনবাদী) ... প্রায় একই ধরণের আহ্বান জানায়। ... আব্দুল হক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ... ভুট্টোকে 'My dear Prime Minister' সম্বোধন করে ১৯৭৪ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক পত্র লেখেন। এতে তিনি 'ক্রীড়নক মুজিব সরকারকে" উৎখাত এবং 'পূর্ব পাকিস্তান' পূণঃ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ, অস্ত্র ও বেতার যন্ত্র চান। ... জামাতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পিডিপি প্রভৃতি ডানপন্থী দলগুলো গোপনে ভুট্টোর সমর্থন লাভ করে ... 'মুসলিম বাংলা' স্থাপনের জন্য কার্যক্রম শুরু করে। ... মওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, 'মুসলিম বাংলার জন্য যারা কাজ করছে, তাদের আমি দোয়া করি। আল্লাহর রহমতে তারা জয়যুক্ত হবে। শুধু মুসলিম বাংলা গঠন নয়, উগ্র পিকিংপন্থীদের 'স্বাধীন পূর্ব বাংলা' গঠনের দাবির সাথেও তিনি সংহতি প্রকাশ করেন" (১(২)/৭৬২-৭৬৩)।

প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি এবং 'নিঃসঙ্গ মুজিবের অক্ষমতা' উপলব্ধির জন্য বিচারপতি হাবিবুর রহমানের লেখা থেকে কিছু কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, "কোনো দেশের ইতিহাসে নাই বিপ্লবের পর বিপ্লবকে বাধা দিয়েছে যারা, শত্রুর সঙ্গে সহযোগিতা করেছে যারা, যারা এ দেশের মানুষকে হত্যা করেছে, তাদের কোনো দেশে কোনো যুগে ক্ষমা করে নাই। কিন্তু আমরা করেছিলাম। ... বলেছিলাম, দেশকে ভালোবাসুন, দেশের জন্য কাজ করুন, স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে নিন, থাকুন। কিন্তু অনেকের পরিবর্তন হয় নাই। তাঁরা এখনো গোপনে বিদেশীদের কাছ থেকে পয়সা এনে বাংলার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন" (১(১)/১০০)।

স্বাধীনতার পরই মওলানা ভাসানীর সাথে উগ্র পিকিংপন্থী গ্রুপের গোপন আঁতাত

গড়ে উঠে। প্রসঙ্গত মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায় লিখেছেন : "রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে ভাসানী যুক্ত ছিলেন প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে এবং নিপীড়িত হয়েছেন কর্তৃপক্ষের দ্বারা। কিন্তু, রাজনৈতিক জীবনের শেষ দিকে যেন ক্রীড়নক হয়ে গেলেন চরম-ডান ও বামপন্থীদের। এধরণের মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে ইন্ধন যুগিয়েছে সামরিক ষড়যন্ত্রের এবং সংসদীয় গণতন্ত্র বিনাশের। ... মাওবাদীরা ১৯৭৩ সালের ১৬ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসকে বেছে নেয় এবং বিজয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচী বানচাল ও জনগণের মধ্যে ত্রাস ... অরাজকতা ... সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তারা ১৬ডিসেম্বর বিজয় দিবসকে 'কালো দিবস', পরাধীনতার দিবস' বলে অখ্যায়িত করে। সিরাজ সিকদারের ... 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি' ঐদিন ঢাকায় 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ' এবং 'তাঁদের আওয়ামী লীগের পুতুল সরকারকে উতখাতের' দাবিতে হরতাল আহ্বান ও প্রচারপত্র বিলি করে। ... ভাসানী হরতাল সমর্থন করেন এবং ১৪ডিসেম্বর পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করেন, 'দেশে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, সশস্ত্র বিপ্লব হল একমাত্র পথ। ... তাঁর বয়স বেশি না হলে নিজেই অস্ত্র ধারণ করতেন'। মওলানা ভাসানীর জনসভার পরপরই মাওবাদীরা ঢাকাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের সাংস্কৃতিক ভবন, ভারতের একটি বিমান কোম্পানির অফিস, একটি দৈনিক পত্রিকা ... প্রভৃতি স্থানে হাত বোমা ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। ... ঢাকার সন্নিকটে ... ডিনামাইট দিয়ে রেল লাইন উড়িয়ে দেয় এবং ভৈরবের নিকট রেল লাইন খুলে ফেলে" (১(২)/৭৬৩-৭৬৪)।

এখানে মূল লক্ষণীয় বিষয়টি হচ্ছে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই, খ্যাত-অখ্যাত অনেক মহলেই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্বের এবং স্বাধীনতার আদর্শের কট্টর বিরোধিতা শুরু করা হয়েছিল। বিরোধিতাকারীরা অপপ্রচার, সশস্ত্র সংঘাত এবং স্যাবোটাজ ইত্যাদি সকল অপকর্মেই জড়িয়েছিলেন, অনেকেই যুক্ত হয়েছিলেন পাকপন্থী নানা লাইনসহ খোদ ভুট্টোর সাথেও। অপরদিকে, প্রকাশ্যে এবং সত্যিকার অর্থেই যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় আস্থাশীল ছিলেন, ন্যাপ (মোজাফফর) এবং সিপিবি'র মত সেই বামপন্থী দলগুলিও তখন দৃশ্যতই দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করছিল। একদিকে তাঁরা চরম ডান-বাম শক্তির বিরোধিতায় মুজিবের সহযোগী ছিলেন, অন্যদিকে সম্ভবত 'রাতারাতি রাজনৈতিক খ্যাতি-প্রতিপত্তি' অর্জনের জন্যই নানারকম মুজিব-বিরোধী কার্যক্রম শুরু করেছিলেন। এসময়ও তাঁরা সহযোগী শক্তি হিসেবে 'ত্রিদলীয় ঐক্যজোট' নামে আওয়ামী লীগের সমর্থক-সহযোগী-সুবিধাভোগী লাইনটা টিঁকিয়ে রাখছিলেন, অনেকে বলেন এঁদের আগ্রহেই মুজিব 'ত্রিদলীয় ঐক্যজোট' গঠনে সম্মত হয়েছিলেন, যদিও আওয়ামী লীগের দক্ষিণপন্থী অংশের প্রবল আপত্তি ছিল। আবার ঐক্যজোটের অংশভাগী হয়েও তাঁরা মুজিব এবং আওয়ামী লীগের প্রতি সমালোচনা-আক্রমনের সব সুযোগই গ্রহণ করতেন। আওয়ামী-লীগ রাজনীতিতে কোনো পরিকল্পনা, দূরদৃষ্টি বা বুদ্ধিমত্তার ছাপ থাকতে পারে, এটা তাঁরা বিশ্বাসই করতে পারতেন না।

১৯৭৩ইং ১ জানুয়ারি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দিবসে পুলিশের গুলিবর্ষণে মতিউল

এবং কাদের নামক ছাত্র ইউনিয়নের দু'জন কিশোর নিহত হয়। প্রধানমন্ত্রী মুজিব কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলীর হুকুমে কিংবা জ্ঞাতসারে এটা ঘটেছিল, এমন সামান্যতম প্রমানও নেই। এবিষয়ে সিপিবি-ছাত্র ইউনিয়ন মুজিবের কাছে প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিচার প্রত্যাশা করলে ঘটনার কার্যকারণ, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মুজিবের ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া জানা যেতো, এমনকি পূণরাবৃত্তি রোধ করাও সহজ হতো বলে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু সিপিবি-ছাত্র ইউনিয়ন, ভেতরে-বাইরে অনেক শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শ সত্বেও সেপথে যাযনি। বরং ৩ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে ছাত্র-জনসমাবেশে ডাকসুর ভিপি ছাত্র ইউনিয়নন নেতা, বর্তমানে সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রকাশ্যে বঙ্গবন্ধুর 'আজীবন ডাকসু সদস্যপদ' সংক্রান্ত 'রেকর্ড' ছিঁড়ে ফেলে শত্রুর চোখে প্রমান করলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকেও আঘাত করা যায়, সহযোগী শক্তির অংশভাগী হয়েও আঘাত করা যায়। দুর্বলতা ছিল আওয়ামী লীগের ভেতরেও, বঙ্গবন্ধুর কর্তৃত্ব এবং সরকারের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল আঘাত করা হয়েছিল ভেতর থেকেও। মাত্র কিছুকাল আগেই আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই জন্ম হয়েছে, 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নবিলাসী জাসদের। ওরা সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনে। বাস্তবতাবোধহীন 'রোমান্টিক বিপ্লব'এর নমুনা হিসেব পশ্চিমবঙ্গের 'নকশালবাড়ি' আর বাংলাদেশের 'জাসদ'এর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' আন্দোলনের পদ্ধতিগত তারমত্য থাকলেও পরিকল্পনা এবং পরিণাম তূল্যমূল্য ভাবা যেতেই পারে।

ফেরা যাক বাংলাদেশের ন্যাপ-সিপিবি-জাসদ বা মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়ন আর পিকিংপন্থী (জাসদ) ছাত্রলীগের কৃতকর্মের কথায়। দু'টি ঘটনাই সাহসী করে তুলেছিল চীন-মার্কিন-পাকিস্তান লবিসহ রাজাকার-দালাল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'বিপ্লবী' পরিচয়ের বাংলাদেশ-বিরোধী বহুমুখী শক্তিসমুহকে। অনস্বীকার্য যে, মুক্তিযুদ্ধজয়ী বাংলাদেশের বিপন্নতার প্রত্যক্ষ শুরুটা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের অংশভাগী জাতীয়তাবাদী এবং বামপন্থী শক্তির হাতেই। ওঁরা যদি তখন শক্ত-পায়ে-সোজা-মাথায় বঙ্গবন্ধুর পাশে, সৎ রাজনীতির পক্ষে দাঁড়াতেন, রাজাকার-দালাল দূরের কথা, আওয়ামী লীগের ভেতরের 'চাটার দল'ও দুষ্কর্মে দুঃসাহসী হতে দু'বার ভাবতো।

তিন খন্ডে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ'টির সম্পাদক ভিয়েনা-প্রবাসী এম নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, "কেউ কেউ ... বলেন, দেশ স্বাধীন হলে দেশটা কিভাবে চলবে, দেশের সার্বিক সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামো কি হবে, সেসব ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। আসলে যারা এমন উদ্ভট প্রচারণা করেন, তাদের উদ্দেশ্য একটা - যে করেই হউক, যে ভাবেই হউক, বঙ্গবন্ধুকে খাটো করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। ... তথ্য-প্রমান থাকার পরও বঙ্গবন্ধু মুজিবের চিন্তা-চেতনা, দূরদর্শিতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলেন, নিঃসন্দেহে তাদের মনোবিকারগ্রস্থ বলে আখ্যা দেওয়া যায়" (১(১)/৪৮৬)। প্রকৌশলী এবং পরিকল্পনাবিদ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এস. এম. নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা করা আর তাকে রাষ্ট্র

হিসেবে গড়ে তোলার লালিত স্বপ্ন দেশের সংবিধানের মাধ্যমে বাস্তবে রূপদানের জন্য" নিম্নোক্ত আদর্শিক লক্ষ্যটি, স্বাধীনতার ন'মাসের মধ্যে প্রণীত সংবিধানে সন্নিবেশিত করেছিলেন, যাতে বঙ্গবন্ধুর সামাজিক বৈষম্যহীন উন্নয়ন চিন্তার দিকটি লক্ষণীয় : "The state shall adapt effective measures to bring about a radical transformation in the rural areas through the promotion of an agricultural revolution, the provision of rural electrification, the development of cottage and other industries and the improvement of education, communications and public health, ... progressively to remove the disparity in the standards of living between urban and the rural ares" (১(১)/৪৫৪)।

"বঙ্গবন্ধুর সরকার দেশের পরিচালনভার গ্রহণ করার পরেই বড় ও মাঝারি পরিত্যক্ত শিল্প-কারখানাসমুহ সরকার কর্তৃক 'টেকওভার' এবং প্রায় ১৫শতাংশ দেশীয় শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আজ যত্রতত্র ... ঢালাওভাবে রাষ্ট্রীয়করণ সিদ্ধান্তের সমালোচনা শোনা যায়। বস্তুত সেই সিদ্ধান্তের সমালোচনা সেই সব ব্যক্তিই করতে পারেন, যাঁরা সেই সময়ের বাস্তবতা সম্পর্কে অজ্ঞ বা অন্ধ ছিলেন। ... মাঝারি এবং বড় প্রায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ছিলেন অবাঙালি, ৩৪শতাংশ আগে থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ব ছিল। ... শিল্প ক্ষেত্রে দেনার বোঝা ছিল শিল্পের প্রকৃত মূল্যের কয়েকগুণ। ... এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর হাতে দু'টি পথ খোলা ছিল। প্রথম পথ হত, এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকা, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হত, কারখানা বেওয়ারীশ হিসেবে বন্ধ থাকা, শ্রমিকরা চকরিচ্যুত হওয়া এবং চুরি ও লুটপাটের মাধ্যমে কারখানা ধবংস হওয়া। ... দ্বিতীয় পথ ... বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেছিলেন, শিল্পগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিশ্চিত ধবংস হওয়া থেকে রক্ষা করা। বঙ্গবন্ধু এ কারখানাগুলোকে দেখেছিলেন রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসাবে ... এই রাষ্ট্রীয়করণ শিল্পগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে, শ্রমিকদের কর্ম-সুযোগ ও আয় অব্যাহত রেখেছে এবং উৎপাদনে অবদান রেখেছে" (১(১)/৪৪৬-৪৪৭)।

তদানিন্তন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির একটা বাস্তব চিত্র মেলে 'সংবাদ'এর বিখ্যাত 'দরবার-ই-জহুর' কলামে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে (১৯৮০ইং) শাজাহান সিরাজ বলেছিলেন, "বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে কোটিপতির সংখ্যা ছিল দু'জন, আর এখন (জুন, ১৯৮০ইং) সে সংখ্যা ষাট থেকে সত্তর জন"। সংখ্যাগুলি বিশ্বাস না হওয়ায় জহুর হোসেন চৌধূরী খোঁজ-খবর করতে গিয়ে জানলেন যে, ড. আলীম আল রাজীর 'পিপলস্ লীগ' সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণের সূত্রে ১১ জুন তারিখের দৈনিক 'সংবাদ' লিখেছে, "শেখ সাহেবের আমলে '৭৪ সালে কোটিপতির সংখ্যা ছিল মাত্র দু'জন, জিয়ার আমলে হয়েছে ৬৪ জন"। তথ্যটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বাংলাদেশ ব্যাংক বুলেটিনের ১৯৭৯ সালের অক্টোবর সংখ্যার ৪৮০নং পৃষ্ঠায়'। "১৯৭৪ সাল মানে আওয়ামী লীগের লুটপাটের ... অত্যুঙ্গ বছর। ... তবু আজকের অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আওয়ামী-বাকশালীদের লুটপাটের কথা এখন যাঁরা বলেন, তাঁদের যদি লজ্জা থাকত, তবে তাঁরা এ অভিযোগের পূণরাবৃত্তি বহু পূর্বেই বন্ধ

করতেন। ... যে দু'জন (পূর্বতন) কোটিপতির উল্লেখ করা হয়েছে তারা হয়ত পাকিস্তান আমলেরই কোটিপতি। আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছরের রাজত্বে দু'তিনজন কোটিপতি হওয়া বিচিত্র নাও হতে পারে। কিন্ত গত পৌনে পাঁচ বছরে ৬২জন কোটিপতি তৈরি হওয়া মাশাআল্লাহ" (৯/১৯৯-২০২)। মন্তব্যটি জহুর হোসেন চৌধুরীর।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য নজরুল ইসলাম সহজ অনুধাবনযোগ্য কিছু পরিসংখ্যান উল্লেখ করেছেন। "পূর্ব পাকিস্তানে সূতাকলের উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল ১৩.৭৭ কোটি পাউন্ড, স্বাধীনতা-পূর্ব ১৯৬৯-'৭০ইং উৎপাদনের পরিমান ছিল ১০.৫৬ কোটি পাউন্ড। স্বাধীনতার পরে জাতীয়করণকৃত সূতা কলে ১৯৭৩-'৭৪ইং উৎপাদিত হয়েছিল ৯.৫৫ কোটি পাউন্ড আর ১৯৭৪-'৭৫ইং ১০.০৫ কোটি পাউন্ড। কাপড় উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ১৩.৭৪ কোটি গজ, ১৯৬৯-'৭০, ১৯৭৩-'৭৪ এবং ১৯৭৪-'৭৫ইং উৎপাদনের পরিমান ছিল যথাক্রমে ৫.৯৯, ৭.৮৭ এবং ৪.৪৯কোটি গজ। চিনির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১.৬৯লক্ষ টন। আলোচ্য তিন বছরে ছিল যথাক্রমে ০.৯৩, ০.৮৮ এবং ০.৯৮লক্ষ টন। 'ইস্পাত ইনগট' উৎপাদনে আলোচ্য তিন বছরের পরিসংখ্যান ছিল যথাক্রমে ০.৫৪, ০.৭৪ এবং ৭.৭৬লক্ষ টন। 'রি-রোল ইস্পাত'এর পরিসংখ্যান ছিল যথাক্রমে ০.৯৯, ১.২৮ এবং ১.৫০ লক্ষ টন। ডিজেল ইঞ্জিন উৎপাদিত হয়েছিল যথাক্রমে ১,২৭৯, ১,৭২০ এবং ৫,১৭৩টি" (১(১)/৪৪৭)। প্রসঙ্গত স্বাধীনতা-পরবর্তী অধিকাংশ কল-কারখানার ভগ্নদশা, অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক এবং দক্ষ শ্রমিকের অভাবের কথা মনে রাখতেই হবে।

'সাপ্তাহিক সোনার বাংলা' ৭ অক্টোবর প্রকাশিত প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, পাটকলে ২৫ কোটি, চিনিকলে ৭কোটি, কাগজকলে ৩.৫ কোটি, ইস্পতকলে ১.৫ কোটি ও খনিজ কর্পোরেশনে ১.১ কোটি টাকা লোকসান হয়েছিল। "পাটকলে লোকসান হওয়ার প্রধান কারণ হল অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে পাটগুদামে আগুন লাগিয়ে কোটি কোটি টাকার পাট পুড়িয়ে দেওয়া। ... তবে এত কিছুর পরেও ২৩ এপ্রিল ১৯৭৪ইং প্রকাশিত এক তথ্যবিবরণীতে জানা যায়, ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে ৯টি সেক্টর কর্পোরেশনের অধীন জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহ ১৭কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করে" (২৪/৩৫)। সুতরাং বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক কল-কারখানা জাতীয়করণের বিরূপ সমালোচনার আগে প্রকৃত তথ্যগুলি মনোযোগের সাথে যাচাই করা অপরিহার্য বটে। প্রসঙ্গতই পরবর্তী সময়ের পাটকল-চিনিকল-স্টিলমিল ইত্যাদির কথাও বিবেচনায় রাখতেই হবে। এমন কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, লোকসানজণিত ক্রটি প্রকৃতপক্ষেই জাতীয়করণের ছিল না, ছিল আমাদের জাতীয় চরিত্রের।

দক্ষ-যোগ্য-সৎ-বিশ্বস্ত লোকেরও বড় সংকট ছিল। "১৯৭৪ সালে প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক সাইদুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'স্যার, আপনি তো অনেক মানুষকে চেনেন। দয়া করে আপনি আমাকে এক শ' ভালো মানুষের একটি তালিকা করে দেবেন'। তখন কি ভালো মানুষের অভাব ছিল? তা' নয়। কিন্তু নকল পূজারী, নষ্ট মানুষের দল এবং সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দা সংস্থার পোষ্য লোকজন তাঁকে সর্বক্ষণ ঘিরে

রাখে। ... বাধাগ্রস্থ করে সব শুভ উদ্যোগ। ... ভালো মানুষদের পৌঁছানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ... অভাব-অনটনের কারণ তলিয়ে দেখল না বেশির ভাগ মানুষ ও সংবাদমাধ্যম। ... ইতিমধ্যে সরকার ও প্রশাসনে অযোগ্য আর দালালশ্রেণীর লোকজন প্রবেশ করে। ... মাসকারেনহাস লিখেছেন, যাঁদের বিশ্বাস করা উচিত হয়নি, যাঁদের ভরসা করা উচিত হয়নি, জাতির জনক বেছে নিয়েছিলেন এমন বহু লোককে। তাঁর বিশ্বাসের ভেতর ক্রটি ছিল না। ভেবেছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে সকলেই মন দিয়ে কাজ করবে"। কিন্তু একান্ত দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুর এমন সঙ্গত স্বাভাবিক মানবিক প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, বরং বলা ভালো দেশী-বিদেশী চক্রে জড়িত ষড়যন্ত্রকারীরাই নানা স্বার্থ-সূত্রের কুট-কৌশলে বিনাশ ঘটিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা'র স্বপ্ন-প্রত্যাশার।

১৯৪৭-'৭১ইং পাকিস্তানের ২৪ বছরকে মুজিব-রাজনীতির সংশয়াতীত সাহসী সাফল্যের সময় হিসেবে চিহ্নিত করেন অনেকেই। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী, বিশেষত পাকিস্তানী সেনা-কারাগারে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিযুদ্ধজয়ী বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন থেকে তাঁর নির্মম হত্যাকান্ড পর্যন্ত (১০জানুয়ারি, ১৯৭২ থেকে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ইং) সময়কালকে কিভাবে চিহ্নিত করা চলে? রাজনীতির কথা বলি কিংবা বাংলাদেশের শ্রেণীবিভক্ত মানুষের সমাজ-মনস্তত্ব, সহজ ব্যাখ্যায় এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। প্রশ্নটা যদি এমন হয় যে, বঙ্গবন্ধু মুজিব কি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন, রাষ্ট্রশাসনে যথার্থই জনগণের আস্থা হারিয়েছিলেন? এখনো বাংলাদেশে এমন মানুষ অনেকেই রয়েছেন, যারা 'হ্যাঁ' বলবেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্যই যদি 'সঠিক' হবে, তাহলে মুজিব-হত্যার প্রায় দু'দশক পরে, যখন রাষ্ট্র-রাজনীতি থেকে মুজিবের নামও কার্যতই নির্বাসিত, তখন কেন তাঁকে মানুষ 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি' নির্বাচিত করেছিল? অনিবার্য উত্তরটা দাঁড়ায়, ১৯৭২-'৭৫ইং সময়ে অসীম প্রত্যাশায় এদেশের আবেগাক্রান্ত মানুষ কোনো পরিকল্পিত অপপ্রচারণায় মনস্তাত্বিকভাবেই পথ হারিয়েছিল। হারাণো সেই পথের সন্ধান এবং ফিরে চলা চলছে তখন থেকেই, যদিও চক্রান্তকারীরাও নিজেদের মতে-পথে এখনো সক্রিয় তীব্রতরভাবে।

আসলে ফরাসী দার্শনিক আঁদ্রে মালরোর কথাটাই ঠিক। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশকে কেমন দেখছেন? ১৯৭৩ইং অধ্যাপক মুরশিদের প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিক মালরো বলেছিলেন, "চমৎকার ... আপনারা তো বেশ সামলে উঠছেন। ... কিন্তু জানেন, আপনারা বাঙালিরা বড়ো ধৈর্যহীন। আপনারা সবকিছু একসঙ্গে পেতে চান - একটুও অপেক্ষা করতে নারাজ"। অতঃপর অধ্যাপক মুরশিদ প্রশ্ন করেছিলেন, 'মুজিব পারবেন তো একটি নতুন রাষ্ট্র তৈরি করতে'? ত্বরিৎ জবাব দিয়েছিলেন দার্শনিক মালরো, "অবশ্যই, যদি না আপনারা শিক্ষিতরা বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে মেরে ফেলেন। ... You are a cynical lot. Don't kill him like one of those tribes which kill their leaders and eat their flash."। প্রাসঙ্গিক মন্তব্য অধ্যাপক মুরশিদের, "এদেশের মধ্যবিত্ত সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা নেতিবাচক সমালোচনায় পটু এবং সময়ের আগেই মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে থাকেন" (১(১) ১৮৯-১৯০)। অনিবার্যভাবেই প্রশ্ন

জাগে, ভিনদেশী দার্শনিকের সেদিনের মূল্যায়ন কি এখনো আমাদেরকে লজ্জিত-অনুতপ্ত করে না?

বঙ্গবন্ধু মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করেছে নির্দিষ্ট কজন 'আদর্শহীন বাঙালি', একথা যেমন সত্য, ঠিক তেমনি সত্য একথাও যে, মুজিব-হত্যার পরিবেশ তৈরি করেছিলাম আমরা, সদ্য-স্বাধীন দেশের প্রায় সকল বাঙালি মিলেই। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সম্পদ-সামর্থ্যহীন নতুন দেশ গঠনে বস্তুগত এবং অভিজ্ঞতাগত অনটন তো ছিলই, কিন্তু যা' ছিল তাও সুষম পরিকল্পনায় কাজে লাগানো যায়নি। তখন, হঠাৎ আমরা যেন ফল-পরিণামহীন চিন্তায় 'সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' হয়ে গিয়েছিলাম। কে কত বেশি পেলে, কত দ্রুত পেলে স্বাধীনতাকে অর্থবহ ভাবতে পারবো, তা' আমরাই স্থির করতে পারছিলাম না। কিছু মানুষ ব্যতিক্রম ছিলেন অবশ্যই, কিন্তু তাঁরা ছিলেন নিতান্তই নীরব। একথাই সেত্য যে, মুক্তিযুদ্ধ মানুষকে অটল ঐক্যবদ্ধ করেছিল, কিন্তু স্বাধীনতা আমাদেরকে চরম অনৈক্যে বহুধা বিভক্ত করেছিল। কেউ রণাঙ্গণের মুক্তিযোদ্ধা, কেউ রণাঙ্গণের বাইরে, কেউ ভারতে গিয়ে আশ্রয়-অস্ত্র পেয়ে যুদ্ধ করেছে কেউ ভারতে না গিয়েই যুদ্ধ করেছে, কেউ ভারতের শরণার্থী শিবিরের 'অমানবিক পরিস্থিতি'তে প্রাণ বাঁচিয়েছেন, কেউ বা দেশের ভেতরেই প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুভয়ে জীবন কাটিয়েছেন। এমনি নানা পরিচয়-বিভাজন এবং প্রত্যাশারও নানা পরিমাপ।

অনস্বীকার্য যে, 'স্বাধীনতা, তোমাকে পাবার জন্য' কোনো না কোনোভাবে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল সকলকেই। কিন্তু স্বাধীনতার পরেই শুরু হলো প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোন্দল-কলহ কার ত্যাগ কত বড় ছিল, কে দাবি করবেন অধিক সংখ্যক 'রিলিফের কম্বল' কিংবা অভুক্তের জন্য বরাদ্দ চাল-গমের বস্তা অথবা লাইসেন্স-পারমিট। সবিনয়ে বলছি, সকল রাজনৈতিক বলয়-বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়েও সচেতন মানুষ হিসেবেই দেখেছি-জনেছি অযৌক্তিক অপরিমেয় চাওয়া-পাওয়ার প্রতিযোগিতা। ১৬ডিসেম্বরের আগের চেনামুখ রাজাকার ১৮ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা সেজে গাড়ি-বাড়ি দখল করে 'জান-কোরবান-বক্তৃতা' করছে,শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার। দেখেছি প্রকাশ্য স্টেডিয়ামে বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা কুখ্যাত রাজাকারকে খুন করছে। স্টেডিয়াম মার্কেটের বারান্দায় মাত্র ৫০টাকা মূল্যে 'মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক' কর্ণেল ওসমানীর স্বাক্ষরযুক্ত অগণিত মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট বিক্রি হতেও দেখেছি। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে মানুষদের 'দেবরূপ' ছিল, স্বাধীনতার পরে সেই বাঙালিরই 'দানবরূপ' দেখতে হয়েছে। এমনসব দানবদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা ছিল, ছিল চরম লাল এবং নব্য-লাল বামপন্থীরা এবং লেবাছ-বয়ানে ধর্মধ্বজীরাও, সবচেয়ে বেশি ছিল সদ্য সদ্য নানা রঙের রাজনীতিতে জড়ানো সুযোগসন্ধানী মানুষ। এসব কিছুরই পরিকল্পিত অপপ্রচার হয়েছে বঙ্গবন্ধুর 'অপরাধ-বিভ্রান্তি' হিসেবে, এমনকি এসবকেই মহান মানুষটির মৃত্যুর কারণ হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। আমাদের অপরাধ-লালসাই ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ব্যর্থতা এবং মুজিব-হত্যার কারণ, দেশি-বিদেশি চক্র নানা কায়দায় আমাদের অপরিণামদর্শী লোভের আগুণটাই শুধু উস্‌কে দিয়েছে, সুযোগ নিয়েছে ধুঁয়াশার অন্ধকারের।

বঙ্গবন্ধু এবং সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং বিশেষত তেলের দাম (৪০০ভাগ) বৃদ্ধির ফলে, "স্বাধীনতার দু'তিন মাসের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল শতকরা দুশো থেকে তিনশ'গুণ। দৈনন্দিন জীবনযাপনই হয়ে উঠল দুঃসহ। সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক বিরোধীরা অভিযুক্ত করলো আওয়ামী লীগ এবং প্রকারান্তরে শেখ মুজিবকেই" (২৫(১)/৩৭)। "সারাদেশে যখন হাহাকার তখন, চরম ডান এবং বামপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে নানা গুজব ছড়াতে থাকে। ... মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও জামাতপন্থীরা বলতে থাকে, পাকিস্তান ভাঙ্গার কারণেই আজ এই অবস্থা। চীনপন্থীরা বলা শুরু করে, বাংলাদেশ সংশোধনবাদী সোভিয়েত ইউনয়ন ও ভারতের কাছে আত্মসমর্পন করার কারণে আজ এই দুর্বিষহ অবস্থা। শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে লাভবান 'ইত্তেফাক' ... একটি ছবি ছেপে সারা দেশে আলোড়ণের সৃষ্টি করে। ছবিটি ছিল 'জালপরা বাসন্তী' নামে এক দরিদ্র মহিলা আহার খুঁজছে। পরবর্তীকালে প্রমান হয়েছে যে ছবিটি বানানো" (২৫ (১)/৪১)। অতঃপর, বিভিন্ন প্রাত্যহিকতার বিবরণ এড়িয়ে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনাতেই মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখবো। বিষয়গুলি হচ্ছে পর্যায়ক্রমিকভাবে ১৯৭২ইং রচিত বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭৩ইং অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচন এবং ১৯৭৪ইং দুভিক্ষ আর ১৯৭৫ইং সংবিধান সংশোধন ও বাকশাল গঠন।

বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান, ১৯৭২ইং

"শেখ মুজিবুর রহমান বা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল দেশকে একটি শাসনতন্ত্র প্রদান"। মুনতাসীর মামুন লিখেছেন, "আর কোনো দেশে এরকম একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এত দ্রুত একটি শাসনতন্ত্র প্রদান সম্ভব হয়েছে বলে জানা নেই। ... শাসনতন্ত্রের মূলনীতিসমুহ ছিল - গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। ... আর ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রে বিধৃত হয়েছিল সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমুহ বা এককথায় এই শাসনতন্ত্র বাংলাদেশে পত্তন করতে চেয়েছিল সিভিল সমাজের ভিত্তি" (২৫ (১)/৩৮)। বঙ্গবন্ধুর সংবিধান অনুসারে, বাংলাদেশের মানুষের জাতিগত পরিচয় নির্ধারিত হয় "Bangallees" অর্থাৎ 'বাঙালি' (৭/৩০২)। পরবর্তী সময়ের সামরিক শাসকেরা সংবিধানের আদর্শিক পরিচয় বদলানোর সাথে সাথে জাতীয় পরিচয়টাও পাল্টে 'বাংলাদেশী' করে দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা ২০১১ইং সংবিধান সংশোধন করে আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাঙারি পরিচয়টা পুনর্বহাল করেছেন।

"শেখ মুজিব যদি ... সংবিধান রচনায় দুই-চার বছর বিলম্বও করিতেন, তবু তাঁকে কেউ দোষ দিতে পারিতেন না। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে ছিন্নমূল দেশবাসীকে পূণর্বাসন, ঝড়-বন্যা, দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশবাসীকে খাওয়ান-পরান ফেলিয়া সংবিধান রচনা না করিলে তাঁকে কেউ কর্তব্যচুতির অপবাদ দিতে পারিতেন না। তবু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ... আওয়ামী লীগ পার্টি শুধু সংবিধানই দিলেন না, ..১৯৭৩ সালের মার্চের মধ্যে একটা সাধারণ নির্বাচনও দিয়া ফেলিলেন। এতো তাড়াতাড়ি নির্বাচন দিবারও

কোনো তাগিদ ছিল না। ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনের বলে আওয়ামী লীগ বিনা তর্কে ১৯৭৪-৭৫সাল তক মেম্বর থাকিতে পারিতেন। একই দিনের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বররা আজও মেম্বর" রয়ে গিয়েছিলেন (৫/৪৩)।

হালিম দাদ খান লিখেছেন, "সংবিধান রচনায় পাকিস্তানিদের লেগেছিল ৯ বছর, (ভারতের তিন বছর) এবং বাঙালিদের ৯ মাস। হাজার বছরের ইতিহাসে ... এই প্রথম বাঙালির ... সংবিধান রচিত হল। ... কিন্তু রচনার চেয়েও কঠিন কাজ ছিল একে বাস্তবে রূপ দেওয়া, যা সম্ভব হয়নি।" হালিম দাদ খান উল্লেখ করেছেন, ১৯৭২ইং সংবিধান সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে বিএনপি'র নেতা-মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ 'বাংলাদেশ : শেখ মুজিবের শাসনকাল' নামক বইতে লিখেছেন, "মাত্র এক বছরের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য আওয়ামী লীগকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এটি ছিল একটি ব্যাপক এবং সুলিখিত দলিল এবং এই উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের তূলণায় উন্নতমানের" (২৪/৪৬)।

উল্লেখ্য যে, "১৯৭০ সালে নির্বাচিত ... ১৬৯জন জাতীয় পরিষদ সদস্য (এমএনএ) এবং ৩০০ জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য (এমপিএ) গণের মধ্যে দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত ও মৃতদের বাদ দিয়ে ৪০৩ জনকে নিয়ে ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ রাষ্ট্রপতির ... আদেশ বলে 'গণ পরিষদ' গঠন করা হয়। এর সদস্যদের মধ্য থেকে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪সদস্যের একটি খসড়া সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। ১২ আক্টোবর গণপরিষদে 'সংবিধানের' খসড়া উত্থাপিত হয়। ... ৪ নভেম্বর তা গৃহীত হয় ... ১৬ডিসেম্বর থেকে তা বলবৎ করা হয়। হালিম দাদ খান উল্লেখ করেছেন, সেই সংবিধানে "জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনি বলে তৎকালীন বিরোধীদলীয় (ন্যাপ) একমাত্র সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত এতে স্বাক্ষর করেননি। আর এখন ১৯৭২ সালের সেই সংবিধান ফেরত পাওয়ার জন্য জনগণ ১৯৭৫ থেকে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। কী বিচিত্র এই দেশ" (২৪/৪৬)। সত্যি, কী বিচিত্র এই দেশ এবং দেশের রাজনীতি, ২০১১ইং এক মামলার রায়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালত ১৯৭২ইং সংবিধানকে মুক্তিযুদ্ধের মৌলিক আদর্শের সংবিধান এবং আদর্শগতভাবে অপরিবর্তনীয় ঘোষণার পরও, এমন কি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের ধারক মূল রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামী লীগ দুই-তৃতীয়াংশের অধিক সদস্য-শক্তি নিয়ে ক্ষমতাসীন থাকা সত্বেও ১৯৭২ইং মূল সংবিধানে সামগ্রিক প্রত্যাবর্তন এখনো সম্ভব হয়নি।

প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় বাহাত্তরের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার রাজনৈতিক-দার্শনিক গুরুত্বের বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা দরকার। ভারতের বিখ্যাত সাংবাদিক এবং 'ইন্ডিয়া টুডে' পত্রিকার 'এডিটোরিয়াল ডিরেক্টর' এম জে আকবরের মন্তব্য : "পাকিস্তান এমন ধারণায় বিশ্বাসী যে, ধর্মের ভিত্তিতেই একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। পাকিস্তান সৃষ্টির মূল ভিত্তি ... দ্বিজাতিতত্ত্বের নড়বড়ে দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে ১৯৭১ সালে, যখন পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বতন্ত্র জাতি-সত্তার পরিচিতি নিয়ে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যায়" ('ভারত ও পাকিস্তান : নৈঃশব্দের মহাপ্রাচীর', 'দৈনিক জনকণ্ঠ', ১৫-১০-২০১২)। এখনো বালুচরা 'পশতুন' পরিচয়ে পাকিস্তান থেকে পৃথক রাষ্ট্রসত্তা

প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, ১৯৭১ইং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায়, পাকিস্তানের শুধু ভৌগলিক একটা অংশই হারিয়ে যায়নি বরং প্রকৃতপক্ষে অবাস্তব ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র-দর্শনটাই ভেঙ্গে পড়েছে। তাই বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তান এবং পাক-পন্থীদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ যত শত্রুতা, তার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, পাকিস্তানের ধর্ম-সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বকেই শুদ্ধ-সঠিক বলে প্রতিপন্ন করা।

১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ইং স্বদেশে ফিরে প্রথম ভাষণেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের রাষ্ট্রাদর্শ এবং সাংবিধানিক চিন্তার দিকটি উল্লেখ করে বলেছিলেন,"আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র,সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা"। ইতিহাসবিদ সালাহউদ্দীন আহমদের পর্যবেক্ষণ : "এই অসাধারণ ঘোষণার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রচিন্তার মূলনীতিগুলি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছিলো। বস্তুত ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র - এই চারটি নীতিকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে সন্নিবেশিত করা হয়। ... ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের পর স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে এই মূলনীতিসমুহের অপব্যাখ্যা করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করে এসেছে। প্রথমে জাতীয়তাবাদের কথা ধরা যাক। আবহমান কাল থেকে বাংলার জনগণ বহির্বিশ্বের কাছে বাঙালি বলে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। ... এই চেতনা ধর্মভিত্তিক বা সাম্প্রদায়িক নয়, এটি অসাম্প্রদায়িক বা ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা, যেটি গড়ে উঠেছে এক অভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার উপর ভিত্তি করে। সুতরাং আমাদের জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ। আবার ... যে গণআন্দোলন শুরু হয়েছিলো বিশেষ করে ভাষা-আন্দোলনের সূত্র ধরে, যেটি চুড়ান্ত পরিণতি লাভ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, সেটি ছিল প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক আন্দোলন। এই আন্দোলন ছিলো অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ। ... বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ... সকল বিপন্ন অসহায় মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন একমাত্র কোনো ধরণের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব। তবে এই ব্যাপারে ... বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে, যাতে জনগণের বৃহত্তম অংশের জীবনযাত্রার ন্যূনতম চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়" (১(১)/৫৫-৫৬)।

২৩ মার্চ ১৯৭২ইং গণভবনে বুদ্ধিজীবী সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন : "উপমহাদেশের গত কয়েক যুগের রাজনৈতিক অস্থিরতা, দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের মূল কারণ সাম্প্রদায়িকতা। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার পর ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রীয় সাম্প্রদায়িকতার রূপ দেওয়া হয়েছে। এটা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফল। ... কয়েক শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং অভিশপ্ত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হিসেবেই স্বাধীন, জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের অভ্যূদয়। আমরা যদি সকল প্রতিকুলতার মধ্যে সেক্যুলার

বাংলাদেশের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতে পারি, তাহলে এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সফল হবে। জনগণের দুঃখ, দারিদ্র্য ও অভাবমোচনের জন্য এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও শান্তি হচ্ছে একটি পূর্বশর্ত (২৮/১৫১-১৫২)।

সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলামের অভিমত : "জাতিসত্ত্বার গোড়ার কথা হলো জাতিগতভাবে মৌলিক মূল্যবোধের সৃষ্টি এবং অবিচলভাবে নিষ্ঠার সাথে সে মূল্যবোধের লালন। ... মৌলিক মূল্যবোধের ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্র। ... সংবিধান, বিচার, আদালত, সংসদ ও রাজনীতি - এক কথায় সামগ্রিক জাতীয় পরিচিতি, এটাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনালব্ধ মূল্যবোধ। ... বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছিলাম, যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল তা ... একটি আদর্শিক রাষ্ট্র। বাঙালির ঐতিহ্য, সভ্যতা ও মননে গড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনায় উজ্জীবিত এক দেশ" (১(১) ২০৭)। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দেশকে সেই আদর্শিক অবস্থানে রাখা হয়নি, বরং এভাবে বলাই যুক্তিসঙ্গত যে, বাংলাদেশকে আদর্শিক অবস্থানচ্যুত করার জন্যই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে হত্যা করা হয়, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ নেতৃত্বদানকারী বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ চারজন জাতীয় নেতাকে- সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, কামরুজ্জামান এবং মনসুর আলী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ লিখেছেন, বঙ্গবন্ধু-হত্যার পরবর্তী ধারাবাহিকতায় জিয়াউর রহমানকে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা' এবং 'স্বাধীনতার ঘোষক' ইত্যাদি পরিচয়ে উপস্থান করা জামাতে ইসলামিরই বেশি দরকার ছিল। কারণ "১৯৭২ সালের সংবিধানের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে না' - এই ধারা তুলে দিয়ে ... তিনিই জামায়াত ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অন্যান্য সহযোগীদের ... রাজনীতি চর্চার সুযোগ করে দিয়েছেন" (১(১)/২৫১)। তিনিই সামরিক হুকুমে সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সমাজতন্ত্র ইত্যাদি আদর্শ বিসর্জন দিয়েছেন।

"সমগ্র পাকিস্তান আমলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিপরীতে রাজনীতি করে আওয়ামী লীগের মধ্যে যে বাস্তবতাবোধের জন্ম হয় তা থেকেই আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। ... আওয়ামী লীগ কর্তৃক গৃহীত ধর্মনিরপেক্ষতা বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল"। এমন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ইতিহাসবিদ ড. আবুল কাশেম 'আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি : ঐতিহাসিকতা ও বাস্তবতা' শিরোনামের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, ১৯৭২ সালে রচিত সংবিধানের মুখবন্ধে ধর্মরিপেক্ষতার আদর্শ সন্নিবেশিত করার পর সংবিধানের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অংশেও বলা হয়েছিল, "জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি ও সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। তবে ... রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা কিংবা অনুরূপ ... লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা ... অংশগ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না। ... আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে পাকিস্তানের ভাবাদর্শিক ভিত্তি

সমুলে উৎপাটিত (এম. জে. আকবরের মন্তব্য স্মরণীয়) হলে সহজাত পাকিস্তান প্রীতির কারণে দক্ষিণপন্থীরা বিপদাপন্ন হয়। ... তাদের রাজনীতি চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণপন্থী বুদ্ধিজীবীরা ভারতের চাপে আওয়ামী লীগ সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে বলে মত পোষণ করেন ... এই অসত্য বক্তব্য প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হল রাজনীতিতে আওয়ামী লীগকে ভারতপন্থী হিসেবে ব্র্যাকেটবন্দী করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করা" (১(১)/৩১৭)। ভারতীয় সংবিধানে ১৯৭২ সালে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' ছিল না, এটি আরো চার বৎসর পর (১৯৭৬ইং) সংযোজিত করা হয়।

অধ্যাপক আবুল কাশেম আরো লিখেছেন, "আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি যে বাংলাদেশের মত ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্য বাস্তবোচিত ছিল তা প্রমানিত হয় ১৯৭৫ সালের পর। ... ১৯৭৫ সালের ... রাষ্ট্রাদর্শবিনাশী ঘটনাবলীর প্রধান বেনিফিসিয়ারি ... জিয়াউর রহমানের উদ্যোগেই মূলত সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ... বাতিল করা হয়। পরে ক্ষমতায় থেকে তিনি একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ... বামপন্থী বিপ্লবী ... পাকিস্তানবাদীরাও যোগ দেন। ... ১৯৭৬ সালের ১মে ... জিয়াউর রহমান চীনপন্থীদের একটি সমাবেশে ... বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে অবাধে ধর্মকর্ম পালন করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন। এর মাত্র দুদিন পরে সামরিক ফরমান বলে ... ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপর থেকে বিধিনিষেধ প্রত্যাহৃত হয়। ... ১৯৭২এর ... সংবিধানের শিরোনামের নীচে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' ... শব্দগুচ্ছ সন্নিবেশিত করা হয় এবং ... ধর্মনিরপেক্ষতা পরিবর্তন করে ... 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস' শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়। ... এরশাদও সামরিক আইন জারি করে হুবহু জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ... রাষ্ট্রের দক্ষিণমুখী পদযাত্রাকে দৌড়ে পরিণত করেন। তিনি ১৯৮৮ সালের ৭জুন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী দ্বারা ইসলামকে রাষ্টধর্ম হিসেবে ঘোষণা করেন। ... ফলে, রাষ্ট্রের চোখে নাগরিকরা আর নাগরিক নয় বরং তারা মুসলমান নাগরিক, হিন্দু নাগরিক ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে" (১(১) ৩১৮-৩২০)।

১৯৭২ সালের ১৯আগস্ট ছাত্র লীগের জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমার দেশে একদল লোক সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। জীবনভর আমি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। স্বাধীনতার জন্য এদেশের মানুষ মৃত্যু বরণ করেছে, রক্ত দিয়েছে একটা আদর্শের জন্য। জাতীয়তাবাদ, যা তোমরা বিশ্বাস কর, এটা হলো - আমি বাঙালি, বাংলা আমার ভাষা। বাংলার কৃষ্টি, বাংলার সভ্যতা, বাংলার ইতিহাস, বাংলার জাতীয়তাবাদ। আমি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, তোমরাও তা' কর। শোষণহীন সমাজ, সুষমবণ্টন, সম্পদের মালিক জনগণ, তোমরা তা' বিশ্বাস কর। এই লক্ষ্যে পৌঁছাবার কোন 'শর্টকাট' রাস্তা নেই। আস্তে আস্তে যেতে হবে" (১(১)/৪৯৯)। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় সুলতান মাহমুদ শরীফের প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ : "বঙ্গবন্ধু ধর্মকে কখনই রাষ্ট্র পরিচালনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে রাজী হননি। ... তিনি প্রচার ও পালন করলেন চন্ডীদাসের অমোঘ বাণী : 'সবার উপরে মানুষ সত্য

তাহার উপরে নাই'। জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের ... সকল নাগরিকের ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতার অঙ্গীকার। রাষ্ট্র সেখানে নিরপেক্ষ, অর্থাৎ 'ধর্ম যার যার যার, রাষ্ট্র সবার' (১(২) ৯১৫)। "বাংলাদেশকে স্বাধীন করাই বঙ্গবন্ধুর একমাত্র কৃতিত্ব নয়। সাম্প্রদায়িকতার অন্ধ প্রকোষ্ঠ থেকে, শতাব্দী-লালিত মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র শোনা গিয়েছিল তাঁর কণ্ঠে" (১(২)/৯২৯)। প্রথম সংবিধান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের সময় 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমাদের ... পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং সেই আদর্শের ভিত্তিতে এদেশ চলবে। ... ধর্মরিপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে; মুসলমান তার ধর্ম পালন করবে, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ যে যার ধর্ম পালন করবে। কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, ... রাজনৈতিক কারণে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। ... যদি কেউ ব্যবহার করে, তাহলে বাংলার মানুষ যে তাকে প্রত্যাঘাত করবে, এ আমি বিশ্বাস করি" (২৬/৪র্থ মলাট)।

১৯৭৪ইং ১৬ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের শেষ বিজয় দিবসের ভাষণে বলেছিলেন :"দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ বাংলাদেশের মানুষ যে মূল্যবোধগুলি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল তারই চূড়ান্ত পর্যায় মাত্র। ... এই আদর্শ বা মূল্যবোধের সংজ্ঞা হলো - গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসকরা এবং দেশী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এই চারটি আদর্শকে বাঙালির জীবন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে। তারা চেয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলতা, ধর্মান্ধতা, পশ্চাৎমুখীনতা এবং অপসংস্কৃতি ও অপজাতীয়তা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। ... ১৬ ডিসেম্বরের জয় ... কেবল যুদ্ধজয় নয়, চারটি মূলনীতির ... এই আদর্শের বিজয় দিবস" (১(২)/ ১০২৩)। সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সন্নিবেশিত করায়, র‍্যক্তিগত জীবনে স্বধর্ম ইসলামে নিষ্ঠাবান মুজিবকে দেশে-বিদেশে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে, সর্বদাই পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবেই। এখানে তারই দু'টি মাত্র উদাহরণ উল্লেখ করছি।

"লিবিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান গাদ্দাফি বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ার শর্ত জুড়ে বললেন, বাংলাদেশের নাম পাল্টে রাখা হোক 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ'। উত্তরে বঙ্গবন্ধু জানান, বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তথা স্বাধীনতাযুদ্ধে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তা ছাড়া সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের ভিন্নধর্মী চিন্তা, চেতনা, মাসনিকতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সর্বোপরি আল্লাহতায়ালা শুধু মুসলমানদের নন, তিনি রাব্বুল আলামিন। সবকিছুরই স্রষ্টা। সুতরাং আপনার প্রস্তাব কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়" (২২/১১৭)। মোয়াম্মের গাদ্দাফির সাথে বঙ্গবন্ধুর এ সাক্ষাত-আলোচনাটি হয়েছিল ১৯৭৩ইং আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সময়। দ্বিতীয় ঘটনাটিও (তথ্যসূত্র : এম. আর. আখতার মুকুলের 'মুজিবের রক্ত লাল') সেখানেই। সাক্ষাতের শুরুতেই সৌদি বাদশাহ ফয়সাল বললেন, "আমি শুনেছি যে, আসলে

বাংলাদেশ আমাদের কাছ থেকে কিছু সাহায্যের প্রত্যাশী। ... সাহায্য দেবার জন্য আমাদের কিছু পূর্ব শর্ত রয়েছে"। জবাবে মুজিব বলেছিলেন, "এক্সেলেন্সী, বেয়াদবী নেবেন না। ... আমার তো মনে হয় না, মিসকিনের মত বাংলাদেশ আপনাদের কাছে কোনো সাহায্য চেয়েছে"। আলোচনার এক পর্যায়ে বাদশাহ বলেছিলেন, "সৌদী স্বীকৃতি পেতে হলে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' করতে হবে"। মুজিব জবাব দিয়েছিলেন, "এই শর্তটা ... বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যগরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলমান হলেও এদেশে প্রায় এক কোটির মত অমুসলিম জনসংখ্যা রয়েছে। সবাই একসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়ে দুর্ভোগ পোহায়েছে। তাছাড়া, এক্সেলেন্সী, আল্লাহতায়ালা ... রাব্বুল আলামীন। তিনি শুধুমাত্র মুসলমানের আল্লাহ নন। তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর অধিকর্তা। ... এক্সেলেন্সী, ... আপনাদের দেশটার নামও তো 'ইসলামিক রিপাবলিক অব সৌদী এ্যারাবিয়া' নয়। ... 'কিংডম অব সৌদী এ্যারাবিয়া। কই আমরা কেউই তো এ নামে আপত্তি করিনি"। আকস্মিক ভাবে এ সাক্ষাৎকার সমাপ্তির ঠিক আগে গভীর ধর্মবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী উন্নতশির বঙ্গবন্ধু উচ্চারণ করেছিলেন, 'লা-কুম দ্বিন কুম ওয়ালি ইয়া-দ্বিন' - তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার।

বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এখানে একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭২ইং বাংলাদেশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ লাভ করেছিল। তখন নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়াকুবু গওন বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কারণ, তিনি হয়তো পাকিস্তান নামক 'একক' রাষ্ট্রটির এক খন্ডে "শসস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ, বায়াফ্রার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে বলে ভীত-সন্ত্রস্থ ছিলেন। ... কমনওয়েলথে আমাদের যোগদান পাকাপোক্ত করতে আর্নল্ড স্মিথকে (তদানিন্তন কানাডার প্রধানমন্ত্রী এবং কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল) যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল" (১(২)/৬৮৯-৬৯০)। অতঃপর ১৯৭৩ইং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল যোগ দিয়েছিল কানাডায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে। "ইয়াকুব গওনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর প্রথম মুখোমুখী দেখা অটোয়াতে কমনওয়েলথ সাংবাদিকদের প্রদত্ত একটি 'রিসেপশনে'। ... জেনারেল ইয়াকুবু ... অপ্রত্যাশিত একটি প্রশ্ন ... করলেন ... 'আচ্ছা প্রধানমন্ত্রী, বলুন তো, অবিভক্ত পাকিস্তান ছিল একটি শক্তিশালী দেশ। কেন আপনি সেই দেশটিকে ভেঙ্গে দিতে গেলেন?' ... চারদিকে পিনপতন নীরবতা। হো হো করে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিতে নীরবতা ভাঙলেন ... তারপর গম্ভীর তর্জনীসঙ্কেতে (বঙ্গবন্ধু) বললেন, 'শুনুন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। আপনার কথাই হয়তো ঠিক। অবিভক্ত পাকিস্তান হয়ত শক্তিশালী ছিল, তারচেয়ে শক্তিশালী হয়ত হতো অবিভক্ত ভারত। কিন্তু সে-সবের চেয়ে শক্তিশালী হত সংঘবদ্ধ এশিয়া, আর মহাশক্তিশালী হত একজোট এই বিশ্বটি। কিন্তু মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সব চাইলেই কি পাওয়া যায়?' কথাটি বলেই তাঁর গলার সাদা চাঁদরটি ... তুলে দিলেন হতবাক নিশ্চুপ

প্রেসিডেন্ট গওনের হাতে। বললেন, 'এই নিন, বাংলাদেশের জনগণের তরফ থেকে আমার এই ক্ষুদ্র উপহার'। ... অটোয়াতে সেই সন্ধ্যায় বাকযুদ্ধে কে ছিলেন জয়ী, সাংবাদিকদের মনে ছিল না সন্দেহের কোনো অবকাশ" (১(২)/৬৮৯-৬৯০)।

ফেরা যাক বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ১৯৭২ইং শাসনতন্ত্রের কথায়। সেই শাসনতন্ত্রের অন্যতম আদর্শ 'সমাজতন্ত্র' সম্পর্কেও প্রভূত বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। "মুজিব নিজে আন্তরিকভাবে গরীবদের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখতেন। ... সত্যি সত্যি তিনি গরীবদের জন্যে কিছু করবেন বলে আশা করেছিলেন"। একথা বলেও গোলাম মুরশিদ ধারণা ব্যক্ত করেছেন, "কিন্তু তাই বলে তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন - এমন কোনো প্রমান নেই। তা সত্বেও (সংবিধানে), রাষ্ট্রের অন্যতম আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন। ... বড়ো বড়ো সব শিল্প এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অবাঙালি মালিকরা দেশত্যাগ করায়, সেসব এমনিতেই রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলো। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র স্থাপনের একটা বড়ো বাধাই তাঁর সামনে ছিলো না (২০/২০১)। তাহলে বঙ্গবন্ধু কি বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন, কোনো বা আদর্শিক পূর্ব-চিন্তা ছিল না?

বাংলাদেশের বিখ্যাত ব্যাঙ্কার খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের পর্যবেক্ষণ :"বঞ্চিত মানুষের বঞ্চনা কমিয়ে আনার ... তিনি কোনো বিশেষ তত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। ... বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র বিষয়টি প্রথম অবতারণা করলেন সত্তরের নির্বাচনের পর নির্বাচনোত্তর এক বিশাল সমাবেশে। ... 'আজ আমি আপনাদের একটা বড় কথা বলবো। সেটা হল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের কথা অনেকেই অনেকদিন থেকে বলছেন- কিন্তু কিছুই করতে পারেন নাই। আমি জানি কোন কথাটি কখন বলতে হয়। ... স্বাধীনতার পর ... রাজনীতিতে গণতন্ত্র এবং অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রের সহ-অবস্থান প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষণীয়। ... এটি অগ্রসর চিন্তা, ... মানবাধিকার বজায় রেখে সম্পদের সুষমবণ্টন আমাদের মতো দেশে শুধু অগ্রসর চিন্তাই নয় -সাহসী প্রয়াসও বটে। এই সাহসী কল্যাণচিন্তার উদ্ভব ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর চেতনায়। তাঁর এ চেতনার পেছনে রয়েছে মানুষের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা, আর এ ভালোবাসা বাস্তবায়নে দুরন্ত সাহস" (১(২)/১১০৭-১১০৮)। অতঃপর আমরা অন্যান্য তথ্য-সূত্রে বঙ্গবন্ধুর সমাজতন্ত্র বিষয়ক চিন্তার ভিত্তি-বিকাশ-প্রয়োগের দিকগুলি সন্ধান করতে পারি।

বঙ্গবন্ধুর তিনটি ভিন্ন বক্তৃতা থেকে বিষয়গত উদ্ধৃতি তাঁর মানস-পটভূমি উপলব্ধির সহায়ক হতে পারে। ১. "আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র"। ২. আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়"। এবং ৩. "যে শহীদেরা আমাদের হাতে দেশের স্বাধীনতা তুলে দিয়ে গেছে তাদের মৃত্যু নেই। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীন দেশে মানুষ যখন পেট ভরে খেতে ভাবে, পাবে মর্যাপূর্ণ জীবন তখনই শুধু লাখো শহীদের আত্মা তৃপ্তি খুঁজে পাবে" (২৫ (১)/৮)। উদ্ধৃতি তিনটি আমাদেরকে সহজভাবে এমন ধারণাই দেয় যে, 'সমাজতন্ত্র' শব্দটির প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও এবং আজীবন গনতন্ত্রী হলেও, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে তাঁর স্বপ্নের স্বদেশ 'সোনার বাংলা'

বিনির্মানের গভীর চিন্তাভাবনা থেকেই 'সমাজতন্ত্র' নামক তত্বটিকে নির্ভরযোগ্য ভেবেছিলেন। অন্যথায়, দেশের মানুষের 'পেটের ভাত আর উন্নত জীবন' কথাগুলিকে নিতান্তই কথার কথা বলে ভাবতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মনেপ্রাণে গণতন্ত্রী বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় চিন্তাভাবনা করেই সমাজতন্ত্রে আস্থাশীল হয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সমাজতান্ত্রিক কর্মোদ্যোগ প্রসঙ্গে তৎকালীণ (প্রথম সংবিধান জারির পরবর্তী) কয়েকটি সংবাদ শিরোনামের উল্লেখ একান্তই উল্লেখযোগ্য। "সমাজতন্ত্রের পথে মুজিবের বাংলাদেশ - ব্যাংক, বীমা, পাট, চিনি, পরিবহন শিল্প জাতীয়করণ। 'শোষণমুক্ত সমাজ গড়িব'- দেশের প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু" (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭-০৩-১৯৭২)। "জার্মান বেতার সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু - 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি'র কথা বলেন (দৈনিক ইত্তেফাক, ২১-০১-১৯৭২)। "দেশের সম্পদ জনগণের, কোনো ব্যক্তির নয় - বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনে ভাষণ" (দৈনিক আজাদ, ৮-০৪-'৭২)। "বঙ্গবন্ধু শীঘ্রই সমাজতন্ত্রমুখী শিল্পনীতি ঘোষণা করবেন" বলেছেন শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম (দৈনিক ইত্তেফাক, ১১-০৩-'৭২)। "বঙ্গবন্ধুর আহ্বান : সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদ করুন" (দৈনিক আজাদ, ২৫-০৪-'৭২)। "সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শীর্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিশ্বখ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদগণ বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর সচিবালয়ে দেখা করেন" (দৈনিক আজাদ, ১৩-০১-'৭৩)। উদ্ধৃত সংবাদগুলিই জানায় যে, বঙ্গবন্ধু জেনে-বুঝে দেশের প্রয়োজনেই সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছিলেন। মুজিব যা বিশ্বাস করেন না, তেমন রাজনৈতিক আচরণ কি কখনো করেছেন?

জাতীয় সংসদে প্রথম সংসবিধান উপস্থাপনের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু 'সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে স্পষ্ট করেই বলেছিলেন :"আমাদের আদর্শ পরিষ্কার হয়ে রয়েছে। এই পরিষ্কার আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং এই আদর্শের ভিত্তিতে বাংলাদেশ চলবে। ... আমরা বিশ্বাস করি সমাজতন্ত্রে, যেখানে শোষণহীন সমাজ থাকবে। শোষকশ্রেণী কোনোদিন দেশের মনুষকে শোষণ করতে পারবে না। এবং সমাজতন্ত্র না হলে সাড়ে সাত কোটি মানুষ ৫৪,০০০ বর্গমাইলের মধ্যে বাঁচতে পারবে না। সেইজন্য অর্থনীতি হবে সমাজতান্ত্রিক"। আরো বলেছিলেন,"ভবিষ্যৎ বংশধর, ভবিষ্যৎ জনসাধারণ কিভাবে শাসনতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবে তারই উপর নির্ভর করে শাসনতন্ত্রের সাফল্য, তার কার্যকরিতা। ... ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মরিপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ গঠন করতে পারে, তাহলে আমার জীবন স্বার্থক, শহীদের রক্তদান স্বার্থক" (২৬/ ৪র্থ মলাট)।

প্রসঙ্গত এখানেই বলে রাখা দরকার যে, বঙ্গবন্ধু-হত্যা এবং জেলখানায় চারনেতার হত্যার ধারাবাহিকতায় বিশ্বাসঘাতক মোশতাক এবং 'বেনিফিশিয়ারি' জিয়া-এরশাদ প্রমুখ সেনাশাসকরা রাষ্ট্রক্ষমতা জবরদখলের পর শাসন-শক্তি চুড়ান্তরূপে কুক্ষিগত করার বাসনায় বাংলাদেশের আদি-সংবিধানের মৌলিক চারিত্র্য চুড়ান্তরূপেই

লন্ডভন্ড করে ফেলেছিলেন। পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগশাসনামলে যা অনেকাংশে পূণরুদ্ধার করা গেছে, যদিও বাকি রয়েছে অনেক কিছুই। দেশপ্রেমিক মানুষ প্রত্যাশিত সেই পরিবর্তনের দিকেই তাকিয়ে আছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের বাংলাদেশকে ফিরে পেতে হলে বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত বাহাত্তরের সংবিধানের সাথে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য পূণঃপ্রতিষ্ঠা করতেই হবে। অন্যথায় 'ভৌগলিক বাংলাদেশ' থাকলেও 'আদর্শিক বাংলাদেশ' ফিরে পাওয়া যাবে না কিছুতেই।

বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৩ইং
সমালোচনা এবং বাস্তবতা

১৯৭২ইং জাতীয় সংবিধান প্রবর্তনের পরেই মুজিব সরকার মনোযোগ দিলেন সেই সংবিধানের আওতায় প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিকে। প্রথাসিদ্ধ নিয়মেই বিচার বিভাগ থেকে বিচারপতি ইদ্রিসকে বাংলাদেশের প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন করা হলো। মওলানা ভাসানী দাবি তুললেন, সরকারকে পদত্যাগ করে সর্বদলীয় সরকার গঠনের মাধ্যমে 'নিরপেক্ষ নির্বাচন' অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মুজিবের সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই প্রার্থীদের যোগ্যতা প্রতিপন্ন করতে হবে। যাদের কাছে নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য এখন সরকারের পদত্যাগের কথা বলা হচ্ছে, তাঁরা প্রায় সকলেই বিগত ১৯৭০ইং নির্বাচনে 'জামানত' হারিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের আলোচনার (জানুয়ারি,'৭৩ইং) একটি বিবরণ দিয়েছেন এস. এ. করিম :"Razzak told him that because of Mujib's great popularity Awami Leage would no doubt be victorius ... it might be a good idea for the Awami League not to try to secure a landslide victory of the type it got in the 1970 elections. He argued that democracy could only thrive if other political parties were represented in the new parliament ... Mujib listened patiently to Razzaque but was not convinced by his suggestion that the AL should allow opposition candidates to win in some constituencies either by not putting up AL candidates or by not contesting them" (৭/৩০৪-৩০)।

সুপরিচিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিক আহমদ ছফা, তাঁর 'যদ্যপি আমার গুরু' নামক গ্রন্থে নির্বাচন প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবের একটি কৌতুহলোদ্দীপক সংলাপের উল্লেখ (অধ্যাপক রাজ্জাকের অননুকরণীয় ভাষাতেই) করেছেন, এখানে উদ্ধৃত করছি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কিছু কথা' শিরোনামের নিবন্ধ থেকে। শেখ সাহেবকে একবার (সম্ভবত জানুয়ারি,১৯৭১ইং) অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "আপনার হাতে ত অখন দেশ চালাইবার ভার, আপনে অপজিশনের কী করবেন। অপজিশন ছাড়া দেশ চালাইবেন কেমনে। জওহরলাল নেহরু ক্ষমতায়

বইস্যাই জয়প্রকাশ নারায়নরে কইলেন, 'তোমরা অপজিশন পার্টি গইড়্যা তোল'। শেখ সাহেব কইলেন 'আগামী ইলেকশানে অপজিশন পার্টিগুলো ম্যাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সিট পাইব না'। আমি একটু আহত অইলাম, কইলাম, 'আপনে অপজিশনরে একশ' সিট ছাইড়া দেবেন না? শেখ সাহেব হাসলেন। ... ইতিহাস শেখ সাহেবরে স্টেটসম্যান অইবার একটা সুযোগ দিছিল। তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না" (১(১)/৯৫)।

"What Professor Razzaque suggested was a version of an experiment Kamal Ataturk had attempted to do in his country to encourage some measure of pluralism to strengthen the foundations of the Turkish Republic. It did not work in Turkey and it would not have worked in Bangladesh. Democracy can not be nurtured by an artificially created opposition" (৭/৩০৫)। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোনো গণতান্ত্রিক দেশেই সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশে এমন 'কৃত্রিম বিরোধী দল' সৃষ্টির কোনো প্রায়োগিক নজির মেলে না। নেহরু কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়নকে গোনাগুনতি 'সিট' ছেড়ে না দিয়েই তাঁদের 'অপজিশন' সংগঠিত করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাংলাদেশে অধ্যাপক রাজ্জাক কথিত মোট ৩০০আসনের মধ্যে ১০০কেন, আরো বেশি সংখ্যক ছেড়ে দিলেও 'সীট প্রত্যাশী' সকল দলকে খুশি করা যেতো কি? এভাবে আপোষে 'সিট' ভাগাভাগি কার্যত গণতন্ত্রকেই প্রহসনে পরিণত করে। এক্ষেত্রে জাপা-জাসদের এবং বিএনপি-ফ্রিডম পার্টির সিট ভাগাভাগির কথা একান্ত বাস্তব উদাহরণ হিসেবেই স্মরণ করা যেতে পারে। ধারণা করি, অধ্যাপক রাজ্জাক তত্ত্বীয় বা একাডেমিক আলোচনা হিসেবেই বঙ্গবন্ধুকে অমন কথাগুলি বলেছিলেন এবং তাই বঙ্গবন্ধুর আপত্তি-অসম্মতিতে প্রাজ্ঞ অধ্যাপকের ক্ষুব্ধতার কোনো কারণই ঘটেনি।

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর উল্লেখ করেছেন : "পরে যখন শেখ মুজিবের নাম উচ্চারণ করা প্রায় নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তখন 'বাংলাদেশ : স্টেট অব নেশন' বক্তৃতায় অধ্যাপক রাজ্জাক তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু বলে উল্লেখ করেন ষোলবার। বাংলাদেশ ও শেখ মুজিব সম্পর্কে তিনি বলেন,'এই উপমহাদেশের সমগ্র অঞ্চল বা কোনো বিশেষ অংশের সঙ্গে ধর্ম বা শ্রেণীগত কাঠামোর দিক দিয়ে আমাদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু স্বতন্ত্র পরিচয় রাখার ক্ষেত্রে আমাদের অদম্য ইচ্ছাই এ সবকিছুকে অতিক্রম করেছে। এই আকাঙ্খার প্রতীক হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু এবং এটাই এই বিশেষ মানুষটা আর জনতার মধ্যে গড়ে তুলেছিল অবিচ্ছেদ্য সেতুবন্ধন। বঙ্গবন্ধুর স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর গুণের তালিকা প্রস্তুত করা বা তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর স্ফীতবাক হওয়া অপ্রাসঙ্গিক। জনতা তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল। কারণ তাঁর মধ্যে তারা জাতি হিসেবে নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার যে গভীর ইচ্ছা তার বহিঃপ্রকাশ দেখেছিল" (১(১)/৯৫)।

অনেক পর্যবেক্ষকই এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সদ্য-স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু যদি সংবিধান এবং নির্বাচন দিতে আরো

দু'এক বছর বিলম্বও করতেন, তবু সমালোচনার কোনো কারণ ঘটতো না। কিন্তু আপন গণতান্ত্রিক চিন্তা থেকেই বঙ্গবন্ধু এক্ষেত্রে কালহরণ করেননি। তবে অনস্বীকার্য যে, ১৯৭৩ইং নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর এবিষয়ে বঙ্গবন্ধু-বিরোধী মহলে প্রভূত বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল কিন্তু তার কতটুকু ছিল বাস্তবভিত্তিক কিংবা কতটুকু কল্পকথা, সে সম্পর্কে এযাবৎ কোনো নির্মোহ মূল্যায়ন হয়নি। যে কতিপয় ক্ষেত্রে নির্বাচনী কারচূপির অভিযোগ উঠেছিল, তার সাথে বঙ্গবন্ধুর কিংবা দলীয় হাইকমান্ডের যোগসাজসের মত কিছুই প্রতিপন্ন হয়নি, যা ঘটেছিল, তা স্থানীয় পর্যায়ের সুবিধা-প্রত্যাশী নেতাকর্মী এবং প্রশাসনের উদ্যোগেই ঘটেছিল। কিন্তু অনস্বীকার্য যে অপবাদ সবটুকুই বহন করতে হয়েছে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগকেই।

১৯৭৩ইং জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রায় অনালোচিত একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা দরকার। এমন বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে নিষিদ্ধ-ঘোষিত ধর্ম-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং পশ্চাদমুখী প্রতিক্রিয়াশীলতার পূণঃবিকাশে মওলানা ভাসানির উদ্যোগ সরাসরি সহায়ক হয়েছিল। "Maulana Bhashani, ... had gone into seclusion immediately after liberation. But the prospect of another election (1973) drew him back into the public arena. As a religious leader he could not resist the temptetion to bring together several religious groups, banned to operate on their own because of their pro-Pakistan ideology, under his United Action Committee. As a peasant leader he sought to attract various Maosists (opposed to liberation of Bangladesh) into the fold ... The basis of their tenuous unity was a shared anti-indian feeling" (৭/২৯৪)।

৭ মার্চ ১৯৭৩ইং নির্বাচনের প্রায় একমাস আগে, "১০ ফেব্রুয়ারি সকল জেলার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের ঢাকায় ডেকে এনে শেখ মুজিব 'নির্বাচনে সরকারী ও বিরোধীদলের মধ্যে কোনো বৈষম্য না-করা'র আহ্বান জানান। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাঁর এই সদিচ্ছার মূল্য দেয়নি" (২৪/৪৭)। তথাপি ভোট-কারচুপি প্রসঙ্গে পর্যবেক্ষকদের এমন মন্তব্য উড়িয়ে দেবার নয় যে, "There was also the general impression that the candidates of all the parties had indulged in electoral irregularities ... Some of these were time-honoured methods going back to British days. What was qualitatively different in the 1973 elections was the direct involvement of the govt. machieary in the manipulation of votes ... in atleast 15 constituencies" (৭/৩০৮)। "অবজারভারের এক প্রতিবেদনের মতে বিরোধীদলকে কমপক্ষে ৩০টি আসন থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে" (২৪/৪৮)। গোলাম মুরশিদের মন্তব্য, নির্বাচনে "কারচুপির ঘটনা খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। ... দেশের একটি প্রধান দল ছিলো মোজাফফর ন্যাপ। আওয়ামী লীগের পরে সবচেয়ে বেশি ভোট (প্রায় ৯%) পেয়েছিল এই দল। কিন্তু একটি আসনেও জয়ী হতে পারেনি। ... মোজাফফর আহমেদ দাবি করেন যে,

নির্বাচনে কারচুপি না হলে তাঁর দল ২৫টি আসনে জয়ী হতো। কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে, অবাধ নির্বাচন হলে, বিরোধী দলগুলি হয়তো বড়জোর ৩০/৪০টির মত আসনে জয়ী হতো। ৩০০ আসনের সংসদে তা নিতান্ত নগণ্য। ... সংসদে বিরোধী দল কার্যত না-থাকায় তা পরিণত হলো রাবার স্ট্যাম্পে। মুজিবের ইচ্ছাই হতো সংসদের ইচ্ছা" (২০/২০৪)। উল্লেখ্য যে, উক্ত নির্বাচনে সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯১টি আসন পেয়েছিল আওয়ামী লীগ আর জাসদ পেয়েছিল ২টি, জাতীয় লীগ ১টি, স্বতন্ত্র ৬টি।

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ফারুক চৌধুরী লিখেছেন, "শেখ মুজিব তাঁকে লন্ডনে বলেছিলেন যে, বিরোধী দলগুলো যদি ১০০টি আসন পেত তাহলে দেশের রাজনৈতিক সমস্যা অনেক কম হত" (২৪/৪৮)। এখানে জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের সাথে মুজিবের চিন্তার মিল লক্ষ্য করা গেলেও,নির্বাচনে আসন বাটোয়ারার নীতিতে মুজিব কখনো আস্থাশীল ছিলেন না। এটা ১৯৫৪ইং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময়ও তেমনি লক্ষ্য করা গেছে। আর তখন বাটোয়ারা-নীতি যে সুফল দেয়নি, তা' ইতিহাসেই প্রতিপন্ন হয়েছে। ১৯৭৩ইং নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আমলা কাজী ফজলুর রহমানের মন্তব্য : "ঠিক মতো নির্বাচন হলে সরকারি দল বড়জোর ২০টি আসন হারাতো। ... দেশের লোক আওয়ামী লীগকে বা তাদের মনোনীত প্রর্থীদের ভোট দেয়নি, দিয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। সবাই জানে এখন দেশে তাঁর কোনো বিকল্প নেই" (২৪/৪৯)। অনস্বীকার্য যে, ২০-৩০টি আসনে স্থানীয় উদ্যোগে কোনো-না-কোনো রকমের কারচুপি হয়ে থাকতে পারে, এবং তাতেই প্রবল আওয়ামী লীগ-বিরোধী প্রচারণা শুরু করা গিয়েছিল। অর্থাৎ অতি-উৎসাহী স্থানীয় নেতাকর্মীদের অবৈধ তৎপরতায় বঙ্গবন্ধুর সুনাম এবং আওয়ামী লীগের সমুহ ক্ষতি হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী এবং সরাসরি বঙ্গবন্ধু বিরোধী শত্রুদের প্রবল অপপ্রচারে এ ক্ষতি কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি।

১৯৭৩ইং মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যতটুকু কারচূপি যেভাবেই হয়ে থাকুক, তা মুজিবের অভিপ্রেত ছিল, এমনটি বলার মত তথ্য-প্রমান কোনো সূত্রেই মিলেনি। বরং মুজিব স্বচ্ছ-সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন বলেই বিশ্বাস করা চলে। তাঁকে নির্বাচনী কারচুপিতে আস্থাশীল মানুষ বলে মনে করার কোনো কারণ কখনো ঘটেনি। মাত্র দু'মাস পরে চারটি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। "the results of these by-elections announced on 30 May- 2 seats won by Awami League, 1 by JSd and one by an independent candidate – only served to emphasise that had the March elections been equally fair, the Awami Leagur would have won with a comfortable majority." (৭/৩১০)।

বঙ্গবন্ধু-বিরোধী সকল অপ-প্রচারের মূল উৎস এবং প্রধান শক্তি এসেছে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণী থেকে, কখনো সাধারণ নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীন শ্রেণী থেকে নয়। বিষয়টি সম্পর্কে কোনো গ্রহণযোগ্য নির্মোহ সমাজতাত্বিক বা অর্থনৈতিক গবেষণাও হয়নি। রাজনীতি কখনো কল্প-কথার ওপর নয়, দাঁড়ায় সমকালীন বাস্তবতার ওপর। তাই, এমন গবেষণার প্রয়োজন এখনো অনস্বীকার্য বলেই মানতে হয়।

দালাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সাধারণ ক্ষমা ঃ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা

"বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দালালদের দ্বারা সংঘটিত নরমেধযজ্ঞকেও 'মানবেতিহাসের জঘণ্যতম হত্যাযজ্ঞ', 'সাম্প্রতিক কালের নিষ্ঠুরতম হত্যালীলা' ইত্যাদি শব্দমালায় বর্ণনা করা হয়। বলা হয়ে থাকে, রক্তই যদি স্বাধীনতার মূল্য হয়, তবে বাঙালি জাতি সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে। ... ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার তেত্রিশতম বার্ষিকী ... রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বের ইতিহাসে যে সমস্ত গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে; তারমধ্যে স্বল্পতমসময়ে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের গণহত্যায়। ... নিষ্ঠুরতার দিক দিয়েও এই হত্যাযজ্ঞের তূলনা নেই। ... হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা পড়লে আরও একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে যে, এই বর্বরতায় ঘাতকবাহিনীর সমান নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিল তাদের এদেশীয় দালাল শান্তি কমিটি, জামাতে ইসলামী,মুসলিম লীগ, আলবদর, আল-শামস, মুজাহিদ, রাজাকার ... প্রভৃতি বাহিনীর সদস্যরা। ... পৃথিবীর দেশে দেশে স্বাধীনতাযুদ্ধের পর অজ্ঞাতনামা শহীদদের উদ্দেশ্যে স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়েছে, আর তালিকা তৈরি করে সূচিহ্নিত করা হয়েছে স্বাধীনতাবিরোধীদের। আমাদের দেশে হয়েছে ঠিক তার উল্টো। ... মানবেতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও আমাদের সাহিত্যিক গবেষকরা এই হত্যাকান্ডের সামগ্রিক রূপরেখা বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন" (২৭/৯-১১)।

"প্রতিটি দেশেই জাতীয় চেতনাবিরোধী কিছু লোক থাকে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এরা 'ঘরশত্রু বিভীষণ'এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আমাদের দেশও এ-থেকে ব্যতিক্রম নয়। ২৫মার্চ ১৯৭১ হনাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পর প্রথম সুযোগেই কিছু লোক হানাদারদের সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে যায়। ওরা প্রথমে 'শান্তি কমিটি', পরে আলবদর, রাজাকার,আলশামস্ প্রভৃতি ঘাতকবাহিনী গড়ে তোলে। এই 'সহযোগীরা' (কোলাবরেটর') সাধারণভাবে 'দালাল'রূপে পরিচিতি পায়। মুক্তির ঊষালগ্নে ১৪ডিসেম্বর ১৯৭১ বুদ্ধিজীবীদের নিধন ছিল ওদের বাংলাকে মেধাহীন করার কৌশল। স্বাধীনতাকামী প্রতিটি পরিবার কোনো না কোনোভাবে ওদের নিগ্রহের শিকার হয়। যুদ্ধোত্তর কালে পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের দ্বারা সংগঠিত নজিরবিহীন গণহত্যার প্রতিবাদে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ শোকবার্তা পাঠায়। ... দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নাৎসীদের বিচারের অভিজ্ঞতায় কেউ কেউ বার্ট্রান্ড রাসেল, জ্যা পল সার্ত্রে, আন্দ্রেঁ মালরো প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেন। স্বয়ং শেখ মুজিব বলেন : পাকিস্তানি সেরাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তার অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুন্যাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি। ... যারা অন্যায়ভাবে আমাদের মানুষদের মেরেছে, তাদের অবশ্যই বিচার হবে" (২৪/৬৪)।

গোলাম মুরশিদ উল্লেখ করেছেন, "শান্তি কমিটির সদস্য হিসেবে তারা পাকবাহিনীকে তথ্য দিতো, পথ দেখাতো। এ দিয়েই পাকসেনারা সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছিলো। ... সেনাবাহিনী শহরে তান্ডব সৃষ্টি করলেও, মফস্বলে হত্যা, লুন্ঠন, অগ্নি সংযোগ, ধর্ষণ এবং ধর্মান্তরের কাজ করেছিলো রাজাকারেরা। এই রাজাকারেরা কেউ কেউ আবার স্বাধীনতার পরে মুক্তিযোদ্ধা সাজে, আনসার বাহিনী অথবা বিডিআরে যোগ দেয়। তারপর তাদের দেশবিরোধী ভূমিকা পালন করতে থাকে। সুতরাং দালালদের ন্যায্য বিচার হওয়া উচিত ছিলো" (২০/১৯৯)। গোলাম মুরশিদ আরো লিখেছেন, "সরকার দালালদের কিছুই করেনি বললে, অসত্য বলা হবে। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার মাসখানেক পরেই- ২৪ জানুয়ারি দালাল আদেশ জারি করা হয়েছিলো। এই আদেশ অনুসারে হাজার হাজার দালাল গ্রেফতার হয। ... ৩রা অক্টোবর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, তখন পর্যন্ত ৪১হাজার ৮শ' দালাল এই আইনের অধীনে আটক করা হয়েছে। ... তখন যদি শ'খানেক দালালেরও যথার্থ বিচার এবং তাদের অমানবিক আচরণের জন্য কঠোর শাস্তি হতো,তা হলে বাংলাদেশে অতো দ্রুত পাকিস্তান প্রেম উথলে উঠতো বলে মনে হয় না। তা হলে কালে কালে দালালরা মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার জাতীয়তাবাদী দলের উঁচু আসনে বসতে পারতো না; অথবা আল-বদর বাহিনীর কোনো সদস্যও দেশের মন্ত্রীর আসন পেতো না। ... যে রাজাকারেরা লক্ষাধিক সাধারণ মানুষের হত্যা এবং লক্ষাধিক নারী ধর্ষণের জন্যে দায়ি ছিলো, তাঁদের একজনেরও ফাঁসি হলো না অথবা দীর্ঘমেয়াদি জেল হলো না, এর চেয়ে বড়ো অবিচার আর কী হতে পারে? তবে কেবল শেখ মুজিব নিজেই এই দালালদের শাস্তি না হওয়ার জন্য দায়ী ছিলেন না। বাংলাদেশ যে ছোট্ট একটি দেশ এবং এখানে আত্মীয়তার বন্ধন জোরালো ভূমিকা পালন করে - তাও এর জন্য দায়ি। ... সবাই সবার আত্মীয়, নিদেন পক্ষে দূর সম্পর্কের আত্মীয়" (২০/২০০-২০১)।

তবে দালাল রাজাকারদের বিচারের প্রত্যাশা এবং ব্যর্থতার বিষয়টিকে অত সরলীকৃত দৃষ্টিতে না দেখাই সঙ্গত, অনিবার্যভাবেই এর সাথে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক কুটনীতির বহুমুখী জটিলতা। "যুদ্ধবন্দী এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের বিচারের সময় জেনেভা কনভেনশনের সুবিধাদানে সরকারকে প্রভাবিত করার জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস, বিশ্বশান্তি পরিষদ, এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল প্রভৃতি সংস্থার প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফরে আসেন। দেশজুড়ে অসংখ্য বধ্যভূমিতে অকল্পনীয় নির্যাতনের চিহ্নসহ অজস্র বিকৃত মৃতদেহ এবং হাড়-কঙ্কালের স্তূপ দেখে তারা স্তম্ভিত হয়ে যান। তারা নিজেরাই এদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ... মার্কিন সিনেটর ডেমোক্রেট দলীয় এ্যাডলাই স্টিভেনসন ... বলেন, 'বাংলাদেশে পাক বাহিনীর নৃশংসতা ছিল ভয়াবহ এবং মানবজাতির ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। এই বর্বরতা মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে'। ... এডয়ার্ড কেনেডি বলেন, 'মানুষের মস্তিষ্কে এধরণের বর্বরতার চিন্তা আসতে পারে এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয়" (২৪/৬৬-৬৭)।

কৌতুহলী পাঠকদের জন্য সবিনয়ে উল্লেখ করছি, দালাল-যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের

উদ্যোগ এবং ব্যর্থতা, পরবর্তী সময়ে 'সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা' ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত তথ্য-সমৃদ্ধ পুস্তক হালিম দাদ খানের 'বাংলাদেশের রাজনীতি :১৯৭২-১৯৭৫' এবং অবশ্যই আরো অনেক তথ্য-পুস্তকাদি রয়েছে। বর্তমান মুজিব-জীবনী আলোচনায় সেই দিনেরও ক্ষমা ঘোষণার পূর্ণাঙ্গ উল্লেখ সম্ভব নয়, তবে আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় বাস্তব পরিস্তিতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হবে। প্রসঙ্গতই বলা দরকার, এবিষয়ে বিরূপ সমালোচনা করা যেতেই পারে, কিন্তু তখনকার সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি মনে রেখেই করতে হবে। অন্যথায়, ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যার আশংকা থাকবেই এবং অহেতুক অনভিপ্রেত অবিচার করা হবে বাংলাদেশের স্রষ্টা এবং বাংলাদেশের জন্যই জীবনদাতা বঙ্গবন্ধু মুজিবের প্রতি। এখনো মৃত মুজিবের বিরুদ্ধেও কঠোর সমালোচনা-অপবাদ উচ্চারিত হয় বিভিন্ন মহলেই। তবে এবিষয়ে গভীরতর বাস্তবতার দিকে চোখ ফিরিয়ে থাকাটাও অযৌক্তিক। প্রশ্ন হচ্ছে, মুজিব কি কোনোরকম ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থচিন্তায় দালাল-যুদ্ধাপরাধী বিচারে অনিচ্ছুক ছিলেন, নাকি বাস্তব পরিস্থিতিই তাঁকে এমন দুর্বলতা প্রদর্শনে বাধ্য করেছিল?

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর ১২জানুয়ারি ১৯৭২ইং বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "লোমহর্ষক হত্যাকান্ডের কাহিনী আমি শুনেছি। তবু বাংলার মানুষ এত নীচে নামবে না (প্রতিশোধ পরায়ন হবে না) , বরং যা মানবিক তা-ই করবে। তবে অবশ্যই আইনানুযায়ী অপরাধীদের বিচার হবে" (২৪/৬৭)। ৬ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ইং কলকাতার ব্রিগেড প্যারেন্ড গ্রাউন্ডের বিশাল জনসমাবেশে মুজিব বলেছিলেন, "যারা গণহত্যা চালিয়েছে, তারা সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, এদের ক্ষমা করলে ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না" (প্রাগুক্ত)। কিন্তু তারপরেও একথাই সত্য যে, বঙ্গবন্ধু মুজিব গণ-প্রত্যাশামত দালাল-যুদ্ধাপরাধীদের যথাযথ বিচার করতে পারেননি।

"ঢাকা ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ শত্রুমুক্ত হলেও ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল মুক্ত হওয়া শুরু হয় এবং সেইসাথে মুক্তাঞ্চলে দালালদের আটক করা শুরু হয়। এপ্রিলের (১৯৭৩) মাঝামাঝি সময়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বরাতে জানা যায়, সারাদেশে দালালির ১২ হাজার মামলার মধ্যে ৬ হাজার মামলার চার্জশিট দেওয়া হয়। এই ৬ হাজার মামলায় অভিযুক্ত ২৯হাজার দালালের মধ্যে ৩১মার্চ ১৯৭৩ পর্যন্ত আটক করা হয়েছে ১০,৪৪০জন। ... মামলার তদন্ত চলছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা ৫,২৬৯জন। এ পর্যন্ত বিশেষ আদালতে ৫৯২টি মামলার বিচার হযেছে, যার মধ্যে ৩১৩টিতে সাজা হয়েছে। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক (৪৭.১৩%) মামলার অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছিল। এই বিপুল সংখ্যক অভিযুক্তের ছাড়া পাওয়া এবং বিচার বিলম্বিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে তৎকালীন স্বরাষ্টমন্ত্রী আব্দুল মালেক উকিল বলেন : মামলার বিচার অনুষ্ঠানের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের অভাব রয়েছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে সাক্ষি-প্রমান জোগাড় করতেও সময় লাগে। সেজন্য সরকার সচেষ্ট। কাউকেই অকারণে সাজা দেওয়া হবে না" (২৪/৬৯)। পেছন ফিরে তাকালে কি কথাগুলি অযৌক্তিক মনে হয়?

দালালাদের বিচার পদ্ধতি এবং দালাল আইনের ত্রুটি প্রসঙ্গে ২৩ জুলাই 'দৈনিক বাংলা'য় দালাল আইন সংশোধনের প্রয়োজন' নামক নিবন্ধে বলা হয়েছিল, "পুলিশের

সংখ্যা এমনিতেই অপ্রতুল। তদুপরি 'কোলাবরেটর অ্যাক্টে' অভিযোগ তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে শুধু থানার ওসিকে। কিন্তু ওসির পক্ষে একা অসংখ্য মামলা তদন্ত করা এক প্রকার অসম্ভব। ... তাছাড়া, দালাল আইন বিশেষজ্ঞদের কিছু মন্তব্য রয়েছে। তাঁরা বলছেন, দালাল আইন করা হয়েছে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিচার করার জন্য। কাজেই সে অপরাধ প্রমানের জন্য থাকতে হবে সাক্ষ্যপ্রমানের বিশেষ ধরণ। কিন্তু বর্তমান আইনের সাক্ষ্যপ্রমানের জন্য অনুসরণ করতে হয় একশ বছরের পুরণো 'ইভিডেন্স এ্যাক্ট'। ... ফলে অপরাধ প্রমান করা হয়ে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য" (২৪/৯৩)। তৎকালীন আমলাতন্ত্র প্রসঙ্গে যথার্থই বলা হয়, "স্বাধীনতার পর পরই মুজিবনগর সরকার 'কন্টিনিউয়েন্স অব সার্ভিসেস অর্ডার' জারি করে পাকিস্তানের পরাজিত প্রশাসনের অংশ এবং 'পাকিস্তান মেইড' আমলাতন্ত্রকে ক্ষমতায় পূণর্বহাল করেন। ... এদের অনেকেই জাতীয় নীতি প্রভাবিত করার মতো গুরুত্বপূর্ণ শীর্ষপদ দখল করে। ... কিছু কিছু উচ্চপদস্থ বাঙালি ছিলেন যারা ওই বিচারে ফেঁসে যাবার ভয়ে ভীত ছিলেন। ফলে তাদের কুকর্ম প্রকাশিত হবার আগেই তারা এ বিচারানুষ্ঠান বন্ধ করতে তৎপর হন" (২৪/৯৩)। অভিযোগ উঠেছিল পরাজিত পাকিস্তান বাহিনীর বাঙালি সৈনিক ও সেনা-কর্মকর্তাদের পূণর্বাসন-পদায়ন সম্পর্কেও। অনস্বীকার্য প্রশ্ন, 'শূন্য থেকে শুরু' বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ এবং স্থানচ্যুত মানুষের পূণর্বাসন এবং বিধ্বস্ত রাষ্ট্র-কাঠামোর পূণর্গঠণ করার কাজগুলির দিকে সীমিত শক্তি-সম্পদ নিয়োগের বদলে, নতুন আইন প্রবর্তন এবং পুলিশ-বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা কি আদৌ সম্ভব ছিল?

'কন্টিনিউয়েন্স অব সার্ভিসেস অর্ডার' সম্পর্কে আব্দুল গাফফার চৌধুরীর মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধাণযোগ্য :"বাংলাদেশ যেহেতু গণবিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, ... পাকিস্তান মেড ব্যুরোক্রেসিকে শাসনক্ষমতা থেকে অপসারণ করা সহজ ছিল এবং সম্ভবও ছিল। ... শেখ মুজিব পাকিস্তানি জেল থেকে মুক্ত হয়ে আসার আগেই অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন একটা মস্ত বড় ভুল করে বসলেন। তিনি 'কন্টিনিউয়েন্স অব সার্ভিসেস অর্ডার' জারি করে ব্যুরোক্রেসিকে আবার ক্ষমতায় পূণর্বহাল করলেন। এই অর্ডারের একটাই মাত্র অর্থ, বাংলাদেশের জাতীয় বিপ্লবের স্বেচ্ছামৃত্যু এবং জয়লাভের পর পরাজিত প্রতিক্রিয়াশীল প্রশাসন যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পন। বাংলাদেশের মত পৃথিবীর আর কোথাও কোন দেশে জাতীয় বিপ্লবে সাফল্য লাভের পর এইভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে দেখা যায়নি" (২৮/৭৯)। মন্তব্যটি জোরালো, সন্দেহ নাই। কিন্তু সদ্য-স্বাধীন বংলাদেশের পরিস্থিতিতে কতটা বাস্তবসম্মত ছিল, সে সংশয় থেকেই যায়। তবে বর্তমান সময়ে মুজিব-জীবনী আলোচনায় সে-বিতর্ক নিতান্তই অর্থহীন বলে মনে করি। বরং দালাল-যুদ্ধাপরাধী বিচারের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় ফেরা যাক।

ভারতে প্রত্যাবসিত প্রায় এক লক্ষ যুদ্ধবন্দীর প্রযোজনীয় বিপুল ব্যয় নির্বাহের কথাটিও ভাবনায় রাখতে হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা, প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ভরণপোষণ এবং সরাসরি যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় ভারতের অর্থনীতির ওপর যে

চাপ পড়েছিল, তারপরে যুদ্ধবন্দীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়-বিধান করা যথার্থই অসম্ভব বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারত স্বাভাবিকভাবেই যথাশীঘ্র একটা সমাধানের পথ খুঁজছিল। তদুপরি ছিল পাকিস্তানে আটক বেশ কয়েক হাজার সামরিক ও বেসামরিক বাঙালির পূণর্বাসনের প্রশ্নটি। বিষয়টিকে ভুট্টো স্বভাবতই যুক্ত করেছিলেন পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের সাথে। বাংলাদেশের ভেতরেও পাকিস্তানে আটকে-পড়া বাঙালিদের যথাশীঘ্র ফেরত আনার ব্যাপারে সরকারের ওপর মানবিক-নৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। সবমিলিয়ে অনস্বীকার্য যে বাঙালি প্রত্যাবাসন এবং যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়গুলি কার্যতই আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে উঠেছিল। জানুয়ারি, ১৯৭৩ইং 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকা লিখেছিল : "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন মুজিবকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছে যে, ৭৩হাজার সামরিক ও ২০ হাজার বেসামরিক ব্যক্তির বিচার হলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো নীতিভ্রষ্ট পাকিস্তানি জনগোষ্ঠি নিয়ে মহা সমস্যায় পড়ে যাবেন এবং এটি উপমাহদেশের শান্তি আলোচনাকে মারাত্মকভাবে ব্যহত করবে" (২৪/৯৫)।

এমন প্রেক্ষাপটেই স্মরণীয়, ১৯৭২ইং ২৬ এপ্রিল প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমরা যদি খুন ধর্ষণ এবং লুটতরাজের মতো অপরাধের শাস্তি প্রদান না করি তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আমাদের কখনও ক্ষমা করবে না'। অথচ সেই মুজিবই 'চারিদিকে উন্নত বড় শক্তির চাপে'র সম্মুখীন হয়ে এশিয়া ও বিশ্বের বন্ধুত্বের আশায় 'প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ' করেন" (প্রাগুক্ত)। ডিসেম্বর ১৯৭৩ইং আব্দুল গাফফার চৌধুরীকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন তিনি শীঘ্রই যুদ্ধাপরাধীদেরকে 'সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা' করে ছেড়ে দেবেন। বিস্মিত গাফফার চৌধূরী প্রশ্ন করেছিলেন, 'পালের গোদাদেরকেও ছেড়ে দেবেন'? বঙ্গবন্ধু বললেন, "হ্যা। সকলকে। কেবল যাদের বিরুদ্ধে খুন, রাহাজানি, ঘরে আগুণ দেযা, নারী হরণ বা ধর্ষণ প্রভৃতির অভিযোগ রয়েছে, তারা ছাড়া পাবেন না"। অতঃপর বিষন্ন কণ্ঠে হেসে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "সকলকেই ছেড়ে দিতে হবে। ... আমিতো চেয়েছিলাম নব্বই হাজার পাকিস্তানি সৈন্যদের ছেড়ে দিয়ে অন্তত ১৯২জন যুদ্ধাপরাধী অফিসারের বিচার করতে। তাও পেরেছি কি? আমি একটা ছোট্ট অনুন্নত দেশের নেতা। চারিদিকে উন্নত ও বড় শক্তির চাপ। ইচ্ছা থাকলেই কি আর সব কাজ করা যায়"? (২৮/১৩-১৪)। ২৬ মার্চ, ১৯৭৫ইং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে মুজিব বললেন, "আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করব। আমি প্রতিশ্রুত ভঙ্গ করেছি। আমি তাদের বিচার করিনি। আমি তাদের ক্ষমা করেছি। কেন না আমি এশিয়া ও বিশ্বের বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম" (২৪/৯৫)।

ইতিহাসবিদ এ. এল. খতিবের একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য। "মুজিব মস্তিষ্কের চেয়ে হৃদয় দ্বারাই বেশি চলিত হতেন। তিনি রেগে গেলেও শীঘ্রই ক্ষমা করতেন এবং কারো উপর রাগ করলেও দয়া দিয়েই ক্ষতিপূরণ করতেন"।

হয়তো কিছুটা প্রসঙ্গান্তর ঘটবে, তথাপি মানবিক মুজিবের হৃদয়ের গভীরতার পরিচয় হিসেবেই একটি তথ্যের উল্লেখ করতে চাই। "মুজিবের হৃদয় কত বড়? এ

প্রশ্নের উত্তর বের করা অসম্ভব। ... ১৯৭২ সালের ঘটনা, অভিজ্ঞতাটি সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর। ... মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পূণর্বাসনের জন্য বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন 'নারী পূণর্বাসন বোর্ড'। ... একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক, পিতাসহ মেয়েকে নিয়ে রাত আড়াইটায় আমার কাছে ছুটে আসেন। মেয়েটি মহান মুক্তিযুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের একজন। তার অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। ... অবস্থা এতোটাই খারাপ ছিল যে, (হাসপাতালের) ডাক্তাররা ঝুঁকি মনে করে চিকিৎসার পূর্বে মেয়েটির নাম-ঠিকানা ও পিতৃপরিচয় জানতে চান। যেহেতু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ ছিল, এসব বীরাঙ্গনার সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। এহেন পরিস্থিতিতে আমি তার জীবন বাঁচানোর স্বার্থে সাহায্যের জন্য সূর্যোদয়ের পূর্বেই ৩২ নাম্বার বাড়িতে যাই। ... সবকিছু খুলে বলি, পিতার নাম ঠিকানা ছাড়া ডাক্তাররা মেয়েটির চিকিৎসা করবে না। ... বঙ্গবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করে থেকে অশ্রুসিক্ত হয়ে বললেন, 'গিয়ে বলো, ওর বাবার নাম শেখ মুজিবুর রহমান, ঠিকানা, রোড নম্বর ৩২, ধানমন্ডি" (২২/১১৪-১১৫)।

বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের সম্পর্কে মুজিব প্রায়ই একটি কথা বলতেন, "যদি একভাই দালাল তো আর এক ভাই মুক্তিযোদ্ধা। প্রত্যেক পরিবারই ক্ষতিগ্রস্থ। আমি তাদের ক্ষতি বাড়াতে চাই না" (২৪/৯৪)। বাংলাদেশের সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্ক-কাঠামো এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ের বাস্তবতার কথা মনে রাখলে, বঙ্গবন্ধু মুজিবের কথার মর্ম বুঝতে অসুবিধা হয় না। এখনো বাংলাদেশের, বিশেষত মফস্বলের 'বিচক্ষণ-সুচতুর' পরিবারগুলির অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবেই জড়িত রয়েছেন। এখানে আদর্শের প্রশ্নটি আদৌ বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে, রাজনৈতিক পট পরিবর্তনেও পারিবারিক সম্পত্তি-সম্মান-প্রভাব অক্ষুন্ন রাখার 'বিচক্ষণ অভিপ্রায়'। পারিবারিক এবং শ্রেণীগত কুশলী-বিভাজনের রাজনীতির শুরুটা মূলত একাত্তরেই, এবং লক্ষণীয় সাফল্যের কারণেই পরবর্তী সময়ে ক্রমবর্ধমান, এসত্য অনস্বীকার্য।

আব্দুল গাফফার চৌধুরী ১৯৭৩ইং অক্টোবর/নভেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, "জেলে সবুর খান খুব অসুস্থ। তাকে কি চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা যায় না? ... একান্তই মানবিক কারণে (অনুরোধ করতে) এসেছি। মুজিব চিন্তিতভাবে বললেন, 'কিন্তু পুলিশের রিপোর্ট, তার অসুস্থতা তেমন গুরুতর নয়'। (গাফফার বললেন), হতে পারে, তবে কম অসুস্থ লোকও ভালো চিকিৎসা পাওয়ার দাবি জানাতে পারেন। মুজিব সহানুভূতির সুরে বললেন : 'বিশ্বাস করো, এদের আমি ছেড়ে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে এরা দেশের বিরুদ্ধে যা করেছেন, তাতে এরা নিজেরাও অনুতপ্ত। ... বয়স হয়েছে। রাজনৈতিক ঝামেলায় নতুনভাবে জাড়ানোর ইচ্ছে এদের অনেকেরই নেই। জনসাধারণের ঘৃণা আর ক্রোধ এদের জীবন অভিশপ্ত করে তুলেছে। কি হবে এদের আরো জেল খাটিয়ে? ... স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে তখনই ফোনে নির্দেশ দিলেন প্রযোজনীয় ব্যবস্থা করার। এই হচ্ছে মানুষ মুজিব। উদার মুজিব। ক্ষমাশীল মুজিব" (২৮/৮২-

৮৩)। শুধু সবুর খান নন, এমন আরো অনেক দালাল-রাজাকারের প্রতিই মুজিব সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, নানা অনুরোধ-সূত্রে।

তবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার জন্য প্রভূত সমালোচনাও হয়েছে মুজিবের। উদাহরণ হিসেবেই মাত্র দুটির উল্লেখ করছি। অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমকে এক সাক্ষাৎকারে শহীদ-জননী জাহানারা ইমাম বলেছিলেন, বঙ্গবন্ধু মুজিব "আমাদের অবিসংবাদিত নেতা ... সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তাঁকে আমরা প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসি। ... ক্রমে তিনি দেশের সবচেয়ে বড়ো নেতা হয়েছেন। ... শেখ যখন (স্বাধীনতার পরে) এলেন, তখন আমার মনে হয় যে, তিনি দেশবাসীর, মুক্তিযোদ্ধাদের মোকাবেলা করতে পারছেন না। ... আসল মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হলো যে, তোমরা অপেক্ষা করো কিংবা তোমরা নিজের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাও। ... অনেক ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট পেয়ে গেলো। ... কতো সোনার ছেলে, কতো তরুণ -যাদের মনের মধ্যে ছিল আদর্শ, চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন মৃত্যুবরণ করেছে। ... কয়েকটা ভুলও বোধ হয় ওই সরকার করেছিল। যেমন দালালদের ক্ষমা করে দেওয়া হলো। তারা তখন জেলে রয়েছে, কেউ লুকিয়ে রয়েছে। ক্ষমা করে দেওয়ার পর তারা বেরিয়ে এসে বেশ কিছুদিন মাথা নীচু করে থাকলো। আস্তে আস্তে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলো। তখন যদি ওই দালালদের শেষ করে দেওয়া যেতো, তা হলে তারা তো এই ক্ষতি করতে পারতো না" (২০/২০৯)।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ইং আলবদরের হাতে শহীদ তিন ভাইয়ের (বদিউজ্জামান, শাহজাহান, ও করিমুজ্জামান) পরিবারের অভিভাবক মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হুদা বলেন : "রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু যারা লাখ লাখ স্বাধীনতাকামী লোককে হত্যা করেছিল, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ ছিল। ... একটি চরম ভুল সিদ্ধান্ত" (২৪/৮৯)। প্রসঙ্গতই আলবদর কর্তৃক ১৪-১৬ডিসেম্বর ১৯৭১ইং সংঘটিত পরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড সম্পর্কে একটি তথ্য উল্লেখ করা যেতে পারে। "২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ বুদ্ধিজীবীগণ উদ্যোগ নিয়ে একটি 'বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটি' গঠন করেছিলেন। জহির রায়হানের অধিনায়কত্বে ... এই কমিটি, বিশেষত এর আহ্বায়ক জহির রায়হান বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনে অনেক দূর এগিয়ে যান। কিন্তু ৩০ জানুয়ারি তিনি নিজেই রহস্যজনকভাবে মিরপুর থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলে এই উদ্যোগে ভাটা পড়ে ... । ১৯৭২এর জানুয়ারিতে ভারতীয় সাপ্তাহিক 'দি নিউ এজ' পত্রিকা জহির রায়হানের বরাত দিয়ে জানায় : 'আমাদের ধারণা ছিল যে, দখলদার ... শাসকদের নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করে সশস্ত্র গোঁড়া ধর্মধ্বজী পশুরা ক্রোধান্ধ হয়ে কাপুরোষোচিত হত্যাকান্ডের মাধ্যমে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি ... এই হত্যাকান্ডের শিকার যারা হয়েছেন, তাঁরা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিস্থানীয় এবং সামাজ্যবাদবিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। ... এরা নির্ভুলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদের বাছাই করে আঘাত হেনেছে। ... আলবদরের এই স্বেচ্ছাসেবকরা অপরের ইচ্ছা কার্যকর করার বাহন ... কিন্তু কারা এই খুনীদের পেছনে ছিল? সংগৃহীত দলিল ও সাক্ষ্য প্রমানদি

থেকে জানা যায়, শ্রেষ্ঠ বাঙালিদের হত্যার কাজে নিয়োজিত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুন্ডাদেরকে আলবদর বাহিনীতে যারা সংঘটিত করে,তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে জড়িত'। উল্লেখ্য, রাও ফরমান আলীর ডায়রিতে Haight ও Daispic নামে যে দু'জন সিআইএ এজেন্টের নাম পাওয়া গিয়েছিল, তারা ইন্দোনেশিয়াতে (সুকর্ণ সরকারের পতন ঘটানোর জন্য, ১৯৬৫-'৬৭ইং) বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড পরিচালনা করেছিল এবং ইন্দোনেশীয় সরকার সেজন্য তাদের অনুপস্থিতিতে বিচারও করেছিল" (২৪/৬৫-৬৬)।

এখন স্বাধীনতার ৪২ বছর পেরিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার একাত্তরের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধাধীদের বিচারকার্য পরিচালনা করছে। স্বার্থান্বেষী নানা মহল থেকেই হামেশা বলা হয়, শেখ মুজিব নিজেই যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে গেছেন, তখন বর্তমান বিচারের উদ্যোগটি নিতান্তই নিরর্থক শত্রুতা মাত্র। কিন্তু এ কথা কি আদৌ সত্য? এবার পেছন ফিরে দেখা যাক। 'সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা'র আগেও একাধিকবার নানা শর্তসাপেক্ষ দালাল আইনের পরিবর্তন এবং বিভিন্ন অপরাধীদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে। কিন্তু "শর্তসাপেক্ষ ক্ষমা প্রদর্শনেও পরিস্থিতির খুব ইতরবিশেষ ঘটেনি। ... হাজার হাজার লোক ... আটক হয়ে রইল। ... পোষ্যরা মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছিল। দেশের পত্র-পত্রিকায় এ-সম্পর্কে বিরূপভাবে লেখা হচ্ছিল। ... মওলানা শামসুল হক (পাঁচবাগী) ও মওলানা ভাসানীও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'সাপ্তাহিক হলিডে'সহ বেশকিছু পত্রিকায় এ নিয়ে লেখা হয়। দালাল মশিউর রহমান যাদু মিয়া হাজত থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ... সংবর্ধনা সভায় 'বিপ্লবী' রাশেদ খান মেনন প্রমুখ পর্যন্ত তাকে আটক রাখার জন মুজিব সরকারের সমালোচনা করেন। সব মিলিয়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, পিছু হঠতে হঠতে আওয়ামী লীগ সরকার ... ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ নরহত্যা ও ধর্ষণকারী ব্যতীত সকল দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। সাধারণ ক্ষমার ফলে ৩৬,৪০০দালাল মুক্তিলাভ করে" (২৪/৮৬)।

৩০ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রদত্ত ঘোষণার ১নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয় :"সরকার নরহত্যা, নারীধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ অথবা বিস্ফোরকের সাহয্যে ঘরবাড়ি অথবা জলযান ধ্বংসের অভিযোগে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছাড়া বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ,.. (পি.ও নং৮, ১৯৭২) বলে যারা আটক হয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা অথবা হুলিয়া রয়েছে এবং যারা এই আইনে সাজা ভোগ করছেন তাদের সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করছেন"।

উক্ত আদেশের ২নং অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছিল : "দণ্ডবিধির নম্বর ৩০২ ধারা (হত্যা) , ৩৭৬ ধারা (ধর্ষণ) , ৪৩৫ধারা (গুলি অথবা বিস্ফোরক ব্যবহার করে ক্ষতি সাধন) এবং ৪৪৬ ধারা (ঘর জ্বালানো) এবং ৪৪৮ ধারায় (নৌযানে আগুন বা বিস্ফোরণ) অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্তগণ এক নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ক্ষমার আওতায় পড়বে না" (২৪/৮৬-৮৭)। সুতরাং এখন যারা বলেন 'যুদ্ধাপরাধী বিচার' একটি পুরাতন মিমাংসিত ইস্যু কিংবা বলেন, শেখ মুজিব সকল যুদ্ধাপরাধীদের প্রতিই 'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণা করেছিলেন, তারা উদ্দেশ্যমূলক চরম মিথ্যা কথা বলেন। আরেকটা বিষয় অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলে যান যে. যুদ্ধাপরাধের আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা

অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধের মামলা কখনো তামাদি হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এখনো, অপরাধীকে পাওয়া গেলেই করা হচ্ছে।

'সাধারণ ক্ষমা' ঘোষণাকালে বঙ্গবন্ধু মুজিব আন্তরিকভাবেই আশা করেছিলেন যে, "এসব লোক দীর্ঘদিন ধরে আটক রয়েছেন ... এতদিনে তারা নিশ্চয়ই গভীরভাবে অনুতপ্ত। তারা নিশ্চয়ই তাদের অতীত কার্যকলাপের জন্য অনুশোচনা করছেন। ... মুক্ত হয়ে দেশগঠনের পবিত্র ও মহান দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ তারা গ্রহণ করবেন এবং তাদের সকল তৎপরতা ও কার্যকলাপ ভুলে গিয়ে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন" (২৪/২৭)। বঙ্গবন্ধু মুজিবের এই আশাবাদ কার্যতই ব্যর্থ হয়েছে। মুক্তি পেয়েই অপরাধীরা পুরনো খেলায় মেতে উঠেছিল। শহীদ আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী সারা মাহমুদ বলেছিলেন, "১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যদের সাথে মিলে যারা একর পর এক হত্যাকান্ড চালিয়েছে, তারা আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একইভাবে কাজ করছে। আর এটা ঐ সাধারণ ক্ষমারই ফল" (২৪/৮৯)। এমন ফল-প্রতিক্রিয়া থেকে জাতিকে মুক্ত করতেই এখন বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও সরকার একটি 'মানবিক ভুল' করেছেন, শাস্তিপ্রাপ্ত হলে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরধীরা আপিল করতে পারবে। এমন সুযোগ কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে দেওয়া হয়নি।

১৯৭৪ইং মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ঃ
গণমৃত্যুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা

"মুজিবের দুর্ভাগ্য, কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনও তাঁর আমলে ব্যাহত হয়েছিলো। ... '৭২ সালের ভয়াবহ খরায় ... এপ্রিলে ... জুন মাসে ... প্রচন্ড ঘুর্ণিঝড়ে ... প্রচুর ক্ষতি হয়েছিলো ফসলের। '৭৩ সালেও ... ডিসেম্বরে ... উকুলীয় জলোচ্ছ্বাসে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবচেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দেয় '৭৪- সালে। ... আগস্টে যে অসাধারণ বন্যা হয়, তাতে তলিয়ে যায় দেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা। ... প্রায় এক কোটি টন ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ... বাংলাদেশকে বিভিন্ন দেশ খাদ্যশস্য দান করছিলো ঠিকই, কিন্তু তা দিয়ে মানুষকে দু' বেলা খাওয়ানো যায়নি। ... '৭৪ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ... ১৯৪৩ সালের পর এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বাংলায় আর কখনো হয়নি। জাতিসংঘের আহ্বানে অনেক দেশই এগিয়ে আসে খাদ্য সাহায্য নিয়ে, কিন্তু সে সাহায্য পর্যাপ্ত ছিল না। অথবা তা ঠিক সময়ে পৌঁছেনি। এর মধ্যে আবার বাংলাদেশকে 'শিক্ষা দেওয়ার জন্য' মার্কন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুত সাহায্য দেরিতে পাঠায়। যে-জাহাজ দুটি এই শস্য নিয়ে আসছিলো, দুর্ভিক্ষ একেবারে দোরের গোড়ায় দেখতে পেয়ে, মার্কিন সরকার তা অন্য দিকে পাঠিয়ে দেয়" (২০/১৯১-১৯২)।

"১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সিআইএ'র খাদ্য-রাজনীতির শিকার। ... ১৯৭৪ সালের শুরুতে বাংলাদেশ সরকার খাদ্যঘাটতি পূরণের জন্য কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে খাদ্য কেনার কথা ছিল। ... ১৯৭৪ সালের গ্রীষ্মে বাংলাদেশ সরকার বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র ঘাটতির মুখে পড়ে। ঋণ সংগ্রহও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

মার্কিণ খাদ্যশস্য সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত দুটি বড় চালানের বিক্রি বাতিল করে। ... একই সঙ্গে পিএল-৪৮০ কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশকে প্রদত্ত খাদ্যশস্য পাঠাতে দেরি করা হয়। কারণ দেখানো হয়, কিউবার কাছে পাট বিক্রয় করার ফলে বাংলাদেশ সাহায্য পাওয়ার যোগ্য কিনা, তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যদিও একই সময় মিসর কিউবায় তুলা রপ্তানি করেছিল এবং মিসরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করতে পিছপা হয়নি। ... ১৯৭৪ সালে 'দুর্ভিক্ষ' শব্দটা যতটা না ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনে জড়িয়ে থাকল, তার চেয়ে হাজার গুণ প্রচার করা হলো সংবাদ মাধমে। প্রচার কাজেও ওই রাক্ষুসে দল এবং সাম্রাজ্যবাদের গোয়েন্দা সংস্থার পোষ্য লোকজন। ... কিন্তু কেন দুর্ভিক্ষ? কেন আইনশৃঙ্খলার অবনতি? কারা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্ম দিচ্ছে? তা একবারের জন্যও ভাবলো না গুজবপ্রিয় দেশের মানুষ" (২২/১২২-১২৪)।

"It would be incorrect to attribute the famine wholely or even partially to floods ... Classic work of Amartya Sen, `Poverty and Famines', show that despite severe floods of 1974, production of rice that year was higher than in any other ... year during the 1971-1975 period. The Nobel-Prize-winning economist therefore argues that ... it wasn't a FAD (Food Availability Decline) famine ... Likewise, Martin Ravallion, a World Bank economist, who specialises in poverty, traces ... this way : Severe flooding disrupted rice planting that threw landless rural labourers out of work. Then false fears of shortages doubled the rice price in a few weeks. For the poor, who spend more than three-quarters of their wages on food, the blow was catastrophic" (৭/৩৩৫)।

"শেখ মুজিব শাসন ক্ষমতা গ্রহণের কিছুদিন পরেই - অর্থাৎ জাতীয় ও বিদেশ নীতিতে তাঁর আত্মমর্যাদাশীল জাতীয় পরিপোষক নীতি স্পষ্ট হয়ে উঠতেই পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রে তাঁর ইমেজ ধ্বংসের জন্য ক্রমাগত প্রচারণা, বিশ্ব ব্যাঙ্কের ভূমিকা, মার্কিন বিদেশ মন্ত্রী কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলক মন্তব্য, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির জন্য অর্থনৈতিক সাবোটাজে পাশ্চাত্যের বিশেষ করে মার্কিন সাহায্য ও অন্যান্য এজেন্সিগুলোর প্রত্যক্ষ ভূমিকা থেকে এটা বহু পূর্বেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, মুজিবের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ও জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশকে ধবংস করার জন্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া হাত মিলিয়েছে। মুজিবও এটা বুঝতে পেরেছিলেন ... দ্রুত আঘাত এগিয়ে আসছে" (২৮/১৬৮)।

"মজুদকারীরাও দুর্ভিক্ষের জন্য কম দায়ী ছিলো না। অনেকে বাজারে যথাসময়ে চাল ছাড়েনি। অনেকে নুনের দাম বাড়িয়ে দিয়েছিলো। ... অভাবের সৃষ্টি করেছিলো মরিচের। ... খাদ্যদ্রব্যের দাম হু হু করে বাড়ছিলো। কিন্তু চোরা কারবারি, পাচারকারী, মজুদদার, দুর্নীতিবাজ কর্মচারী, পারমিট ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ মানুষের আয় বাড়ছিলো না। বরং অনেকের সাজানো ব্যবসা এবং কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায়,

আয় আগের তূলনায় কমে যায়" (২০/১৯২-১৯৩)।"সংকটের সময় বন্ধুত্বের হাত বাড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নগদ অর্থে দুই লাখ টন খাদ্যশস্য কিনে জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছিল দেশে। বঙ্গবন্ধু সরকার এ সময় সাহায্য চাইলে ... গতিপথ পাল্টে ... বাংলাদেশের পথে রওনা হয়। যদিও প্রয়োজনের তূলনায় ওই খাদ্য শস্য ছিল অনেক কম। ... বিপদের দিনে ... এই সাহায্য ছিল অনেক বড়। ... ত্রাণ সাহায্য যা কিছু জোগাড় হলো, তাও ঠিকঠাক পৌঁছালো না অভাবী মানুষের দরজায়। ... হলো দুর্ভিক্ষ। ... বঙ্গবন্ধুর সরকারের জনপ্রিয়তা কমাতে এবং বাংলাদেশ যাতে কোনোভাবেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতে না পারে। সেই চেষ্টা। পেছনে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত। (২২/১২৩-১২৪)। "ইতিমধ্যে সরকার ও প্রশাসনে অযোগ্য আর দালালশ্রেণীর লোকজন প্রবেশ করে ... বঙ্গবন্ধুর শুভ উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করল। সাংবাদিক মাসকারেনহাস লিখেছেন, যাদের বিশ্বাস করা উচিত হয়নি, যাদের ভরসা করা উচিত হয়নি, জাতির জনক বেছে নিয়েছিলেন এমন বহু লোককে। তাঁর বিশ্বাসের ভেতর ত্রুটি ছিল না। ভেবেছিলেন, যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশ গঠনে সকলেই মন দিয়ে কাজ করবে। কিন্তু 'বিশ্বাসঘাতকতা' যে জনপদের মানুষের মজ্জাগত ত্রুটি, সে-কথা একবারও ভাবলেন না বঙ্গবন্ধু" (২২/১২১-১২২)।

"যখন দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায়, তখন ৫,৮৬২টি লঙ্গরখানা খুলে সরকার লাখ লাখ লোককে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলো। অবশ্য তা দিয়ে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঠেকানো যায়নি। ২২শে নভেম্বর খাদ্যমন্ত্রী জাতীয় সংসদে যে বিবৃতি দেন, ... জানা যায় যে, ততোদিনে সাড়ে সাতাশ হাজার লোক অনাহারে মারা গিয়েছিলো। অপরপক্ষে, বেসরকারী হিসেবে মৃতদের সংখ্যা ছিলো এক লাখেরও বেশি। ... দেশের অর্থনৈতিক সংকট এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মুজিব শাসনের একটা বিরাট কলঙ্ক। জনগণের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল আন্তরিক, চিরদিন রাজনীতিও করেছেন জনগণকে নিয়েই। কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট, দুর্নীতি এবং দলীয় কোন্দলের ফলে তিনি জনগণ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যান।" (২০/১৯৩-১৯৪)। "৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ জাতিসংঘের ... তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন ছিল ৫ লক্ষ টন এবং বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা ৩লক্ষ ৪৭হাজার টন খাদ্য প্রেরণের অঙ্গীকার করে। কিন্তু জাহাজের অভাবে তা পাঠাতে বিলম্ব হয়। এসময় আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যের আমদানি-মূল্যও বেড়ে যায়। ... জুন মাসে (১৯৭৪) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক খাদ্য-সাহায্য বন্ধ করে দেয়ায় পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করে" (২৪/৬১)।

১৯৭৪ইং সরকারী লঙ্গরখানার মাধ্যমে প্রতিদিন ৪২লক্ষ বন্যার্তকে একবেলা সামান্য খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সরকারী লঙ্গর খানার পাশাপাশি, বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক পুরাতন এবং নতুন সংগঠন, নিজেরা নানা সূত্রে স্থানীয়ভাবে 'ত্রান-সহায়তা' সংগ্রহ করে প্রতিদিন হাজার হাজার রুটি তৈরি করে বুভুক্ষু মানুষকে খাদ্য সরবরাহ করেছে। ছাত্র ইউনিয়ন অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে,

'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' স্লেগানধারী জাসদ' দেয়ালে দেয়ালে স্লোগান লিখেছিল : "হায়রে হায় বাংলাদেশ, রুটি খাইয়া হইলাম শেষ"। ১৯৭৪-এর মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষ এবং গণমৃত্যুর পেছনে অবশ্যই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পাক-মার্কিন ষড়যন্ত্র এবং সরকারী-বেসরকারী দলের কতিপয় নেতাকর্মীর অপকর্ম এবং নীতি-নৈতিকতাহীন অপ-প্রচারও কম দায়ি ছিল না। "ভাত দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাব" ধরণের কবিতার কথাগুলোকেও জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে ইন্ধন জোগানোর অনুষঙ্গেই বিচার করতে হয়। তখন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রচারিত একটি সংবাদ-চিত্রের কথা : "কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারি এলাকার ... জেলেপাড়ায় শাড়ীর পরিবর্তে জালা-পরা বাসন্তী আর দুর্গতির ছবি তুলেছিলেন 'দৈনিক ইত্তেফাক'এর ফটো সাংবাদিক আফতাব আহমদ। (পরে প্রমাণ হয়েছিল, এগুলি ছিল 'সাজানো ছবি')। 'বাসন্তী উপাখ্যান' তৈরি করেছিলেন রমনা ইউনিয়নের আনছার চেয়ারম্যান। 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এ গুরুত্ব দিয়ে ছবিটি প্রকাশ করা হয়েছিল। দেশে-বিদেশে ছবিটি নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছিল। সেই সময় (বা এখনো) শাড়ীর তূলণায় জালের দাম ছিল অনেক বেশি। বোবা-মেয়ে-সাজানো বাসন্তী (এবং দুর্গতি) কিন্তু ১৯৭৪ সালে মারা যায়নি।" (১(২)/১১২৭)। এসব ছবি-খবর ইত্যাদি ছিল জাতীয়-আন্তর্জাতিক চক্রান্তের যোগসাজসে পরিকল্পিত, একথা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশের "খাদ্য-সংকট নিয়ে আমেরিকার ... কাউন্সিল অব ফরেন রিলেশন্স, নিউইয়র্কের জার্নালে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি প্রকাশিত প্রতিবেদনে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ তুলে ধরা হয়। 'ফুড পলিটিকস্' শিরোনামের প্রতিবেদনে এমারথ চাইল্ড লিখেছেন, সিআইএ 'খাদ্যই শক্তি' নামের নব্য মতবাদকে সামনে রেখে খাদ্য-রাজনীতি দ্বারা ক্ষমতা ও প্রভাব খাটানোর কৌশল উদ্ভাবন করেছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ খাদ্য-রাজনীতির শিকার। প্রাণ হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ" (২২/১২২)। ১৯৭৪ইং দেশজোড়া দুর্ভিক্ষে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল রংপুর জেলা, তারপরেই ময়মনসিংহ এবং সিলেট। "As the sterving multitudes from the famine-striken northern districts streamed into Dhaka in search of odd jobs or alms, makeshift camps were set up on the outskirts of the capital ... The current famine conditions attracted a number of foreign journalists ... What they reported was opposite of what the government hoped for. ... their reportage was that the current famine was only partially due to natural cause; it was due mainly to government ineptitude and indifference" (৭/৩৩৭)।

এসময়ই বাংলাদেশের প্রতি সকল সহায়তা বন্ধ করে, মার্কিন বিদেশমন্ত্রী কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে উপহাস করে বলেছিলেন "Bottomless busket" কোনো রকম সাহায্য করেই বাংলাদেশের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। একান্ত লজ্জা-দুঃখ-ক্ষোভের সাথেই বলতে হয়, এখনো পাক-মার্কিন চক্রের কুট-বাক্যটি বাংলাদেশে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জাতিসত্বার অবমাননার দিকটি সর্বদাই তাঁদের সমালোচক চোখ এড়িয়ে যায়। তবে সেইসাথে একথাও উল্লেখ করা অপরিহার্য যে, পরবর্তী আওয়ামী লীগ

সরকারের শাসনামলে একাধিকবার, বিশেষত ১৯৯৮ইং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হওয়ায় 'জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পেশাদার বিশেষজ্ঞবৃন্দ' একসুরেই লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর আশংকা প্রকাশ করেছেন, গলা মিলিয়েছিলেন এদেশের চেনামুখ রাজনীতিবিদ-বুদ্ধিজীবীরাও। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজের মত করেই সে-সব বিশেষজ্ঞ-বুদ্ধিজীবী-আশংকা মিথ্যা প্রমান করতে পেরেছে। ১৯৭৪ইং পারেনি, কারণ, একসাথে দেশি-বিদেশি চক্রান্ত মোকাবেলার শক্তি ছিল না বাংলাদেশের, প্রশাসন ছিল দুর্বল, ভৌত অবকাঠামো বিধ্বস্ত, দুর্নীতি হয়ে উঠেছিল নতুন মহামারী। একটা অনভিজ্ঞ নতুন সরকারের পক্ষে সবদিক সামলানো যথার্থই অসম্ভব ছিল।

১৯৪৩ইং দুর্ভিক্ষের সময় (পঞ্চাশের মন্বন্তর) খাদ্যের সন্ধানে উপার্জনহীন এবং অনাহারক্লিষ্ট লোকজন হাজারে হাজারে এসে ভীড় করেছিল কলকাতার পথে ঘাটে। ঠিক তেমনি, ইতোমধ্যে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশেরও অভাবী এলাকাগুলি থেকে লোকজন ঢাকায় চলে এসেছিল, এখনো আসে। "১জানুয়ারি ১৯৭৫ আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম প্রকাশিত তথ্যে জানা যায়, ১৯৭৪ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে তারা ঢাকা শহরে ২হাজার ৪শ' ৪৩টি বে-ওয়ারিশ লাশ দাফন করেছে" (২৪/৬২)। সুতরাং ১৯৭৪ইং অনাহার-অপুষ্টিতে মৃত্যুর সংখ্যা সংসদ-ভাষণে মন্ত্রীর কথিত সাড়ে সাতাশ হাজারে মত হওয়াই স্বাভাবিক। লাখ-দেড়লাখের সংখ্যাগুলি বাসন্তী-দুর্গতির ছবির মতই সাজানো-বাড়ানো বলে মনে হয়। প্রতিটি মৃত্যুই করুণ, অস্বাভাবিক মৃত্যু করুণতম, স্বজনেই জানে তার প্রকৃত বেদনা। তবে আজ কিংবা আগামীকাল, তাঁদের শোক-স্মৃতিতে পেছন ফিরে আমরা যেন স্মরণ করি, দেশি-বিদেশি কিছু মানুষের লোভ আর ষড়যন্ত্র, সেদিন প্রাকৃতিক প্রতিকুলতা এবং সরকারী ব্যর্থতার চেয়েও দুর্ভিক্ষে গণ-মৃত্যুর অন্যতম প্রধান দৃশ্যমান কারণ হয়ে উঠেছিল। এটা যতই দুঃখ-লজ্জার কথা হোক না কেন, একেই কেউ কেউ রাজনীতি বলে চালাতে চান।

বঙ্গবন্ধুর 'বাকশাল' ঃ
তথাকথিত একদলীয় শাসন

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের বেদনা-ব্যর্থতা, এমনকি বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ডের জন্য যে কারণগুলিকে বঙ্গবন্ধু-বিরোধীরা চিহ্নিত করে থাকেন, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে তাঁর প্রবর্তিত 'বাকশাল' (BAKSAL) ব্যবস্থাটি। প্রাসঙ্গিক সব কথার আগেই বলা দরকার, 'বাকশাল' ব্যবস্থাটি কার্যকর করার আগেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে, ব্যবস্থাটির ভালো-মন্দ সম্পর্কে বাস্তব পরীক্ষা কিংবা সামান্য সমালোচনা করার মত অভিজ্ঞতা অর্জন করাও কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশের রাজনীতির কিছু কুটকৌশলী মানুষ এখনো 'বাকশাল' বলে নিজেদের না-দেখা জুজুর ভয় দেখান অন্যকে। 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' - 'বাকশাল' পদ্ধতির শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তনকে বঙ্গবন্ধু বলতেন 'দ্বিতীয় বিপ্লব', পরবর্তী

সময়ে তাঁর বিরোধীরা সকলেই, এমনকি অনুগামীদেরও অনেকেই ব্যবস্থাটিকে বলেছেন 'গণতন্ত্র-বিনাশী একদলীয় শাসন'। 'বাকশাল'-কথায় চায়ের টেবিল বা মাঠের বক্তৃতা গরম করেন যাঁরা, তাঁরা সকলেই বিষয়টির প্রেক্ষাপট এবং ভালোমন্দ সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত রয়েছেন বা অবহিত থাকার প্রয়োজন মনে করেন বলে, ভাবার কোনো কারণই নেই। একটি সাধারণ প্রশ্নের প্রেক্ষাপটেই 'বাকশাল' সম্পর্কিত বিষয়টির আলোচনা শুরু করা যেতে পারে : সমবায় সমিতিকে কি একক কর্তৃত্ববাদী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়, নাকি সমবায়ীদের সামগ্রিক এবং সমন্বিত সিদ্ধান্তে পরিচালিত সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করতে হয়? যেকোনো সমবায় ব্যবস্থায় যুক্ত হবার ব্যবস্থা যেমন থাকে, তেমনি থাকে যুক্ত না হবার এবং ছেড়ে যাবার পথও। সমবায় ব্যবস্থাকে যদি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলা হয়, বাকশাল ছিল এক নব-ধারার সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতি।

স্বাধীনতা-উত্তর বহুমুখী "সংকট নিরসনে বাকশাল ছিল শেখ মুজিবের মস্তিষ্কপ্রসূত এক উদ্ভাবন। ... মুজিবের সমসাময়িক বক্তৃতা থেকে যা জানা যায়, তা হলো : রাজনীতিবিদ ও আমলাদের পারস্পরিক সন্দেহ দূর করা, আমলাদের দ্বারা রাজনীতিবিদদের মর্যাদা ক্ষুন্নকরণ বন্ধ করা, সমাজের 'জ্ঞানীগুণী' ও অন্যধরণের লোকদের সম্পৃক্ত করা। সামরিক, বেসামরিক, সরকারী, বেসরকারী কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার যতদূর সম্ভব হয়, সবাইকে নিয়ে একটি নতুন দল, নতুন System-এর মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য স্থাপন করা। ... বলা হয়, প্রতিটি থানায় একটি প্রশাসনিক কাউন্সিল হবে। রাজনৈতিক কর্মী বা সরকারী কর্মচারী এর চেয়ারম্যান হবেন। বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্মচারী, বাকশালের প্রতিনিধি, কৃষক, শ্রমিক, মহিলা, যুব-প্রতিনিধি, ব্যাংক-প্রতিনিধি এর সদস্য হবেন। এরাই থানা চালাবে। সব মহকুমা জেলা হবে। প্রত্যেক জেলায় একজন গভর্নর থাকবেন। সাংসদ, রাজনৈতিক কর্মী, সরকারী কর্মচারী এই গভর্নর হতে পারবেন। ... এই System চালু হওয়ার পর খারাপ হলে Rectify করা হবে। মুজিবের ভাষায়, এটাও গণতন্ত্র - শোষিতের গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। ... এটা আমাদের দ্বিতীয় বিপ্লব। ... লক্ষ্য দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো" (২৪/৫৯-৬০)।

উল্লেখ যে, ১৯৭৪ইং দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে দলীয় নেতাকর্মীদের 'অসৎ ভূমিকা', অনেকের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া এবং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ষড়যন্ত্রকারীদের গভীর সংযোগের বিষয়াদি নিয়ে বঙ্গবন্ধু গভীরভাবেই ভেবেছেন, যা ছিল একান্তই সিদ্ধান্তমূলক। ১৯৭৪-এর অভিজ্ঞতায় শেখ মুজিব ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিত বিশ্বাসে পৌঁছেছিলেন যে, বিদ্যমান দলীয় এবং সাংবিধানিক শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তম অংশ দরিদ্র জনসাধারাণের কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়, এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিপক্ষ হবে সম্পদ-শিক্ষা-মেধার অধিকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সমাজে বিদ্যমান স্বল্পসংখ্যক উচ্চবিত্তরাও, নিজের স্বার্থেই যথাসম্ভব মধ্যবিত্ত-স্বার্থের সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এখানে প্রসঙ্গতই আরো ক'টি গুরুত্বপূর্ণ নামোল্লেখ করা প্রয়োজন, যারা

মুজিবকে দেখতে চেয়েছিলেন পরিবর্তনবাদী (বাকশাল-ধরণের) ভূমিকায়।

প্রথম নামটি মুজিবের ভাগিনেয়, নানা কারণেই বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শেখ ফজলুল হক মণি। কিছুকাল যাবৎই মণি বিভিন্ন বক্তৃতায় বলতেন এবং নিজ-মালিকানার 'বাংলার বাণী' পত্রিকায় লিখতেন, দেশ ও গণ-কল্যাণের জন্য প্রয়োজন : "Rule of Mujib, not rule of law' (৭/৩৪৫)। দ্বিতীয় নামটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর, বে-আইনী উচ্ছৃঙ্খলতার অবসানের জন্যই মুজিবের কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রবর্তনের প্রয়োজন বোধ করতেন তিনি। তাছাড়া, প্রচলিত প্রথার সাক্ষ্য-প্রমানের অভাবে অনেক পরিচিত-মুখ দুস্কৃতকারীরা ছাড়া পেয়ে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট মনসুর আলী ভাবতেন, বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা সামাজিক কল্যাণের জন্যই কিছুটা খর্ব করা প্রয়োজন। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী প্রকৃতপক্ষে গণ-কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকেই এসব কথা ভেবেছিলেন। মুজিবের প্রিয় প্রভাবশালী ছাত্রনেতা থেকে পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মর্যাদায় উন্নতি আবদুর রাজ্জাকের পর্যবেক্ষণ, ১৯৭৪-এর অভিজ্ঞতাই মুজিবকে এধরণের চিন্তায় অধিকতর উদ্বুদ্ধ করেছিল, তদুপরি মণির পরামর্শও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

দলীয় সাধারণ সম্পাদক নীতিবান রাজনীতিক তাজউদ্দিনও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের কথায়-কাজে ক্ষুব্ধ-বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবে, পরবর্তী ঘটনাবলীতে প্রতিপন্ন হযেছে, 'বাকশাল' ধরণের কোনো ব্যবস্থা তাজউদ্দিনের আদৌ পছন্দের ছিল না। মন্ত্রীসভা থেকে ১৯৭৪ইং অপসারিত তাজউদ্দিন ১৯৭৫ইং একদলীয় শাসন প্রবর্তনের উদ্যোগের কথা জেনেই বঙ্গবন্ধুকে টেলিফোন করে বলেছিলেন,"মুজিব ভাই, এর পর বুলেট ছাড়া তো আপনাকে সরানোর কোনো উপায় থাকলো না'। ভাগ্যের পরিহাস, সেই বুলেটের অনিবার্য মুখেই মুজিব এগিয়ে যান ধীর গতিতে - নিজের এবং তাঁর মোসায়েবদের অজ্ঞাতে" (২০/২০৮-১০৯)। কী জানি, একথা কি নিশ্চিত বলা চলে যে, বাকশাল প্রবর্তনের জন্যই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল? যদি তাই হয়, তাহলে মুজিব-হত্যার পেছনে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কথা ভুলে, কেবল বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক 'অতি-মাত্রায় গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ'কেই দায়ি ভাবতে হয়। তারপরেও প্রশ্ন থাকে, বাকশালই যদি মুজিব-হত্যার কারণ হয়, তাহলে তাজউদ্দিন হত্যার কারণ কি?

এস. এ. করিমের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে "Normally a researved person, he (Tajuddin) did not hide his bittereness about the way things had gone wrong in Bangladesh. ... upon his arrival in Dhaka he had publicly blamed the government for the economic crisis in the country ... Wazed Miah, Mujib's son-in-law, recalls ... Mushtaque telephoned him ... the sole purpose ... was to complain about Tajuddin's remarks. Mushtaque told ... Tajuddin had no right as a Cabinet Minister to criticise the policies of the government. He must resign and if he does not ... he should be forced out of the government ... On 26 October (1974) Tajuddin resigned and retired to lead a quiet life" (৭/৩৪৫-৩৪৬)। এখানে শুধু এটুকুই উল্লেখ্য যে, মুজিবনগর সরকারের আমলেই

তাঁদের মত-পথের ভিন্নতার শুরু এবং তাজউদ্দিন-বিরোধী অভিযোগ উত্থাপনের কোনো সুযোগই মোশতাক কখনো কোনো পর্যায়েই হাতছাড়া করেননি। বাস্তব পরিস্থিতি এবং তথ্যপ্রমানের বিচারে, মুজিব-হত্যার জন্য যেমন, জেল-হত্যা, তথা তাজউদ্দিন হত্যার জন্যও মোশতাক অবশ্যই অন্যতম প্রধান অপরাধী।

১৯৭৪ইং মে মাস থেকেই "বিভিন্ন আলোচনায় মুজিবকে 'প্রশাসনিক গণতন্ত্র' এবং 'রাজনৈতিক একনায়কতন্ত্র' - এ দুটি নতুন রাজনৈতিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করতে দেখা যায়। চুয়াত্তরের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করার পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। এই লক্ষ্যে আমেরিকা, ফ্রান্স, তানজানিয়া প্রভৃতি দেশের সাংবিধানিক মডেল পরীক্ষা করেও দেখা হয়। নভেম্বরের আওয়ামী লীগ দলের এক সভায় ... প্রসঙ্গক্রমে মুজিব জানান যে, তাঁর 'প্রস্তাবিত সাংধিনিক পরিবর্তনের ব্যাপারে যদি সংসদীয় দল বিরোধিতা উত্থাপিত করে, তবে জনগণের সঠিক রায় নেবার জন্য এর উপর গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন'। ... বাকশাল গঠনের বিপক্ষে ছিলেন, এমন লোকের সংখ্যা আওয়ামী পরিবারে ছিল অতি নগণ্য। ১৮জানুয়ারি ১৯৭৫ ... কেন্দ্রীয় নীতি-নির্ধারণী এক সভায় কেবল জেনারেল ওসমানী ও নুরে আলম সিদ্দিকী এর বিরোধিতা করেন। মুজিবের সামনে দাঁড়িয়েই ওসমানী বলেছিলেন, 'আমরা আইয়ুব খানের মতো কোনো মুজিবুর খান দেখতে চাই না'। পরে জাতীয় সংসদে ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এর বিরোধিতা করেন ... সংসদ থেকে পদত্যাগও করেন" (২৪/৫৭-৫৯)।

এখানে একটা বিষয় কারোই নজর এড়াবার নয় যে, বঙ্গবন্ধুর মুখের ওপর অমন কঠিন উপমার কথা বলার পরেও বঙ্গবন্ধু এতটুকু ক্ষুব্ধ-বিরক্তি প্রকাশ করেননি। এবিষয়ে বঙ্গবন্ধুর কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ভাষণের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা একান্তই অর্থবহ হতে পারে। সংবিধান সংশোধন উপলক্ষে ২৫জানুয়ারি ১৯৭৫ইং জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন : "আজকে সংবিধান সংশোধন করে যে নতুন 'সিস্টিমে' আমরা যাচ্ছি, এটাও গণতন্ত্র। এখানে জনগণের ভোটাধিকার থাকবে। এখানে আমরা ... শোষিতের গণতন্ত্র রাখতে চাই। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বাংলার মাটিতে কোনোদিন ... আমরা 'এলাউ' করব না। বাংলাদেশকে ভালবাসবো না, ... 'বিকজ' আমি 'ফ্রি স্টাইল' দিয়েছিলাম - যার যা' ইচ্ছা তা' লেখে, কেউ এ নামে বাংলাদেশকে ডাকে, ওনামে বাংলাদেশকে ডাকে, বাংলাদেশের নাম পর্যন্ত বলতে লজ্জা বোধ করে, তাদের অধিকার নাই বাংলার মাটিতে থাকার" (১(২)/১০১১)।

১৯ জুন, ১৯৭৫ইং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে চারটি প্রধান লক্ষ্যের উল্লেখ করা হয়েছিল : ১. দুর্নীতি দমন, ২. উৎপদন বৃদ্ধি, ৩. জন্ম নিয়ন্ত্রণ এবং ৪. জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। দারিদ্র-বিরোধী সমাজের বদলে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। সমবায়ের প্রণালীতে সর্বসাধারণ আপন শক্তিকে যখন ধন-সম্পদে পরিণত করতে শিখবে, তখনই স্বাধীনতার ভিত্তি মজবুত হবে। তিনি কো-অপারেটিভ গড়ার কথা বললেন। জমির মালিকানা থাকবে ব্যক্তিগত। সরকার পার্টির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবে

প্রসঙ্গতই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন : "সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটবার জন্য। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্য। এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, অফিসে না গিয়েও টাকা পাওয়া যায়। ফ্রি স্টাইলে চলছে সবকিছু। ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কাজ না করে টাকা দাবি করে সাইন করিয়ে নেয়। যেন দেশে সরকার নেই। স্লোগান হলো, বঙ্গবন্ধু কঠোর হও। বঙ্গবন্ধু কঠোর হবে। কঠোর ছিল, আছে। কিন্তু দেখলাম চেষ্টা করলাম, এত রক্ত, এত বাধা, এত দুঃখ দেখে আবদার করলাম, অনুরোধ করলাম, ... কামনা করলাম। চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী"। ... "আজকে যে সিস্টেম করেছি, তার আগেও বঙ্গবন্ধুর ক্ষমতা কম ছিল না। আমি বিশ্বাস করি না ক্ষমতা বন্দুকের নলে। বিশ্বাস করি, ক্ষমতা বাংলার জনগণের কাছে। জনগণ যেদিন বলবে, বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা ছেড়ে দাও, বঙ্গবন্ধু একদিনও রাষ্ট্রপতি, একদিনও প্রধানমন্ত্রী থাকবে না। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতার রাজনীতি করে নাই। বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছে দুঃখী মানুষকে ভালোবেসে ... শোষণহীন সমাজ কায়েমের জন্য" (২২/১২৫-১২৬)।

বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ভেতর দিয়ে জানবার-বুঝবার সুযোগ পেয়েছেন যাঁরা, তাঁরাই হয়তো মানবেন, কথাগুলি ছিল তাঁর প্রাণের কথা, জীবনাদর্শের কথা। বঙ্গবন্ধুকে বুঝবার প্রয়োজনেই আরেকটা উদ্ধৃতি দেয়া অপরিহার্য মনে করছি:"আমি ফেরেশতা নই। শয়তানও নই। আমি মানুষ। আমি ভুল করবই। আমি ভুল করলে আমার মনে রাখতে হবে, আই ক্যান রেক্টিফাই মাইসেলফ। আমি যদি রেক্টিফাই করতে পারি, সেখানেই আমার বাহাদুরি। আর যদি গোঁ ধরে বসে থাকি যে, না আমি যেটা করেছি সেটাই ভালো. দ্যাট ক্যান্ট বি হিউম্যান বিয়িং। ফেরেশতা হইনি যে সবকিছুই ভালো হবে। এই সিস্টেম ইন্ট্রোডিউস করে যদি দেখি যে খারাপ হচ্ছে, অলরাইট রেকটিফাই ইট। কেন না, আমার মানুষকে বাঁচাতে হবে। ... আমরা শোষণহীন সমাজ গড়তে চাই। আমরা একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি করতে চাই। উই ডু নট লাইক টু ইম্পোর্ট ইট ফ্রম এনিহোয়ার ইন দি ওয়ার্ল্ড। এটা আমার মত। মাটির মত" (২২/১২৬-১২৭)।

সকলেই বলেন, বঙ্গবন্ধু জনগণের 'পালস্' অনুভব করতে পারেতেন আপন দক্ষতায়। তাহলে স্বাধীনতার তিন-সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই সবকিছু অমন ওলট-পালট হয়ে গেলো কি করে? ১৯৭৫ইং বঙ্গবন্ধুর বাকশাল (অনেকের মতে একদলীয় শাসন) প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটা প্রশ্ন তখন আলোচনায় উঠেছে, এখনো উঠে, গণতন্ত্রের পথে আজীবন সংগ্রামী বঙ্গবন্ধু "একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করে গণতন্ত্রের শিকড় কেটে ফেললেন কেন? স্বাধীনতা অর্জনের পরে রাজনীতির নামে যেভাবে সারা দেশকে নৈরাজ্যকর অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু সরকারকে যেভাবে চূড়ান্ত অসহযোগিতা করা শুরু হয়েছিল, তা নিশ্চয়ই গণতন্ত্র নয়। তবে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার আর কি কোনো বিকল্প ছিল?" (২২/১২৬)।

খুব সহজে বা সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করা সম্ভব নয়। গোলাম মুরশিদ মোটামুটি বহুমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছেন। "নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার এবং সহিংসতা দেখা দেওয়ার অনেক কারণ ছিলো। তার মধ্যে

একটা হলো সহজলভ্য অস্ত্রশস্ত্র। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের দেড়লাখ অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছিলো। ... পাকিস্তনিদের কাছ থেকেও উদ্ধার হয়েছিলো অসংখ্য অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ। মোট সাড়ে তিন লাখ অস্ত্রশস্ত্র লোকেদের হাতে বেআইনিভাবে এসেছিলো। '৭২ সালের প্রথম দিকেই ... তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকে অস্ত্রশস্ত্র জমাও দিয়েছিলেন। ... কাদের সিদ্দিকী তিরিশ হাজার অস্ত্রশস্ত্র সমর্পন করেছিলেন। যদিও তাঁর বাহিনীর কাছে এক লাখ অস্তশস্ত্র ছিলো বলে মনে করা হয়। ... মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য সত্বেও মুজিব বাহিনীর প্রতিটি যোদ্ধা প্রতিটি অস্ত্র ফেরত দিয়েছিলো বলে মনে হয় না। আর যারা গ্রামগঞ্জ থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই 'দুর্দিনের সম্বল' হতে পারে -এই বিবেচনায় নিজের অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। রাজাকাররাও তাদের অস্তশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিল" (২০/১৯৫-১৯৬)।

"ভারতে ... এবং আঞ্চলিক বাহিনীর কাছে ট্রেনিং পওয়া মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা তিন লাখের বেশি ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট দিয়েছিলো এগারো লাখ লোককে। ... আট লাখই ছিলো ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধাদের নির্বাচিত আট হাজার সদস্য রক্ষী বাহিনী এবং কিছু 'লাল বাহিনী'র সদস্যও হয়েছিল। পুলিশ এবং আনছার বাহিনীতেও অনেকের জায়গা হয়। কিন্তু বাকি ভূয়ো এবং খাঁটি মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকে ডাকাত এবং ছিনতাইকারিতে পরিণত হয়। দেশের সীমিত সংখ্যক পুলিশ বাহিনীর পক্ষে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব ছিল না"(২০/১৯৬)। গোলাম মুরশিদ উল্লেখ আরো করেছেন, "দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি '৭৩ সালে সবচেয়ে খারাপ হয়। ... এ বছর বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় পঞ্চাশটি পুলিশ ফাঁড়ি এবং থানা লুট হয়। তা ছাড়া, ব্যাপকভাবে দেখা দেয় শ্রমিক সংঘর্ষ। পুলিশ এবং রক্ষীবাহিনীর গুলিতেও বিভিন্ন জায়গায় বহু লোক হতাহত হন। ... '৭৪ সাল নাগাদ তিন/চার হাজার আওয়ামী লীগ সমর্থক-সহ ৫জন সংসদ সদস্য নিহত হয়েছিলেন ... । আইন-শৃঙ্খলার চেয়েও বড়ো হয়ে দেখা দেয় খাদ্যের অভাব। ... '৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে লাখ খানেক লোক মারা গিয়েছিলেন" (২০/২০৫)। অবশ্য সরকারী হিসেবে সাড়ে ২৭ হাজার আর বিভিন্ন বেসরকারী সূত্রে ৮০হাজার থেকে এক লাখের বেশি মৃত্যুর কথা বলা হয়ে থাকে।

"তীব্র আর্থিক অনটনের মধ্যে পুলিশ কেন, বিচারকদের পক্ষেও সৎ থাকা সম্ভব ছিল না। ... সমাজের পরতে পরতে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজনীতিকরা যদি দুর্নীতির আশ্রয় নিতে পারেন, তবে অন্যরা নয় কেন? এমনকি বিদেশে (বাংলাদেশের) যে কটুনীতিকরা ছিলেন, বাংলাদেশের জন্যে কোনো জিনিষ কিনলে তাঁরা সরাসরি শতকরা পাঁচভাগ 'কমিশন' নিতেন বলে দাবি করেছেন ম্যাসকারেনহাস। শেখ মুজিবের ... অন্যদের কাছে পূজনীয় হওয়ার লোভ ছিলো। ... কিন্তু টাকা পয়সার প্রতি তাঁর কোনো লোভ ছিলো বলে জানা যায় না। তাঁকে হত্যা করার পর তাঁর বাড়ি তল্লাশি করে যেসব মূল্যবান জিনিষপত্র পাওয়া যায়, তার দাম ছিলো মাত্র সাত লাখ টাকার কিছু বেশি" (২০/১৯৬)। রাষ্ট্রপতির বাড়ি, গ্রামের মোটামুটি অবস্থাসম্পন্ন একটি সুদীর্ঘ

সময়ের পরিবার, সদ্য সদ্য বিয়ে হয়েছে দু'পুত্রের - সব মিলিয়ে নিহত মুজিব-পরিবারের সম্পদকে কি আদৌ বেশি বলা চলে?

মনে পড়ছে, মুজিব-হত্যা এবং 'সিজার লিস্ট'সহ সম্পদের হিসাব প্রকাশের পর এক বন্ধু বলেছিলেন, যদি মুজিব হত্যাকারী এবং 'সিজার লিস্ট' প্রণয়নকারীরা সৎ হয়, তাহলে কোনো সন্দেহই থাকে না যে, সর্বময় রাষ্ট্রক্ষমতার অধিকারী হয়েও মুজিব প্রশ্নাতীত সৎ-জীবনের অধিকারী ছিলেন। অপরদিকে যদি মুজিবের সিজার লিস্টের বাইরে 'অবৈধ অঘোষিত' সম্পদ থেকে থাকে, তাহলে মুজিব-হত্যাকারী এবং সিজার লিস্ট প্রণয়নকারীদেরকে 'অসৎ লুণ্ঠনকারী' বলতেই হয়। মুজিবের পারিবারিক সততার আরেকটি উদাহরণ এখানেই উল্লেখ করা যেতে পারে। দেশে অবৈধ অর্থের সঞ্চয়-সরবরাহ কমানোর জন্য মুজিব যখন এক শ' টাকার নোট নির্দিষ্ট স্বল্পতম সময়ে ব্যাঙ্কে জমা দেবার আদেশ জারি করেছিলেন, সেটা আগেভাগে নিজের স্ত্রীকেও জানাননি। বেগম মুজিব তখন টুঙ্গিপাড়ায় থাকায়, সরকারী এ হুকুমটা জানতেই পারেননি। মুজিব-হত্যার পরবর্তী সময়ে ধানমন্ডির বাসায় আলমারিতে শাড়ির ভাঁজে সেই 'মূল্যহীন' সঞ্চয় পাওয়া গিয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব "নিজে সৎ থাকলেও, দুর্নীতিবাজরা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছিলো। এদের মধ্যে তাঁর কোনো কোনো আত্মীয়, স্বজন এবং দলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাজউদ্দিন অথবা নজরুল ইসলামের মত ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিলেন। সেরনিয়াবতও ব্যক্তিগতভাবে সৎ ছিলেন বলে শোনা যায়। ... দরিদ্রদের দুর্নীতির আশ্রয় নেওয়ার কারণ আর্থিক অনটন এবং আইনের শাসনের অভাব। কিন্তু প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দুর্নীতি করতেন লোভের বশবর্তী হয়ে" (২০/১৯৬-১৯৭)। "ইতিমধ্যে বাইরের শত্রুরা চলে এসেছে অন্দরমহলে। বিরোধীরা অস্ত্র বগলদাবা করে হইহই করে বেড়াতে থাকে যত্রতত্র। ষড়যন্ত্রের জালে ঘিরে ফেলে সারাদেশ। ... অল্পকথায় বলা যায়, যেকোনো মিথ্যা জনমানসে সত্য বলে বিশ্বাস করানোর জন্য ঘন ঘন উচ্চারণ ('গোয়েবলসীয় প্রচার') করতে হয়। বিরোধীরা যত্নসহকারে সেই কাজটিই করল। নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির জন্মদাতা জাসদের জন্ম ৩১ অক্টোবর ১৯৭২। সরকারের নামে মিথ্যাচার ছড়ানোর প্রধান মুখপত্র দৈনিক গণকণ্ঠ প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার দিন। ... মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্থায়ি সরকারকে অসহযোগিতা করার প্রধান ব্যক্তি সিরাজুল আলম খানের পরামর্শে গণকণ্ঠ প্রকাশিত হয়। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকলেন কবি আল মাহমুদ" (২২/১২৭-১২৮)। গুজব এবং নেতিবাচক সংবাদ প্রচারের আরো অনেক পত্র-পত্রিকা তখন বাংলাদেশে। একদার অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধানতম মুখপত্র দৈনিক ইত্তেফাক, সম্পাদক মানিক মিয়ার মৃত্যুর পরে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে চরম নেতিবাচক ভূমিকা অনেক নিয়মিত পাঠককেই বিস্মিত এবং মর্মাহত করেছিল। সচেতন মানুষ ব্যথিত-বিস্মিত হয়েছিল মওলানা ভাসানীর 'হক-কথা' পত্রিকাটির চরম 'না-হক' প্রচারণাতেও।

তখন পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, কোনো কোনো পত্রিকা সরকারের সমালোচনা

করতে ভয় পেতো, অপরদিকে কোনো কোনো প্রত্রিকায় নেতিবাচক অতিরঞ্জন আর গুজব প্রচারই হয়ে উঠেছিল মূল প্রতিপাদ্য। সুতরাং ভাবা যেতেই পারে, গুজব-ছড়ানো অসত্য-অসমীচিন খবরের উৎস বন্ধ করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, যাতে জনমনে অযথা আতঙ্ক ছড়ানোর পথ বন্ধ হয়। "৭৩ সালে 'স্বদেশ' এবং 'হক-কথা'সহ তিনটি পত্রিকা নিষিদ্ধ করা হয়। ... '৭৪ সালের ২০ শে নভেম্বর 'প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস্' আইন পাশ হয়। 'গণকণ্ঠ' নিষিদ্ধ হয় পরের বছর ২৭শে জানুয়ারি। আর, ১৬ই জুন সরকারী আদেশ অনুযায়ী চালু রাখা হয় মাত্র চারটি জাতীয় পত্রিকা। অন্যগুলোর প্রকাশনা নিষিদ্ধ হয়। মোট কথা, সমালোচনার সকল দুয়ার খিল দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল সরকার" (২০/২০৫)।

এখানে প্রাসঙ্গিক একটি কৌতুহলকর তথ্য উপস্থাপন করা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুর অন্যতম প্রিয়ভাজন "এনায়েতউল্লাহ খান সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'হলিডে' পত্রিকা স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনকে জোরালো ভাষায় সমর্থন করেছিল। এনায়েতউল্লাহ খান বর্তমানে 'নিউ এজ' নামের একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'হলিডে' এবং 'নিউ এজ' মূলত দৈনিক 'ইনকিলাব'এরই ইংরেজী সংস্করণ বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। ... ১৯৭৫ সালে বাকশাল কায়েম হওয়ার পর সংবাদপত্র প্রকাশনা বিষয়ে বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দেওয়ার জন যে তিন-সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়, তার অন্যতম সদস্য ছিলেন এনায়েতউল্লাহ খান। বঙ্গবন্ধু চারটি পত্রিকা বাদে অন্য পত্রিকাগুলো যে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, তার পিছনে এনায়েতউল্লাহ খানের পরামর্শের বিষয়টি তিনি নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবেন না" (১(২)/১০৫৬)। আরেকটি বড় বিষয় হচ্ছে, চারটি মাত্র সংবাদপত্র রেখে বাকিগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সরকার নাকি শত শত সাংবাদিকের রুটি-রুজির পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে, তখন সকল সংবাদকর্মীর জন্যই কোনো-না-কোনো প্রতিষ্ঠানে সরকারী উদ্যোগেই চাকুরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্নবিলাসী জাসদের জন্মকথা আগেই বলা হয়েছে। জাসদের মিছিল থেকে ১৭সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ইং তদানিন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সরকারী বাসভবনে গোলাগুলি চালানো হয়, তাতে অন্তত ৮জন নিহত হয়েছিল বলে জানা যায়। তারো আগেই (৩জানুয়ারি, ১৯৭৩ইং) সিপিবি'র ছাত্রসংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি এবং ডাকসু-ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম পল্টনের প্রকাশ্য সভায় বঙ্গবন্ধুর 'আজীবন ডাকসু সদস্যপদ' ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। অনস্বীকার্য যে, এ দুটি ঘটনায় স্বাধীন বাংলাদেশে নেতিবাচক রাজনীতি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছিল। কারণ, জাসদ সৃষ্টি হয়েছিল আওয়ামী লীগের ভেতর থেকেই। রব-সিরাজ প্রমুখ বিদ্রোহী হলেও বঙ্গবন্ধুর স্নেহভাজন রাজনীতিবিদ হিসেবেই পূর্ব-পরিচিত ছিলেন। সিরাজুল আলম খানও ছিলেন ষাটের দশক থেকেই বঙ্গবন্ধুর প্রধানতম আস্থাভাজন ছাত্রনেতাদের একজন। অপরদিকে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি তখন ছিল আ.লীগ, ন্যাপ (মাজাফফর) এবং সিপিবি সমন্বয়ে গঠিত 'ত্রি-দলীয় এক্যজোট'এর অংশভাগী। এরা যখন এভাবে-ওভাবে সরকারের ওপর আঘাৎ করে, তখন প্রকৃত শত্রুরা সহজেই

পথ পেয়ে যায়। সকলেই জানেন, জাসদ কিছু দিন যেতে না যেতেই ভেঙ্গে ছত্রখান হয়ে গেছে। বহুমুখী ভাঙ্গনের পরেও, টিম টিম করে সিপিবি এখনো টিঁকে আছে, সেলিম তার বর্তমান সভাপতি। বড় জানতে ইচ্ছে হয়, ১৯৭৩ইং ৩ জানুয়ারির অঘটনটি সম্পর্কে তিনি এখন কি ভাবেন? আরেকটা বিষয় জানতে ইচ্ছা হয়, যথার্থ গণকল্যাণের আদর্শ থাকলে কোনো রাজনৈতিক দল কি জাসদ-সিপিবি'র মত অমন 'উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল ... ক্ষণকালের ছন্দ' হতে পারে?

সে সময় "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' স্লেগানে-ভাসা তরুণ যুবাদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর সংঘর্ষে হতাহত হন অনেকে। তরুণ যুবারা জানতেন না, তথাকথিত রিলিফ কর্মী পিটার কস্টার্সদের সঙ্গে জাসদ গণবাহিনীর সম্পর্ক এবং সম্পর্কের কারণ। জাসদ গণবাহিনীর সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর লড়াইটা ছিল মূলত সিআইএ'র সঙ্গে বাংলাদেশের শান্তি রক্ষা বাহিনীর লড়াই। কারণ, আমেরিকার নিক্সন সরকার, চীন ও পাকিস্তান কোনো দিনই চায়নি বাংলাদেশ ভালো থাকুক" (২২/১২৮)। বঙ্গবন্ধু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, সেজন্য তারা জাসদমার্কা লাল পতাকা দিয়ে ঠেকাল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। প্রসঙ্গত অনেকেই হয়তো স্মরণ করতে পারেন, 'নকশালবাড়ি আন্দোলন' নামক রোমান্টিক বিপ্লবে কী বিপুল সর্বনাশ সাধিত হচ্ছিল সাধারণভাবে পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজের এবং বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত পরিবারের হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র-যুবক-যুবতীর। যা' হোক, তখনকার বাংলাদেশেও এমন একটা পরিস্থিতিই সৃষ্টি হয়েছিল চরম ডান-বামের উদ্দেশ্যমূলক অবৈধ মিলনে। সে অবস্থায় প্রকৃত দেশপ্রেমিক মানুষের, বিশেষত বঙ্গবন্ধুর মত মানুষের তো নিশ্চেষ্ট দর্শক হয়ে থাকার কোনো উপায় ছিল না। দেশ এবং দেশের মানুষকে বাঁচাতেই হবে। বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের কাছে মাথা নত করতে অথবা হতাশায় হাল ছাড়তে দেখা যায়নি কখনো।

সুতরাং দারুণ দুঃসময়ে দেশ-জনগণকে বাঁচাতে বঙ্গবন্ধু যে ব্যতিক্রমী সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তারই নাম রাষ্ট্রপতি শাসনপদ্ধতির 'বাকশাল', সর্বদলীয় শাসনপদ্ধতি, একদলীয় নয় কিছুতেই, চিরস্থায়ি তো নয়ই। বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছিলেন, সংসদ না চাইলে, এবিষয়ে গণভোট করা হবে, আর ব্যবস্থাটি ভালো না হলে 'রেক্টিফাই' করা হবে। অথচ, বাংলাদেশবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা বাকশালকেই 'গণতন্ত্র হত্যা' এবং 'একদলীয় শাসন' বলে প্রোপাগান্ডা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করেছে। অবশ্যই উল্লেখ্য যে, 'বাকশাল ব্যবস্থা'টি কার্যকরীকরণের আগেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কিছু ভয় ছিল খুণীদের। প্রথমত, বাকশাল কার্যকর করা হলে প্রশাসন-বাজার-জননিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই শৃঙ্খলা ফিরে আসবে, তখন বঙ্গবন্ধু হত্যার সুযোগ থাকবে না। সুতরাং সুযোগ থাকতে থাকতেই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। দ্বিতীয় ভয়টি ছিল, সাধারণ জনগণের সংশয়াতীত সমর্থনের কারণে হত্যা না করে শাসন-কর্তৃত্ব থেকে বঙ্গবন্ধুকে অপসারণ করা অসম্ভব। খুণীদের তৃতীয় ভয় ছিল, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে কিছু মানুষ রয়েছেন, যাঁদেরকে লোভে কিংবা ভয়ে কাবু করা যাবে না, তাঁরা জনগণকে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর

শাসন-ধারায় বাংলাদেশকে ফেরাবেনই। সুতরাং কারাবন্দী অবস্থাতেই নজরুল-তাজউদ্দিন-মনসুর-কামরুজ্জামান প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হয়েছিল।

বাকশাল পূর্ববর্তী ব্যবসায়িক কারসাজির কথা উপলব্ধির জন্যই উল্লেখ করা দরকার, বাকশাল ঘোষণার পরেই দৈনন্দিন পণ্য-বাজারে অনুকুল পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। "চালের সের (এক কেজির কিছু কম) আট টাকা থেকে কমে এসে দাঁড়ালো সাড়ে পাঁচ টাকায়। সরিষার তেলের দাম প্রতি সের একচল্লিশ টাকা আট পয়সা থেকে কমে এলো ত্রিশ টাকা সাঁইত্রিশ পয়সায় (২২/১২৮)। "অবশেষে (৪ অক্টোবর ১৯৭৪ইং) বাংলাদেশে খাদ্য পাঠানোর সবুজ সংকেত দেয় আমেরিকা। দুই মাস পরে যখন বাংলাদেশের বন্দর স্পর্শ করল আমেরিকার খাদ্যবোঝাই জাহাজ, ততক্ষণে (বঙ্গবন্ধু সরকারের নানা প্রচেষ্টাতেই) অনাহারী মানুষের মৃত্যু থেমেছে। নিভে গেছে জ্বলে ওঠা ক্ষুধার কষ্ট" (২২/১২৪)।

এখানে মুজিব-জীবনীর প্রাসঙ্গিকতায় অতি সংক্ষেপে 'বাকশাল'এর প্রেক্ষাপট এবং বাস্তব লক্ষ্য-প্রসঙ্গে একান্ত সংক্ষেপে কিছুটা উল্লেখ করতে পারি। এক্ষেত্রে মূলত নির্ভর করছি, আওয়ামী লীগ এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির আন্ত-সম্পর্ক বিষয়ক গবেষণায় পি-এইচ ডি অর্জনকারী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. অজিত কুমার দাস লিখিত 'বঙ্গবন্ধুর বাকশাল ঃ পটভূমি, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী' শীর্ষক নিবন্ধের ওপর।

প্রাসঙ্গিক পটভূমিতে ড. দাস উল্লেখ করেছেন : "শুধু বিরোধী দলগুলির সরকারবিরোধী তৎপরতাই নয়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর খোদ শাসক দলের অভ্যন্তরে মতাদর্শিক সংকট দেখা দেয়। সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগের অপেক্ষাকৃত উদার গ্রুপটি 'মুজিববাদ' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলে অপর রেডিক্যাল গ্রুপটি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। ... আ.স.ম. আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজের নেতৃত্বাধীন ... গ্রুপটি ছাত্রলীগ থেকে বের হয়ে গিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠন করে এবং মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে মাঠে নামে। ... পিকিংপন্থী (বিভিন্ন নামে-নেতৃত্বে ও নীতিতে) দলগুলো 'সশস্ত্র সংগ্রাম'এর মাত্রা জোরদার করে। ... ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসকে 'কালো দিবস' ও 'পরাধীনতার দিবস' বলে আখ্যায়িত করে ... 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ' এবং 'তাঁদের বিশ্বাসঘাতক আওয়ামী লীগের পুতুল সরকারকে উৎখাতের' দাবিতে হরতাল আহ্বান ও প্রচারপত্র বিলি করে। ... মওলানা ভাসানী ... ১৪ই ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে জনসভায় ঘোষণা করেন, 'দেশে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, সশস্ত্র বিপ্লব হল একমাত্র পথ'। ... পরবর্তীকালে (১৯৭৪ সালে) মাওবাদী গ্রুপগুলোর সাথে জাসদের গণবাহিনী যুক্ত হয় এবং তাদের 'বিপ্লবী অভিযানে' ১৫০টি ছোটোবড় হাটবাজার, প্রায় ৫০টি ব্যাংক, ৪০টি থানা বা ফাঁড়ি লুট হয়। ১৯৭৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর উগ্রপন্থীরা ঘোড়াশাল সার কারখানাটিতে কন্ট্রোল রুম উড়িয়ে দেয় ... ক্ষতি হয় বৈদেশিক মুদ্রায় ১৫০মিলিয়ন টাকা"।

"প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ডানপন্থী ও উগ্র বামপন্থীদের কার্যকলাপ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক বিরোধীদের মিথ্যা অপপ্রচার এসব কিছু মিলে দেশ এক মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হয়। এসময় বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি গৃহীত এক প্রস্ত

াবে বলে যে, যে-সব ব্যক্তি ও দল স্বাধীনতা ও প্রগতির বিরোধী বলে বিবেচিত হবে, গণতন্ত্রের স্বার্থেই তাদের দমন করা প্রয়োজন। গণতন্ত্রের নামে দেশে প্রচলিত বর্তমান বুর্জোয়া গণতন্ত্র চলতে দেয়া যায় না। ... সিপিবি-নেতা মণি সিংহ ১৯৭৪ সালের ১৭নভেম্বর ঢাকার ... এক জনসভায় ঘোষণা দেন যে, 'কৃষক শ্রমিকের গণতন্ত্রের জন্য পার্টি সংগ্রাম করবে এবং আওয়ামী লীগ সরকার কোনো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন আনলে তাতে সাহায্য করবে'। ... শেখ মুজিবও দেখেন যে, বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে তিনি 'জনগণের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তি'র অঙ্গীকার পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ... এই পটভূমিতেই ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ... রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রবর্তন করেন এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি দেশের সকল দল বিলুপ্ত করে 'এক জাতীয় দল' হিসেবে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ, সংক্ষেপে বাকশাল কায়েম করেন" (১(২)/৭৬৩-৭৬৫)।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর পর্যবেক্ষন : বঙ্গবন্ধু "বাকশাল ব্যবস্থাকে একটি আপৎকালীন ও অস্থায়ী, বড়ো জোর একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবেই দেখেছিলেন। ... ৪র্থ সংশোধনীর ফলে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার, একদলীয় সরকার ও জেলা-ভিত্তিক বিকেন্দ্রায়িত সরকার-ব্যবস্থা কতোটা কার্যকর হত সেটা চিরকালের জন্য একটা অনুমানের বিষয় হয়ে রইল" (১(১)/৭৩)। আর এ 'অনুমানের বিষয়'টাকে 'যার মনে যেমন' তেমন করেই এখনো চরম বিরূপ নিন্দা-সমালোচনার বিষয় হিসেবে জিইয়ে রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বক্তা আর উদ্দেশ্যহীন শ্রোতা যেন সমভাবেই ভুলে যান যে, বঙ্গবন্ধু-হত্যার অব্যবহিত পরবর্তী শাসকেরা, ৪র্থ সংশেধনীর মধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়টিকে মোশতাক-জিয়া-এরশাদ প্রমুখ শাসকেরা কেউই বাতিল করেননি এবং খুনীদের বিচারও করেননি বরং সরকারী কোষাগার থেকেই পুরষ্কার-পরিতোষিক দিয়ে তুষ্ট রেখেছেন। এখানেই ব্যাপারটাকে রাজনৈতিকভাবে জটিল করে ফেলা হয়েছে। বাকশাল বাতিলের নামে সেনা-শাসকেরা "সৃষ্টি করলেন এক বাংলাদেশ ... বিকল্প বাংলাদেশ', তাঁদের নতুন বাংলাদেশ। এই নতুনত্ব ঘোষণার পেছনে যে দাবি (অনস্বীকার্যভাবেই) তা হ'ল, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ এখন অতীতের ব্যাপার, তার মৃত্যু হয়েছে। এখন ... একাত্তরের বাংলাদেশ এক অর্থে টিঁকে আছে, আবার নেইও" (প্রাগুক্ত)।

'বাকশাল গঠনের উদ্দেশ্য' সম্পর্কে ড. দাস লিখেছেন, "মূলতঃ উগ্র পিকিংপন্থী দলগুলোর 'সশস্ত্র বিপ্লবের' নামে ব্যাংক ... থানা ... ফাঁড়ি লুট, রাতের অন্ধকারে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হত্যা প্রভৃতি কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করলে বঙ্গবন্ধু বাধ্য হয়েই ... বাকশাল কায়েম করেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু নিজের মুখেই বলেছেন, 'স্বাধীনতার পর আমাদের কি দশা হল? ধবংসস্তুপের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা পেলাম, এবং রক্তের বিনিময়ে পেলাম। ... সম্পদ বলতে কোনো পদার্থ আমাদের ছিল না। সমস্ত কিছু ধবংস, আমরা কিন্তু চেষ্টা করলাম। ঠিক আছে, আমরা একদম যাকে বলে ফ্রি-হ্যান্ড দিয়ে দিলাম। আচ্ছা বলো, ... করো ... দল গড়ো ... লেখো, ... বক্তৃতা করো, বাধা নাই, ফ্রি-হ্যান্ড। ... কিন্তু

দেখতে পেলাম কী? আমরা যখন এই পন্থায় এগুতে শুরু করলাম, বিদেশী চক্র এদেশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো ... এদেশের স্বাধীনতা বানচাল করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করল ... হুড়হুড় করে বাংলাদেশে অস্ত্র আসতে আরম্ভ করল, দেশের মধ্যে ... ধবংসাত্মক কার্যকলাপ। এছাড়া আরো দেখা গেল; ... তারা রাতের অন্ধকারে মানুষ হত্যা করতে আরম্ভ করলো। যখন আমরা বলেছি যে ... পাঁচ বছর পরে ইলেকশন হবে। ইলেকশন কর। ইলেকশনে যদি ডিফিট খাই, আরেকজন এসে বসবে। ... তা না করে ইলেক্টেড মেম্বার অব পার্লামেন্ট তাদের হত্যা করা হল। যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছেন ... ধবংসপ্রাপ্ত হয়েছে যাদের সম্পত্তি, তাদের রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হল। মোট কয়েক হাজার কর্মীকে হত্যা করা হল। ... যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে যুদ্ধ করেছে, মুক্তিবাহিনীর ছেলে, তাদের হত্যা করা হল। চরম ষড়যন্ত্র। এত অস্ত্র উদ্ধার করি, তবু অস্ত্র শেষ হয় না। ... রাজনীতির নামে হাইজ্যাক ... ডাকাতি ... রাজনীতির নামে একটা ফ্রি-স্টাইল শুরু হয়ে গেল। ... কিছুদিন আগে স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটা দেশে এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না"।

"বঙ্গবন্ধু কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের অন্ধ সমর্থক ছিলেন না। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছিল তাঁর রাজনৈতিক মানস। ... তিনি উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বটে কিন্তু ... তিনি গরীব-দুঃখী ও খেটে-খাওয়া মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার কথাও ভাবতেন। ... প্রফেসর জিল্লুর রহমান খানের ভাষায়, : "The socialist element of Mujbism is more closely associated with the democratic socialism of Greart Britain and India rather than Marxist socialism ... '। ... শুধুমাত্র দেশের কল্যাণের কথা ভেবেই বহুদলীয় গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে ... বাকশাল কায়েম করেন। ... বঙ্গবন্ধুর 'একদলীয় শাসন'এর ধারণাটির মধ্যে ছিল বেশ নতুনত্ব। ... বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন মতের মানুষকে এর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন যাতে সবাই এক জায়গায় সমবেত হয়ে সম্মিলিতভাবে দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে পারেন" (১(২) ৭৬৬-৭৬৭)।

বঙ্গবন্ধু গভীরভাবেই লক্ষ্য করেছিলেন, প্রত্যেক গোষ্ঠীই নিজ অবস্থান-মর্যাদা-স্বার্থ রক্ষায় যতটা সচেতন ততটাই সজাগ অপরের অধিকার অস্বীকার করতে। তাই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,"এক গ্রুপ আমরা পলিটিশিয়ান হয়ে গেলাম। একগ্রুপ আমরা বুদ্ধিজীবী। ... এক গ্রপ সরকারী কর্মচারী ... কিন্তু 'একচুয়াল' যেটা 'পিপল' সমস্ত একতাবদ্ধ করতে না পারলে সমাজের দুর্দিনে দেশের মঙ্গল হতে পারে না। ... সমস্ত দেশ একটা ভাগ ভাগ অবস্থার মধ্যে থাকত। এই সন্দেহটা দূর করে ... সকলেই যে এক এবং সকলেই যে দেশকে ভালবাসে এবং মঙ্গল চায় ... এই 'পুল' আমি করতে পারি, যদি আমি নতুন একটা 'সিস্টেম'চালু করি, একটা নতুন দল সৃষ্টি করি - জাতীয় দল, যার মধ্যে এক মত, এক পথ, এক ভাব, এক হয়ে দেশকে ভলবাসা যায়। ... এজন্য আজকে এটা করতে হয়েছে" (১(২)/৭৬৭)। বাকশাল নামক যে পদ্ধতিটি আদৌ কোনোদিন কার্যকর করা হয়নি, অথচ প্রচন্ড বিরূপ সমালোচনা করা হচ্ছে প্রায় চারদশক জুড়ে, আজ নিজের মনে

পরিচ্ছন্ন চিন্তায় পেছন ফিরে তাকালে কি মনে হয়, এর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর কোনো রকম অবৈধ ক্ষমতালিপ্সা ছিল? যদি নিজের মনেই নেতিবাচক উত্তর মেলে, তাহলে অবশ্যই ভাবতে হবে, কারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করল, কেন করল? ততোধিক ভাবতে হবে আজো কারা এজন্য বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করে চলেছে?

"দুঃখের তিমিরে ... জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক" ঃ
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, ১৯৭২-১৯৭৫

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে কারা-মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন ১০জানুয়ারি ১৯৭২ সালে। বঙ্গবন্ধু ১২জানুয়ারি ২৩ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি হলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। শেখ হাসিনা লিখেছেন, "১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার আত্মনিয়োগ করেছিল। ... আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেই ... অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। মাত্র তিন বছরের মধ্যে এই বিধ্বস্ত দেশকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা দিতে সক্ষম হয়। আর এ সফলতাই ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের মর্মবেদনার কারণ। ... বঙ্গবন্ধু যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলছেন, ... শরণার্থীদের ফিরিয়ে এনে পূণর্বাসন করা, লাঞ্ছিত মা-বোনদের চিকিৎসা ও সামাজিকভাবে পূণর্বাসন করা, অবৈধ শিশুদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, আহত মুক্তিযোদ্ধার চিকিৎসা ও শহীদ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করা, রাস্তাঘাট, পুল-ব্রিজ, পোর্ট, স্কুল-কলেজ, মসজিদ, মন্দির পূণঃনির্মান করা, শূন্য রিজার্ভ মানি, শূন্য খাদ্য-গুদাম - বলতে গেলে শূন্যের ওপর দাঁড়িয়েই তো যাত্রা শুরু করেছিলেন। সে অবস্থায়ও ষড়যন্ত্রকারীরা থেমে থাকেনি। একদিকে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যসহ নেতাকর্মীদের হত্যা করা, অপরদিকে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি, পাটের গুদামে আগুন, ফাঁড়ি লুট, নানা ধরণের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিকল্পিতভাবে চালাল এবং মিথ্যা অপপ্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করল" (১(১)/২৫-২৬)।

"শেখ মুজিবের তর্কাতীত কৃতিত্ব হলো: তিনি বাংলাদেশে বিশ্বাসযোগ্য একটি সরকার স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি না-এলে দেশ অরাজকতা এবং হানাহানির দিকে চলে যেতো। তাঁর আর-একটি প্রধান কৃতিত্ব '৭২সাল শেষ হওয়ার আগেই দেশকে তিনি একটি চমৎকার সংবিধান দান করেছিলেন। বস্তুত তিনি দেশকে এমন একটি সংবিধান দিয়েছিলেন, যা বাঙালিরা দীর্ঘকাল যাবৎ আশা করছিলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট-কেন্দ্রিক সরকার অথবা ফৌজী একনায়কত্বের বদলে বাংলাদেশে গৃহীত হয় সংসদীয় পদ্ধতি। তদুপরি, নিজে ধর্মভীরু মুসলমান হলেও, ধর্মনিরপেক্ষতাকে মুজিব দেশের অন্যতম আদর্শ করেছিলেন। তাঁর আমলে বঙ্গভবনে মিলাদ, মিলিটারি প্যারেডে কোরাণ তেলাওয়াত, মিলিটারির অঙ্গিকার কোরাণ ছুঁয়ে- সবই চালু ছিল। কিন্তু অমুসলমান বলে কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়নি" (২০/২০১)।

ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন বলছেন, "শেখ মুজিবুর রহমান বা তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল দেশকে একটি শাসনতন্ত্র প্রদান। আর কোনো দেশে এরকম একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর এত দ্রুত একটি শাসনতন্ত্র প্রদান সম্ভব হয়েছে বলে জানা নেই। এ শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের চারটি মূলনীতি ঘোষণা করা হয়েছিল, তৎকালীন পরিস্থিতিতে তা খানিকটা র‍্যাডিক্যালও বলা যেতে পারে। শাসনতন্ত্রের মূলনীতিসমুহ ছিল - গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। মূলত : মুক্তিযুদ্ধ যে ক'টি কারণে হয়েছিল, শাসনতন্ত্রের মূল নীতিতে তাই বিধৃত হয়েছিল, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতা। সামরিক বাহিনীর জেনারেলরা (বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর) প্রথমেই মূল নীতিসমুহ, বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর আঘাত হেনেছিলেন। ... মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল সামরিক সমাজের বিপরীতে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। আর ১৯৭২ সালের শাসনতন্ত্রে বিধৃত হয়েছিল সিভিল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমুহ বা এককথায় এই শাসনতন্ত্র বাংলাদেশে পত্তন করতে চেয়েছিল সিভিল সমাজের ভিত্তি" (২৫ (১)/৩৮)।

"বাংলাদেশের আবির্ভাব মৌলবাদী শক্তিসমুহের উপর একটা চরম আঘাত হিসাবে এসেছে ... এমন একটা গুণগত পরিবর্তনের সুযোগ এসেছে যে, পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় কাঠামো বাংলাদেশ, ভারত এমনকি পাকিস্তানের সমাজকেও একটা মৌলিক পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে" (২৪/৫১)। "মুজিবও আশা করেছিলেন, ধর্মীয় ইস্যুতে সৃষ্ট ও বিদ্যমান পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বাংলাদেশ একটি প্রাবর-রাষ্ট্র ('Buffer State') হিসেবে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড-স্বরূপ অবস্থান করবে। রাষ্ট্র-রাজনীতিতে ধর্মানুষঙ্গ যুক্ত করার কুফল এখন অনেক দেশেই দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি যথার্থ উদ্বেগ প্রকাশ করেই বলেছেন, "ধর্মভিত্তিক রাজনীতি এখন একটি রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে" (দৈনিক জনকণ্ঠ,১৫-১১-'১২)। দেশের উদ্বিগ্ন বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ "ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি করছেন" (প্রাগুক্ত)। রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়া গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, এমনকি সকল নাগরিকের সমানাধিকারের বিষয়গুলিও নিশ্চিত করা সম্ভব কিনা, সেটাই এখন বাস্তব ভাবনার বিষয়। কট্টর সাম্প্রদায়িক না হলে, সকল বাম-ডান রাজনৈতিক দলকেই এবিষয়ে ভাবতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর সরকার "সংবিধান প্রবর্তনের পরে নির্বাচন দেওয়া তাঁদের গণতান্ত্রিক কর্তব্য মনে করেছিলেন। গণপরিষদে (১৯৭০ইং নির্বাচিত এবং স্বাধীনতার পরেও বহাল) আওয়ামী লীগই ছিল একমাত্র পার্টি। অপজিশন বলিতে একজন মেম্বরও ছিলেন না। এমন একদলীয় গণপরিষদ সংবিধান রচনার পর ঐ সংবিধানেই 'অস্থায়ী বিধান' হিসাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন : 'এই গণপরিষদই পার্লামেন্টে রূপান্তরিত হইল'। তারপর সেই পর্লামেন্টের আয়ু, কতদিন পরে পার্লামেন্টের নয়া নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে, এসব ব্যাপারে তাঁদের সুবিধা মতো বিধান করিয়া লইতে পারিতেন। আওয়ামী লীগ এসব কিছুই করেন নাই। বরঞ্চ অবিলম্বে নির্বাচন দিয়া পার্লমেন্টারী গণতান্ত্রিক দুনিয়ার আদর্শ নজির স্থাপন করিলেন" (৫/৪৩)।

বঙ্গবন্ধু নিজেই নিজের সম্পর্কে বলতেন, আমি মানুষ, আমার ভুল হতেই পারে, তবে ভুল বুঝতে পারা মাত্র সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করাই মানুষের কর্তব্য। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তবু বলতেই হয়, তাঁর মন্দভাগ্য,মন্দভাগ্য বাঙালির, তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল-হানি ঘটে, তার সাথে প্রবলভাবেই যুক্ত হয়েছিল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। তারই পরিণামে দুর্ভিক্ষে কয়েক হাজার (সরকারী হিসেবে ২৭,৫০০) লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটে, আরো পাঁচ-সাত হাজার মানুষ মারা পড়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতিজনিত সশস্ত্র সংঘাতে। সুতরাং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরের তিন-সাড়ে তিন বছর সময় বাংলাদেশের মানুষের জন্য কিংবা অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর জন্যও আদৌ স্বস্তিতে কাটেনি। তবে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির বেদনাদায়ক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পাক-চীন-মার্কিন ষড়যন্ত্র সত্বেও আনন্দ-সংবাদও ছিল যথেষ্টই। নিঃসংশয়ে বলা চলে, বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব এবং সুখ্যাতির জন্যই সেই সংবাদগুলি সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলি মূলতই ছিল নবজাত বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সংগঠনসমুহের স্বীকৃতির সংবাদ।

ইতিহাসের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের পর্যবেক্ষণ : "মুক্তিযুদ্ধের সময় ইসলামী বিশ্বের বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা, স্বাধীনতার পরে ইসলামী বিশ্বে পাকিস্তানের বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণা এবং সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি - ইত্যাদির কারণে ... বাংলাদেশ ও ইসলামী বিশ্বের মধ্যে এক বিরাট মানসিক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রভাবে ক্রমান্বয়ে এ ব্যবধানের অবসান হয়"। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় অধ্যাপক হোসেন উল্লেখ করেছেন, "১৯৭১-এর ... ২ জুলাই ইসরায়েলী সংসদ বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান সামরিক চক্রের 'পাশবিকতা ও বেপরোয়া ধবংসলীলাকে' নিন্দা করে একটি প্রস্তাব পাশ করে। এমনকি তাদের রেড ক্রস বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমান ওষুধ, কাপড় ও খাবার পাঠায়। শুধু তাই নয়, ১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে ইসরায়েল বাংলাদেশকে কুটনৈতিক স্বীকৃতি জানায়। ... ইসরায়েলের এ ভূমিকায় নাটকীয় বিস্ময় থাকলেও একেবারে দুর্বোধ্য নয়।..উদ্দেশ্য (ইসরায়েলের) ছিল, ইসলামী বিশ্বের দুঃখজনক বৈরিতায় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশের ওপর একটি মানসিক প্রভাব গড়ে তোলা। ... বাংলাদেশ ইসরায়েলের অর্থ, অস্ত্র, ও কূটনৈতিক স্বীকৃতি গ্রহণ করলে তা হতো আরব বিশ্বের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের এক বিরাট কূটনৈতিক বিজয়। ... যখন আরব-বিশ্ব সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করছে তখন ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা। কিন্তু তা না করে (সমস্ত ইসরায়েলি সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করে) বাংলাদেশ আরব-বিশ্বকে একটি দুষ্টান্ত মূলক শিক্ষাই দিয়েছিল" (১(২)/৬৭৮)।

ড. হোসেনের প্রসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রশ্ন : "বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাদের (আরব রাষ্ট্রসমুহের) কাছে পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে ইসলামী সংহতি বিনষ্টের একটি অপপ্রয়াস মনে হয়েছিল। ... বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্নিহিত সমস্যা

সম্পর্কে আরব-বিশ্ব সম্যকভাবে অবহিত ছিল না। ... ১৯৭৩-এর জানুয়ারি মাসে ঢাকা সফরকারী মিশরীয় সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের নেতা মোহাম্মদ হায়কল একথা স্বীকার করেছিলেন : 'সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল না।" ... কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিশ শতকের ... সহজতর সংবাদ প্রবাহের যুগে এ ধরণের 'ইনফরমেশন গ্যাপ' কি ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ ও কান ঢেকে রাখার মত ব্যাপার নয়? ... তারা এটা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে, এ মুক্তিযুদ্ধ ছিল বঞ্চনা, স্বৈরাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যা যুক্তির বিচারে ইসলামী সমর্থন পেতে পারতো" (১(২)/৬৭৮-৬৭৯)।

অধ্যাপক হোসেন বিস্তারিতভাবেই লিখেছেন, "সাংবিধানিকভাবে মুজিব সরকার ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। ... ১৯৭২-এর ৪ নভেম্বর ঘোষিত প্রথম সংবিধানে (ক) যাবতীয় সাম্প্রদায়িকতা, (খ) কোন একটি বিশেষ ধর্মের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার, এবং (ঘ) ধর্মের ভিত্তিতে পার্থক্য করার ঐতিহ্যকে বিলোপ করা হয়। ... ১৯৭১-এ ইসলাম ও ইসলামী সংহতির নামে যে নৃশংস বাঙালি (পাকিস্তানি-ইসলাম সমর্থক ও তাদের বাঙালি সহযোগীদের পরিভাষায় 'কাফের') নিধন-যজ্ঞ চলেছিল,তার প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রে এমনি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। ... বোঝা গিয়ছিল যে, রাষ্ট্রয় মূলনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে ইসলাম অনুপস্থিত থাকবে। এ-ধারণা বাস্তবে পরিণত হলো যখন ১৯৭২-এ সরকার বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা গ্রহণকারী দক্ষিণপন্থী ও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করেন। তবে মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়, বঙ্গবন্ধু নিজেই তা মনে করেনি কখনই" (১(২) ৬৭৯-৬৮০)।

তবে একটি বাস্তব প্রশ্ন জাগতেই পারে, সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি কি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে, বিশেষত বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি-লাভের বিষয়ে খুব উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল? নাকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক দিকটিই বিশ্ব-জনের অনুকুল মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল? হালিম দাদ খান বাংলাদেশের আন্তরাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ১৯৭৫ইং পর্যন্ত স্বীকৃতি অর্জনের একটি বছর-মাস ভিত্তিক তালিকা উপস্থাপন করেছেন (২৪/২২১-২২৩)। অতঃপর নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি প্রদত্ত স্বীকৃতির সেই সুদীর্ঘ তালিকার ঐতিহাসিক তথ্যই নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

১৯৭১ সাল

১. ভারত (৬, ডিসেম্বর)　　২. ভূটান (৭ মতান্তরে ৪ ডিসেম্বর) ১৯৭২ইং।

১৯৭২ সাল

জানুয়ারি মাস

৩. পূর্ব জর্মানি (১১ জানুয়ারি)　　৪. মঙোলিয়া (১১ জনুয়ারি)
৫. পোলান্ড (১২ জানু)　　৬. বুলগেরিয়া (১২ জানু)
৭. বার্মা (১৩ জানু)　　৮. নেপাল (১৩ জানু)

৯. বার্বাডোস (২০জানু)
১০.যুগোশ্লাভিয়া (২২জানু)
১১. টোংগো (২৪ জানু)
১২. সোভিয়েট ইউ (২৫জানু)
১৩. চেকোশ্লাভ (২৫জানু)
১৪. সাইপ্রাস (২৬ জানু)
১৫. হাঙ্গেরি (৩১জানু)
১৬. অস্ট্রেলিয়া (৩১ জানু)
১৭. ফিজি (৩১জানু)
১৮. নিউজিল্যান্ড (৩১জানু)

ফেব্রুয়ারি মাস

১৯. সেনেগাল (১ ফেব্রু)
২০. যুক্তরাজ্য (৪ ফেব্রু)
২১. পঃ জার্মানি (৪ ফেব্রু)
২২.ফিনল্যান্ড (৪ ফেব্রু)
২৩. ডেনমার্ক (৪ ফেব্রু)
২৪. সুইডেন (৪ ফেব্রু)
২৫. নরওযে (৪ ফেব্রু)
২৬.আইসল্যান্ড (৪ ফব্রু)
২৭. ইসরায়েল (৪ ফেব্রু)
২৮. অস্ট্রিয়া (৮ ফেব্রু)
২৯.কিউবা (৯ ফেব্রু)
৩০. জাপান (১০ ফেব্রু)
৩১. লুক্সেমবার্গ (১১ ফেব্রু)
৩২. নেদারল্যান্ডস (১১ ফেব্রু)
৩৩. বেলজিয়াম (১১ ফেব্রু)
৩৪. আয়ারল্যান্ড (১১ ফেব্রু)
৩৫. ইতালি (১২ ফেব্রু)
৩৬. ফ্রান্স (১৪ ফেব্র)
৩৭. সিঙ্গাপুর (১৬ ফেব্রু)
৩৮. মরিশাস (২০ ফেব্রু)
৩৯. ফিলিপাইনস (২৪ ফেব্রু)
৪০. ইন্দোনেশিয়া (২৫ ফেব্রু)
৪১. মালয়েশিয়া (২৫ ফেব্রু)
৪২. মালাউই (২৯ ফেব্রু)

মার্চ মাস

৪৩. গাম্বিয়া (২ মার্চ)
৪৪. শ্রীলঙ্কা (৪ মার্চ)
৪৫. সোয়াজিল্যান্ড (১০ মার্চ)
৪৬. গ্রীস (১১মার্চ)
৪৭. সুইজারল্যান্ড (১৩মার্চ)
৪৮. লোসাথো (২১মার্চ)
৪৯. বোৎসোয়ানা (২৩ মার্চ)
৫০. জ্যামাইকা (২৫মার্চ)
৫১. তাইওয়ান (২৮ মার্চ)

এপ্রিল মাস

৫২. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (৪ এপ্রিল)
৫৩. গ্যাবন (৬ এপ্রিল)
৫৪. মালাগাসি (১৪ এপ্রিল)
৫৫. সিয়েরালিয়ন (২১ এপ্রিল)
৫৬. লাওস (২৫ এপ্রিল)
৫৭. লাইবেরিয়া (২৬ এপ্রিল)

মে মাস

৫৮. কোস্টারিকা (২ মে)
৫৯. ভেনিজুয়েলা (২ মে)
৬০. কলম্বিয়া (২ মে))
৬১. মেক্সিকো (১১ মে)
৬২. স্পেন (১২ মে)
৬৩. দঃ কোরিয়া (১২ মে)

৬৪. ব্রাজিল (১৫ মে)
৬৫. আর্জেন্টিনা (২৫ মে)
৬৬. হাইতি (২৬ মে)

জুন মাস

৬৭. চিলি (১ জুন)
৬৮. ইকুয়েডর (৬ জুন)
৬৯. জাম্বিয়া (২১ জুন)
৭০. রুমানিয়া (২৮ জুন)

জুলাই মাস

৭১. তাঞ্জানিয়া (১২ জুল)
৭২. মাল্টা (১৯ জুল)
৭৩. ডোমিনিকান (১৯ জুল)
৭৪. গুয়েটামালা (২২ জুল)
৭৫. ইয়েমেন (৩১ জুল)

আগস্ট মাস

৭৬. পেরু (১ আগস্ট)
৭৭. বলিভিয়া (২ আগস্ট)
৭৮. পানামা (২৪ আগস্ট)
৭৯. উরুগুয়ে (২৪ আগস্ট)

সেপ্টেম্বর মাস

৮০. প্যারাগুয়ে (২১ সেপ্টে)
৮১. ভ্যাটিকান (২৫ সেপ্টে)

অক্টোবর মাস

৮২. হন্ডুরাস (১৯ অক্টো)

নভেম্বর মাস

৮৩. উঃ ভিয়েতনাম (২৫ নভে)
৮৪. ইথিওপিয়া (২৫ নভে)

ডিসেম্বর মাস

৮৫. ঘানা (৮ ডিসে)

১৯৭৩ সাল

ফেব্রুয়ারি মাস

৮৬. আফগানিস্তান (১৮ ফেব্রু)

মার্চ মাস

৮৭. লেবানন (২৮ মার্চ)

জুলাই মাস

৮৮. মরক্কো (১৩ জুল)
৮৯. আলজেরিয়া (১৬ জুল)
৯০. তিউনিসিয়া (১৬ জুল)
৯১. মৌরিতানিয়া (১৬ জুল)
৯২. দঃ ভিয়েতনাম (৩১ জুল)

আগস্ট মাস

৯৩. আইভরি কোস্ট (২৩ আগস্ট)

সেপ্টেম্বর মাস

৯৪. জায়ারে (৮ সেপ্টে)
৯৫. মিশর (১৫ সেপ্টে)
৯৬. সিরিয়া (১৫ সেপ্টে)
৯৭. নাইজার (২৪ সেপ্টে)
৯৮. গিনি বিসাও (৩০ সেপ্টে)

অক্টোবর মাস

৯৯. ক্যামেরুন (৬ অক্টো)
১০০. গিনি (১০ অক্টো)
১০১. জর্ডান (১৬ অক্টো)
১০২. ডাহোমি (২২ অক্টো)

নভেম্বর মাস

১০৩. কুয়েত (৪ নভে)

১৯৭৪ সাল

ফেব্রুয়ারি মাস

১০৪. পকিস্তান (২২ফেব্রু)
১০৫.ইরান (২২ ফেব্রু)
১০৬. তুরস্ক (২২ ফেব্রু)
১০৭. নাইজেরিয়া (২৭ ফেব্রু)

মার্চ মাস

১০৮. কাতার (৪ মার্চ)
১০৯ ইউ.এ.ই. (১০ মার্চ)
১১০. কঙ্গো (২১ মার্চ)

১৯৭৫ সাল

আগস্ট মাস

১১১. সৌদি আরব (১৬ আগস্ট)
১১২. সুদান (১৬ আগস্ট)
১১৩. চীন (৩১ আগস্ট)

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন

১৯৭২ সাল

১. কমনওয়েলথ (১৮ এপ্রিল)
২. বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (১৯ মে)
৩. আঙ্কটাড (২০ মে)
৪. আইডিএ (১৩ জুন)
৫. আইবিআরডি (১৩জুন)
৬. আইএমফে (১৩ জুন)
৭. আইএলও (২২জুন)
৮. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (২ জুলাই)
৯. আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ব্যাংক (২ জুলাই)
১০. আইআইএ (২১ জুলাই)
১১. আইপিইউ (২০ সেপ্টেম্বর)
১২. জাতিসংঘের স্থায়ি পর্যবেক্ষক (১৭ অক্টোবর)
১৩. ইউনেস্কো (১৯ অক্টোবর)
১৪. কলম্বো পরিকল্পনা (৬ নভেম্বর)
১৫. এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (১৪ নভেম্বর)
১৬. গ্যাট (২০ নভেমর)
১৭. ইউনিডো (১১ ডিসেম্বর)

১৯৭৩ সাল

১৮. আইসিএও (২৪ জানুয়ারি)
১৯. ইউপিইউ (৭ ফেব্রুয়ারি)
২০. ইসিএএফই (১৭ এপ্রিল)
২১. বিশ্ব আবহওয়া সংস্থা (১ জুলাই)
২২. আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (৮ সেপ্টেম্বর)
২৩. রেডক্রস লীগ (১ নভেম্বর)

১৯৭৪ সাল

২৪. ইসলামী সমেলন সংস্থা (২৩ ফেব্রুয়ারি)
২৫. ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (১৩ আগস্ট)
২৬. জাতিসংঘ (১৭ সেপ্টেম্বর. ১৩৬তম সদস্য)
২৭. বিশ্ব খাদ্য পরিষদ (১৭ ডিসেম্বর)

উল্লেখিত তালিকা থেকেই লক্ষণীয় যে, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মহলে স্বীকৃতিযোগ্য হয়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের আপত্তি বা বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির জন্য কোনো রাষ্ট্রের বা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য-পদ লাভে কোনো কার্যকর আপত্তি-অসুবিধা দেখা দিয়েছিল বলে মনে হয় না। পাক-মার্কিন-চীন অক্ষশক্তি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বাধা দিয়েছে। এদের সাথে সৌদি আরব এবং লিবিয়াও যুক্ত ছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ১৯৭২ইং এপ্রিল মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। পাকিস্তান ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ইং লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর যোগদান নিশ্চিত করতেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিল। তথাপি কোনো কোনো সূত্রে উল্লেখ করা হয়, মুজিব-হত্যার অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন উল্লেখ করেছেন, "মুজিব হত্যার ১২ ঘন্টার মধ্যেই পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের নতুন সরকারকে ... বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ৫০হাজার টন চাল, ১০মিলিয়ন গজ সূতা এবং ৫ মিলিয়ন গজ ... নরম মসলিন উপহার দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। ... পাকিস্তান সরকার ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ'কে স্বীকৃতির উদাত্ত আহ্বান জানায়। পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র ... এক বিবৃতিতে বলেন, 'যেহেতু মোশতাককে ক্ষমতা গ্রহণে কেউ বাধা দেয়নি এবং জনগণ কর্তৃক তিনি সাদরে গৃহীত হয়েছেন, তাই মোশতাক সরকার আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী স্বীকৃতির সকল শর্ত পূরণ করছে। ... পরের দিন মন্ত্রীসভায় ... ভুট্টো ... বলেন, 'প্রথমত, বাংলাদেশের ব্যাপারে অন্যান্য দেশের চেয়ে পাকিস্তানের বাড়তি নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। কারণ, আমরা এক সময় একসঙ্গে একই

রাষ্ট্র এবং একই মানসিকতাসম্পন্ন ছিলাম। দ্বিতীয়ত, নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়া না হলে দেশটি গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে ... তাই পাকিস্তান দ্রুত স্বীকৃতি ও সাহায্য দিয়ে তার নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছে'। পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের ব্যাপারে অতি উৎসাহী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে একই দিন তার বিদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোকে বাংলাদেশ সরকারকে দ্রুত স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে ভূমিকা রাখার জন্য একটি নির্দেশ জারি করে" (১(২)/৭১৫-৭১৬)। তবে এবিষয়ে পূর্বেল্লেখিত 'স্বীকৃতি প্রদানকারী দেশ ও সংগঠনগুলির তালিকা'র দিকে নজর রেখে একটি প্রশ্ন করা যেতেই পারে, মুজিব-হত্যার পরবর্তী পরিস্থিতিতে 'মোশতাক সরকার'এর প্রতি অতি দ্রুত সমর্থন জ্ঞাপন এবং 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ'এর প্রতি দ্রুত সমর্থন-সহযোগিতা প্রদানের পাকিস্তানি আহ্বানে মোশতাক-চক্র এবং পাকিস্তানের সংযোগের বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া ছাড়া বাংলাদেশের আদৌ কোনো লাভ হয়েছিল কি? তারচেয়েও বড় প্রশ্ন, বাংলাদেশের অমন 'অবৈধ' নব-নামকরণ (ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ) করে পাকিস্তান কেন কুটনৈতিক শিষ্টাচর লঙ্ঘণ করেছিল?

গভীর ক্ষোভ-দুঃখ-লজ্জার সাথেই উল্লেখ করা দরকার, শামসুল হুদা চৌধুরীর 'একাত্তরের বিজয়' নামক বইটি থেকে উদ্ধৃত করে লন্ডন-প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিক জানাচ্ছেন, "বঙ্গবন্ধুকে হত্যার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর ডালিম (শরিফুল হক) হত্যাকারীদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করে : 'শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। ... বাংলাদেশ এখন থেকে একটি ইসলামিক রিপাবলিক" ((১(১) ৪০৪)। সুতরাং বলাই বাহুল্য বাংলাদেশের 'অবৈধ নবনামকরণের ধৃষ্টতা' পাকিস্তান যুক্তিসঙ্গত (তাঁদের) এবং প্রত্যাশিত মতেই দেখিয়েছিল এক বাঙালি খুণীর কথার সূত্রেই। ইতিহাসে বাংলাদেশ-বিরোধী ষড়যন্ত্র-অপরাধ-অপকর্মের অসংখ্য বিদেশী কুটনীতিক তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু একান্তই অনস্বীকার্য যে, সর্বক্ষেত্রেই জড়িত তথাকথিত, 'বাঙালি' পরিচয়ধারী কতিপয় কাপুরুষ-কুসন্তান। এটা মনে না রাখলে, মুজিব-হত্যার কথা বলি কিংবা বাংলাদেশের ইতিহাসের, বিচারে ভুল হবেই। ১৭৫৭ইং পলাশীর রক্তাক্ত করুণ ইতিহাসের জন্য ইংরেজ রবার্ট ক্লাইভ প্রমুখের আগ্রাসী মানসিকতাই শুধু দায়ি ছিল না, ততোধিক অপরাধী ছিল মীরজাফর প্রমুখ স্বদেশী-স্বজনদের লোভাতুর ষড়যন্ত্র।

ফেরা যাক মূল প্রসঙ্গে। সৌদি আরব (এবং সুদান) আর চীনের স্বীকৃতি এসেছে বঙ্গবন্ধু-হত্যার অব্যবহিত পরেই, যথাক্রমে ১৬ এবং ৩১আগস্ট ১৯৭৫ইং। সাধারণভাবে একথা অনেকেই বলেন যে, "পাকিস্তানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৬ আগস্ট সৌদি আরব এবং ৩১ আগস্ট বাংলাদেশকে চীনের স্বীকৃতি প্রদান, পাকিস্তানের ওপর মোশতাক সরকারের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করে। ... মোশতাক ১৮ আগস্ট বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে 'নতুন অধ্যায়' সৃষ্টির আহ্বান জানান। ... পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে বাংলাদেশে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না গেলেও 'দৈনিক ইত্তেফাক' ২৮ আগস্ট উপমহদেশের নতুন বাস্তবতার আলোকে দুটি দেশের মধ্যে দ্রুত সম্পর্ক স্থাপনের তাগিদ দেয়" (১(২)/৭২০)। বাংলাদেশকে সৌদি আরব

ও চীনের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে প্রাক্তন আমলা শাহরিয়ার ইকবালের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় পাকিস্তানসহ ১১০টি দেশ (পূর্বোল্লেখিত তালিকা দ্রষ্টব্য) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, এসব দেশের মধ্যে সৌদি আরব ছাড়া ইসলামী বিশ্ব ও তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল দেশই ছিল। "তাঁর মৃত্যুর পর গণচীণ ও সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। প্রচলিত ধারণা যে, খন্দকার মোশতাক ক্ষমতা দখলের পরই এই দুইটি দেশ স্বীকৃতি দেয়। আন্তর্জাতিক কুটনৈতিক নিয়মে কোন দেশের স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্তটি স্বীকৃতিদানকারী দেশের সরকার কতগুলো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়ে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নতুন দেশের সরকারকে জানিয়ে দেয়া হয়। এই জানানোটি 'Defacto Recognition' নামে পরিচিত। আনুষ্ঠানিক পত্র অর্থাৎ 'Dejure Recognition' কিছুদিন পর পাঠানো হয়। সৌদি আরব ও গণচীনের স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্তও অনুরূপভাবে হয়েছিল" (১(২)/২২০-২২১)।

শাহরিয়ার ইকবাল উল্লেখ করেছেন, "একদিন সন্ধ্যায় ভারতে অবস্থানকারী একটি আরব দেশের রাষ্ট্রদূত ... সৌদি আরবের তখনকার বাদশাহ ফয়সালের পাঠানো কয়েকটি উপহার বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছিলেন। ... একটি অতি মূল্যবান জায়নামাজ, একটি সোনার হাতঘড়ি এবং এক বাক্স খেজুর। বঙ্গবন্ধু আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, খেজুরের বাক্সটি যেন গণভবনের কতকর্তা ও কর্মচারীদের খাওয়ার জন্য দেওয়া হয়। সোনার ঘড়িটি সরকারী তোসাখানায় সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়া হয়। জায়নামাজটি বঙ্গবন্ধুর পিতার জন্য তাঁর ... বাসভবনে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। ... এই ঘটনা প্রমান করে যে, সৌদি সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরই ... বাদশাহ উপহার পাঠিয়েছিলেন। ... স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরবের সেই প্রথম যোগাযোগ। সরকারী চিঠিটি ('Dejure Recognition') ২৯-৮-১৯৭৫তারিখে বাংলাদেশ পররাষ্ট মন্ত্রণালয়কে পাঠানো হয়েছিল। গণচীনের ঘটনাটিও অনুরূপ। ... হুমায়ুন কবীর তখন পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের 'External Publicity' বিভগের পরিচালক ছিলেন। একদিন তাঁকে গণভবনে রাষ্ট্রপতির দপ্তরে ডকে পাঠানো হয়। ... বলা হলো যে, অতি জরুরী এবং গোপনীয় কাজে তাঁকে হংকং যেতে হবে। সেখানে তার সাথে দেখা হবে বার্মায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কে. এম. কায়সারের। রাষ্ট্রদূত কায়সার রেঙ্গুন থেকে হংকং হয়ে পিকিং যাবেন। সেখান থেকে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এনলাই-এর বঙ্গবন্ধুকে লেখা একটি চিঠি নিয়ে হংকংয়ে ফিরবেন। হুমায়ুন কবীর সেই চিঠি ... নিয়ে ঢাকায় ফিরবেন। ... হুমায়ুন কবীর নিষ্ঠার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর দেয়া দায়িত্ব পালন করেছিলেন। চৌ-এনলাই সেই চিঠিতে বঙ্গবন্ধুকে জানিয়েছিলেন, গণচীন সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। আনুষ্ঠানিক ('Dejure Recognition') ... পত্রটি ৩১-৮-১৯৭৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া হয়। খন্দকার মোশতাকের পাকিস্তানপন্থী পররাষ্ট্র সচিব সমপূর্ণ ঘটনাটি নিখুঁতভাবে পাল্টে দিয়েছিলেন" (১(২)/২২১-২২২)। অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনাক্রম গোপন করেছেন।

অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতা লাভের আনন্দ-গৌরব সত্বেও সম্পদ-স্বজন-সম্ভ্রম হারাণোর বেদনাই মানুষকে

ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল। প্রকাশ্য এবং গোপন জাতীয়-আন্তর্জাতিক চক্রান্ত জনমনে, এবং বিশেষত বঙ্গবন্ধুর মনেও নিদারুন ক্ষোভ-দুঃখ-হতাশার সৃষ্টি করেছিল। এসব ষড়যন্ত্রেই বাংলাদেশে ঘটেছিল দুর্ভিক্ষ-গণমৃত্যু এবং গণহত্যাও। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব আর সরল-সহজ যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যের কারণেই এ দুঃসময়ে বাংলাদেশের বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি-সম্মান অর্জন ঠেকাতে পারেনি ষড়যন্ত্রকারীরা। কবির উপমায় পরিস্থিতিটা যেন যথার্থই ছিল, "দুঃখের তিমিরে ... জ্বলে তব মঙ্গল আলোক"।

১৯৭৫ইং বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ড ঃ
ষড়যন্ত্রকারী এবং উপকারভোগীদের কথা

বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকান্ড প্রসঙ্গে আলোচনার শুরুতেই কিছু কথা বলা দরকার। সদ্য-স্বাধীন প্রায় বিধ্বস্ত বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের 'অপ-শাসন, স্বজনপ্রীতি, অযোগ্যতা-অক্ষমতা'র কথাগুলি বিভিন্ন মহলেই বহুল আলোচিত। তবে এখনো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, দায়িত্বশীলতা, কর্মোদ্যোগ ও সাফল্যের কিছু তথ্য-পরিসংখ্যান একান্তই অবিস্মরণীয় বলে বিবেচনা করা চলে। এখানে সবিনয়ে বলছি, প্রাজ্ঞ-প্রবীণদের জন্য নয়, বঙ্গবন্ধু মুজিবের প্রতি কৃতিত্ব-শ্রদ্ধা আরোপের অপ্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যেও নয়, তরুণ প্রজন্মের যারা সেই সময় এবং সংকটের প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুকে জানতে আগ্রহী, নিম্নোদ্ধৃত দীর্ঘ প্যারাটি একান্তই তাঁদের প্রতি নিবেদিত।

"ভারত হতে প্রত্যাবর্তনকারী ১ কোটি লোকের পূণর্বাসন, ও দেশের অভ্যন্তরে ৩ কোটি ছিন্নমূল মানুষের জন্য খাদ্য সংস্থান, ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠানো ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমান অস্ত্র ফিরিয়ে নেওয়া, মুক্তিযুদ্ধে নিহত ৩০লাখ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও ২লাখ নির্যাতিতা মা-বোনের দায়িত্ব গ্রহণ, চিকিৎসার জন্য পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেশ প্রেরণ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও নারী পূনর্বাসন বোর্ড গঠন, শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা দান, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ প্রণয়ন, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন, ১১হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, ৫৪হাজার শিক্ষক নিয়োগসহ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পূনর্নিমান, প্রতি থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মান এবং অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের স্থায়ী চাকরির মর্যাদা দান, জাতীয় সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও নেবৌহিনীসহ প্রতিরক্ষা বাহিনীকে জাতীয় মর্যাদায় পূনর্গঠন এবং কুমিল্লায় দেশের প্রথম সামরিক একাডেমী স্থাপন, পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও বেসামরিক প্রশাসনের অবকাঠামো গড়ে তোলা, পাকিস্তানে আটক প্রায় ৪ লক্ষ বাঙালিদের দেশে ফিরিয়ে এনে পূনর্বাসিত করা, ৭লক্ষ পাকিস্তানিদের ফেরত পাঠানো, বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলায় প্রথম ভাষণ দান, জাতি সংঘের সদস্যপদ ও (আন্তর্জাতিক সংগঠনসহ প্রায়) ১৪০টি দেশের স্বীকৃতি লাভ। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সীমান্ত চুক্তি ও ফারাক্কার পানি বণ্টন চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য ৪৪ হাজার কিউসেক পানির ব্যবস্থা। ... অর্থনীতি পূনর্বাসন

ও পূনর্গঠনের কার্যক্রম যখন সুচারুভাবে সম্পন্ন প্রায়, কারখানায় ও ক্ষেতখামারে উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুদ্রানীতির সংস্কারের ফলে দ্রব্যমূল্য যখন দ্রুত জনগণের ক্রয়-ক্ষমতায় চলে এসেছে ... ঠিক তখনি দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। দেশ নিক্ষিপ্ত হয় সামরিক অভ্যুত্থান ও স্বৈরশাসনের বেড়াজালে।" বিশ্ব ব্যাংকের ১৯৮৭ সালের প্রণীত রিপোর্টে (উল্লেখ করা হয়) ১৯৭২-১৯৭৫ সালে অর্থাৎ বাংলদেশের সবচেয়ে সমস্যা সংকুল ক্রান্তিকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৭ ভাগ। ... তা বঙ্গবন্ধুর আমলে গৃহীত পদক্ষেপেরই ফলশ্রুতি মাত্র। ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকে প্রতি সের চালের দাম ৪.৫০ টাকায় এবং মে মাসে ৩.৭৫টাকায় দাঁড়ায়" (৫/১১৩-১১৫)।

'পনেরো আগস্ট ট্রাজেডি ও জনক হত্যার কারণ' শিরোনামের বইতে শেখ গিয়াস উদ্দীন আহমেদ মিন্টু লিখেছেন : "বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পাওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা, যুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা ক্ষমমাপ্রাপ্ত হওয়া সত্বেও, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যাতে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াতে না পরে, বাংলাদেশের পূনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর সফলতা যাতে না আসে এবং আন্তর্জাতিকভাবে তাঁর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত যাতে না হতে পারে, সেজন্য তারা জাল বুনতে থাকে। আসলে স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি ... তাদের প্রত্যাশা ছিলো, 'পাক সার সাদ বাদ'এর জাহেলিয়া যুগে ফিরে যাবার। পুনরায় বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে চেয়েছিলো তারা। এর সাথে জাসদ গণবাহিনী, সর্বহারা পার্টি, চীনপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি সশস্ত্র দল গঠন করে ৭৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত আওয়ামী লীগের ৪হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করে। অপরদিকে রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হয় গণবাহিনী ও বেআইনী সশস্ত্র দলের অনেক সদস্য। সেদিনের ট্রটস্কিপন্থী জাসদ গণবাহিনীর ভূমিকা প্রকারান্তরে পাকিস্তান প্রেমিকদের জন্য পোয়াবারো হয়েছিলো" (৩০/১৪৬)

একান্তই অনস্বীকার্য যে, অসাফল্য-অপশাসনের জন্য নয় বরং অনস্বীকার্য 'কমিটমেন্ট' এবং সাহস-সফলতার জন্যই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরও 'নির্ভার-নির্ভয়' হতে পারেনি খুণীরা কিংবা দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা। তাদের ভয় ছিল, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে যাঁরা চরম সংকটের মাঝেও মুক্তিযুদ্ধ সফল করতে পেরেছিলেন, তাঁরা অবশ্যই বঙ্গবন্ধু-হত্যার পরেও বাংলাদেশটাকে 'বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা' বানিয়ে তুলবেন, সুতরাং একই গ্রুপের ঘাতকের হাতেই প্রাণ দিতে হয়েছিল কারাবন্দী সেই চারজন জাতীয় নেতাকেও। বাঙালির স্বপ্নের বাংলাদেশ কেন বাস্তবে প্রত্যাশার বাংলাদেশ হয়ে উঠতে পারেনি, সেকথা উপলব্ধি করতে হলে, আজ কিংবা অগামীকালও ভাবতে হবে এসব হত্যাকান্ড এবং হত্যাকারীদের পারস্পরিক এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ-পরিচয়ের কথাও। সুযোগসন্ধানী জ্ঞানপাপী হত্যাকারী এবং তাদের পেছনের ষড়যন্ত্রকারীদেরও ভাবতেই হবে, শারীরিক হত্যকান্ড ঘটিয়ে মুজিবকে অপসারণ করা গেছে, যেমন সবাইকে যায়, কিন্তু বাংলার মানুষের মন থেকে মুজিবকে

অপসারণ করা যায়নি, সেটা আদৌ সম্ভব নয়। জীবিত মুজিব অপেক্ষা মৃত মুজিব ক্রমশ বিশালতর, প্রবলতর হয়ে উঠছেন। তারই প্রথম পর্বে ২০০৪ইং মুজিব-হত্যার প্রায় ৩০ বছর পরে, বিবিসি-জরিপে শ্রেষ্ঠতম বাঙালির আসনটি বাঙালিরাই নির্ধারণ করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য। মহাত্মা গান্ধীর নাম কি ঘাতকের গুলিতে মুছে গেছে ভারতের চলমান ইতিহাস থেকে, কঙ্গো থেকে লুলুম্বা কিংবা চিলি থেকে আলেন্দে?

মুজিব-হত্যার পরবর্তী সময়ে একেবারেই প্রত্যক্ষ ভিত্তিমূলক কিছু প্রশ্ন জেগেছিল মুজিব-অনুরাগী আব্দুল গাফফার চৌধুরীর মনে। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় সেই প্রশ্নগুলি উদ্ধৃত করছি : "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কি জানতেন, তাঁকে হত্যা করার একটা বিরাট চক্রান্ত চলছে? তিনি কি জানতেন এই চক্রান্তে বিদেশীরা যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁর নিজের দলের লোক? ... এই চক্রান্তের উদ্দেশ্য কি? শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা। না, বাংলাদেশেরও সর্বনাশ করা?" (২৮/৯)।

এস. এ. করিমের ভাবনা : "What was not apparently visible to Mujib and therefore virtually ignored by him was the likelihood of a deadlier threat from a better-armed and better-organised body of men – the Army ... With no threat to Bangladesh ... from across the border, the armed forces seemed to have one primary function: ceremonial work like parade on the National Day, mounting guard of honour ... thought that Mujib did not care much about their welfare ... Their perception that Mujib neglected them ... when Rakkhi Bahini was created in February 1972 to fight the leftist insurgency and help in the restoration of law and order ... When Mujib sent his second son Jamal, to recieve military training an Sandhurst in England,it was whispered that upon his return to Bangladesh, he would join their ranks for the sole purpose of keping a watch over them ... Not surprisngly the cantonment voted overwhelmingly for opposition candidates during the 1973 elections" (৭/৩৬৬)।

"এ কথা বললে অদ্ভুত শোনাবে যে, সেনা-সদস্যরা প্রায় সবাই মুক্তিযোদ্ধা হওয়ায়, তাও একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছিলো। মুক্তিযুদ্ধে তাঁরা অংশ নিয়েছিলেন বিদ্রোহ করে। অর্থাৎ ... শৃঙ্খলা ও চেইন অব কমান্ড, ... ভঙ্গ করে ... । এটা দেশের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা এবং প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছিলো। আবার, বিদ্রোহ করার এবং চেইন অব কমান্ড ভাঙ্গার মানসিকতাও জন্ম দিয়েছিলো। ... যখনই তাঁরা ছোটো অথবা বড়ো কোনো অপরাধীকে ধরেছেন, তখন তাঁরা ওপর মহলের হুকুমে ছাড়া পেয়েছে। ... তার ওপর,আবু তাহের, জিয়াউদ্দিন এবং জলিলের মতো রাজনীতি-সচেতন বহু সেনাসদস্যও ছিলেন - যাঁরা ভিন্ন ধরণের সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য ভেবেছিলেন। মুজিব-হত্যার সবচেয়ে বড়ো নেতা ফারুকও এমনি এক ক্ষুব্ধ মেজর। মুন্সিগঞ্জে গিয়ে দারুনভবে তাঁর চোখে পড়ে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি। তখনই নাকি ফরুকের মনে হয় যে,

জাতির পিতাকে হত্যা করবেন (২০/২১১-২১২) , পর্যবেক্ষনমূলক মন্তব্যটি গোলাম মুরশিদের।

হালিম দাদ খান লিখেছেন, মুজিব বলতেন, "আমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মত একটা দানব সৃষ্টি করতে চাই না' ... বেগম মুজিবও সেনাবাহিনীর লোকদের ভীষণ ভয় করতেন। প্রহরারত সৈন্যদের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি স্বামীকে বলতেন, 'এ সমস্ত লোকেরা একদিন তোমার বিরুদ্ধে তাদের বন্দুক প্রয়োগ করবে'। ... স্বাধীনতা যুদ্ধকালেই সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ও রাজনৈতিক উচ্চভিলাষ দেখা দেয়। ... সংসদ সদস্য ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করায় সামরিক অফিসাররা অ-খুশি ছিল এবং তারা ওসমানীকে এড়িয়ে চলত। মুজিববাহিনী সৃষ্টি তাদের অবিশ্বাসকে আরও বৃদ্ধি করে। শফিউল্লাহ, জিয়া ও খালেদ মোশাররফ - এই তিনজনের মধ্যে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল" (২৪/১১১)। সুশৃঙ্খল নিয়ম এবং চেইন অব কমান্ড মেনে সেনাবাহিনী গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশে। বরং মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কিছু অসন্তোষ-অস্থিরতার ধারাটাই বহমান থেকেছে, প্রবলতর হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। আবার সত্যের খাতিরেই মেনে নিতে হবে যে, একটা প্রবল রাজনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে (অথবা যদি বলেন, ঐতিহ্য নিয়ে) গড়ে উঠেছিল যে সেনাবাহিনী, তাতে নানা-রং-রাজনীতি ঢুকে গিয়েছিল জন্ম-মুহূর্তেই।

প্রসঙ্গত প্রশ্ন জাগতেই পারে, স্বদলীয় অনেক নেতাকর্মীর স্বজনপ্রীতি এবং অনাচার-দুর্নীতির প্রতি কি মুজিবের সমর্থন ছিল কিংবা তিনি কি চোখ বন্ধ করে রাখতেন? শেখ সাদী জানাচ্ছেন, "বঙ্গবন্ধু দেখলেন দুর্নীতির নৈরাজ্যে সারা দেশে প্রাণদৈন্য। যত দিন না এই সমস্যা দূর হয়, তত দিন উন্নতির চেষ্টা ভিত্তিহীন। ১৯৭৫ সালের ২১জুলাই বললেন, 'জনগণের সেবার জন্যই আমরা নির্বাচিত হয়েছি ... আজ আমার কাছে আপনারা তওবা করে যান যে স্বজনপ্রীতি করবেন না। ঘুষখোরদের সাহায্য করবেন না। মাত্র কয়েকটা লোকের জন্য বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না। আমি এর প্রতিকার দেখতে চাই। ... আমার কর্মী যাঁরা আছেন, যাঁরা আমার কথায় বন্দুক ধরে যুদ্ধ করেছিলেন, ... যাঁরা আমার কথায় সবকিছু ত্যাগ করতে পারতেন, তাঁরা আমার একটা কথা রাখুন। ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করুন'। আলো ও আঁধারের দুই পথ সামনে ... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' ... জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিশ্বাস করেছেন বঙ্গবন্ধু" (২২/১২৭-১২৯)।

১৯৭১ইং ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে (২৬মার্চ) বঙ্গবন্ধুকে ধানমন্ডি ৩২নম্বরের বাসা থেকে গ্রেফতার করে সংবাদটি বিশ্ববাসীকে জানাতে (১০এপ্রিল) প্রায় দু'সপ্তাহ বিলম্ব করেছিল ইয়াহিয়া খানের সেনা-আমলা চক্র। একথা আগেই বলা হয়েছে। অপরদিকে ১৯৭৫ইং বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু মুজিবের হত্যার খবরটি প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই প্রচার করেছিল পাকিস্তানি পত্র-পত্রিকা 'বিশেষ সংখ্যা' প্রকাশ করে। ইতিহাসের অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন লিখেছেন, "মুজিব হত্যার তিন ঘন্টার মধ্যেই মুজিবের মৃত্যু ও বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর করাচি ও লাহোরের পত্র-পত্রিকাগুলো বিশেষ বুলেটিন বের করে এবং রেডিও পাকিস্তান সকাল আটটার খবরে

তা প্রচার করে" (১(২)/৭১৫)। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, "১৬ই আগস্ট উর্দু পত্রিকা 'নওয়া-ই-ওয়াক্ত' দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে মোশতাককে পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিত হয়ে দেশের নাম 'পূর্ব পাকিস্তান' বা 'পূর্ব পাকিস্তান ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' রাখার প্রস্তাব দেয়। 'পাকিস্তান টাইমস' এই পরিবর্তনের ফলে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে 'মুসলিম বাংলা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে মন্তব্য করে। উর্দু দৈনিক 'জং' এক সম্পাদকীয়তে (১৮ আগস্ট) মন্তব্য করে, 'বাংলদেশের মানুষ পাকিস্তান ও পাকিস্তানি আদর্শের প্রতি বিদ্বেষী নয়"। পত্রিকাটিতে মোশতাক সরকারকে মুজিব আমলের পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভুলগুলো শুধরে নিয়ে অনতিবিলম্বে ... সম্পর্ক স্থাপনেরও পরামর্শ দেওয়া হয়। রেডিও পাকিস্তান এসময় প্রতিদিন বাংলাদেশ সংক্রান্ত খবরা-খবর গুরুত্ব সহকারে প্রচার এবং সরকারের নীতির ভূয়সী প্রশংসা করে। ১৭ আগস্ট রেডিও পাকিস্তানে প্রচারিত এক খবরে বাংলাদেশের নতুন সরকারের 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ' নামকরণের প্রশংসা ... করে" (১(২)/৭১৬-৭১৭)।

ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন প্রসঙ্গতই উল্লেখ করেছেন, "২০শে আগস্ট বাংলাদেশ সরকার দেশটির 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র' নামকরণের সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে ঘোষণা করে যে, সরকারের মূলনীতির কোন পরিবর্তন হবে না। সরকারের ৪ মূলনীতিও অপরির্তিত থাকবে বলে প্রেসিডেন্টের এক অধ্যাদেশে ঐদিনই ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণা ইসলামাবাদের পররষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ক্ষোভের সঞ্চার করে। ... বলা হয়, বাংলাদেশের এ সংবাদে পাকিস্তান অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছে ... ২০আগস্ট লন্ডনে জামাতে ইসলামি প্রভাবিত 'মিল্লাত' পত্রিকা ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পেছনে ভুট্টোর হাত রয়েছে বলে মন্তব্য করা হলে পাকিস্তান চিন্তিত হয়ে পড়ে। ... অবশ্য ... মুজিব বিরোধীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের সাক্ষ্যও এ ধারণাকে ঘণীভূত করে তোলে" (১(২)/৭১৭)। অপরদিকে ড. দেলোয়ার একথাও উল্লেখ করেছেন যে, "অবশ্য পাকিস্তানের 'আল ফাতাহ'র সম্পাদক ওয়াহাব সিদ্দিকী ২২ আগস্ট মুজিব-হত্যায় দুঃখ প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, মুজিব দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করার যথেষ্ট চেষ্টা চালান। কিন্তু দেশের অবস্থার যখন উন্নতি হচ্ছিল, ঠিক তখনই তিনি নিহত হন।" (১(২)/৭১৮)।

"মুজিব হত্যাকান্ডে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ প্রকাশ করে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা স্বাধীনতা-বিরোধীরা। তাদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত লন্ডনে মুজিব হত্যাকান্ডের পরের দিনই তারা বাংলাদেশে হাই কমিশনার সৈয়দ আব্দুস সুলতানসহ স্বাধীনতাপন্থীদের দূতাবাস থেকে বের করে দেয়। বিক্ষোভকারীরা মুজিবের ছবি টেনে নামায় এবং তা ভেঙ্গে রাস্তায় ফেলে দেয়। গোলাম আযম জেদ্দা থেকে নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দানের জন্য মোশতাক ও ভুট্টোকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি পত্র পাঠান। ... পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বাঙালি নেতা আহম্মদ আলী, খাজা খয়ের উদ্দিন, হামিদুল হক চৌধুরী, কামরুজ্জামান (বর্তমানে বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধী) , ও নসরুল্লাহ নামে একজন প্রাক্তন এমএনএ, সোহরাওয়ার্দীর কন্যা ও ভুট্টোর প্রাক্তন উপদেষ্টা আখতারি সোলায়মান ও ঢাকার নওয়াব খাজা হাসান আসকারি পাকিস্তান সরকারের

বাংলাদেশের নীতিকে সমর্থন এবং মোশতাক সরকারের সাফল্য কামনা করেন। ... মূলত তাদের আগ্রহেই কনফেডারেশনের ইস্যুটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ৯ সেপ্টেম্বর রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'পাকিস্তান বাংলাদেশ সংহতি পরিষদ' নাম একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে" (১(২)/৭১৯)।

এবার মনোযোগ দেয়া যেতে পারে, বঙ্গবন্ধু (এবং মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ) হত্যার জাতীয়-আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটের দিকে। এখানে সামগ্রিকভাবে বিষয়টির উপলব্ধির তথ্য-ভিত্তি হিসেবে কয়েকটি সুদীর্ঘ নিবন্ধের সংক্ষেপিত অংশ উদ্ধৃত করবো। প্রথমটি ইউরোপিয়ান আওয়ামী লীগের সভাপতি অনিল দাস গুপ্তের 'মুজিব হত্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা' (১(২)/১১৩২-১১৩৫)। দাসগুপ্ত লিখেছেন : "১৯৭১ সালে আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার বলেছিলেন, দুনিয়ায় তাদের যে ক'জন দুশমন আছে, বাংলাদেশের শেখ মুজিব এদের অন্যতম। অন্য দু'জন ছিলেন ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রনায়ক থিউ ও চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দে। ... প্রতিশোধপরায়ন কিসিঞ্জার তাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে উৎখাত করার চক্রান্ত করেছিলেন"

মার্কিন সাংবাদিক লরেন্স লিফসুল্টজ এবং নিউইয়র্কের 'দি নেশন' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক যৌথ উদ্যোগে এবিষয়ে দীর্ঘ আড়াই বছর সময়জুড়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও বাংলাদেশের প্রায় দু'শতাধিক লোকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তার ভিত্তিতে প্রণীত লিফসুল্টজের 'বাংলাদেশ : দ্য আনফিনিশড রেভ্যূলেশন' নামক গ্রন্থটি থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায় : "ক. আমেরিকান পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসাররা ... বলেছেন, যে চক্রটি মুজিবকে হত্যা করে, তাদের প্রতিনিধিগণ ১৯৭৪ সালের শরৎকালে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে এসে এ ব্যাপারে সাহায্য চায়। খ. ... ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের সি.আই.এ-এর 'স্টেশন চিফ' ১৯৭৫ সালের ১৫আগস্ট অর্থাৎ মুজিব-হত্যার দিন পর্যন্ত চক্রান্তকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। গ. মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর মি. লিফসুল্টজকে জানিয়েছে যে, মাহবুব আলম চাষী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, এ.বি.এস সফদার ছিলেন তখন মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি.আই.এ-এর মুখ্য এজেন্ট। ঘ. ঢাকার সি.আই.এ-এর স্টেশন চিফ ফিলিপ চেরি বলেছেন, 'আমাদের যোগাযোগটা এতো ভাল ছিল যে, অভ্যুত্থানের খবর পেয়ে আমরা খুব শিগগিরই তা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে পেরেছিলাম'। ম. চেরি স্বীকার করেন যে, তিনি যখন যুক্তরাষ্ট্রে খবর পাঠান, তখনও অভ্যূত্থান চলছিল। ... পররাষ্ট্র দপ্তরের এই কর্মকর্তা আরো বলেন, 'খন্দকার মোশতাক গংদের সঙ্গে এই যোগাযোগ ছিল ১৯৭১ সালে, সেই কলকাতা থেকেই। ... ১৯৭১ সালে মোশতাক-চাষীদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে যোগাযোগ ছিল ১৯৭৫ সালেও তা অক্ষুন্ন ছিল"।

"ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের জনৈক সিনিয়র অফিসার জানান, প্রস্তাবিত অভ্যুত্থান সম্পর্কে স্থানীয় ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে ১৫ আগস্টের (১৯৭৫) চার-পাঁচ মাস আগে থেকেই ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। ... ঢাকার মার্কিন দূতাবাস তিন দিন আগেই ১৫আগস্ট (১৯৭৫) ছুটির দিন বলে ঘোষণা করেছিল। এই ছুটি ছিল তালিকা-বহির্ভূত ছুটি। আর এই দিনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে

হত্যা করা হয়। ঢাকার মার্কিন দূতাবাস ... জানত ঐদিন তাদের আজ্ঞাবহ সেনাবাহিনীর একদল চক্রান্তকারী অফিসার শেখ মুজিবকে হত্যা করবে"।

"আগস্টের প্রথম সপ্তাহে মাহবুব আলম চাষী ছিলেন রাঙাগামাটিতে। দ্বিতীয় সপ্তাহে ... কুমিল্লায়। ... ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব-হত্যার পরে তাকে দেখা যায় স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক-এর পাশে। কাজেই বঙ্গবন্ধু-হত্যায় প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্বদানকারী মেজর ফারুক-রশিদরা যতই দাবি করুক -মুজিব হত্যার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত তাদের নিজেদের, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। ... ফারুক-রশিদরা মূল চক্রান্তকারীদের হাতের হাতিয়ার ছিল। এর বেশি কিছু নয়। ... এই হত্যাকান্ডের কন্ট্রোল-রুম ছিল ঢাকার মার্কিন দূতাবাস, তার প্রমান হল - মুজিব-হত্যার প্রথম ঘোষণা আসে ওয়াশিংটনের 'ভয়েস অব আমেরিকা' থেকে। অভ্যুত্থানের কাজ সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার আগেই দুনিয়াময় 'ভয়েস অব আমেরিকা' অভ্যুত্থানের খবর ছড়াতে থাকে। ... ফিলিপ চেরি নিজেই স্বীকার করেছেন, ... শেখ মুজিব হত্যার খবর তিনিই ওয়াশিংটনে পাঠিয়েছিলেন। ... ১৪-১৫ আগস্টের কালো রাতে ... দূতাবাসের সিনিয়র অফিসাররা ... অফিসে রাত কাটিয়েছেন। ... এই ঘটনাই (সব মিলিয়ে) প্রমান করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সেই কলঙ্কময়ী রাতে ... ভোর পর্যন্ত না ঘুমিয়ে ঢাকা মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যাকান্ড পরিচালনা করেছিলেন। এই হত্যা ষড়যন্ত্রে মার্কিনীদের সাথে পাকিস্তান ও পশ্চিম এশিয়ার দু'একটি মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে তাদের ক্রীতদাসদের দিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক, ... ঘটনাটি ঘটিয়েছে। নিহত হয়েছেন খেটে-খাওয়া দুঃখী মানুষের নেতা বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"।

এবারের উদ্ধৃতি রবিউল আওয়ালের 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঃ ষড়যন্ত্রের শিকার' শীর্ষক নিবন্ধ (১(২)১১২১-১১৩১) থেকে। "শুক্রবারের (১৫আগস্ট, ১৯৭৫) ভোরবেলা। মসজিদে মসজিদে আযানের ধ্বনি। ... ধানমন্ডির ৩২নম্বরে কিছু বিপথগামী সেনা-সদস্যের গোলাগুলির শব্দে একাকার। ... বঙ্গবন্ধু, শেখ মণি আর সেরনিয়াবতের পরিবার আক্রান্ত হলো সেইসব বিপথগামী সেনা-সদস্যদের দ্বারা। ... এর পেছনে দেশী-বিদেশী বিশাল ষড়যন্ত্র কাজ করেছিল। এই ষড়যন্ত্রের পেছনে ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি, জাসদের সরকার-বিরোধী ভূমিকা এবং সিরাজ সিকদারসহ হক-তোয়াহার গ্রুপ। স্বাধীনতার পর থেকেই তারা আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে নির্দ্বিধায় খুন করে। ... সরকারদলীয় কয়েকজন এম পি'কেও তারা হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। ... বাংলাদেশের কোন কোন মহলের ধারণা, মার্কিন গোয়েন্দা চক্র সিআইএ'র সাথে এই দলের (সিরাজ সিকদারের) কোন কোন নেতার ছিল ঘনিষ্ট যোগাযোগ। আর ঐ চক্রের নির্দেশেই ঐ দল সারাদেশে সংকট সৃষ্টির জন্য সশস্ত্র সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়"।

"এর পরে আসে মেজর জলিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি খুলনা জেলার নয় নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে তৎকালীন সরকার তাকে গ্রেফতার করে। কারণ, তার কাছে কিছু কাগজপত্র পাওয়া যায়। সরকারের সন্দেহ,

সেসব কাগজপত্রে যা লেখা ছিল সেগুলো ... সিআইএ-র নির্দেশ। ... শোনা যায় 'যুদ্ধের একরাতে মেজর জলিল এ্যাকশনে গিয়েছিলেন উনিশজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে। কিন্তু তাদের সবাই ধরা পড়েছেন পাক-হানাদারদের হাতে। জলিল সাহেব শুধু একাই ফিরে এসেছেন নিরাপদ আশ্রয়ে'। মুক্তিযোদ্ধাদের একজন গলা চড়িয়ে বললেন, এটা ষড়যন্ত্র। জলিল সাহেব ইচ্ছে করেই ঐ ছেলেদের নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানি ফাঁদে ফেলেছেন। মেজর জলিল তাহলে কাদের লোক ছিলেন? তিনিও কি পাকিস্তানি গুপ্তচরদের সাথে সিআইএ-র কানেকশন? তা না হলে দক্ষিণবঙ্গে জলিল গ্রেফতার হলে জার্সি বদলিয়ে মুসলিম লীগের ক্যাডার বাহিনী তার সাথে যোগ দেয় কি ভাবে? এরপর তিনি যোগ দেন জাসদে। ... জীবনের শেষ দিকে জাসদ ছেড়ে কট্টর মৌলবাদের কোলে আশ্রয় নেন। ... তার মৃত্যুও হলো পাকিস্তানের রাজধানী ইসলাবাদে"।

"বঙ্গবন্ধুর সরকার সবচেয়ে মুশকিলে পড়েন কর্ণেল জিয়াউদ্দীনকে নিয়ে। জিয়াউদ্দীন সুন্দরবন এলাকার বেশ কিছু জায়গা নিয়ে 'মুক্তাঞ্চল' গড়ে তোলেন। এই জিয়াউদ্দীনকে জলিলের লোক মনে হলেও পরে জানা গেছে তিনি ছিলেন সিরাজ সিকদারের লোক। ১৯৭৩সাল ... শফিউল আলম প্রধান (আইয়ুব আমলের প্রাদেশিক পরিষদের স্পিকার দিনাজপুরের গমিরউদ্দিন প্রধানের পুত্র) তখন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। সুবক্তা ও সুসংগঠক শফিউল আলম প্রধান তখন ছাত্রলীগকে দাঁড় করালেন আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন হিসাবে। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তার জিভ থেকে অবিরাম বিষ ঝরতে লাগল। এরই মধ্যে ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে খুন হলো সাতজন ছাত্র। এরা ছিল যুবলীগ সভাপতি শেখ মণির সমর্থক। এই খুনির তালিকায় প্রথম নামটি উঠলো - শফিউল আলম প্রধান। ... প্রধান গ্রেফতার হলো। এই প্রধান কে ছিলো? সেকি কোনো সন্ত্রাবাদী দলের 'প্ল্যান্টেড ম্যান'? ... এই প্রশ্নের জবাবও ঠিকই পাওয়া গেল, তবে কয়েক বছর পরে। ... প্রেসিডেন্ট তখন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ... বিশেষ মার্জনায় প্রধান জেল থেকে ছাড়া পেলো। ছাড়া পেয়ে প্রধান সর্বহারা দলের নেতা সিরাজ সিকদারের মাজার জিয়ারত করতে গেল এতদিনে বোঝা গেল শফিউল আলম প্রধান কে"।

"স্বাধীন বাংলাদেশে বিচিত্র খলনায়ক এই মোশতাক চরিত্র। মাথায় টুপি, মুখে মধু, মনভরা ছলনা। ... মোশতাকের চরিত্রে স্থিরতা বলে কিছু ছিল না। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন না পেয়ে সে ... আওয়ামী লীগ পারলামেন্টারি পার্টির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ও কৃষক-শ্রমিক পার্টিতে গিয়ে ঢোকে। তার রাজনৈতিক জীবন ছিল পরস্পর-বিরোধিতা, আত্মপ্রতারণা ও ভন্ডামিতে ভরা। সারাজীবন সে ডানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সমর্থন যুগিয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য আওয়ামী লীগের প্রগতিশীল অংশটির সাথে থেকেছে। কারো কারো মতে - তাকে (আ.লীগের প্রগতিশীল অংশে) রাখা হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাকে ট্রয়ের ঘোড়ার মত ... ব্যবহার করেছে। তার সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়। সে ... মাহবুব আলম চাষী, তাহেরউদ্দিন ঠাকুর প্রমুখকে সাথে নিয়ে ... ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করে। মুক্তিযুদ্ধ বানচাল করে - পাকিস্তানের

সাথে 'করফেডারেশন' গঠন করাই ছিল এই চক্রের লক্ষ্য। ... আমেরিকানদের সাথেই মোশতাক, হোসেন আলী, চাষী, ঠাকুরদের ঘনঘন ওঠা বসা। এই দলের সাথে যুক্ত হয়েছেন কর্ণেল ওসমানী। ... একটা ক্ষেত্রে ... মোশতাকের সঙ্গে কর্ণেল ওসমানীর মিল। দু'জনেই ভারতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। ... দু'জনেরই ... মাখামাখি বৃটিশ ও আমেরিকান সাহায্য সংস্থার লোক, কূটনৈতিক ও সাংবদিকদের সঙ্গে"।

"মওলানা ভাসানী একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের সময় ৯ মার্চ টাঙ্গাইল থেকে এসে পল্টনের বিরাট জনসভায় বলেছিলেন, 'আপনারা মুজিবকে জানেন না। সে আমার সাথে নয় বছর কাজ করেছে। সে কখনই জনগণের সঙ্গে বেঈমানী করবে না। সে আমার কাছে আমার ছেলের চেয়েও প্রিয়'। আবার বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর ... মোশতাকের সাহসের তারিফ করে অভিনন্দন জানিয়ে ভাসানী তাকে একটি তারবার্তা পাঠান"। এবার বামপন্থী তোয়াহার কথা। " ... পকিস্তানে বিশ্বাসকারী বিহারীরা তখনও পর্যন্ত এরকম একজন বাঙালিকে তাদেরই একজন বলে মনে করতো, যদি সে হয় সবুর খানের মত একজন মুসলিম লীগার অথবা তোয়াহার মত চীনপন্থী কম্যুনিস্ট। মুক্তিযুদ্ধের সময় নোয়াখালি জেলায় ... সে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চাইতেও মুক্তিবাহিনীকে প্রধান শত্রু হিসাবে গণ্য করতো"।

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ইং মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রথমেই বলেছিলেন, "আমরা একটি নতুর পদ্ধতির উন্নয়ন করতে যাচিছ, যা হবে বাংলাদেশপন্থী, ভারতপন্থী, পাকিস্তানপন্থী এবং সর্বোপরি শান্তিপন্থী"। নিক্সনের এ কথাটিকে 'সোনর পাথরবাটি' বানানোর খায়েশ ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি? প্রকৃতপক্ষেই নিক্সন সরকার তখন এসব কোনো দেশের প্রতিই সহানুভূতিশীল বা আন্তরিকভাবে দায়িত্বশীল ছিল না। পাকিস্তানি সেনা-কারাগারে বঙ্গবন্ধুর বেঁচে থাকার বিষয়টিতে "মার্কিনীরা কৃতিত্ব দাবি করে। কিন্তু ঢাকায় তাঁর বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন তাদের গর্বে (এবং অবশ্যই আত্মবিশ্বাসে) আঘাত হানে। ... কিসিঞ্জারের সাবেক সহকারী রজার মরিস মনে করেন - ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের সময় বঙ্গবন্ধু যে বীরের সম্বর্ধনা পান, তা ছিল সম্ভববত (কিউবার ফিদেল) ক্যাস্ট্রোর ট্যাংকে চড়ে হাভানায় প্রবেশের পর মার্কিন বৈদেশিক নীতির হতবুদ্ধিতার একমাত্র পর্ব"।

"চিলির রাষ্ট্রপতি হিসাবে আলেন্দের নির্বাচনের আগে ও পরে ... হেনরী কিসিঞ্জার ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত চিলিতে ... মিথ্যা প্রচার চালাতে প্রায় এক কোটি ৩০লক্ষাধিক ডলার খরচ করে ... । এর পরেও আলেন্দের রাষ্ট্রপতি হওয়া ঠেকাতে পারেনি। অবশ্য ১৯৭০ সালে আলেন্দের ক্ষমতায় আসা ঠেকিয়ে রাখতে না পারলেও ১৯৭৩ সালে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কিসিঞ্জার মনে করতো সে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর ভাগ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম এবং কেউ তার জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করলে ... পথের কাঁটা হিসেবেই বিবেচনা করতো। তার শত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের। ... মরিস বলেন যে, "কিসিঞ্জারের কূটনৈতিক ব্যর্থতা তার একান্ত ব্যক্তিগত সুতরাং প্রতিশোধ অনিবার্য। ... পথের কাঁটা সরিয়ে দেবার ব্যাপারে কিসিঞ্জারের কোন বিবেকের তাড়না ছিল না"। মার্কিন খাদ্য-রাজনীতি এবং বাংলাদেশের ইত্তেফাকের

উদ্যোগে 'জালপরা বাসন্তী-দুর্গতি'র ছবি বিশ্বজোড়া ছড়ানোর কথা আগেই বলা হয়েছে।

১৯৭৩ সালের শেষ দিকে আবদুল গাফফার চৌধুরী প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন, "বঙ্গবন্ধু তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা ভাবছেন এবং বলছেন। মৃত্যুতে তাঁর ভয় ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য যে কাজ তিনি করতে চান, আততায়ীর গুলি হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁকে তা করতে দেবে না, এমন একটা শঙ্কা তিনি পোষণ করতে শুরু করেছিলেন।...এই প্রথম তাঁর মুখে একটা চক্রান্তের ইংগিত পেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি কি সত্যি সত্যি ভাবছেন, কেউ আপনাকে হত্যা করতে চায়? মুজিব বললেন, তুমি সাংবাদিক, তোমাকে একথা মুখ ফুটে বলতে হবে কেন? তুমি কি বুঝতে পার না, কারা আমাকে হত্যা করতে চায়? এবং কেন চায়? ... ১৯৭৩ সালে ... মুজিব গেলেন আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে। সংগে আমাকেও যেতে হল। ... ক্যাস্ট্রোর (কিউবার প্রেসিডেন্ট) ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কঠোর ব্যবস্থা দেখে মুজিব একদিন বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। বলেছিলেন ক্যাস্ট্রো অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা। তার কি এত কঠোর প্রহরা দরকার? ... একজন 'এইড' ... বললেন, ক্যাস্ট্রোকে খুন করার চক্রান্ত কয়েকবার হয়েছে। এই চক্রান্তের পেছনে সি.আই.এ'র হাত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এই প্রথমবার দেখলাম সি.আই.এ'র নামে মুজিব একটু ম্লান হয়ে গেলেন। ... কিছুদিন পরেই চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দে নিহত হলেন সামরিক অভ্যুত্থানে। ... মুজিব বললেন : 'আলেন্দে নিহত হয়েছেন খবরটা শোনার পর থেকেই আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি'। শেখ মুজিবের যে নির্ভয়-চরিত্র ও প্রকৃতির সঙ্গে আমার পরিচয়, সেখানে বহুদূরের চিলির ঘটনায় তাঁকে শঙ্কাবোধ করতে দেখে বিস্ময় বোধ করেছি (২৮/১১-১৩)।

১৫এপ্রিল,১৯৭৪ইং কোলকাতার প্রেসক্লাবে আবদুল গাফফার চৌধুরীর সাক্ষাত আলোচনা হয়েছিল আলোচনা হয়েছিল চিলির নিহত (সিআইএ-পকিল্পনায়) প্রেসিডেন্ট সালভাদর আলেন্দের পত্নী মিসেস আলেন্দের। বাংলাদেশের পরিস্থিতি এবং আলেন্দে-মুজিব সম্পর্কিত আলোচনায় মিসেস আলেন্দে বলেছিলেন : "এটা সি.আই.এ'র একটা সেট প্যাটার্ণ। কোন পপুলার গভরমেন্টকে ওরা ধবংস করার জন্য প্রথমে সেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়। শ্রমিক ধর্মঘট উস্কে দেয়। ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে। এইভাবে পপুলার নেতা বা গভরমেন্টের জনপ্রিয়তা নষ্ট করে দিয়ে তারপর খুনখারাপি শুরু করে। জনমতকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের দিকে নিয়ে নেয়। প্রথমে ওরা ভাব দেখায় গণতন্ত্র পূণপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এসব করা হচ্ছে। তারপর ধীরে ধীরে মিলিটারির মধ্য থেকে ওদের বাছাই করা লোকটিকে ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরের আসনে বসিয়ে দেয়। এইভাবে কঙ্গোতে ওরা লুলুম্বাকে মেরে বসিয়েছে মবুতুকে। ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণকে সরিয়ে বসিয়েছে সুহার্তোকে। চিলিতে আলেন্দেকে সরিয়ে বসিয়েছে পিনোচেকে। জানি না তোমাদের মুজিবের ভাগ্যে কি আছে।" (২৮/২৬)।

প্রসঙ্গতই উল্লেখ্য যে, ১৭ এপ্রিল তারিখে কোলকাতা ময়দানে বিরাট জনসমাবেশে প্রদত্ত বক্তৃতায় মিসেস আলেন্দে বলেছিলেন : "গণতন্ত্রের এখন ... বড় শত্রু আমেরিকা।

তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ অ-পুঁজিবাদী বিকাশ তার কাম্য নয়। তাই চিলি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশে ধবংসাত্মক পরিকল্পনার কাজে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। হাজার হাজার এজেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। এই চক্রান্তের সবচাইতে ভয়ের দিক অন্তর্ঘাত। ... সি.আই.এ. টাকার জোরে একটি অনুন্নত দেশে পার্লামেন্টে, জুডিসিয়ারি এবং প্রচার মিডিয়ায় প্রবেশ করে। অনুগত ব্যুরোক্রেসির মাধ্যমে সরকারের সকল গোপন খবর সংগ্রহ করে এবং পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। যে সরকারের তারা পতন ঘটাবে, তার বিরুদ্ধে এজেন্ট সাংবাদিকদের দ্বারা দেশে বিদেশ অপপ্রচার শুরু করে। এভাবে দেশের এবং বিদেশের জনমত যখন ঐ সরকারের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিগড়ে যায়, তখন তারা চরম আঘাত হানে" (২৮/২৬-২৭)। মিসেস আলেন্দের কথিত পদ্ধতি-বিবরণের সাথে বিশেষ-কোনো ব্যতিক্রম হয়েছিল কি বাংলাদেশে মুজিবের ক্ষেত্রে? মিসেস আলেন্দের বক্তব্য শুনতে শুনতে আবদুল গাফফার চৌধুরীরর "মনে হচ্ছিল আমি যেন বাংলাদেশের কথাই শুনছি। ... বার রার আমার মনে হতে লাগল, বাংলাদেশের আকাশেও ঝড়ের কালো মেঘ ক্রমশই ঘনিয়ে আসছে" (প্রাগুক্ত)।

এ আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতার কারণেই বিএনপি'র প্রতষ্ঠাতা, 'স্বাধীনতা'র ঘোষক জিয়ার কথা কিছু উল্লেখ করতেই হয়। ২৫মার্চ রাত ১১টার পরেও তিনি পাকিস্তানি সেনা-কর্মকর্তা জানজুয়ার আদেশে বন্দরে যাচ্ছিলেন 'সোয়াত' জাহাজ থেকে পাকিস্তানি অস্ত্র-খালাসের জন্য। পূর্বালোচিত এ প্রসঙ্গটিও এখানে এড়ানো যাক। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়া "একজন সাধারণ মেজর হলেও দেশ স্বাধীন হবার পরই তার উন্নতির সদর দরজাটি খুলে যায়। কর্ণেল-ব্রিগেডিয়ার-মেজর জেনারেল হলেন। ১৯৭২ সালেই ... বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উপাধ্যক্ষ্য। আর বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্য দিয়ে খুনীরা ১৯৭৫ সালের ২০ আগস্ট তাঁকে একেবারে সেনাবাহিনীর শীর্ষ পদে বসিয়ে দিল। মাত্র চার বছরের ব্যবধানে ... বাংলাদেশের রাজদণ্ডটি কার্যত তার হাতে এসে গেল। ... কর্ণেল (অব) তাহের ছিলো জিয়ার ঘনিষ্ট জনদের একজন। ... জীবনদাতা বললেও অত্যুক্তি হবে না। স্বার্থের তগিদে জে. জিয়া তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলাতে একটুও দ্বিধা করেনি। ... ১৯৭৩ সালের গোড়ার দিকে টাঙাইলে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের একটি গোপন সম্মেলন। ... আলোচ্য বিষয় ছিল: বাংলাদেশের সে সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা। বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার পর উপস্থিত নেতৃবৃন্দ একটি সিদ্ধান্তে আসেন। ... এই প্রশাসনকে পাল্টাতে হবে। কি ভাব? জনৈক বীর গেরিলা যোদ্ধার জবাব : বঙ্গবন্ধুকে বাঁচিয়ে রেখে। জিয়ার এক্ষেত্রে উল্টো সুর। তিনি বললেন, না, তাহলে হবে না। মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখলে সবকিছু পন্ড হয়ে যাবে। ... এ প্রশ্নেই বৈঠক ভেঙ্গে যায়" (১(২)/১১২৮-১১২৯)। মুজিব-হত্যার পরে, ১৯৭৬ সালের ২ আগস্ট বৃটেনের আই-টিভি মুজিব-হত্যা সম্পর্কে মেজর ফারুক ও মেজর রশীদের একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিল। ম্যাসকারেনহাস গৃহীত ঐ সাক্ষাৎকারে "ফারুক স্বীকার করে, "১৯৭৫ সালের ২০ মার্চ সন্ধ্যাবেলা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের জন্য মেজর জেনারেল জিয়ার সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করে। জিয়াকে সে বলে, 'আমরা জুনিয়র অফিসাররা (মুজিব হত্যার) সব ঠিক করে ফেলেছি। আমরা আপনার সমর্থন ও নেতৃত্ব চাই। ... জিয়ার মন্তব্য ছিল

: 'আমি একজন সিনিয়র অফিসার। এ ধরণের ব্যাপারে আম জড়িত হতে পারি না। তোমরা জুনিয়র অফিসাররা যদি এটা করতে চাও, এগিয়ে যাও' (১(২)/১১৩০)। জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করার পর (সামরিক) ফরমান জারি করে বাংলাদেশের চার মূলনীতি ... নাকচ করে সামরিকতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন"। মুজিব-জীবনের অন্তিম ঘটনাবলী অনুধাবনের জন্য এ-সকল তথ্যের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

এবার সাংবাদিক শফিকুর রহমানের বর্ণনা থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিব-জীবনের অন্তিম পর্বের কথা বলা যাক। বর্তমানে বেশ কিছুকাল যাবৎ বিএনপি-জামাত জোটের "শীর্ষ নেতানেত্রী, পাতি নেতা-নেত্রীরা প্রায়শ একটা কথা বলেন, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু পালালেন না কেন? তারা একটা উদ্দেশ্য নিয়েই কথাটা বলেন। তাদের উদ্দেশ্য হলো বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী নেতৃত্বকে প্রশ্নবোধক করা। বঙ্গবন্ধুকে খাটো করা গেলে জিয়াউর রহমানকে একটু উপরে তোলা যাবে। ... সে রাতে বঙ্গবন্ধুর জীবন চলে যেতে পারতো তা জেনেও তিনি (বঙ্গবন্ধু) চরম ঝুঁকি নিয়েছিলেন" (১(২)/১১১৫)। বঙ্গবন্ধুর জীবন পর্যালোচনা করলে এ-সত্য আদৌ অস্পষ্ট থাকে না যে, তিনি কখনো, কৈশোরকাল থেকেই, পালানোর রাজনীতি করেননি। "১৯৭৫-এর ১৫আগস্ট রাতেও ঘাতকরা পাকিদের মতই গুলি চালাতে চালাতে যখন বাসভবনে ঢুকেছিল তখনো তিনি পেছনের দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করেননি, বরং সামনের দরজা খুলে একইভাবে 'What do you want' বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছিলেন। মুখোমুখি হবার সাথে সাথে নূর হুদার হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গিয়েছিল। জল্লাদ হাবিলদার মোসলেম অস্ত্র তুলে গুলি চালিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেল" (১(৩)/১১১৪)। ঘাতকের বুলেট লেগেছিল সামনের দিক থেকে বঙ্গবন্ধুর বুকে, ভীত কিংবা পলায়ণপর মানুষের মত পিঠের ওপর নয়। এভাবেই সমাপ্ত হলো একটি মহাজীবনের, বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

বঙ্গবন্ধু কি এমন অত্যাসন্ন আক্রমনের কথা, শত্রুর চক্রান্তের কথা জানতেন, সংশয় প্রকাশ করেছেন আবাদুল গাফফার চৌধুরী। নানা সূত্রেই উল্লেখ করা হয়েছে ভারত এবং রাশিয়ার কুটনতিক লাইনে মুজিবকে আসন্ন 'চরম বিপর্যয়'এর আশংকার কথা জানানো হয়েছে। ফিদেল ক্যাস্টো, ১৯৭৩ইং আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে আলিঙ্গন করে বলেছিলেন, "আমি হিমালয় দেখিনি কিন্তু মুজিবকে দেখেছি"। ক্যাস্ট্রো-মুজিব আলোচনার কিছুটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিচ্ছি, যা থেকে উপলব্ধি করা সহজ হবে, মুজিবের মানবিক ভুলের সুযোগে কতটা দানবিক শত্রুতা করেছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুরা।

ক্যাস্ট্রো জিজ্ঞেস করেছিলেন বঙ্গবন্ধুকে : "আপনি কোলাবরেটর আর বিপ্লবের শত্রুদের শক্ত হাতে শাস্তি দিয়েছেন তো? কত জনকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন? বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'আমি কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারিনি। দেশে এত রক্তপাত হয়েছে, আমি কী করে আরো রক্তপাত ঘটাই? ক্যাস্ট্রো বলেছেন 'আপনি ভুল করছেন ফ্রেন্ড। একটা যুদ্ধে জয়লাভ করলেই বিপ্লবের শত্রু শেষ হয় না। আমাকে কত কলাবরেটরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হয়েছে জানেন? ... বঙ্গবন্ধু একটু ম্রিয়মান কণ্ঠে বললেন, ওরা সবাই

আমার দেশের মানুষ, আমার সন্তানের মত, আমি তাদের হত্যা করি কিভবে? ক্যাস্ট্রো বলেছেন, আপনি যাদের চিল্ডরেন ভাবছেন, আপনার এই চিল্ড্রেনই সুযোগ পেলে আপনাকে হত্যা করবে'। ... এক পর্যায়ে ক্যাস্ট্রো জিজ্ঞেস করেছেন, আপনি কি আপনার সামরিক বাহিনীতে 'পার্জ' চালিয়েছেন? অফিসারদের মতিগতির ওপর লক্ষ্য রেখেছেন? বঙ্গবন্ধু বলেছেন, ওরা মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রাণবাজি রেখে যুদ্ধ করেছে। ওদের ওপর আমি বিশ্বাস হারাই কী করে? ... ক্যাস্ট্রো বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধে বা বিপ্লবে অনেকেই অনেক রকম মোটিভ নিয়ে এসে যোগ দেয়। তাদের সবাই মুক্তিযুদ্ধ বা বিপ্লবে বিশ্বাসী নয়। কিউবার বিপ্লবে যারা যোগ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে বাতিস্তার অনেক অনুচর ছিল। অনেকে এসেছিল বিপ্লবী সেজে আমাদের দলে ঢুকে বিপ্লবকে পেছন থেকে ছুরি মেরে নিজেরা ক্ষমতা দখলের জন্য মার্কিন সিআইএ'র সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। আমাকে এধরণের কয়েক শ' বিপ্লবীকে আমার দল 'আর্মড ফোর্সেস' থেকে এলিমিনেট করতে হয়েছে। তা না হলে বহু আগে আমি এবং আমার বিপ্লবী সহকর্মীরা ... এলিমিনেটেড হয়ে যেতাম। ফ্রেন্ড, সব সময় মনে রাখবেন, বিপ্লব করা সহজ, কিন্তু বিপ্লব রক্ষা করা কঠিন" (৩০/১৫৯-১৬০)। নানা সূত্রে বলা হয়, ক্যাস্ট্রো বঙ্গবন্ধুকে এমন কথাও বলেছিলেন যে, আপনি পুরনো-পরাজিত সেনা আর প্রশাসনের ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্র চালাতে চান, "ব্রাদার ইউ আর ফিনিশড্"।

কতিপয় বিশ্বস্ত সহকর্মী আর সাংবাদিকদের মাধ্যমেও বঙ্গবন্ধু ঘটমান এবং সম্ভাব্য প্রায় সব খবরই পেতেন। গাফফার চৌধুরী লিখেছেন, "মুজিবের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ও জাতীয়তাবাদী বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া হাত মিলিয়েছে। মুজিবও এটা বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন দ্রুত আঘাত এগিয়ে আসছে। তাই তিনিও দ্রুত মোড় নিয়েছিলেন আঘাত প্রতিহত করার জন্য। তবে ... তাঁর এই দ্রুত মোড় পরিবর্তন তাঁর শেষ রক্ষার সহায়ক হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট রাত্রে বাংলাদেশের ইতিহাসের আরেকটি অধ্যায়ের যবনিকাপাত হয়েছে বটে– কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষণে এটাকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য সাময়িক বিপর্যয় আখ্যা দেওয়াই ভালো" (২৮/১৬৮)।

কয়েকটি মানবিক মন্তব্য

প্রবুদ্ধ দার্শনিক সরদার ফজলুল করিমের মন্তব্য : "শেখ মুজিবকে আমরা হত্যা করেছি আমাদের অতিক্রম করে বড় হওয়াতে। সবদিকে বড়, তেজে, সাহসে, স্নেহে, ভালোবাসা এবং দুর্বলতায়। ... এবং সেই ঈর্ষা থেকেই আমরা তাঁকে হত্যা করেছি। কেবল এই কথাটি বুঝিনি যে, ঈর্ষায় পীড়িত হয়ে ঈর্ষিতের স্থান দখল করা যায় না। তাইতো এই ভূখন্ডে মুজিবের অবস্থান সবার শীর্ষে (৩০/১৫৭)। মনীষী আবুল ফজলের ডাইরী থেকে : "যীশুখৃস্টকে হত্যার পাপের বোঝা ইহুদিরা আজো বয়ে বেড়াচ্ছে। শেখ মুজিব যীশু ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন মানুষ। তার পরিবারের শিশুরা, ছেলেরা, মেয়েরা (পুত্রবধুরা) সবাই ... ছিল আদম সন্তান। সম্ভববতঃ এটি এ যুগের ... নৃশংসতম

হত্যাকান্ড। ... ১৫ আগস্টের ভোর রাত্রের নির্মমতা কারবালার নির্মমতাকে যেন ছাড়িয়ে গেছে। ... এ দিনের অপরাধ আর পাপ সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে ... বৃহৎ অপরাধ আর বৃহৎ পাপ বিনাদণ্ডে যায় না। ... বাংলার মানুষকে সে দণ্ড একদিন না একদিন একভাবে না একভাবে ভোগ করতেই হবে"। অধ্যাপক হায়াৎ মাহমুদ লিখেছেন : বঙ্গন্ধু-হত্যার যৌক্তিকতা যারা প্রতিপন্ন করতে চায় তারা স্বার্থান্বেষী তো বটেই, অধিকন্তু সম্পূর্ণ নীতিজ্ঞানহীন মানুষ। বঙ্গবন্ধুর কাছে বাঙালির যে ঋণ, তাতে এই নৃশংস হত্যাকান্ড সন্তানদের পিতৃহত্যার সমতূল্য ... সমভাবে ঘৃণ্য ও শাস্তিযোগ্য। এই সরল সত্য উপলব্ধির জন্য ... সৎ ও বিবেকবান মানুষের বিচারবুদ্ধিই যথেষ্ট"। আবদুল গাফফার চৌধুরীর পর্যবেক্ষণ : বঙ্গবন্ধুর হত্যার মাধ্যমে "বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ শুধু হত্যা করেনি, এই স্বাধীনতার শত্রুদের এনে ক্ষমতায় বসিয়েছে এবং জামাতের মতো ঘাতক দলকেও উদার গণতান্ত্রিক দল বলে সার্টিফিকেট" দেয়। (৩০/১৫৭-১৬২)।

বঙ্গবন্ধু-জীবনের এ আলোচনার বইটি শেষ করতে চাই তিনজন বিখ্যাত কবির তিনটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে। প্রথমমেই কবি শামসুর রাহমানের 'তিনি এসেছেন ফিরে' কবিতা থেকে : "ওরা তাঁকে হত্যা ক'রে ভেবেছিল তিনি // সহজে হবেন লুপ্ত উর্ণাজালে আর ধোঁয়াশায়,//মাটি তাঁকে দেবে চাপা বিস্মৃতির জন্মান্ধ পাতালে-// কিন্তু তিনি আজ সগৌরবে/ এসেছেন ফিরে দেশপ্রেমিকের দৃপ্ত উচ্চারণে,// সাধারণ মানুষের প্রখর চৈতন্যে,"। কবি কায়সুল হক 'তিনি এবং আমাদের স্বপ্ন' কবিতায় লিখেছেন; "এখন সত্যি কি নিস্কণ্টক আমাদের পথ?// সব দায়দায়িত্ব এখন//আমাদের// তিনি তো আছেন মিশে আমাদের সত্তার গভীরে"। 'এই নাম স্বতোৎসারিত' মহাদেব সাহার কবিতার কথা : "তুমি কেউ নও, বলে ওরা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গান আর// নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা বলে// তুমি বাংলাদেশের হৃদয় । ... তুমি এই বাংলার ফুলফল, রাখালের বাঁশি, মুক্তিযুদ্ধর গান// এই স্বতোৎসারিত বাংলা কবিতা"।

১৯-১২-১২ইং

পরিশিষ্ট-১:

১৫ মার্চ, ১৯৪৮ইং ভাষা সংগ্রাম পরিষদ এবং পূর্ব-বঙ্গ সরকারের মধ্যে সাক্ষরিত

৮-দফা চুক্তি*

১. অদ্য পাঁচ ঘটিকায় সকল রাজবন্দীর মুক্তি ।
২. ইত্তেহাদ, স্বাধীনতা ও অন্যান্য খবরের কাগজের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ঐ দিনই তুলে নেয়া হবে।
৩. আজই ব্যবস্থাপক পরিষদে (প্রাদেশিক আইন সভা) বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হবে।
৪. আজই ব্যবস্থাপক পরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য অনুমোদন সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে।
৫. পুলিশী নির্যাতনের জন্য ইনকোয়ারি কমিশন করা এবং দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে।
৬. যে সকল গুন্ডা-শ্রেণীর লোক আন্দোলনে ছাত্রদের মারপিট করেছে, তাদের শাস্তি দেয়া হবে।
৭. এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী ছাত্র বা অন্য কাউকে 'ভিকটিম' করা হবে না।
৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর এই মর্মে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে, এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : চুক্তিনামার ১-৭ নং পর্যন্ত শর্তগুলি ছাত্ররা আগেই প্রস্তুত করে এনেছিলেন। অতঃপর আলোচনাক্রমে ৮নং দফাটি মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন নিজ হাতে লিখে চুক্তিনামায় যুক্ত করেছিলেন।

[*সূত্রঃ 'ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু', সরদার সিরাজুল ইসলাম, দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২।]

পরিশিষ্ট-২ :

১৯৫৪ইং যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের ঐতিহাসিক ২১-দফা ম্যানিফেস্টো *

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায় প্রথা রহিত করা হইবে।
৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাহাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং লীগ (মুসলিম) মন্ত্রীসভা আমলের পাট কেলেঙ্কারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।
৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারী সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।
৫. পূর্ববঙ্গকে লবণ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারির কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা আমলের লবণের কেলেঙ্কারী সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাদের অসদুপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।
৬. শিল্প ও কারিগরী শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পূণর্বাসিত করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।
৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।
৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূল নীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।
৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমুহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভূক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমুহকে সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল আইন-কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমুহকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চ শিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং ছাত্রাবাসের অল্প ব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন-ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাদের আয়ের একটি সুসংগত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রী এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করিবার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ ও রহিতকরতঃ বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্ধারণ করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবীতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বয়ত্বশাসন ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্ট ক্ষমতাসমুহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থলবাহিনীর হেড কেয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তান ও নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মানের কারখানা নির্মানকরতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনের মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১. যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

* (৩/৬৬-৬৮)

পরিশিষ্ট-৩ :

১৯৫৪ইং ৬ জুন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় শেখ মুজিবের উত্থাপিত ১১-দফা খসড়া ম্যানিফেস্টো *

১. 'ফেডারেশন অব পাকিস্তান' নামে সত্যিকার অর্থে ফেডারেল পদ্ধতির প্রণয়ন।

২. বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র কায়েম ও যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন।

৩. কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীসহ সকল সরকারী উচ্চপদে মেধা অনুসারে বাঙালিদের নিয়োগ।

৪. পাকিস্তানের উভয় অংশে বৃহৎ শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ।

৫. মোহাজেরদের জন্য সম্মানজনকভাবে পূণর্বাসন কর্মসূচী প্রণয়ন।

৬. ফেডারেশনে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ সাধনে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচী প্রণয়ন।

৭. পূর্ব পাকিস্তানে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন কায়েমের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক মুদ্রা-ব্যবস্থাসহ পৃথক অর্থনীতি প্রণয়ন।

৮. পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের সকল প্রদেশের জন্য পৃথক বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন।

৯. বৈদেশিক মুদ্রার হিসাবনিকাশ ও আয়-ব্যয়ের পূর্ণ অধিকার প্রদেশের হাতে ন্যস্ত করণ।

১০. পূর্ব পাকিস্তানে নৌবাহিনীর সদর দফতর প্রতিষ্ঠানসহ দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে মিলিশিয়া বাহিনী গঠন।

১১. ছাত্রদের দাবীদাওয়াসহ শ্রমিক-কৃষকদের ন্যায্য দাবীসমুহ পূরণ।

* (২৩/৩৯-৪০)।

তথ্য-সূত্র

১. এম. নজরুল ইসলাম সম্পাদিত — 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মারক গ্রন্থ' ১ম খণ্ড: ১(১) ২য় খণ্ড ১(২) ৩য়খণ্ড ১(৩) এম. নজরুল ইসলাম ২০০৭ইং, জোৎস্না পাবলিসার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

২. আবুল মনসুর আহমদ — 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৭০ইং

৩. শেখ হাফিজুর রহমান — 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রেক্ষাপট', জোনাকী প্রকাশনী, ৩৯/৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ২০০১ইং

৪. খোকা রায় — 'সংগ্রামের তিন দশক' (১৯৩৮-১৯৬৮), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী ১৯৮৬ইং, ১০ পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০২

৫. আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন — 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ ১৯৪৯-৯৯' সাকো ইন্টারন্যাশন্যাল লিমিটেড, ৬২-৬৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা , ১৯৯৯ইং

৬. আবু জাফর শামসুদ্দীন — 'আত্মস্মৃতি' প্রথম খণ্ড, আহমেদ পারভেয শামসুদ্দীন ১৯৮৯ইং, ৪/ক, মোমেনবাগ, ঢাকা-১২১৭

৭. এস. এ. করিম — "SHEIKH MUJIB TRIUMPH AND TRAGEDY' Second Edition, দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ২০০৯ইং

৮. শেখ মুজিবুর রহমান — 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ৬১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ২০১২ইং

৯. জহুর হোসেন চৌধুরী — 'দরবার-ই-জহুর' লালন প্রকাশনী, বংশাল রোড, ঢাকা-১০০০ ১৯৮৫ইং

১০. মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান (অব) — 'পূর্বাপর ১৯৭১ পাকিস্তানি সেনা-গহ্বর থেকে দেখা' সাহিত্য প্রকাশ, ৩৭/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ২০০৫ইং

১১. শরীফ শমশির সম্পাদিত — 'এক দফার প্রবক্তা এম এ আজিজ স্মারকগ্রন্থ' সমাজ অধ্যয়ন কেন্দ্র, ১০৫,আগ্রাবাদ বা/এ,চট্টগ্রাম ২০০৪ইং

১২. কর্ণেল শওকত আলী — 'সত্য মামলা আগরতলা' প্রথমা প্রকাশন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিঃ. ঢাকা-১২১৫, ২০১১ইং

১৩. পঙ্কজ ভট্টাচার্য প্রমুখ সম্পাদিত — 'সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক স্মারক গ্রন্থ' সা. আ. মানিক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনা কমিটি, গোপীবাগ ফার্স্ট লেন, ঢাকা-১২০৩, ২০০৯ইং

১৪. এ বি এম মূসা — 'মুজিব ভাই' প্রথমা প্রকাশন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিঃ.ঢাকা-১২১৫ ২০১২ইং

১৫. শাহরিয়ার কবির — 'পাকিস্তান থেকে ফিরে' অনন্যা, ৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা ২০০২ইং

১৬. বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর সম্পাদিত — 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র' আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ১৯৯৩ইং

১৭. স্বদেশ রায় — 'বিক্ষুব্ধ মার্চ ৭১' পল্লব পাবলিশার্স ৬৪/৫ লেক সার্কাস, কলা বাগান, ঢাকা-১২০৫ ১৯৯১ইং

১৮. জি. পি. মিত্র — 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও চার নগরী' নিখিল প্রকাশক, ৮/৯ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০ ২০০০ইং

১৯. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী — 'পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি' জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭, প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০ ২০০৪ইং

২০. গোলাম মুরশিদ — 'মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস'প্রথমা প্রকাশন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিঃ. ঢাকা-১২১৫, ২০১১ইং

২১. তাদামাসা হুকিউরা — 'রক্ত ও কাদা ১৯৭১' প্রথমা প্রকাশন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিঃ. ঢাকা-১২১৫ ২০১২ইং

২২. শেখ সাদী — 'বঙ্গবন্ধু : ভাষা ও মনোজগৎ' স্কুল অব বেঙ্গল হিস্ট্রি, পুঠিয়া, রাজশাহী ২০১২ইং

২৩. তোফায়েল আহমেদ — 'উনসত্তরের গণ-আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু' আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ১৯৯৭ইং

২৪. হালিম দাদ খান — 'বাংলাদেশের রাজনীতি, ১৯৭২-১৯৭৫' আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ২০০৪ইং

২৫. মুনতাসীর মামুন — 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ২০০৪ইং

২৬. আবুল খায়ের সম্পাদিত — 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য' সংঘ প্রকাশন, ৪৮/এ-বি পুরানা পল্টন, ঢাকা ২০০১ইং

২৭. কেন্দ্রীয় কমিটি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র — 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ৩১ ই, তোপখানা, ঢাকা-২, ১৯৮৭ইং

২৮. আবদুল গাফপার চৌধুরী — 'ইতিহাসের রক্ত-পলাশ' আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ১৯৯৬ইং

২৯. এম আর আখতার মুকুল — 'আমি বিজয় দেখেছি' সাগর পাবলিশার্স, ঢাকা, জিপিও বক্স ৩০৫৭ ১৯৮৪ইং

৩০. শেখ গিয়াস উদ্দীন আহমেদ মিন্টু — 'পনেরো আগস্ট ট্রাজেডি ও জনক হত্যার কারণ' মিজানুর রহমান, ১৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ২০০৬ইং

বিশেষ দ্রষ্টব্য : 'তথ্য-সূত্রের ক্রমিক নং (সংশ্লিষ্ট পুস্তকের খণ্ড নং)/পৃষ্ঠা নং, পদ্ধতিতে মূল পাঠে তথ্যোল্লেখ করা হয়েছে।

Northern University * Bangladesh * Library